শেরে বাংলা

শেরেবাংলা হইতে বংগবন্ধু

আবুল মনসুর আহমদ

বংগ বন্ধু

শেরে-বাংলা হইতে বংগবন্ধু



আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস ঃ ঢাকা

প্রকাশক
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর : ১৯৮১
[অগ্রহায়ন : ১৩৮৮]

প্রচ্ছদ অঙ্কনে : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আবদুর রহিম
বুলবুল আর্ট প্রেস,
৬৩, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১
(১—২০ নং ফর্মা)

মোহাম্মদ বদরুজ্জামান
আদর্শ মুদ্রায়ণ
৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন, ঢাকা-১
(২১—২৫ নং ফর্মা এবং ইনার)

আমাদের নিবেদন

বাংলাদেশের স্বনামধন্য কৃতি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার জনাব আবুল মনসুর আহমদের 'শেরে-বাংলা হইতে বংগবন্ধু' নামক এই বইখানি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা যেমন গৌরবান্বিত তেমনি আনন্দিত বোধ করি। গুরুত্বের দিক দিয়ে এই অমূল্য বইখানির প্রকাশ কেবলমাত্র প্রকাশকের দায়িত্ব পালনই নয়, একটি মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালনও বটে,—বইটি পড়ার পর বাংলাদেশের বিদগ্ধ পাঠক সমাজও তা স্বীকার করবেন। বইখানিতে সংযোজিত প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করলেও পারম্পর্যের দিক দিয়ে এগুলির মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আছে, এবং যেসব নীতি ও ঘটনাবলীর বিবৃতি ও বিশ্লেষণ আছে, তার ঐতিহাসিক মূল্যে অপরিসীম। আজকের দিনের সচেতন মানুষের সঠিক পথে অগ্রগমনের জন্যে তা জানা একান্ত দরকার।

জনাব আবুল মনসুর আহমদ তাঁর দুর্লভ বিশ্লেষণ-ধর্মী মনোভংগী বিরল অভিজ্ঞতাপূর্ণ রাজনৈতিক নিরিখ এবং প্রখর দূরদৃষ্টির সাহায্যে আমাদের সত্যিকার স্বাধীনতায় উত্তরণের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর সে পর্যালোচনা একাধারে সৃষ্টি-কুশলতায় শক্তিশালী এবং ভাষার প্রখরতা ও যুক্তির সংহত প্রয়োগে সমুজ্জ্বল। শেরে-বাংলার উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের মর্ম কথা কী ছিল, তার মধ্যে বাংলার মুসলিম মানসের কী মনস্তত্ত্ব কাজ করেছিল—এ বইতে এক-দিকে যেমন তার বিশ্লেষণ বিবৃত, অন্যদিকে তেমনি ভারত বাঁটোয়ারার ফলে বাংগালী কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাকে অবলীলা-ক্রমে ঠকানো হয়েছিল, তার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তাবলী এ বইয়ের অন্যতম উপজীব্য হয়েছে। অতঃপর পাকিস্তানী আমলের পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শোষণ, বৈরী ও প্রতিকূল মনোভাব, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, নিগ্রহ এবং শেষ পর্যায়ে ব্যাপক গণহত্যার মনস্তত্ত্বও এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাকিস্তানী আমলের ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজী, একের পর এক ওয়াদা ভংগ, বাংলাদেশকে ক্রমাগত পাঞ্জাবীদের পদানত করার চক্রান্ত, সামরিক শক্তির জোরে সংহতির নামে নিজেদের একাধিপত্য রক্ষার অপচেষ্টা, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি বাঙালীর সদিচ্ছা ও সহনশীলতা, বাঙালী নেতৃত্বের উদারতা, দূরদর্শিতা ও সংগ্রামশীলতা

ইত্যাদি বিষয়ও আলোচনার অংগীভূত হয়েছে। ভূমিকা লিপিতে লেখক বলেছেন ঃ 'আমাদের নবলব্ধ আযাদি অতীত সংগ্রাম সমূহের সমষ্টিগত ফল। তাই আমাদের সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের বর্তমান জয় অতীত পরাজয়েরই সন্তান। ওসব না ঘটিলে এটা ঘটিত না। তাই আমাদের ওহাবী আন্দোলন, সিপাই বিপ্লব, স্বরাজ-খিলাফত আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এ সবের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিতে হইবে; এদের পরম্পরা বুঝিতে হইবে।'

'আমাদের সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরের মর্মার্থ উপলব্ধি' এবং আজকের স্বাধীনতায় উত্তরণের অববাহিকায় সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলনের পারম্পর্য ও 'তাৎপর্য হৃদয়ংগম' করার জন্যে এ বইখানি বাঙালী পাঠকের সামনে এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে প্রতিভাত হবে, সে কথা না বললেও চলে। বস্তুতঃ বইখানি আরও আগেই (স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই) প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। লেখক স্বয়ং বইখানি প্রকাশের এরূপ সময়-সীমাও নির্দেশ করেছিলেন। আমরা সেমত কাজও শুরু করেছিলাম কিন্তু বর্তমান সময়ে নানা প্রকার যান্ত্রিক অসুবিধা, দক্ষ শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা এবং অপরাপর নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার দরুন আমরা নির্ধারিত সময়-সীমায় বইখানি প্রকাশ করতে সক্ষম হইনি। সেজন্যে আমরা দুঃখিত এবং লেখক ও বিদগ্ধ পাঠক সাধারণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এজন্যে অন্য অজুহাত দেওয়ার কিছুই নেই। আমরা মনে করি, আমাদের এই অপারগতা ও বিলম্বে এ বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্যের কোন ক্ষতি সাধন করবে না।

বহু সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও মনে হয় বইখানিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। মুদ্রণ সৌষ্ঠবও সর্বত্র সমমানের হতে পারেনি। আমাদের অনিচ্ছাকৃত এই সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠক সাধারণের ক্ষমা পাবে, আশা রাখি। বইখানি পাঠক সাধারণের উপযুক্ত সমাদর লাভ করলে এবং এই সব বই প্রকাশ করে আমরা যে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি তা সহানুভূতির সংগে বিবেচিত হলে, আমরা আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

—প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাপারে দু'টি কথা

'শেরে-বাংলা হইতে বংগবন্ধু' মরহুম আবুল মনসুর আহমদের প্রকাশিত শেষ ক'টি বইয়ের অন্যতম। এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'তে চলেছে সুদীর্ঘ কাল পরে যদিও প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। আহমদ পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দীন আহমদকে এজন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আজ আর লেখক আমাদের মাঝে নেই। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ছিল অসামান্য। এ সাফল্য অর্জনে তাঁর সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয়, পুত্র ও সহচর হিসেবে আমার ছিল। বেঁচে থাকলে তিনি দেশ ও জাতিকে আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু যতটুকু তিনি দিয়ে গেছেন তার মূল্যায়নও হবার লক্ষণ দেখছি না। তাঁর মতাদর্শ প্রচারেও তিনি প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। স্বয়ং তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'আত্মকথা'য় তিনি বলেছেনঃ 'ইমার্সনের মত পন্ডিত ব্যক্তির কথা বুঝিতে মার্কিনবাসীর পঞ্চাশ বছর লাগিয়াছিল, আমার মত অপন্ডিত ব্যক্তির কথা বুঝিতে আপনাদের একশ' বছর লাগিলেও আমি তাতে বিস্মিত হইব না।'

মরহুমের আজীবন সংগ্রাম ছিল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের, স্বজাত্যাভিমানের। অবিভক্ত বাংলায় যদিও তাঁর সবচাইতে বড়ো পরিচয় ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্যাটায়ারিস্ট হিসেবে—তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও অসমসাহসী সাংবাদিকতা জাতির জন্য এক অক্ষয়, অমর সম্পদ। এ ছাড়া তিনি নিজেকে নিষ্ঠাবান ও সত্যাদর্শী ঐতিহাসিক হিসেবে দাবী করতেন। এটার প্রমাণ হিসেবে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

'শেরে-বাংলা হইতে বংগবন্ধু' বইটি প্রথম বের হয় তেয়াত্তুরের মাঝামাঝি। তখনকার একদিনের অভিজ্ঞতার ফসল এটা।

মরহুমের পুত্র হিসেবে আমাকে অনেক রাজনৈতিক ও অন্যান্য মিশনে যেতে হ'ত। একদিন আমাকে বইটির একটি কপি দিয়ে আব্বা বললেন যে এটা তুমি স্বয়ং 'মুজিবকে দিয়ে এসো।' সে সময় জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল। আমি সোজা চলে গেলাম রফিকুল্লা চৌধুরীর কাছে। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রীর সচিব। এককালে সলিমুল্লা মুসলিম হলে আমারই ক্যাবিনেট কলীগ। আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন 'বস্ যে কি ব্যাপার ?' আমি বললামঃ আপনার বর্তমান 'বসের' অর্থাৎ বংগবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে

চাই। চৌধুরী বললেন 'আপনাকে আমার মাধ্যমে যেতে হবে না—সোজা চলে যান তাঁর কক্ষে।' কথামতো প্রধানমন্ত্রীর কামরায় সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ঢুকে পড়লাম। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আসনে ছিলেন না। চৌধুরী আমাকে আগেই বলেছিল যে 'খাসকামরায় নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পাশেই আর একটি ছোট শয্যাবিশিষ্ট কামরা আছে সেখানে নির্ঘাৎ পাওয়া যাবে।' গেলও তাই। তিনি শুয়ে শুয়ে মাইক্রোফোন মাধ্যমে সংসদের বিতর্ক শুনছিলেন।

আমাকে দেখেই প্রধানমন্ত্রী শোয়া থেকে উঠে স্বভাবসিদ্ধ হাসি মুখে সাদর অভ্যর্থনার সুরে প্রশ্নের তুফান ছুটিয়ে বললেন ঃ

"কিরে মহবুব যে। হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে ? মনসুর ভাই কেমন আছেন ? বোস বোস—হাতে ওটা কি ?"

আমি বললাম "আব্বার সর্বশেষ বই—ওটা দিতেই তো আসা। আব্বা বললেন আপনাকে নিজ হাতে এটা পেঁৗছে দিতে।"

"দেখি দেখি আরে মনসুর ভাইয়ের লেখা বই। আমি তো তাঁরই শিষ্য। এ বইয়ে দেখছি তিনি আমাকে 'বংগবন্ধু' লিখেছেন। এ যে আমার জন্য কতবড়ো সম্মান সেটা তাঁকে বলিস। সকলের বলা এক কথা—আর মনসুর ভাইয়ের কলমে বের হওয়ার আলাদা সম্মান।" আমি চুপ করে থাকলাম। বংগবন্ধু ইতিমধ্যে বইটি খুলে পড়া শুরু করেছেন। পড়ছেন আর মন্তব্য করে চলেছেন।

"আহা! কি সুন্দর তাঁর ভাষা। তিনি পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে কলম রেখে যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম—অন্যান্যরা দুহাতে কলম ধরেও অতো সুন্দর লিখতে সক্ষম হবেনা।"

"তুই আমার তরফ থেকে তাঁকে একটা অনুরোধ জানাবি। তিনি ২১ দফার স্রষ্টা ৬ দফার রচয়িতা। তাঁকে বলিস বাংলাদেশের ৪ মূলনীতির ওপর, যেটাকে সকলে মুজিববাদ বলে, তিনি তা বলবেন না আমি জানি, ওর ওপর একটা বই লিখতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মনসুর ভাই লিখলে সেটা জনগণের কাছে স্পষ্ট হবে। কিরে বলবি তো ? তিনি কি আমার কথা রাখবেন ?" আমি বললাম ঃ 'নিশ্চয় তিনি আপনার কথা রাখবেন। আমি বলবো।'

—"তা তুই কি করছিস ? তুই কি রাজনীতিতে আসবিনা ? মনসুর ভাইয়ের ট্রাডিশনটা তোরা কি কেউ রাখবিনা ? যদি রাজী থাকিস তবে তোকে বিদেশে পাঠাতে পারি।"—বঙ্গবন্ধু বলেই চলেছেন বইটি পড়তে পড়তে। আমি বললাম ঃ 'আব্বাকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।'

(সাত)

—"তুই কি ভাবছিস আমি তোকে একা যেতে বলেছি ? মনসুর ভাইকেও আমি সরকারী খরচে বিদেশে পাঠাচ্ছি। যদি রাজী থাকেন তবে বলিস।" বল্লেন বংগবন্ধু। এ সময়ের মধ্যে মন্ত্রী বা অন্যকাউকে আসতে দেননি। একবার সেরনিয়াবৎ সাহেব আর একবার তোফায়েল আহমদ সাহেবকে শুধু ২/১ মিনিটের জন্য ভিতরে আসার অনুমতি দেন।

এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু বইটির অনেক পাতাই পড়ে ফেলেছেন। হঠাৎ কি একটা জায়গায় যেন তিনি আটকা পড়লেন। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, "হ্যাঁ ! মনসুর ভাই জিন্না ব্যাটাকে কায়েদে আযম লিখেছেন ? তিনি কি জানেন না যে বাঙালীদের যাবতীয় সর্বনাশের মূলে ঐ জিন্না শয়তানটা ?"

আমি তো একেবারে হতভম্ব। এতো সুন্দর আবহাওয়াটা একেবারে মাটি হ'বার অবস্থা। বংগবন্ধুর চীৎকার শুনে তোফায়েল সাহেব দৌড়ে এসে পড়লেন। আমাকে জিজ্ঞেস করার আগেই আমিও সমান উচ্চকণ্ঠে বল্লাম ঃ 'আব্বা জানতেন এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। তাই আগে থাকতেই এর জবাবও আমাকে দিয়ে রেখেছেন।'

"বল্ কি বলেছে বুড়া। বলার আবার এর মধ্যে কি আছে ?"

সম্বোধন সম্মানজনক মনসুর ভাই থেকে সোজা নেমে গেছে 'বুড়ায়'। আমি বললাম ঃ "তিনি বলেছেন মুজিব যদি একান্তই বইটা পড়ে সে নির্ঘাৎ জিজ্ঞাসা করবে এটা।" তুমি আমার হয়ে বলবে "আবুল মনসুর একজন ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকের কর্তব্য ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা। তাঁর সাধ্য নেই ইতিহাসের গতি পরিবর্তন, পরিবর্ধনের। জিন্না সাহেবকে তাঁর দেশবাসী ভালবেসে কায়েদে আযম পদবী দিয়েছে। সেটা আবুল মনসুরের মতো ঐতিহাসিকের কলমের এক খোঁচায় শেষ হতে পারে না।" এ ছাড়া আরও বলেছেন "মুজিবকে মনে করিয়ে দিও যে পাকিস্তানী আমলের সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর ভারতীয় নেতা গান্ধীকে চিরকাল আমি মহাত্মাজী বলে অভিহিত করে এসেছি পাকিস্তানী ভ্রুকুটী অগ্রাহ্য করে। সম্মানী লোকের সম্মান দিতে জানাটাও গৌরবের, যে দেয় তার জন্যই যে পায় তার জন্য নয়।

তাছাড়া খোদা না খাস্তা এমন দিন যদি বাংলাদেশে কোনদিন আসে যেদিন শেখ মুজিবকে বংগবন্ধু বলার কেউ থাকবে না—ঐতিহাসিক আবুল মনসুর একা হলেও সে দিনও তাঁকে বংগবন্ধু বলেই সম্বোধন করবে তার বইয়ে, এটা তাকে বলে দিও।"

"আহঃ বুড়া আমারে জ্বালাইছে"—বলে বংগবন্ধু আমার দিকে দুষ্টামীর হাসি হেসে আবার শুয়ে পড়লেন। 'মনসুর ভাইকে বলিস কাল আমি তার সঙ্গে দেখা করতে আসছি এটার ফয়সালা করতে।'

(আট)

আজ বংগবন্ধুও নেই আবুল মনসুর আহমদও নেই কিন্তু এ ঘটনাটা চির ভাস্বর হয়ে আছে আমার মনের মণি কোঠায়। এ কাহিনী আমি বহু লোককে বলেছি দুজনেরই জীবিতাবস্থায়। এটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেন শেরে বাংলা আর তার রূপকার বংগবন্ধু। শেরে বাংলা সম্পর্কে আবুল মনসুরের মত ছিলঃ "এঁর মাঝে আমাদের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি ছিলেন পুরোপুরি বাঙ্গালী আবার খাঁটি মুসলমান। বাংলাদেশের আর্ট কালচার সিভিলিজেশনের এটাই কিন্তু আসল রূপ।

এ বইয়ে সংযোজিত প্রবন্ধগুলোর প্রতিপাদ্য এটাই। আমাদের দেশ হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি বা মাটি ফুঁড়েও বের হয় নি। আমরা ভেঙ্গে গেছি কিন্তু মচকাইনি। বাংলাদেশীদের আলাদা বৈশিষ্ট্যই এর কারণ।

মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে এ বইয়ের শেষ কপিটা মহিউদ্দীন সাহেবকে স্বহস্তে উপহার দিয়ে লেখক বলেছিলেন এটা প্রকাশের বন্দোবস্ত করতে। মহিউদ্দীন সাহেব তাঁর দে'য়া কথা রক্ষা করেছেন। সে জন্য জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ আমার, আমার মায়ের, ভাইদের, পরিবারের এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে।

৫৪৩ এল ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
রোড নং ১৩, ঢাকা

মহবুব-আনাম
৫ই ডিসেম্বর '৮১

ভূমিকা

এক

পাকিস্তান ভাংগিয়া দুই টুক্‌রা হইয়াছে। পূর্বাঞ্চল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে উন্নীত হইয়াছে। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। এইরূপেই সে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছে। গণতন্ত্রী আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ যে বিশ্বের দরবারে তার যথাযোগ্য মর্যাদার স্থান দখল করিবে, সে সম্বন্ধে কারও মনে দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটিয়াছে। শেরে-বাংলা ফযলুল হক ১৯৪০ সালে লাহোরে যা শুরু করিয়াছিলেন, বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে তা সমাপ্ত করিয়াছেন।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কোনও দাম নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য এ-সব প্রবন্ধের খুবই আছে। শেরে-বাংলা হইতে বংগবন্ধু পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্রমবিকাশটা এতে বুঝা যাইবে। তাই নানা দিক হইতে এ-সব প্রবন্ধ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়কদের কাজে লাগিবে। কেন, কিভাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল, কেনই-বা তা ভাংগিয়া গেল, এটা জানা থাকা খুবই দরকার সকলের জন্যই। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং রাষ্ট্রনেতা ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে এ ইতিহাসের খুঁটিনাটিও জানিতে হইবে।

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আমাদের মুক্তি-যুদ্ধের ফল। এই মুক্তি-যুদ্ধ একটা আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ সংগ্রামের একটা ডায়লেকটিক আছে। এ ঘটনার একটা ধারাবাহিকতা আছে। সে ধারাবাহিকতা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে প্রতিষ্ঠিত। সে বস্তুবাদের ঘটনা-পরম্পরা মাইলস্টোনের মতই সুস্পষ্ট।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিজেই মানুষের জীবনাদর্শ নয়, জীবনাদর্শের উপায় মাত্র। উপায় হিসাবেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। প্রাথমিক হইলেও এটা অপরিহার্য পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপকে নির্ভুল করিতে হইলে, মানে আমাদের স্বাধীনতাকে সফল করিতে হইলে, আমাদের গতিপথে

যেমন সামনে ও ঊর্ধ্বে নযর রাখিতে হইবে, তেমনই পিছন ফিরিয়া দেখিতে হইবে এবং পায়ের নীচে তাকাইতে হইবে। চাকা-ঘোরার মতই এই উভয় কাজই অগ্রগতির অবিচ্ছিন্ন অংশ। আমাদের নবলব্ধ আযাদি অতীত সংগ্রামসমূহের সমিষ্টিগত ফল। তাই আমাদের সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের বর্তমান জয় অতীত পরাজয়েরই সন্তান। ও-সব না ঘটিলে এটা ঘটিত না। তাই আমাদের ওহাবী আন্দোলন, সিপাই বিপ্লব, স্বরাজ-খিলাফত আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, এ সবের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিতে হইবে; এদের পরম্পরা বুঝিতে হইবে।

দুই

প্রধানতঃ মুসলিম বাংলার উদ্যোগেই পাকিস্তান হইয়াছিল। শেরে-বাংলা ফযলুল হক ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে খ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম-বাংলার ভোটাররা প্রায় একবাক্যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতের মুসলিম-মেজরিটি প্রদেশসমূহের আর কোথাও পাকিস্তানের পক্ষে এত ভোট পড়ে নাই। অথচ ভারত বাটোয়ারার বেলায় মুসলিম বাংলা যেমন ঠকিয়াছে, এমন ঠকা আর কোন প্রদেশ ঠকে নাই। শুধু ভারতের মোকাবেলাই ঠকে নাই, পশ্চিম পাকিস্তানের মোকাবেলাও ঠকিয়াছে। তথাপি তারা অভিযোগ করে নাই। নিজেদের ভোটে গণ-পরিষদে পশ্চিমা নেতাদের স্থান করিয়া দিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ও সংরক্ষণে যে বাংলা এত উৎসাহ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখাইয়াছে, সেই বাংলাই আজ পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল কেন, সাধারণভাবে বিশ্ববাসীর এবং বিশেষভাবে বাংলা ও পাকিস্তানের অধিবাসীর সে কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের জীবনে বাংলার প্রতি যে নির্মম, আত্মঘাতী ও অদূরদর্শী ঔপনিবেশিক দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে, তা সকলেরই জানা আছে। শুধু এই সব ও এমন ধরনের অবিচারের প্রতিবাদেই যে-কোন দেশ যে-কোন জোট ভাংগিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে। ইতিহাসে এমন নযির অনেক আছে। তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও আয়ার্ল্যান্ডের বৃটিশ জোট হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তবু বাংলা-পাকিস্তানের ব্যাপারটা ঐ-সব স্বাধীনতা আন্দোলন হইতে মূলগতভাবে পৃথক। অন্যান্য অনেক পার্থক্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য

পার্থক্য এই যে, (১) বাংলা ও পাকিস্তানের ঐক্য-জোটটা ছিল স্বেচ্ছা-মূলক, যবর-দখলের ব্যাপার ছিল না; (২) সে ইচ্ছাটা উভয় দেশের নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, জনগণের ভোটে তা সমর্থিত হয় নাই; (৩) এই কারণে ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন এ জোটটা ছিল পরীক্ষামূলক, এক্সপেরিমেন্টাল; (৪) সর্বোপরি এই জোট ছিল ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের, গণরায়-সমর্থিত ম্যানিফেস্টো ও জনগণের নিকট দেওয়া ওয়াদার সুস্পষ্ট বিরোধী। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই কোণে দুইটি স্বাধীন মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইয়াছিল।

তিন

কাজেই দেখা যাইতেছে, সাবেক পাকিস্তান কোনও গণ-সমর্থিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল না। এই তথাকথিত রাষ্ট্রে তেইশ বছরে কোনও সাধারণ নির্বাচন হয় নাই। তেইশটি বছর পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ধাক্কাতেই উহা ভাংগিয়া গিয়াছে। পঁচিশ বছরেও এই রাষ্ট্রের একটি শাসনতান্ত্রিক বিধান রচিত হইতে পারে নাই। নয় বছরের চেষ্টায় যে একটি শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল, একদিনের সামরিক আঘাতে তা ভাংগিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের সারাটা জীবন কাটিয়াছে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তে এবং সামরিক ডান্ডা-বাযিতে। দেশবাসী একদিনের তরেও স্বাধীনতার স্বাদ চাখিতে ও স্বাধীন নাগরিকের অধিকার ভোগ করিতে পারে নাই। অপরদিকে চলিয়াছে দমন, যুলুম ও শোষণ।

তবু এ জোট ভাংগায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকে ত হইয়াছেনই, বাংলারও অনেকে হইয়াছেন। কারণ যতই অসহ্য হউক, সহজে জোট ভাংগিতে কেউ চায় না। স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য বটে, কিন্তু ঐক্য ভাংগা বেদনাদায়ক। এই বেদনার অংশীদার হইয়াও সকলে স্বীকার করিবেন, এ ছাড়া বাংগালীর সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। পশ্চিমা ভাইরা বাংগালীদের একরূপ পিটাইয়া-খেদাইয়া স্বাধীন করিয়াছেন! কোনও বাংগালীই পাকিস্তান ভাংগিতে চায় নাই। বরঞ্চ উল্টাটাই সত্য। এই বই-এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে শেরে-বাংলা, সুহ্‌রাওয়ার্দী ও বংগবন্ধু মুজিবুর রহমান সহ বাংলার সকল জাতীয় নেতাই শেষ পর্যন্ত মনে-প্রাণে লাহোর প্রস্তাব-ভিত্তিক ফেডারেশন হিসাবে পাকিস্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। এমন যে আমাদের স্বাধীনতার অগ্রনায়ক আওয়ামী লীগ, তাঁরাও বাংলার স্বাধীনতার দাবী করেন নাই। তাঁদের নির্বাচনী ইশতাহারে 'ছয় দফা'র তিন বিষয়ের ফেডারেল কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল। এই ইশতাহারকে রেফারেন্ডাম ঘোষণা করিয়া আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের

প্রায় সবকয়টি ও প্রাদেশিক পরিষদের শতকরা পঁচানব্বইটি সীট দখল করিয়াছিলেন। বলা যায়, বাংলার ভোটাররা প্রায় একবাক্যে ছয় দফা সমর্থন করিয়াছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক অভিযানের আগেতক স্বাধীনতার কথা কেউ বলেন নাই। যখন দুই পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল, তখন যে দুই-একজন পূর্ব পাকিস্তানী আওয়ামী নেতা বাংলার স্বাধীনতার কথা বলিয়াছিলেন, তাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের সাথে আপোস করিতে পশ্চিমা নেতাদের চাপ দেওয়া। এই অবস্থায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টসহ পশ্চিমা নেতাদের সহিত আওয়ামী নেতাদের আলোচনা চলিতে থাকাকালে অতর্কিতে রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অপ্রস্তুত শান্তিপ্রিয় বাংলার জনগণের উপর বিশ্বের নিষ্ঠুরতম বর্বর আক্রমণ চালায় দেশেরই প্রতিরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রপতির হুকুমে। মনের দিক হইতে এই দিনই পাকিস্তান ভাংগিয়া গিয়াছে। এদিনের আগে যেমন পাকিস্তান ভাংগিয়া দিবার পক্ষে কোন পূর্ব পাকিস্তানী ছিলেন না, ঐ দিনের পরে তেমনি পাকিস্তান বজায় রাখিবার পক্ষেও কোনও পূর্ব-পাকিস্তানী ছিলেন না।

চার

এইভাবে পঁচিশ বছর পরে যে পাকিস্তান ভাংগিয়া গেল, তাতে দুইটি সান্ত্বনার কথা আছে। একটি এই যে, যে-মুসলিম বাংলা পাকিস্তান গড়ার কাজে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তারা পাকিস্তান ভাংগে নাই। অপরটি এই যে, এটা ভাংগিয়া ভালই হইয়াছে। অপর দিকে এই ব্যাপারে লজ্জা ও পরিতাপেরও দুইটি দিক আছে। তার একটি এই যে, স্বেচ্ছায় আপোসে এজমালী পরিবার গড়িয়াছিলাম, স্বেচ্ছায় আপোসে তা ভিন্ন করিতে পারিলাম না। অপরটি এই যে, এই এজমালী পরিবার পৃথক হইতে দুনিয়ার জঘন্যতম গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল।

লজ্জা ও পরিতাপের দিকটাই আগে বলিয়া লই। অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা দেশে কঠোর দমন নীতি প্রচলনের নযির দুনিয়ায় অনেক আছে। কিন্তু সেটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, বিনাবিচারে আটক করণ, প্রেসের কণ্ঠ রোধ, সভা-সমিতি ও পার্টি নিষিদ্ধ করণ, ইত্যাদি কার্যতায় সীমাবদ্ধ থাকে। সৈন্য বাহিনী নামাইয়া নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর গণহত্যা চালানোর নযির দুনিয়ায় আর নাই। শাসিত ও শাসকগোষ্ঠী দুই জাতির লোক হইলে অবশ্য এটা কল্পনা করা যাইতে পারে। মুখে যাই বলুন, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা যে বাংগালীদের ভিন্ন জাতির লোক মনে করিতেন

ভা কথায় প্রথম প্রকাশ করেন জেনারেল আইউব। তাঁর এক দশকের স্বৈরাচারী শাসনের শেষার্ধে তিনি খোলাখুলি বলিতে শুরু করেন: যদি পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান হইতে সরিয়া পড়িতে চায়, তবে সিভিল, ওয়ারের মধ্য দিয়া অস্ত্রের ভাষায় সে বিদ্রোহ দমন করা হইবে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণা রাজ্যসমূহের বিদ্রোহ উত্তরী রাজ্যেরা যেমন করিয়া গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দমন করিয়াছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাই করিবে। জেনারেল আইউবের এই 'থেট্টা' জেনারেল ইয়াহিয়া কাজে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই প্রয়োগের আগের দিন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমি ধারণাই করিতে পারি নাই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও জেনারেল-প্রেসিডেন্ট নিরস্ত্র বাংগালীর বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী নামাইবার কল্পনাও করিতে পারেন। আইউবের 'গৃহযুদ্ধ' কথাটার অর্থ আমি বুঝিয়াছিলাম বাংগালীরা তাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবির সমর্থনে অস্ত্র ধরিলেই পশ্চিমারা সেনা বাহিনীর জোরে তা দমন করিবে। কিন্তু বাংগালী ভোটারদের সব ভোট আওয়ামী লীগের 'ছয় দফার' পক্ষে পড়িলেই এবং সে ছয় দফা পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী মনে হইলেই আওয়ামী লীগ, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও তাঁদের সমর্থক ভোটারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী নামান হইবে এবং সেটাকে বিদ্রোহ দমন বা গৃহযুদ্ধ বলা হইবে, এটা আমার মাথায় ঢুকে নাই। তবে এঁরা কিসের জন্য 'নিজের দেশের' উপর কামান মেশিন গান দাগিয়া, বোমা ফেলিয়া লক্ষ-লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ মারিতেছে, হাজার-হাজার দালান-কোঠা ভূমিসাৎ করিতেছে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের শস্যক্ষেত্র ও গাছপালা পোড়াইয়া দিতেছে? এরা কি পাগল হইয়া গিয়াছে? না কি আমি পাগল হইয়া গেলাম?

নিজ দেশবাসীর উপর এই গণহত্যা যে ওদের পাগলামি ছিল না, তাদের বিবেচনায় যে ওটা ছিল তাদের পবিত্র কর্তব্য ও অধিকার, সেটা জানিতে আমার তিন মাস সময় লাগিয়াছিল। জুন মাসের শেষ দিকে যখন 'বিচ্ছুদের' দুষ্কৃত' বাড়িয়া গেল, সেই সময় শাসক-গোষ্ঠীর প্রভাবশালী একজন আমার বাসায় আসিয়া তিরস্কারের সুরে আমার বহুত-বহুত অতীত গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া ধমকের সুরে বলিলেন: 'পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় আপনার কি কোন দায়িত্ব নাই?' আমি যখন দেখাইলাম যে, তলওয়ারের আঘাতে তাঁরাই সংহতির গলা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, তখন তিনি শসস্ত্র বাহিনী নামাইবার পক্ষে যুক্তি দিতে লাগিলেন। তর্কে-তর্কে আমি বলিলাম: 'বাংগালীরাই ভোটের

জোরে পাকিস্তান বানাইয়াছে, এটা আপনি মানেন? বিনা দ্বিধায় তিনি বলিলেনঃ এটা আমরা সবাই মানি ও প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করি। তর্কে জিতিবার রাস্তা আমার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া আমি প্রত্যয়ের সাথে বলিলামঃ 'ভোট দিয়া যারা পাকিস্তান বানাইয়াছে, ভোট দিয়া সে পাকিস্তান ভাংগিবার অধিকারও নিশ্চয়ই তাদের আছে।'

আমার ঐ কথার জবাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ উচ্চশিক্ষিত প্রভাবশালী সরকারী ভদ্রলোক যে কথাটি বলিয়াছিলেন, সে কথাটি পাঠকদের শুনাইবার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনাটির অবতারণা করিলাম। তিনি দৃঢ়তার সংগে বলিলেনঃ 'না, সে অধিকার তাদের নাই। বাংগালী মুসলিমদের হাতে ভোট ছিল, তাই ভোট দিয়া পাকিস্তান বানান তাদের অধিকার ও দায়িত্ব (রাইট ও রেস্পন্সিবিলিটি) ছিল। আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে অস্ত্র আছে, তাই সে অস্ত্র দিয়া পাকিস্তান রক্ষা করা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব।' আমি বিস্ময়ে বলিলামঃ 'পূর্ব পাকিস্তানীদেরে হত্যা করিয়াও?' তিনি সমান জোরে বলিলেনঃ 'জি হাঁ, পূর্ব পাকিস্তানীদেরে হত্যা করিয়াও। যারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না, পাকিস্তানে তাদের বাঁচিবার কোন অধিকার নাই।' তিনি আরও যে সব কথা বলিলেন তার অর্থ এই যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে গিয়া যে কয় মিলিয়ন (দশ লাখ) বাংগালী মারিতে হইবে, সে পরিমাণ খাঁটি পাকিস্তানী ভারত হইতে আনা যাইবে। এখানে বাশেন্দার অভাব হইবে না।

পাঁচ

এর থনে এটা বোঝা গেল যে, অনেক পশ্চিম পাকিস্তানী পূর্ব পাকিস্তানীর চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিটাকেই বেশী আপন মনে করিতেন। এটা ঔপনিবেশিক মনোভাব এবং কালক্রমে এটা তাঁদের সাধারণ মনোভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানের সৃষ্টির গোড়াতে পশ্চিমা ভাইদের মনে যাই থাকুক, অবস্থা ও পরিবেশে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে যেটা তাদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক দাবীর রূপ পাইয়াছিল তা এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানটাই পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ মাত্র। একটা অপরটার অংশ হইলে অপরটাও একটার অংশ, এটা তেমন ব্যাপার নয়। তাই এর উলটাটাও সত্য নয়। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানই পাকিস্তান, আর পশ্চিম পাকিস্তানটা সেই পাকিস্তানের অংশ মাত্র, কোনও পশ্চিমা ভাই-ই

এ ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আলাস্কাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ মনে না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই আলাস্কার অংশ মনে করিলে যেমনটা হয়, এখানেও তেমনটাই হইত। শুধু আয়তন নয়, রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিষ্ঠানও এই মনোভাব সৃষ্টির ও বৃদ্ধির গোড়ায় কার্যকরী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে বসিয়া সার্ভে-অব-পাকিস্তান 'পাকিস্তানের' যে সরকারী ম্যাপ প্রকাশ করিতেন, সেটা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানেরই ম্যাপ। সেই ম্যাপের এককোণে 'ইনসেট' হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের একটি ও জুনাগড় ও মানভাদারের একটি করিয়া ক্ষুদ্র ম্যাপ থাকিত। এমন পরিবেশে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছোট হইলেও বাধিত না। আকারে ছোট হইয়াও ইংল্যান্ড বৃহদাকারের মার্কিন মহাদেশকে উপনিবেশ মনে করিতে পারিয়াছিল। মোট কথা, একবার ঔপনিবেশিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিলে সেখানে আর এক জাতীয়তা-বোধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। এ অবস্থায় আইউবের গৃহযুদ্ধের হুমকি আর ইয়াহিয়ার গণহত্যা দুইটাই মূলতঃ শাসিত জাতির বিরুদ্ধে শাসক জাতির ঔপনিবেশিক অহমিকার প্রকাশ।

পূর্ব পাকিস্তানীরাও সাধারণভাবে এবং তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্ব বিশেষভাবে, পাকিস্তানের দুই উইংকে দুই স্বতন্ত্র জাতি মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সেটা মেজরিটি-মাইনরিটি বা শাসক-শাসিত দুই জাতি নয়, সমান দুই কালচারেল, লিংগুয়িস্টিক ও রেশিয়াল জাতি। এমন দুইটি জাতিকে একটি সেকিউলার পলিটিক্যাল নেশনে উন্নত করা যায় কি না, পঁচিশ বছরের পাকিস্তান ছিল তারই এক্সপেরিমেন্ট।

ছয়

এখান থনেই আমাদের সান্ত্বনার দিকটার শুরু। পাকিস্তান ব্যর্থ হওয়ার মানে কি? নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো লাহোর প্রস্তাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দুইটি মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের কথা ছিল। তার খেলাফে দুই প্রান্তের দুইটি রাষ্ট্রকে এক রাষ্ট্র করা এবং তারই একটি রাষ্ট্রে বসিয়া অপরটি শাসন করিবার যে চেষ্টা, মাত্র সেইটাই ব্যর্থ হইয়াছে। তার মানে, লাহোর প্রস্তাবের নির্ভুলতা প্রমাণিত হইয়াছে, সে প্রস্তাবের ব্যতিক্রম ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। লাহোর প্রস্তাবে ফিরিয়া যাইবার মত গণতান্ত্রিক ও প্রতিশ্রুত পন্থার জন্য যুদ্ধ করিতে হইল, এই স্বীকৃত অধিকার ও মেজরিটির বাঁচার দাবি আদায়ের চেষ্টায় নিরস্ত্র মেজরিটি সশস্ত্র মাইনরিটির হাতে বিশ্বের নিষ্ঠুরতম বর্বর গণহত্যার শিকার হইল। এর পরিণামও

চরম বিষময় হইবার কথা। কিন্তু স্বাধীন বাংলার মনে কোনও প্রতিহিংসা নাই; প্রতিশোধ লইবার কোনও বাসনা নাই। এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন স্বয়ং বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবেত বিশ লক্ষ লোকের সামনে সকলের করতালির মধ্যে। এমনি মহৎ বাংগালীর প্রতিদান! এমনি মহীয়ান তাদের নেতা! শেখ মুজিব বলিয়াছেন ঃ 'তোমরা সুখে থাক; আমাদেরে সুখে থাকিতে দাও!' লাহোর প্রস্তাবে ফিরিয়া যাইবার এর চেয়ে বাংগালীর পক্ষে উদার ও পশ্চিমা ভাইদের পক্ষে সস্তা উপায় আর কি হইতে পারে? পশ্চিমা ভাইরা ভারত বাটোয়ারার সময় সবটুকু সুবিধা নিজের কোলে টানিলেন, কলিকাতার দামে লাহোর কিনিলেন, বাটোয়ারায় আমাদের প্রাপ্য অংশের সবটুকু পশ্চিমে নিয়া গেলেন, পঁচিশ বছর ধরিয়া স্বৈরাচারী পন্থায় ও সামরিক শক্তিতে আমাদেরকে শাসন করিলেন, গরিব বাংলার সম্পদটুকু দু'হাতে লুটিয়া ইমারতের উপর ইমারত গড়িলেন, শেষ পর্যন্ত ইলেকশনে হারিয়া লাঠি ধরিলেন; বন্দুক ও সংগিনে গণহত্যা করিলেন, কামান দাগিয়া আমাদের দালান-ইমারত ধূলিসাৎ করিলেন; ত্রিশ লক্ষ লোককে খুন, তিন কোটি লোককে গৃহত্যাগী ও এক কোটি লোককে দেশত্যাগী করিলেন; বস্তি, বাজার, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা, গাছ-পালা ও ব্যাংকের কারেন্সি নোট পোড়াইলেন; যুদ্ধে হারিয়া আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে আমাদের সুধী সমাজকে বর্বরভাবে কাতলে-আম করিলেন। এত করার পরেও বাংলার নেতার মুখ দিয়া বাংগালী বলিতে পারিয়াছে ঃ 'পশ্চিমা ভাইরা, আমরা প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ চাই না। তোমরা সুখে থাক আমাদেরও সুখে থাকিতে দাও।' পৈশাচিক ধ্বংসলীলা ও বর্বরতম গণহত্যা ছাড়াও বাংলাদেশ পঁচিশ বছরের এজমালী সংসারের হিসাব-নিকাশ দাবি করিতে পারিত। আপোসে টেবিলে বসিয়া আলোচনার মাধ্যমে পৃথক হইলে বাংলাদেশ ন্যায়তঃই জায়দাদ ও দায় দেনা বাটোয়ারার দাবি করিত এবং সে নিকাশে বাংলার দেনার চেয়ে পাওনা অনেক বেশী হইত।

সাত

কাজেই লড়াই করিয়া পৃথক হওয়ায় পশ্চিমা ভাইদের লাভই হইল। তাঁরা গজ-কপালিয়া। ভারত বাটোয়ারার সময়ও লাভ তাঁদেরই হইয়াছিল। পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময়ও লাভ তাঁদেরই হইল। কাজেই বুদ্ধিমান দূরদর্শী পশ্চিমা নেতারা মুখে যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা মানিয়া লইবেনই। এই হিসাবেই যত তাড়াতাড়ি এটা ঘটে, ততই তাঁদের মংগল।

কারণ স্বাধীন সার্বভৌম ও সংঘবদ্ধ একটি রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিতে যে-সব কাজে হাত দিতে হইবে, সেগুলি শুরু করা যাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবার পরে, আগে নয়। বাংলাদেশ পুনর্দখল করিয়া অখণ্ড পাকিস্তানের পুনর্গঠনের স্বপ্নে দিন কাটাইলে পশ্চিমা ভাইদের খুব মূল্যবান সময়ের অপচয় হইবে এবং তাতে ইক্‌বালের কল্পিত পাকিস্তানটিও বিপন্ন হইতে পারে। লাহোর প্রস্তাব-মতই তাঁদের বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে; লাহোর প্রস্তাব-মতই পশ্চিমাঞ্চলকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র করিতে হইবে। তা করিতে গেলে তাকে সেকিউলার গণতান্ত্রিক ফেডারেল রাষ্ট্র হইতে হইবে এবং লাহোর প্রস্তাব-মতই তার অংগ রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইতে হইবে। এ সবই গুরুতর কাজ ও ঘোরতর কঠিন দায়িত্ব। অথচ পাকিস্তান টিকাইয়া রাখিবার জন্য এ সব কয়টাই অপরিহার্য। গণতন্ত্রের অভাবেই ১৯৪৭ সালের পরিকল্পিত 'এক অখণ্ড পাকিস্তান' টিকিল না, এটা আজ সবাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের অভাব ঘটিল কেন, সেটা বাংগালীরা যেমন বুঝিয়াছেন, পশ্চিমা ভাইরা সকলে এখনো ততটা বুঝেন নাই।

আট

এই না-বুঝা ব্যাপারটাই রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতা। রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ হইতে হইবে, অন্য কথায় ধর্মকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে ও বাহিরে রাখিতে হইবে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা মানে ধর্ম-বিরোধিতা নয়, ধর্মে উদাসীনতাও নয়। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র যেমন নিরপেক্ষ থাকিবে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও তেমনি একে অন্যের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে। যে ব্যক্তি নিজের বাপ-মাকে সম্মান করে, সে অপরের বাপ-মাকে অসম্মান করিতে পারে না। তেমনি যে ব্যক্তি নিজের ধর্মে শ্রদ্ধাশীল, সে অপরের ধর্মে অশ্রদ্ধাশীল হইতে পারে না। এমন ধর্ম-নিরপেক্ষতা আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বসম্মত সত্য। আধুনিক সকল রাষ্ট্র সম্বন্ধেই এটা প্রযোজ্য। কিন্তু সাবেক পাকিস্তান ও ভারতের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে বেশী সত্য। কারণ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যে পাকিস্তান ও ভারত এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছিল, তার প্রধান বুনিয়াদী শর্তই ছিল এই যে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রই ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে। কথাটা বুঝিতে হইলে

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু-মুসলিম-সমস্যার সমাধানের পন্থা হিসাবেই উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মতানুসারে দেশ ভাগ হইয়া দুইটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছিল।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক মুক্তি নাই, একথা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় নেতাদের সবাই বলিয়াছেন। তাই দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সমস্যা সমাধানের বহু পন্থা উদ্‌ভাবন, আলোচনা ও এক্সপেরিমেন্ট করা হইয়াছে। কোনটাই সফল হয় নাই। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে শেরে-বাংলা প্রস্তাবিত 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণ করে এবং এটাকেই তারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা বলিয়া দাবি করে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরিয়া দেশময় আলোচনা ও আন্দোলন হওয়ার পর এই প্রস্তাবের উপর ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষময় সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে ভারতীয় মুসলমানরা প্রায় সর্ব-সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। লাহোর প্রস্তাবের মর্ম এই যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটি স্বাধীন মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্র গঠিত হইবে। এর ফলে গোটা ভারতবর্ষ তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে। দুই পাশের দুইটি ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র হইবে মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্র, আর মধ্যেকার বৃহত্তর অংশ হইবে হিন্দু-মেজরিটি রাষ্ট্র। এই পরিকল্পনাই পরবর্তী কালে বৃটিশ ক্যাবিনেট প্ল্যানে গ্রুপিং সিস্টেমে মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল।

হিন্দুরা ভারতবাসীর বিপুল মেজরিটি। কাজেই তাদের নেতারা ন্যায়তঃই এবং গণতান্ত্রিক দাবিতেই এভাবে দেশ বিভাগে আপত্তি করিতে এবং শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে পারিতেন। হিন্দু জনসাধারণও এমন বিভাগের তীব্র বিরোধী ছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা সমাধানের অন্য কোনও রাস্তাও তাঁদের সামনে খোলা ছিল না। তাই কংগ্রেস তথা হিন্দু নেতৃত্ব অসাধারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া. শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান হিসাবেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বাটোয়ারা করিতে সম্মত হন। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতারা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, এর দ্বারা হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা সত্যই চিরতরে সমাধা হইয়া গেল। তাঁরা সে কথা বলিয়াছেনও। মুসলমানদের নেতা কায়েদে-আযম জিন্নাও এই কথা বলিয়াছেন। শুধু বাটোয়ারার আগে বলেন নাই, বাটোয়ারার পরেও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'আজ

যেভাবে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার দূরদর্শী সমাধান হইল, এটা আগে হইলে বহু-দিন আগেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া যাইত।'

নয়

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, কায়েদে-আযম জিন্নার সেকিউলার গণতান্ত্রিক মতবাদের আন্তরিকতায় কংগ্রেস-নেতাদের আস্থা ছিল বলিয়াই জিন্না-নেতৃত্বে স্বতন্ত্র মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিতে দেশভাগে তাঁরা সম্মত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস-নেতাদের পক্ষে দেশবিভাগে নিজেরা রাযী হওয়া এবং হিন্দু দেশবাসীকে রাযী করান অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ ছিল। একেই তো দেশের মেজরিটির পক্ষে দেশভাগে রাযী হওয়া খুব কঠিন কাজ, তার উপর ভারতের দুই কোণে দুইটি মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের দাবি করিয়া পরবর্তীকালে সেই দুইটির সমন্বয়ে একটিমাত্র রাষ্ট্র করার অভিপ্রায়কে সন্দেহের চক্ষে দেখা হিন্দু নেতৃত্বের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট এলাকা লইয়া বহু মুসলিম-রাষ্ট্র বিদ্যমান। এদের মধ্যে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব-বোধ সুপরিচিত। এই ভ্রাতৃত্ব-বোধকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের প্যান-ইসলামিক মতবাদ, খিলাফত আন্দোলন, কবি ইকবালের 'চীন ও আরব হামারা' ইত্যাদি অভিমত ও প্রচারণার সাথে ভারতের হিন্দু নেতারা সুপরিচিত ছিলেন। এই অবস্থায় ভারতের দুই প্রান্তের দুইটি মুসলিম-মেজরিটি অঞ্চল লইয়া একটি মাত্র 'ইসলামী' রাষ্ট্র গঠন করিবার এবং তার নাম 'পাকিস্তান' রাখিবার পরিকল্পনার পিছনে উভয় পাশ হইতে হিন্দু-ভারতকে এন্‌সার্কেল করিবার দুরভিসন্ধি নাই, এ সম্পর্কে হিন্দুদের নিঃসন্দেহ হইবার উপায় ছিল না। অথচ ১৯৪০ সালে যখন লাহোর প্রস্তাব পাশ হয়, তখন তাতে সুস্পষ্টভাবে দুইটি স্বতন্ত্র মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের কথাই বলা হইয়াছিল এবং তাতে 'পাকিস্তান' বা 'ইসলামী রাষ্ট্র' এই ধরনের কোনও কথাই ছিল না। বরঞ্চ তাতে অমুসলমানদের সমান নাগরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষার দ্ব্যর্থহীন অংগীকার ছিল। ছয় বছর ধরিয়া ঐ প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার ও আলোচনা করিয়া শেষ মুহূর্তে দুইটাকে এক রাষ্ট্র এবং তাকে 'পাকিস্তান' নামকরণের পিছনে কোনও অসাধু উদ্দেশ্য না থাকুক, হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ঘোরতর সন্দেহ সৃষ্টি অসম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ এই কারণেই হিন্দু-সাধারণ্যে পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব এত তীব্র ছিল। এমন বিরোধী

জনমত ঠেলিয়া একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় উপস্থিত হইতে নেতাদের যে অসাধারণ মনোবল, দুর্জয় সাহস, তীব্র দেশপ্রেম, নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ় প্রত্যয় এবং দেশবাসীর বিচার-বুদ্ধিতে গভীর আস্থার দরকার, এ সব গুণই কংগ্রেস-নেতৃত্বের ছিল। তাই তাঁরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের নির্ভযোগ্য পন্থা হিসাবে দেশভাগ স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। জিন্না-নেতৃত্বে হিন্দু নেতাদের আস্থাও তাঁদের এ সিদ্ধান্তের সহায়ক হইয়াছিল। পূর্বেকার ত্রিশ বছরের ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাই মুসলমানদের প্যান-ইসলামিযম, খিলাফত আন্দোলন ইত্যাদির বিরোধিতা করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সেকিউলার রাজনীতি-বোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তানী প্রচারণার মধ্যে রাজনৈতিক মোল্লাকি যতই থাকুক না কেন, জিন্না-নেতৃত্বে পাকিস্তান একটা ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, তার স্থলে একটা আধুনিক সেকিউলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে, এ বিশ্বাস বহু তরুণ মুসলিম নেতার মতই হিন্দু নেতাদেরও ছিল। পাকিস্তান গণ-পরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে জিন্না যেদিন ধর্মনিরপেক্ষ পাকিস্তানী রাজনীতির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেস নেতারা সেইদিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

দশ

আরও মনে রাখা দরকার, '৪৭ সনের বাটোয়ারায় ভারতবর্ষের ভূমিটাই ভাগ হইয়াছিল, ভারতবাসী ভাগ হয় নাই। আদম-এওয়াজ না করিয়াই একটি হিন্দু-প্রধান ও একটি মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। মুসলিম-মন হইতে হিন্দু-ডমিনেশনের ভীতি দূর করার উদ্দেশ্যেই একটির স্থলে দুইটি ভারত গড়া হইয়াছিল: তার একটি হিন্দু-মেজরিটি, অপরটি মুসলিম-মেজরিটি। এটাও শুধু হিন্দুর দেশ নয়, ওটাও শুধু মুসলমানদের দেশ নয়, উভয়টাই হিন্দু-মুসলমানের দেশ। এই বাটোয়ারার দুই শরিকের দুই কর্তা মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে-আযম জিন্না এই ফর্মুলাকে এত সহজভাবে নিয়াছিলেন যে, বাটোয়ারার পরে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন: 'ভারতও আমার দেশ, পাকিস্তানও আমার দেশ।' আর পাকিস্তানের গবর্নর-জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করার সময় কায়েদে-আযম জিন্না বলিয়াছিলেন: 'আমি ভারতের নাগরিক হিসাবে পাকিস্তানের গবর্নর-জেনারেল পদ গ্রহণ করিতে যাইতেছি পাকিস্তানের জনগণের আমন্ত্রণে তাদেরই খেদমত করিবার জন্য।

নব সৃষ্ট দুই জাতির দুই পিতার এই উক্তিদ্বয়ে যে মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে এটাই ছিল স্পিরিট-অব-পার্টিশন। হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা সমাধানই ছিল ভারত বাটোয়ারার একমাত্র উদ্দেশ্য। নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকরা পার্টিশনের এই স্পিরিট ও বাটোয়ারার আসল উদ্দেশ্য উভয়টাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কায়েদে-আযমের মৃত্যুর পর হইতে শাসকরা ঐ দুইটি ব্যাপারেই বিশ্বাস ভংগ করিয়া চলিলেন। কায়েদে-আযমের গণপরিষদে ঘোষিত বুনিয়াদী ওসিয়ত সেকিউলার গণতন্ত্রের পথ তাঁরা বর্জন করিলেন। ফলে ইন্টারনেলি তাঁরা গণবিরোধী ও একস্টারনেলি তাঁরা ভারত-বিরোধী হইয়া পড়িলেন। ফলে রাষ্ট্রে চলিল আমলাতান্ত্রিক সামরিক শাসন; আর দেশে চলিল সাম্প্রদায়িক পীড়ন ও আঞ্চলিক শোষণ। যে গণতন্ত্রের জন্য দেশ স্বাধীন করা হইল, সে গণতন্ত্র আসিল না। যে সাম্প্রদায়িকতার অবসান করার জন্য দেশ ভাগ হইল, সে সাম্প্রদায়িকতার অবসান হইল না। স্বাধীনতার আগে যা ছিল হিন্দু-মুসলিম ও কংগ্রেস-লীগ বিরোধ, সেটাই হইয়া উঠিল এখন ভারত-পাকিস্তান বিরোধ। আগে সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক সংঘাত, এখন সেটা হইয়া উঠিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত। আগে সাম্প্রদায়িক দাংগা হইত, এখন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

এগার

মোট কথা, দেশভাগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব দেশভাগ বাতিল করিবার অধিকারও পক্ষগণের হইয়াছে। কোন উদ্দেশ্যে একটা কাজ করিয়া আমরা যদি দেখিতে পাই ও-কাজে উদ্দেশ্যটা সফল হইল না। তখন কাজটা বাতিল করা শুধু সংগত নয়, উচিতও বটে। এ অবস্থায় কার দোষে বাটোয়ারার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, সে বিচার না করিয়াও দুই পক্ষ বা কোনও এক পক্ষ দেশভাগ বাতিল করিতে পারে। এ অবস্থায় হিন্দুরা যদি ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারা বাতিল করিয়া পাকিস্তান ভাংগিয়া দিতে চাহিত, তবে তাদেরে কোনও মতেই দোষ দেওয়া যাইত না। আর দেশভাগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার ব্যাপারে যদি পাকিস্তান বা মুসলিম পক্ষই দোষী হইয়া থাকে, তবে ত কথাই নাই।

তাই বিচার করিয়া দেখা যাক, দেশ বাটোয়ারার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল কার দোষে? বিচ্ছিন্নভাবে ঘটনাগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে,

একটার দোষ হিন্দুর, অপরটার দোষ মুসলমানের; একটার দোষ ভারতের অপরটার দোষ পাকিস্তানের। কিন্তু সমগ্রভাবে এবং মূল কারণের বিচার, করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে, এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী একা পাকিস্তান; মানে পাকিস্তানের শাসকরা। তাঁরা সেকিউলার গণতন্ত্র বর্জন করিয়া 'ইসলামী রাষ্ট্রে'র যিকির দিয়া পাকিস্তানের অমুসলমানদিগকেই শুধু বিপন্ন করিলেন না, ভারতের মুসলমানদিগকেও বিপন্ন করিলেন। শুধু পাকিস্তানেই সাম্প্রদায়িকতার প্রাধান্য দিলেন না, ভারতেরও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিলেন। পাকিস্তানের একটা 'ইসলামী হুংকার' ভারতের পাঁচটা 'হিন্দুয়ানী হুংকারে' প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার যিকিরে পাকিস্তানে কায়েদে-আযমের অভিপ্সিত 'পাকিস্তানী নেশন' গড়িতেই শুধু বাধা দিলেন না, সেকিউলারিস্ট কংগ্রেস নেতৃত্বের 'ভারতীয় নেশন' গড়ার কাজেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাকিস্তানের 'মুসলিম জাতীয়তাবাদের' জবাবে ভারতে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' জোরদার হইতে লাগিল। ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের মধ্যে পাকিস্তানী মুসলিম জাতীয়তাবাদ সংক্রমিত হইতে থাকায় কংগ্রেস-নেতাদের ভারতীয় সেকিউলার নেশন গড়ার চেষ্টা এদিক হইতেও সংকটের সম্মুখীন হইল। ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের ঐ মুসলিম জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোকাবিলা হইল। ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাংগা অবিরাম চলিতে লাগিল। পাকিস্তানী শাসকরা ভারতের সাম্প্রদায়িক দাংগার অপব্যাখ্যা করিয়া ভারত সরকার, কংগ্রেস নেতৃত্ব ও হিন্দু সমাজকে দোষ দিতে থাকিলেন। এটাকেও তাঁরা হিন্দুদের মুসলিম-বিরোধিতা ও ভারতের পাকিস্তান-বিরোধিতা বলিয়া চালাইতে লাগিলেন। পাকিস্তানে আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক স্বৈরাচার চলিতে থাকায় মুসলিম পাকিস্তানীদের মেজরিটির মতই হিন্দু পাকিস্তানীরাও পাকিস্তান সরকার বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তানী হিন্দুদের এই নিতান্ত গণতান্ত্রিক অপযিশন মনোভাবকে পাকিস্তান রাষ্ট্র-বিরোধী মনে করা হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে যে-কোনও অসাবধান বিদেশী পরিব্রাজকের পক্ষে এই ধারণা করা অসম্ভব ছিল না যে পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু তলে-তলে ভারতের পক্ষে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশ মনে-মনে পাকিস্তানের পক্ষে ও ভারতের বিপক্ষে। তার মানে ১৯৪৭ সালের আগে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক যা ছিল, আজও তাই আছে। অর্থাৎ দেশ বাটোয়ারা করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে এবং পাকিস্তানের, মানে মুসলমানদের দোষেই ব্যর্থ হইয়াছে।

বার

পাকিস্তানী শাসকরা যদি এরূপ না করিতেন, তবে কি হইত? এবার ব্যাপারটা বিচার করা যাক। প্রথমতঃ, পাকিস্তান যদি ভারতের মত সেকিউলার [illegible] রাষ্ট্র হইত, তবে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটির পক্ষে নিজ-নিজ ধর্ম-বিশ্বাস ও আচরণ ঠিক রাখিয়াই যার-তার রাষ্ট্রীয় জাতির [illegible] হওয়া সহজ হইত। তারা সমান অধিকারভোগী নাগরিক হইতে পারিত। তাতে উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা লোপ পাইত। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের স্থলে মৈত্রী হইত। দুই রাষ্ট্রের কাকেও প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্বের বেশীর ভাগ খরচ করিতে হইত না। সে টাকা জনগণের কল্যাণে ব্যয়িত হইতে পারিত।

দ্বিতীয়তঃ, সেকিউলার পাকিস্তানে সরল সহজ একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা সম্ভব হইত। ভারতের সংগে-সংগেই, এমন কি আগেও, সেটা হইয়া যাইতে পারিত। সংবিধান-মতে সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্র-ক্ষমতা জনগণের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক [illegible] পক্ষে শাসন-ক্ষমতা দখল সম্ভব হইত না। একান্তভাবে পশ্চিমা-ভিত্তিক স্বেচ্ছাচারী শাসন দুই অঞ্চলের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ অসাম্য সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইত না। বরঞ্চ জনগণের শাসনে উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য ও রাষ্ট্র-ক্ষমতায় সমান শরিকিতে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে একাত্মতা [illegible] জাগ্রত হইত। পরিণামে কালক্রমে তাই একজাতি-বোধে রূপান্তরিত হইত।

তৃতীয়তঃ, এর ফলে পাকিস্তান ইন্টারনেলি উভয় অঞ্চলের একাত্মবোধে এবং এক্সটারনেলি পাক-ভারত মৈত্রীতে নিরাপদ, সুসংহত, উন্নত ও শক্তিশালী হইত, ভারতও তাই হইত। উভয় দেশের জনগণই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইত। ভারত বিভাগের মূল উদ্দেশ্য যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের অবসান, চিরদিনের জন্য তাও হইয়া যাইত।

তের

তা হয় নাই বলিয়াই আজ পাকিস্তান ভাংগিয়া গিয়াছে। এই ভাংগনটা ঘটিয়াছে পাকিস্তানের ইন্টারনেল সংঘাতে, কোন এক্সটারনেল হামলায় নয়। কেউ কেউ মনে করেন এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন যে, ভারতই এই ভাংগনের জন্য দায়ী। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ভারতের রুলিং

পার্টি কংগ্রেস কোনও দিন পাকিস্তান ভাংগিবার চেষ্টা করেন নাই; বরং উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান টিকিয়া থাকুক, এটাই তাঁরা চাহিয়াছেন। মহাত্মাজী পাকিস্তানের জন্মলগ্নের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা ভারত সরকারের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য আমরণ অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'পাকিস্তান ও মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করার অপরাধে' মহাত্মাজী অদূরদর্শী সাম্প্রদায়িকতাবাদী নাথুরামের গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে পণ্ডিত জওয়াহেরলাল পাকিস্তানের সাথে নেহেরু-লিয়াকত ও নুন-নেহেরু চুক্তি দস্তখত করিয়াছিলেন। সিন্ধু অববাহিকার পানি বণ্টনের জন্য পাকিস্তানে আসিয়া নেহরু-আইউব চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এ সব কি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের দুশ্‌মনির নমুনা? বস্তুতঃ পাকিস্তান ধ্বংস করিবার অথবা ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারার সীমালংঘনের কোনও চেষ্টা ভারত-সরকার কোনও দিন করেন নাই। পশ্চিম সীমান্তে দুই-দুইটা পাক-ভারত লড়াই হইয়া গেল, কোনও বারই ভারত অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে নাই। পাকিস্তানের ভূমি দখল করিবার ইচ্ছা ভারতের থাকিলে তার সুযোগ আসিয়াছিল অনেক। এবার যেমন পাক-বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে চৌদ্দ দিনের বেশী যুদ্ধ করিতে পারে নাই, তেমনি ঘটিতে পারিত অন্য দুই যুদ্ধের বেলাও। পাকিস্তানের ভূখণ্ডের উপর যে ভারতের কোনও লোভ নাই, তা প্রমাণের জন্য ভারত সরকার বহুদিন ধরিয়া পাকিস্তানের সাথে 'নো-ওয়ার' চুক্তি করিতে চাহিয়াছেন। পাকিস্তান সরকার কাশ্মিরের দোহাই দিয়া অমন চুক্তি করিতে বরাবর অস্বীকার করিয়াছেন। তবু ভারত সরকার পাকিস্তানের দিকে কোনও দিন আগ্রাসনী মতোভাব প্রদর্শন করেন নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকরা ভারতকে তাঁদের একনম্বর দুশমন বলিয়াছেন। কেউ-কেউ হাজার বছরের যুদ্ধের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। কারণে-অকারণে সরকারী গাড়ি-ঘোড়াতে পর্যন্ত 'ক্রাশ ইণ্ডিয়া' প্ল্যাকার্ড লাগাইয়াছেন। ভারতে অনুরূপ পাক-ধ্বংসের কোনও স্লোগান দেখা যায় নাই। পাকিস্তানের শাসকরা সত্য-সত্যই ভারতকে তাঁদের এক-নম্বর শত্রু মনে করিতেন, এটা আমার বিশ্বাস হয় নাই। সত্যিই যদি ভারতকে তাঁরা পাকিস্তানের একনম্বর দুশমন মনে করিতেন এবং ভারতের পক্ষ হইতে আক্রমণের আশংকা করিতেন, তবে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এমন অবহেলা করিতেন না; এমন অরক্ষিতও তাকে রাখিতেন না। আমার সন্দেহ হয়, ইসলাম ধর্ম ও ভারতের দুশ্‌মনিকে তাঁরা সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালাইবার অজুহাত হিসাবেই ব্যবহার করিতেন।

চৌদ্দ

এবারের লড়াইয়েও ভারতের পাকিস্তান ভাংগিবার কোনও অভিপ্রায় প্রমাণিত হয় নাই। এবারের লড়াইটা ছিল আগাগোড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার লড়াই। পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের জীবনে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে একক নিরংকুশ সংখ্যাগুরু দল এবং পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দল হইয়া পড়ে। এতেই ক্রোধান্ধ হইয়া পশ্চিমা সামরিক সরকার আইনতঃ ও ন্যায়তঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার ও তাঁর আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং দেশরক্ষা বাহিনীকে নিরস্ত্র জনতার উপর লেলাইয়া দেন। তাঁরা ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম বর্বর গণহত্যা সাধন করে। বাংলার ত্রিশ লক্ষ লোক নিহত, তিন কোটি লোক গৃহহীন ও এককোটি লোক দেশত্যাগী হইয়া ভারতের আশ্রয়-প্রার্থী হয়। নিতান্ত প্রাণের দায়েই নিরস্ত্র ও যুদ্ধে অনভ্যস্ত বাংগালী এবার অস্ত্র হাতে নেয়। নয়মাস ধরিয়া এরা দুর্ধর্ব পাক-বাহিনীকে নাজেহাল করে। নিজেদের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিবার জন্য পাক-সরকার এটাকে পাক-ভারত যুদ্ধ বলিয়া চালাইবার অসাধু উদ্দেশ্যে পশ্চিম সীমান্তে ভারতাক্রমণ করিয়া বসেন। ভারতও প্রতি-আক্রমণ করে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত দুই ফ্রন্টেই। পশ্চিম ফ্রন্টের লড়াইটা হয় দুই দেশের মধ্যেই; কিন্তু পূর্ব ফ্রন্টের লড়াইটা হইয়া পড়ে দেশবাসীর জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধের সহায়তা মাত্র। এ ফ্রন্টে বাংগালী মুক্তি যোদ্ধারা দীর্ঘ নয় মাস ধরিয়া দুর্ধর্ষ পাক-বাহিনীর সংগে মরণপণ যুদ্ধ করিতেছিল। ভারতীয় বাহিনী তাদের সহায়তায় আগাইয়া আসিলে মাত্র চৌদ্দদিনের যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী আত্ম-সমর্পণ করে। এ ফ্রন্টে যুদ্ধ থামিয়া যায়। সংগে-সংগে ভারত পশ্চিম ফ্রন্টেও একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। এর ফলে এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম কোনও ফ্রন্টেই পাকিস্তানের কোনও ভূমি দখল ভারতের উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তা থাকিত, তবে ভারত একতরফাভাবে পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করিত না। বরং পূর্ব প্রান্তের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর এ অঞ্চলে নিয়োজিত সকল সেনা পশ্চিম ফ্রন্টে নিয়া দ্বিগুণ শক্তিতে সেখানে লড়াই চালাইয়া যাইতে পারিত। তা না করিয়া ভারত পূর্ব ফ্রন্টে জয়লাভের সংগে-সংগে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাকে স্বীকৃতি দান করিয়া তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। আর পশ্চিম ফ্রন্টে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ১৯৪৭ সালের আন্তর্জাতিক সীমার মধ্যে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়াছে।

পনর

স্পষ্টই দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান, তা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং সেই হেতু সে বাটোয়ারা রদ-রহিত করিবার ন্যায়সংগত অধিকার ভারতের অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত সে বিভাগ রহিত করিতে চায় না। আমাদের মতই ভারত সরকারও বিশ্বাস করেন যে, বাটোয়ারার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই বটে, কিন্তু সে অসাফল্যের জন্য বাটোয়ারা দায়ী নয়, বাটোয়ারা প্রয়োগের ত্রুটিই এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী। দ্বিতীয়তঃ যে কারণে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হইয়াছিল, সে কারণ আজও বিদ্যমান আছে।

আভ্যন্তরীণ সংঘাতেই পাকিস্তান ভাংগিয়াছে বটে এবং সে ভাংগায় ভারত সহায়তা করিয়াছে বটে, তবে এটাও আমাদের বুঝিতে হইবে যে, এতে উপ-মহাদেশের লাভই হইয়াছে। হিন্দুরও হইয়াছে, মুসলমানেরও হইয়াছে। যে অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হইয়াছিল, আমরা ঠিক সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আমরা লাহোর প্রস্তাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। একটির জায়গায় দুইটি মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্র হওয়ায় উপমহাদেশ আজ তিনটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আধার হইল : বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। বাংলা ও ভারত উভয়েই সেকিউলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানও যদি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেকিউলার গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হইয়া যায়, তবে উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ চিরতরে সমাধান হইয়া যাইবে। তাতে এ অঞ্চল গণতন্ত্র, সেকিউলারিযম ও সমাজবাদের লীলা-ভূমিতে পরিণত হইবে। সে অবস্থায় তিন রাষ্ট্রের গণভিত্তিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সহ সার্বিক উন্নতি দ্রুততম হইবে। রাষ্ট্রত্রয়ের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ উন্নয়ন কার্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে। একই গণতান্ত্রিক আদর্শ-ভিত্তিক তিন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যয় বিপুল ভাবে হ্রাস পাইবে। তাদের মধ্যেকার প্রতিরক্ষার খরচা ত লাগিবেই না, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও যুক্তভাবে হইতে পারিবে। রেলসহ সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তার ও বেতারসহ সমস্ত টেলি-কমিউনিকেশন অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে। আমাদের রেললাইন চাটগাঁ হইতে পেশাওয়ার পর্যন্ত থ্রু ট্রেন বহন করিতে পারিবে। ইউরোপের কমনমার্কেটের মত বাংলা-ভারত-পাকিস্তানে কমন-মার্কেট হইতে পারিবে। কালক্রমে সিংহল, বার্মা, নেপাল ও আফগানিস্তান এই অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাইবে। পাকিস্তান দুই টুকরা হইয়া স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা সৃষ্টি হওয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক

ভবিষ্যৎ এমনি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় হইয়াছে ! এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা এখন তিনটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কদের সুষ্ঠু চিন্তা ও দূরদর্শী প্রজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

ষোল

এ প্রসংগে একটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা আমি কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার অভ্যুদয়কে অভিনন্দিত করিতে গিয়া কেউ-কেউ অতি উৎসাহে বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি না করিয়াই এঁরা এমন কথা বলিতেছেন। স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ে যেটা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে, সেটা আসলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নয়। শুধু ইসলামের দোহাই দিয়া দুইটি দূরবর্তী ভৌগোলিক, ভাষিক ও কৃষ্টিক দেশকে এক রাষ্ট্রে বাঁধার যে পাকিস্তানী চেষ্টা হইয়াছিল, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ে সেটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যে ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছিল, সেটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নাই, ভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টাও কেউ করে নাই। বাংলাদেশ বা ভারতের নেতারা '৪৭ সালের বাটোয়ারা মানিয়া লইয়াছেন এবং ঐ বাটোয়ারার বাউণ্ডারিকেই যার-তার সার্বভৌমত্বের সীমারেখা হিসাবে [illegible] করিয়াছেন। '৪৭ সালের বাটোয়ারাটা হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মাবলম্বীর ভিত্তিতে। হিন্দু-মেজরিটি ভারত ও মুসলিম-মেজরিটি পাকিস্তান এই দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবিকেই 'টু নেশন' থিওরি বলা হইত। কথাটার মর্ম ছিল এই যে, ভারতবর্ষ একটি নেশন-স্টেট হইবে না, হইবে দুইটি নেশন-স্টেট। সত্য বটে মুসলিম লীগের এই স্লোগানটাও নির্ভুল ছিল না। কারণ লাহোর প্রস্তাব স্বাধীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিয়াছিল দুইটি নয়, তিনটি নেশন-স্টেট হিসাবে। মুসলিম লীগ নেতারা 'থ্রি নেশন থিওরির' জায়গায় 'টু নেশন থিওরি' প্রয়োগ করায় পরিণামে তাঁদের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। সে স্থলে লাহোর প্রস্তাবের 'থ্রি নেশন থিওরি' সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। এই 'থ্রি নেশন-স্টেটস্'-এর ভিত্তিতেই আজ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে।

সতর

এ অবস্থায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রীয় চেতনা ও একাধিক জাতীয় রাষ্ট্রীয় চেতনাকে একই হামালদিস্তায় কুটিতে গেলে অতীত অবস্থা বিশ্লেষণেও ভুল হইবে, ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণেও বিভ্রান্তি ঘটিবে। সত্য কথা এই যে, '৪৭ সালে ভারত বাটোয়ারাটা হইয়াছিল দুইটি ধর্মাবলম্বী দুইটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম ভিত্তিতে। সে বাটোয়ারা ঠিক আছে। মুসলিম অংশের দুই খণ্ডকে ধর্মের ডাকে একটি করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, সেটাই ব্যর্থ হইয়াছে। ধর্ম-বিশ্বাসে এক হইয়াও বাংলার মুসলিম ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম এক 'নেশন-স্টেট' করিতে পারিল না। এইখানেই আমাদের সমালোচনার সীমারেখা। এর বেশী গেলেই ভুল করা হইবে। কেন, সে কথাটাই আলোচনা করা যাক। হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্ম-সম্প্রদায়-ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত করা ঠিক হইয়াছিল কিনা, এটা তর্কের বিষয় হইতে পারে, এমন কি ভ্রান্তও বলা যাইতে পারে। কিন্তু আজ সে কথা তোলা শুধু অপ্রাসংগিক নয়, বিপজ্জনকও বটে। কারণ সে বাটোয়ারা মানিয়া লইয়াই এ বাটোয়ারার বড় শরিক ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেছেন। এ অবস্থায় কেউ যদি তথাকথিত 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' সমালোচনা বা বিরোধিতা করেন, তবে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একবার তেমন সন্দেহ-অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইলে বাংলাদেশ ও ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি উদয়ের আশা করিতেছেন, তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। সাবেক পাকিস্তানী নেতাদের পঁচিশ বছরের ভুলে উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত ও উন্নয়ন বিলম্বিত হইয়া জনগণের জীবনে যে দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছিল, অন্য দিক হইতে ভিন্নরূপে তেমন দুর্ভাগ্য আবার দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশপ্রেমিক চিন্তানায়ক ও সুধিগণের এ বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

আঠার

আরেকটি ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা বাংগালী জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি গণতান্ত্রিক সেকিউলার নেশন-স্টেট হিসাবে বাংলাকে গড়িয়া তোলার ব্যাপারে এটি একটি মৌল প্রশ্ন। প্রশ্নটা জটিল এই কারণে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা রাষ্ট্রের

বাহিরেও রেস্, ভাষা ও কৃষ্টিতে বাংগালী এমন একটি মানব-গোষ্ঠী আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নাগরিক। বাংলা রাষ্ট্রের নাগরিকরা আমরা যদি এককভাবে বাংগালী হই, তবে ওঁরা কি? এখানেই বিভ্রান্তির সূচনা। কেউ কেউ 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা' স্লোগানে এই বিভ্রান্তিকে জটিল করিয়া তুলিতেছেন। এ বিভ্রান্তির নিরসন হওয়া অত্যাবশ্যক।

আমাদের রাষ্ট্রনেতারা 'সাড়ে সাত কোটি' বাংগালীর বাংগালীত্ব ঘোষণা করিয়া এই তর্কের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। 'সাড়ে সাত কোটি' সংখ্যাটা চিরস্থায়ী নয়। এটা মাত্র বর্তমান সংখ্যা। তবু এটাই আমাদের জাতীয়তার সীমা নির্দেশক। এ সংখ্যার তাৎপর্য এই যে, ১৯৪৭ সালের বিভক্ত বাংলার যে অংশ গোড়ায় পূর্ববাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তান ছিল এবং বর্তমানে বাংলাদেশ হইয়াছে, এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই শুধু রাজনৈতিক অর্থে বাংগালী। এদেশের বাইরের নাগরিকরা সে অর্থে বাংগালী নন।

কথাটা রোম্যানটিকও নয়, অযৌক্তিকও নয়; রাজনৈতিক সত্য। রাজনৈতিক এই জন্য যে, এখানে আমরা রাজনৈতিক জাতির কথাই বলিতেছি। রেস, ভাষা ও কৃষ্টির দিক হইতে বাংলাদেশের অধিবাসীদের মতই পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরাও বাংগালী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জাতিতে তাঁরা ভারতীয়। এখানে মনে রাখা দরকার, রেস্, ভাষা ও কৃষ্টিতে অভিন্ন মানবগোষ্ঠী যদি অখণ্ড ভৌগোলিক সীমার অধিবাসী হয়, তবে তারা হয় ন্যাশনালিটি। এই ন্যাশনালিটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হাসিল করিলে তারা হয় নেশন। ১৯৪৭ সালের আগে অখণ্ড বাংলার অধিবাসী আমরা ছিলাম অখণ্ড বাংগালী ন্যাশনালিটি। '৪৭ সালে স্বেচ্ছায় ভোট দিয়া আমরা বিভক্ত হইয়াছিলাম। পশ্চিম বাংলার বাংগালী ন্যাশনালিটি বৃহত্তর ন্যাশনাল ইউনিটি ভারতে মিলিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দীকে জাতীয় রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করে। এদিকে আমরা পূর্ব বাংলার বাংগালীরা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল ইউনিট পাকিস্তানে মিশিয়া পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় নেশন গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে উদ্যমেও আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়াছিলাম। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে অগণতান্ত্রিক অভিমতের দরুন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী নেশন গড়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া আমরা বাংগালীরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র ও ভাষা-কৃষ্টিতে ইউনিফর্ম বাংগালী নেশন গড়িয়া তুলিয়াছি। ফলে বাংগালী জাতীয়তা বাংলা রাষ্ট্রের চতুঃসীমার

মধ্যেই পরিবৃত। রেস্, ভাষা ও কৃষ্টিতে অবাংগালী হইয়াও বাংলা রাষ্ট্রের নাগরিকরা জাতিত্বে ও নাগরিকত্বে বাংগালী। আর রেস্, ভাষা ও কৃষ্টিতে বাংগালী হইয়াও পশ্চিমবংগের বাংগালীরা ভারতীয়। রাজনৈতিক জাতীয়তা পলিটিক্যাল নেশনহুড রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সহিত সমায়ত বলিয়াই এটা ঘটিয়াছে।

৫৪৩ এল, ধানমণ্ডি
রোড নং ১৩
ঢাকা

আবুল মনস্থর আহমদ
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭২

১

ধর্ম-শাসিত রাষ্ট্র, না রাষ্ট্র-শাসিত ধর্ম ?

যাঁরা ধর্মের দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করিতে গিয়াছেন, পরিণামে তাঁরা ধর্মকেই [illegible]র দ্বারা শাসন করাইয়াছেন। ধর্ম-শাসিত রাষ্ট্র সম্ভব হইলে ভালই হইত। [illegible] ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, তা সম্ভব নয়। ইতিহাসের এ শিক্ষা অগ্রাহ্য [illegible] যাঁরা রাজনীতিতে ধর্মকে টানিয়া আনিতে চান, তাঁরা ধর্ম ও রাজনীতি [illegible]রই অনিষ্ট করিতেছেন। রাষ্ট্রের অনিষ্টের চেয়ে ধর্মের অনিষ্ট মানুষের [illegible] ক্ষতিকর। অথচ তাঁরা জানেন না, ধর্মের কি অনিষ্ট তাঁরা করিতেছেন।

[illegible]দের সকলের উদ্দেশ্য অসাধু, এ কথা আমি বলিতেছি না। তাঁদের [illegible]কতায়ও সন্দেহ করিতেছি না। ইংরাজী সাহিত্যের এক মহাজন ব্যক্তি [illegible]ছেন: ‘প্রেম ও ধর্মের ব্যাপারে যাদের গলার জোর যত বেশী, তাদের [illegible] জোর তত কম।’ কথাটা সাধারণতঃ সত্য। তবু আমাদের দেশের [illegible] কথায়-কথায় গলার জোরে ইসলাম-প্রীতি ঘোষণা করেন, তাঁদের সকলের [illegible] জোর কম, এটা আমি ধরিয়া লইতেছি। এঁদের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ [illegible] এঁরা না-জানিয়া না-বুঝিয়া ইসলামের, সুতরাং মুসলমানদের, অতএব [illegible]দের, ক্ষতি করিতেছেন।

[illegible] লইলাম, এঁরা রাজনীতির পাপাচার দেখিয়া সরল বিশ্বাসেই ধর্মের [illegible]নীতি শাসন করিতে চাহিতেছেন: কিন্তু তাঁদের পন্থা গৃহীত হইলে [illegible] তাঁরা দেখিবেন, রাজনীতিই ধর্মশাসন করিতেছে। দামেশ্ক্-বাগ- [illegible] খলিফার আমলে এটা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ইসলাম রক্ষার জন্য [illegible]দের এত কঠোর নির্যাতন বরণ করিতে হইয়াছিল।

[illegible] রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। তার মধ্যে [illegible] পার্থক্যটি এই যে, রাষ্ট্র চলে শক্তিতে, ধর্ম চলে ঈমানে। অর্থের সাথে [illegible]র, দেহের সাথে আত্মার, শক্তির সাথে নীতির যা সম্পর্ক, রাষ্ট্রের [illegible]র সম্পর্কও তাই। কাজেই যাঁরা রাষ্ট্রের ও ধর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible], তাঁরা আসলে পাহলওয়ানের সাথে ঋষি-দরবেশকে পাঞ্জা লড়িতে [illegible] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে মোহাম্মদ আলী ক্লে’র সাথে বক্সিং লড়িতে [illegible] এমন প্রতিযোগিতা স্পষ্টতঃই অসংগত।

উপমাটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। রাষ্ট্রের হাতে অর্থও আছে, শক্তিও আছে; ব্যুরোক্র্যাসিও আছে, আর্মিও আছে। ধর্মের এসব-কিছু নাই। ধর্মে যবরদস্তি নাই। অথচ যবরদস্তির উপরই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের সংজ্ঞাই হইল 'অর্গ্যানাইযড কো-আরশন'। রাষ্ট্রের এলাকা মানুষের দেহ। ধর্মের এলাকা মানুষের মন। ধর্মে আমার আনুগত্য আল্লার কাছে। রাজনীতিতে আমার আনুগত্য রাষ্ট্রের কাছে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই বুনিয়াদী পার্থক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি রূপে কি আকারে ও কি ধরনে প্রযুক্ত হইতেছে, তারই বিচার করিয়া দেখা যাক।

যাঁরা বলেন, আমাদের ধর্ম গোটা-জীবনের একটি কমপ্লিট কোড, পূর্ণাংগ আইন, তাঁরা ধর্মের সামগ্রিক রূপের কথাই বলেন। ধর্মও একটা বিজ্ঞান। সব বিজ্ঞানের মতই ধর্মেরও থিওরেটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল ও এপ্লাইড দিক আছে। বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের দিক দিয়া ধর্মে-ধর্মে পার্থক্য আছে। কিন্তু ব্যবহারিক দিকে কোনও পার্থক্য নাই। ধর্মের এই ব্যবহারিক দিককেই নীতি বা মরালিটি ও এথিক্স্ বলা হয়। 'সদা সত্য কথা বলিও', 'মিথ্যা কথা বলিও না', 'পরের দ্রব্য চুরি করিও না', 'প্রতিবেশীকে ভালবাসিও' ইত্যাদি নীতিবাক্যে এবং আরও হাজারো আত্মিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক হিতোপদেশে সব ধর্মই এক। এসব ব্যাপারে ধর্মে-ধর্মে কোনও বিরোধ নাই। অথচ আমাদের সাংসারিক জীবনের পনর আনাই এসব নৈতিক ব্যাপার। কাজেই এসব ব্যাপারে সব রাষ্ট্রই আইন করিয়াছে ধর্মকে রাজনীতিতে না আনিয়াই। সমস্ত অপরাধকে দণ্ডনীয় করিয়া অত বড় পেনাল কোড যে রচিত হইল, তাতে ধর্মকে রাজনীতিতে আনার দরকার হয় নাই। কারণ, এ সব ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত ঈমান, বিশ্বাস ও মতামতের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় নাই। করা হয় নাই বলিয়াই এ সব ব্যাপারে আইন করিবার অধিকার রাষ্ট্র নিজ হাতে নিয়াছে। রাষ্ট্রের আইন মানে মানুষের রচিত আইন। অধুনা রাষ্ট্র মানেই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মানেই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের গঠন ও পরিবর্তন। সরকারের গঠন-পরিবর্তন মানেই আইন রচনা, রদ, বাতিল বা সংশোধনের অধিকার। সে অধিকার খাটানোও হইতেছে অহরহ। আজকার আইন আগামী কালের বে-আইন, গতকালের করণীয় কর্তব্য আজকার দণ্ডনীয় অপরাধ। এটাই রাষ্ট্রের এলাকা। এই-ই রাজনীতি।

কিন্তু ধর্মের অন্য একটা দিক আছে, যেখানে রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার নাই। সেটা ধর্মের ঈমান ও অনুষ্ঠানের দিক। সব ধর্মেরই তা আছে। আমাদের আছে পাঁচ আরকান। এখানে কোনও রাজাকে ঢুকিতে দিব না। এ সবের বিচার-বিবেচনার জন্য কোনও রাজার কাছে যাইবও না। এর নামই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতি।

এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতিকেই ইংরেজীতে বলা হয় সেকিউলারিযম। এই শব্দটাই আমাদের দেশে যত কম বুঝা হইয়াছে, তত বেশী ভুল বুঝা হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, ধর্ম-নিরপেক্ষ মানে ধর্ম-বিরোধী। আরও ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, সেকিউলারিযম মানে ন্যায়-নীতি, সত্য-সততা, সাধুতা, সচ্চরিত্রতা কিছু না মানা, যার-মন-যা চায় তাই করা। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ভ্যাণ্ডালিযম আর কি!

ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির এই অর্থ করা হইয়াছে বলিয়াই এর পক্ষে মুখ ফুটিয়া কেউ কথা বলিতে সাহস পায় না। নিজের মনের ভাব গোপন রাখিয়া কল্পিত জনপ্রিয়তা লাভের আশায় তেমন যে বিলাতীমার্কা পলিটিশিয়ান, তাঁরাও মুখে-মুখে ধর্ম-প্রীতিতে গলিয়া পড়িতেছেন। এ ধরনের মোনাফেকদের ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্যের চিন্তা আমরা করি না। তাঁরা এতে করিয়া পাকিস্তানের যে ক্ষতিটা করিতেছেন, আমাদের ভাবনা সেই জন্য। ধর্ম ও রাষ্ট্রের অনাবশ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগাইয়াই আমরা নয় বছরে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারি নাই। নয় বছরে যা-ও একটি রচিত হইয়াছিল, এক ব্যক্তির হুইসেলের এক ফুঁকে তা বাতিল হইয়া গেল। তেইশ বছরেও আমরা একটি শাসনতন্ত্র পাইলাম না। এই কারণেই আজো পাকিস্তানী নেশনের রূপ নির্ধারিত হইতে পারিল না। এসবের মূলে আছে একটিমাত্র বিভ্রান্তি। ধর্ম ও রাষ্ট্রের স্থান নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এই বিভ্রান্তির হেতু। আলেমদের প্রতি সুবিচারের খাতিরে এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, এই বিভ্রান্তির জন্য গোড়াতে আলেমরা দায়ী ছিলেন না। সকল ব্যাপারে বিলাতী-মার্কা নেতারা যখন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা না করিবার বাহানা হিসাবে 'অভূতপূর্ব ইউনিক ইসলামী শাসনতন্ত্রের' কথা বলিতে লাগিলেন, মাত্র তখনই আলেমরা খুব স্বভাবিকভাবেই বলিলেন: "তোমরা ইসলামের ও কোরআন-সুন্নার কি জান? যদি ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হয়, তবে আমরাই করিব।" ব্যস, গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। লাগিয়া গেল হাটের মার। যে যেখান দিয়া যাকে পারিল, এক ঘা মারিতে লাগিল। প্রাচীন সভ্যজাতি উপমাদেশের ছয় শ' বছরের শাসক মুসলমানরা তেইশ বছরেও নিজের দেশের শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যর্থ হইল। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর না হইলে, পাকিস্তানী আদর্শ ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী না হইলে এ ব্যর্থতা আর কতদিন চলিবে, কে জানে? অতএব আমাদের কল্যাণের জন্যই ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্ম-বিরোধিতার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্মকে যাঁরা রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ধর্মের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁরা তা করিয়াছেন। জার্মানির বিসমার্ক, ইংলণ্ডের লর্ড সল্সব্যারি ও স্যার

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, আমেরিকার ইমার্সন ও জন ডিউই প্রমুখ যাঁরা খুব জোরের সাথে সেকিউলারিযম সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাঁরা সকলেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন।

ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের আরেকটা প্রধান মৌলিক পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্র ভৌগোলিক সরহদ্দে সীমাবদ্ধ, আর ধর্ম ভৌগোলিক সীমা-সরহদ্দের ঊর্ধ্বে। অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারের মতই রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বিরোধ হইতে পারে, অহরহ হইতেছেও। একই ধর্মে বিশ্বাসী লোক এই বিবদমান রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্ম আনিলে এইখানে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হইতে পারে। আমরা পাকিস্তানী মেজরিটি ধর্মবিশ্বাসে আফগানদের সাথে এক। ধর্মীয় স্বার্থে তারা ও আমরা একই। কিন্তু পাখতুন আন্দোলনের ব্যাপারে তারা আমাদের স্বার্থ-বিরোধী। শাতিল-আরবের সীমা লইয়া ইরান-ইরাকে গুলি-বিনিময় চলিতেছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ও আফগানদের, ইরানী-দের ও ইরাকীদের ধর্মীয় কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক, এমনকি পরস্পর-বিরোধী। আরেকটা নযির লউন। আমরা পাকিস্তানী মুসলমান ও ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বন্ধন ও কর্তব্য একই। তেমনি ভারতীয় হিন্দু ও পাকিস্তানী হিন্দুর ধর্মীয় বন্ধন ও কর্তব্য একই। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী মুসলমান ও পাকিস্তানী হিন্দুর রাষ্ট্রীয় বন্ধন ও কর্তব্য একই। ঠিক তেমনি এক ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের রাষ্ট্রীয় বন্ধন ও কর্তব্য। ধর্মকে রাজনীতি হইতে আলাদা না করিলে এখানেই আনুগত্যের সংঘাত বাধিবে। পাকিস্তানী হিসাবে পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের রাষ্ট্রীয় আনুগত্য রাষ্ট্রের কাছে, ধর্মের কাছে নয়। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ব্যাপারে ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের অবস্থাও ঠিক তাই। ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, তবে পাকিস্তানের হিন্দুরা মুসলমানের সাথে একত্রে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তলওয়ার ধরিবে। আমরা ভারত আক্রমণ করিলেও ভারতের মুসলমানরা তথাকার হিন্দুদের সাথে একত্রে আমাদের বিরুদ্ধে তলওয়ার ধরিবে। যারা তা করিবে না, তারা তাদের দেশের দুশমন, পঞ্চম বাহিনী। পাকিস্তান-আফগানে লড়াই বাধিলে তেমনি যার-তার দেশের পক্ষে মুসলমান মুসলমানে খুনাখুনি হইবে। এটাই সকলের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও আনুগত্য।

অতএব যাঁরা বলেন, তাঁরা আগে মুসলমান পরে পাকিস্তানী, তাঁরা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক ধর্ম-প্রীতি দেখাইতে গিয়া নিজেদের জন্য এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেন। প্রথমতঃ, যখনই তাঁরা বলেন, তাঁরা আগে মুসলমান

পরে পাকিস্তানী, তখনই তাঁরা পাকিস্তানী হিন্দুদেরেও বলিবার অধিকার দেন যে, তাঁরা আগে হিন্দু, পরে পাকিস্তানী। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনি মুসলমান, যদি আপনার ধর্মকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান দেন, তবে পাকিস্তানের হিন্দুরও সে অধিকার মানিয়া লন। এর তাৎপর্য গুরুতর ও সুদূরপ্রসারী, অতি সহজেই তা বুঝা যায়। অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মকে টানিয়া আনিলে এটা হতে বাধ্য। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই ধর্মকে দুনিয়ার আর সব স্বার্থের উপরে বড় করিয়া দেখিয়া থাকে। ধর্ম আগে, না রাষ্ট্র আগে, এ প্রশ্নটাই অবান্তর। ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্ম আগে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র আগে—এটা পানির মত সরল কথা। আমিও মুসলমান আপনিও মুসলমান—এই যুক্তিতে আমি আপনার পরিবার ও বাড়ি-ঘর দখল করিতে পারি না। যদি করিতে যাই, তবে আমি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমার কাল্লা লইবার অধিকার আপনার আছে। এইখানেই রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও ধর্মীয় আনুগত্যের পার্থক্য। ধর্মকে রাজনীতি হইতে আলাদা রাখিলে এই দুই আনুগত্যের সংঘর্ষ বাধে না ; বাধে শুধু তখনই, যখন আমরা ধর্মকে রাজনীতিতে টানিয়া আনি। ধর্মের প্রতি আনুগত্য সভ্য মানুষের একটা বড় সম্পদ। কোনও প্রকার বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই কত মানুষ স্বেচ্ছায় ধর্ম ও সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছে ! রাষ্ট্রের জন্যও মানুষ প্রাণ দিয়াছে সত্য, কিন্তু সেটা দিয়াছে রাষ্ট্রের আদেশে বাধ্য হইয়া। যার-তার জায়গায় দুইটাই বড় আনুগত্য। যথা-স্থানে থাকিয়া দুইটাই মানবের কল্যাণ করিতে পারে। দুইটা একত্র করিলেই আনুগত্যের সংঘাতে দুইটারই ক্ষতি হইবে।

অথচ দুইটা একত্র করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যাঁরা কোরআন-সুন্নার বিধান মত পাকিস্তানীদের জীবন যাপনের ব্যবস্থার জন্যই ধর্মীয় শাসনতন্ত্র চান, তাঁরা দুইটা সুস্পষ্ট কথা, হয় বুঝিতেছেন না, অথবা বুঝিয়াও বলিতেছেন না। কথা দুইটি এই ঃ

প্রথমতঃ, তাঁরা বলেন, আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দুর্নীতি, পাপাচার, মিথ্যাচার, অধর্ম ও নীতিহীনতা দূর করার জন্যই ইসলামী শাসনতন্ত্র ও কোরআন-সুন্নার শাসন প্রবর্তন করা দরকার। এ কথার অর্থ কি এই যে, যতদিন ইসলামী শাসনতন্ত্র ও কোরআন-সুন্নার শাসন কায়েম না হইবে, ততদিন তাঁরা সৎ, সাধু, সত্যবাদী, চরিত্রবান ও ধার্মিক হইতে বাধ্য নন ? ততদিন কি তাঁরা সত্য কথা বলিবেন না ? চরিত্রবান হইবেন না ? মিথ্যা বর্জন করিবেন না ? কালাবাজারি ও মুনাফাখোরি ছাড়িবেন না ? পক্ষান্তরে তাঁরা কি আশা করেন যে, যেদিন ইসলামী শাসনতন্ত্র হইয়া যাইবে, কোরআন ও সুন্নার শাসন প্রবর্তন হইবে, সেইদিনই পাকিস্তানের মিথ্যাবাদীরা সত্যবাদী হইয়া

যাইবে ? চরিত্রহীনরা চরিত্রবান ও অসাধুরা সাধু হইয়া যাইবে ? কালাবাজারিরা কালাবাজারি ও মুনাফাখোররা মুনাফাখোরি ছাড়িয়া আসল দামে দ্রব্যাদি বিলি-বিতরণ শুরু করিয়া দিবে ? না, নয়া-সমাজ-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন করিয়া এ-সব দূর করিতে হইবে ? তাঁরা কি মনে করেন, যে সব অমুসলমান পাকিস্তানীর উপর কোরআন-সুন্না বাধ্যকর নয়, তাঁরা সৎ-সাধু হইতে, সত্য কথা বলিতে, মিথ্যা বর্জন করিতে, কালাবাজারি না করিতে বাধ্য নন ? তাঁরা কি বলিতে চান, তাঁদের ধর্মের নির্দেশ না থাকিলে তাঁরা নির্বিবাদে মিথ্যা কথা বলিতে, চুরি-জারি করিতে এবং কালাবাজারি চালাইয়া যাইতেন ? তাঁরা কি বলিতে চান, এত দিন পাকিস্তান ও তার ইসলামী শাসনতন্ত্র হয় নাই বলিয়া অতীতের ও বর্তমানের দুনিয়ার সব মুসলমানই ধর্মহীন, চরিত্রহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন ও আছেন ? আসল ব্যাপার তা নয়। ইসলামী শাসনতন্ত্র হউক আর না হউক ধর্ম-নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানীকে সৎ, সাধু, চরিত্রবান, দেশ-প্রেমিক, পরহিতৈষী হইতে হইবে। ধর্মীয় শাসনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে আগেও চলে নাই, ভবিষ্যতেও চলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা আজ কোরআন-সুন্নার শাসন চালাইবার দাবি ও ওয়াদা করিতেছেন, তাঁরা ক্ষমতায় বসিলে সত্যই কি নারী-শিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করিয়া নারীকে পর্দায় অবরোধ করিবেন ? মেয়েদের স্কুল-কলেজ ও নার্সিং বন্ধ করিয়া দিবেন ? ফটোগ্রাফি, আর্ট কলেজ, সিনেমা-থিয়েটার, নাচ-গান, মিডওয়াইফারি ও মেয়েদের ডাক্তারি বে-আইনী ঘোষণা করিবেন ? যদি বলেন 'হাঁ', তবে তাঁরা আধুনিক রাষ্ট্র চালাইবার যোগ্য নন। যদি বলেন 'না', তবে তাঁরা ধর্মীয় ভাঁওতা দিয়া ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা অপরিচ্ছন্ন ও তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টি ঘোলাটে করিতেছেন এবং নিতান্ত অনাবশ্যকভাবেই এই বিপজ্জনক কাজ করিতেছেন।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, ধর্মীয় রাজনীতিবাদীরা এ-সব কথা বুঝেন না। তবু তাঁরা কারণে-অকারণে জায়গা-বেজাগায় কেন ধর্মের দোহাই পাড়িয়া থাকেন ? পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের জনগণের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমস্যার আর অন্ত নাই। সর্বোপরি তেইশ বছরের স্বাধীনতায়ও তাদের নিরক্ষতা ও দারিদ্র্য এতটুকুও দূর হয় নাই, বরঞ্চ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এসব সমস্যার কথা ভুলিয়া এঁরা পাকিস্তানে ইসলাম রক্ষার কাজে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছেন কেন ? তাঁরা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, শতকরা পঁচাশি জন মুসলমানের দেশ এই পাকি-স্তানে মুসলমান জনসাধারণ দল বাঁধিয়া ইসলাম ধর্ম ত্যাগের এমন শেষ মুহূর্তে

আসিয়া পড়িয়াছে যে, পাকিস্তানীদের ধর্ম রক্ষাই আমাদের একমাত্র সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে? যে সব উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত লোক এ ধরনের কথা বলিতেছেন, তাঁদের দিকে চাহিয়া এমন ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে এর কারণ কি?

এই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া একটা ব্যাপার খুবই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। সেটা এই যে, পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান হইতেই এই আওয়াযটা উঠিতেছে বেশী জোরে-সোরে। ওখানে ওটাকে সামগ্রিক ও সমবেত আওয়াযই বলা যাইতে পারে। এর তাৎপর্য কি? সেখানেই কি ইসলাম বেশী বিপন্ন হইয়াছে? সেখানে ত মুসলমানের সংখ্যা সাড়ে আটানব্বই। যে দেড়জন অমুসলমান আছেন, তাঁদের যিনি প্রধান সেই চীপ জাস্টিস কর্ণেলিয়াস সাহেব ত মায় চুরির দায়ে হাতকাটা সহ পূর্ণ শরিয়তী শাসন প্রবর্তন করিতে চান এই মুহূর্তে। তবে ইসলামের বিপদটা কোথায়।

এর একমাত্র উত্তর এই যে, তাঁরা সত্যই বিশ্বাস করেন, একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতেই দুই পাকিস্তানকে একত্রে বাঁধিয়া রাখা যাইবে না। তাদের এ ধারণা ভুল। প্রথমতঃ, শুধু ধর্ম দিয়া দুই পাকিস্তানকে একত্রে বাঁধিয়া রাখা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, দুই অঞ্চলকে একত্রে বাঁধিয়া পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে [illegible] ও চিরস্থায়ী করিবার ধর্ম ছাড়াও আরও কারণ ও উপায় আছে। শুধু ধর্ম দিয়া রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা সম্ভব হইলে ইসলামের জন্মস্থান এক ধর্ম-বিশ্বাসী, এক ভাষা-ভাষী আরবভূমিতে সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্র হইত না। পক্ষান্তরে দুই অঞ্চলকে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থের রজ্জুতে বাঁধিয়া পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাকে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে। এক অঞ্চলের উপর অপর অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করিয়া উভয় অঞ্চলের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকার ইন্‌সাফ-মত বণ্টন করিলেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইবে। তা না করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মেজরিটির উপর তেইশ বছরের বে-ইন্‌সাফ ও শোষণ বজায় রাখিয়া ইসলাম ও ঐক্যের দোহাই দিলে চলিবে না। পূর্ব-বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী জমিদারি উচ্ছেদকে ইসলাম-বিরোধী বলিয়াও জমিদারি রক্ষা করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ ইসলামকে বে-ইজ্জত করিয়াছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানের উপর এই অবিচার স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে যে ফাঁদ পাতিয়াছেন, একদিন সে ফাঁদে তাঁরা নিজেরাই পড়িবেন।

ইত্তেফাক, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

২

ইসলামী শাসনতন্ত্র কি ও কেন ?

শতকরা পঁচাশিজন মুসলমানের দেশ পাকিস্তান। এদেশের শাসনতন্ত্র চরিত্রে ও প্রাণে ইসলামী হইবেই। নিরংকুশ গণতান্ত্রিক হইলেই তা হইবে। আকৃতিতে বা সাইনবোর্ডে তা হওয়ার দরকার নাই। তথাপি প্রশ্ন উঠিয়াছে ঃ আমাদের শাসনতন্ত্র ইসলামী হইবে, না গণতান্ত্রিক হইবে। প্রাণের চেয়ে দেহের, প্রকৃতির চেয়ে আকৃতির উপর বেশী জোর দেওয়ার ফলেই এ অনাবশ্যক তর্কটা উঠিয়াছে। এতদিন তর্কটা ছিল রাজনীতিবিদ ও শাসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজ এটাকে নির্বাচনের ইশু করিয়া জণগণের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। জনমতের দ্বারাই প্রশ্নটার স্থায়ী মীমাংসা হওয়া ভাল।

প্রশ্নটা আদতে কিন্তু শুধু শাসনতন্ত্রের আকৃতিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের সনাতন প্রশ্ন। কিভাবে প্রশ্নটা উঠে, কিভাবে তার কি মিমাংসা হয়, সেটা ইতিহাসের কথা। সে কথা আরেক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে কি আংগিকে এটা দেখা দিয়াছে, কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে এতে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছে, আজ শুধু সেই কথাটাই আলাচনা করিব।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, শাসনতন্ত্রকে যাঁরা আকৃতিতে ইসলামী করিতে চান এবং তার ফলে পাকিস্তানের গোটা রাজনীতিটাকেই ধর্মমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চহিয়াছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অসদুদ্দেশ্য আরোপ করা উচিত নয়। অবশ্য এঁদের মধ্যে কিছু ধর্ম-ব্যবসায়ীও যে নাই, তাও বলা যায় না। অতীতে যালেম, শোষক ও কায়েমী স্বার্থীদের সমর্থনে পবিত্র ধর্মের দোহাই দেওয়ার অনেক নযির আছে। আজও তেমন লোকের অভাব নাই। তাই বলিয়া যাঁরাই রাজনীতিতে ধর্মের আমদানি করিতে চান, তাঁদের সকলেরই মতলব খারাপ একথা বলা চলে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে ধর্ম-নীতিহীনতা, দুর্নীতি, ঘুষ-রেশওয়াত, উচ্ছৃংখলতা, চরিত্রহীনতা যেরূপ দ্রুত বাড়িতেছে, একদিকে ধনিক-শোষকদের আকাশচুম্বী বিলাসিতা ও অপরদিকে জনগণের সীমাহীন দুর্দশা ও দারিদ্র্য যেমন চরমে উঠিয়াছে, তাতে ধর্মপ্রাণ নীতিবান লোকেরা যদি মনে করেন যে ধর্মহীনতার জন্যই মানুষের এই সার্বিক অধঃপতন ঘটিয়াছে, যদি তাঁরা বিশ্বাস করেন যে রাজনীতিকে ধর্মের অনুশাসনে আনিতে পারিলেই এ অধঃপতন ঠেকান যাইবে, তবে তাঁদের ভ্রান্ত বলা গেলেও অসাধু

বলা চলিবে না। উদার মনে যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাঁদের ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই উচিত ও গণতান্ত্রিক হইবে। পক্ষান্তরে, যাঁরা ধর্মকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিতে চান, যাঁরা শাসনতান্ত্রিক বিধান দ্বারা ধর্মরক্ষার নীতিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁদেরও ধর্ম-বিরোধী, অবিশ্বাসী, বেঈমান, নাস্তিক, কাফের বলা উচিত নয়। তাঁদের মত ও চিন্তায় যদি ভুল থাকে, যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে ভুল দূর করার চেষ্টা করাই ধর্মবাদীদের উচিত। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা।

আমাদের সমাজ-জীবনে যে পাপ, অনাচার ও উচ্ছৃংখলতা ঢুকিয়াছে, তাতে কারো দ্বিমত নাই। আমাদের রাষ্ট্র-জীবনে যে দুর্নীতি বিপজ্জনক স্তরে পেঁ'ছিয়াছে, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারের সাম্প্রতিক ব্যবস্থাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তর হইতে এইসব উচ্ছৃংখলতা, যুলুম, অনাচার ও দুর্নীতি দূর করিবার আশু ও ফলপ্রদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাতেও কোন সন্দেহ ও মতভেদ নাই।

কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মীয় অনুশাসন আমদানি করিলেই, আরও বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে, ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করিলেই এই সব পাপ দূর করা যাইবে কিনা, সেটাই আমাদের বিচার করিতে হইবে। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের কথাটা আরও ব্যাপক বলিয়া তার আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। ইসলামী শাসনতন্ত্রের কথাটাই আমাদের এখনকার আলোচ্য। এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিলেই এই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক পাপ মোচনের ব্যবস্থা হইবে কিনা, চলুন, আজ সে কথাটাই আলোচনা করি।

অনেকে বলিবেন এবং বলিয়াছেনও যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র কথাটা অস্পষ্ট [illegible]। মুসলিম দুনিয়ার অতীত ও বর্তমানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের কোনও নজির নাই। কথাটা সত্য হইলেও আমি আজ সে যুক্তির পিছনে আশ্রয় লইব না। আমি বলিব, অন্য কোনও দেশে না থাকিলেও পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের নমুনা বিদ্যমান আছে। বর্তমানে যে সব দল, পার্টি বা জামাত ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবি করিতেছেন, তাঁরা সকলেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে ইসলামী শাসনতন্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং লইতেছেন।

তা হইলে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র হইতে আমরা ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে [illegible] ধারণা করিতে পারি। আসুন, এখন বিচার করা যাউক, এই শাসনতন্ত্রটি ইসলামী কেন?

এই শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানকে 'ইসলামী' প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছে। প্রিয়েম্বলে [illegible] আল্লার সার্বভৌমত্ব মানা হইয়াছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে জনগণের কাছে আল্লার পবিত্র আমানত বলা হইয়াছে। পাকিস্তান সামাজিক

ইনসাফের ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে, বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কোরআন ও সুন্নার বর্ণিত ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। প্রিয়েম্বলের এই শুভ ইচ্ছা প্রকাশ ছাড়া শাসনতন্ত্রের গর্ভে আরও ৪টি ধারা যোগ করা হইয়াছেঃ 'ডিরেকটিভ প্রিন্সিপল' নামক অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ ধারা ও 'জেনারেল প্রভিশন' নামক অধ্যায়ের 'ইসলামিক প্রভিশনস' শীর্ষক উপ-অধ্যায়ের ১৯৭ ও ১৯৮ ধারা। ২৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন জোরদার করিবার চেষ্টা করা হইবে। ২৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মুসলমান পাকিস্তানীরা যাতে কোরআন-সুন্না মোতাবেক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই অধ্যায়ে 'প্রভাইসো' অর্থাৎ 'কিন্তু-বিধানে' বলা হইয়াছে যে, এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সরকারের উপর আদালতযোগে প্রযোজ্য বাধ্যতামূলক নহে। ১৯৭ ধারার (১) উপ-ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট একটি ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট গঠন করিবেন এবং (২) উপ-ধারায় বলা হইয়াছে যে, (১) উপ-ধারার রিসার্চ ইনস্টিটিউট চালাইবার জন্য মুসলমানদের উপর বিশেষ ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের থাকিবে। ১৯৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোরআন-সুন্না বিরোধী কোনও আইন রচনা করা হইবে না এবং চলিত আইনগুলি ইসলামী নীতি মোতাবেক সংশোধন করা হইবে।

এই 'ইসলামী' শাসনতন্ত্রটিই জেনারেল আইয়ুব এক তুড়িতে বাতিল করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে '৬২ সালে যে শাসনতন্ত্র দিলেন, সেটাও 'ইসলামী শাসনতন্ত্রই' হইল। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে যে সব ইসলামী প্রিয়েম্বল ও ধারা ছিল, তার সবগুলিই '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে থাকিল, বরঞ্চ কিছু বেশী করিয়াই থাকিল। এতে 'এডভাইযারি কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইডিওলজি' নামে একটি সংস্থা গঠনের বিধানও থাকিল। আইয়ুবের উত্তরাধিকারী সামরিক প্রেসিডেন্ট এটিও বাতিল করিয়া দিলেন।

এখন বিচার করুন, দুইটি কথা। এক, এমন পছন্দসই ইসলামিক শাসনতন্ত্র দুইটি বাতিল হইল কেন? দুই, বাতিল না হইলেও ঐ শাসনতন্ত্র দুইটির 'ইসলামিক বিধান' মুসলমানদের কি কাজে লাগিত?

এক নম্বর কথাটারই আলোচনা আগে করা যাক। দেখা গেল, যতই ইসলামী হোক, সামরিক বিপ্লবের দ্বারা তা বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। যে শাসনতন্ত্র দেশে ইসলাম রক্ষার জন্য করা হইয়াছিল, সামরিক শক্তির মোকাবেলা সে নিজেকেই রক্ষা করিতে পারিল না। দেশের শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে পারে একমাত্র জনগণ। সেজন্য শাসনতন্ত্রকে জনগণের পছন্দসই অর্থাৎ গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। '৬২ সালের আইয়ুবী শাসনতন্ত্রে ইসলামিক বিধান যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও

ওটা কেউ চায় নাই। উহার পুনর্বহালও কেউ দাবি করে নাই। স্বয়ং ইসলাম-পন্থীরাও না। কেন চায় নাই ? যেহেতু ওটা মোটেই গণতান্ত্রিক ছিল না। এতে সকলেই কাজে-কর্মে স্বীকার করিলেন, শাসনতন্ত্র শুধু ইসলামিক হইলেই চলে না, তাকে গণতান্ত্রিকও হইতে হয়। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ইসলামী ছিল, মোটা-মুটি গণতান্ত্রিকও ছিল। সেজন্য দেশবাসী সেটা মানিয়া লইয়াছিল। উহার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের জন্য দেশবাসী প্রস্তুতও হইয়াছিল। জেনারেল আই-য়ুব উহা বাতিল না করিলে নির্বাচন হইয়া যাইত। নির্বাচিত পার্লামেন্ট উহার অগণতান্ত্রিক আপত্তিকর বিধানগুলি সংশোধন করিয়া লইত। এই কারণে আইয়ুবী-আমলে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্বহালের দাবি উঠাইয়াছিল এবং আন্দোলন হইয়াছিল। সত্য বটে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলেই '৫৬ সালের শাসন-তন্ত্রের বিরোধী জনমত ছিল। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঐ শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল না করায় কেউ দুঃখিত হন নাই, অনেকেই খুশী হইয়াছেন। কারণ, প্রেসিডেন্ট তার বদলা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র রচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখন বিচার করা যাক, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র জনপ্রিয় ছিল না কেন ? পূর্ব পাকিস্তানের আপত্তি ঐ শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের আপত্তি, উহাতে 'ওয়ান ইউনিট' ছিল বলিয়া। কাজেই স্পষ্টই দেখা গেল, পাকিস্তানের উভয় অংশ হইতে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইয়াছে গণতান্ত্রিক কারণে। উহাতে 'ইসলামিক' বিধান ছিল বলিয়া কেউ আপত্তি করে নাই। যদি ঐ শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকিত, তবে উভয় অঞ্চলে ঐ শাসনতন্ত্র জনপ্রিয় হইত। ঐ শাসন-তন্ত্র রক্ষার জন্য জনগণ জান দিত। ইস্কান্দর, আইয়ুব বা অন্য কোনও ক্ষমতালোভী ডিক্টেটর সে শাসনতন্ত্র বাতিল করিবার দুঃসাহস করিতেন না। সুতরাং বুঝা গেল, গণতন্ত্রই অর্থাৎ জনগণই শাসনতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ ও গ্যারান্টি। অতএব '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার সময় 'ইসলামিক বিধানের' চেয়ে যদি গণতান্ত্রিক বিধানের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হইত, তবে আমাদের কপালে এত বিপদ ঘটিত না।

এখন বিচার করা যাউক, ঐসব 'ইসলামী' বিধানের কি দরকার ছিল ? ওতে পাকিস্তানী মুসলমানদের কি কি উপকার হইত ? পাকিস্তানের মুসলমানরা ইসলামের নীতি অনুসারে জীবন যাপন করিতে পারিবে, সোজা কথায়, পাকিস্তানে মুসলমানরা মুসলমানরূপে থাকিতে পারিবে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে এ-সব

কথা লেখা থাকা কি অনাবশ্যক, হাস্যকর, এমনকি অপমানজনক নয়? এ-সব বিধানের অর্থ কি এই যে, এসব কথা শাসনতন্ত্রে লেখা না থাকিলে পাকিস্তানের মুসলমানরা মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারিত না। শাসনতন্ত্রে এ ধরনের কথা লেখা না থাকিলে পাকিস্তানের সার্বভৌম পার্লামেন্ট কি ঐসব বিধানের সবগুলি মোতাবেক কাজ করিতে এবং মদ, সুদ, বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া, ঘুষখোরি, কালোবাজারি দণ্ডনীয় করিয়া আইন করিতে পারিত না? গোটা পাকিস্তানী জাতির, বিশেষতঃ পাকিস্তানী মুসলমানদের কল্যাণকর যে-কোনও আইন রচনা করিবার, যে-কোনও উপায় অবলম্বন করিবার অধিকার, ক্ষমতা ও বুদ্ধি কি নির্বাচিত পার্লামেন্টের থাকিবে না? শাসনতন্ত্রে লেখা না থাকিলেই পাকিস্তানে প্রচলিত ইংরাজ শাসক প্রবর্তিত আইনগুলির ভাল-মন্দ বিচার করিয়া ঐসব আইনকে প্রয়োজনমত ইসলামী বিধান ও মুসলমানদের চিন্তাধারার মাফিক করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা পাকিস্তান পার্লামেন্টের থাকিবে না, এ রকম সন্দেহ-অবিশ্বাস কেন করা হইতেছে? কারা এ ধরনের সন্দেহ করিতেছেন? শাসনতন্ত্রে বিধান না থাকিলে পাকিস্তানের মুসলমানরা মুসলমান থাকিবে না, মুসলমান-দের বিরুদ্ধে এমন অপবাদমূলক, অপমানজনক ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাব পোষণ করে কারা? যে মুসলমানরা ভারতের চারআনি মাইনরিটি হইয়াও অত অসহায় অবস্থার মধ্যে, অত অত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে, অতশত প্রবল বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া নিজেদের ধর্মীয়, কৃষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষার জন্য ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান হাসিল করিল, শাসনতন্ত্রের শৃংখলে বাঁধিয়া না রাখিলে তারাই প্রথম সুযোগে ইসলাম ত্যাগ করিবে, এমন চিন্তাও যাহারা মনে স্হান দেয়, তাহারা পাকিস্তান ও মুসলমানদের হিতৈষী হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, শাসনতন্ত্রে 'ইসলামী' বিধান থাকিলেও গণতন্ত্রের অভাবে ডিক্টে-টররা কোরআন-সুন্নার খেলাফে আইন জারি করিতে পারেন, তার প্রমাণ স্বয়ং জেনারেল আইয়ুব। তিনি অন্যান্য ইসলামপন্হীর মতই ইসলামী শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও কোরআন শরিফের সুস্পষ্ট নির্দেশের খেলাফে অর্ডিন্যান্স বলে মুসলমানের ওয়ারিশী ও বিবাহ আইন রচনা করিয়াছেন। নিজের এই কাজের সমর্থনে আইয়ুব সাহেব মিসরের নযির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কথা সত্য হইলে মিসরের মত খাস ইসলাম ও আরবী ভাষার দেশেও কুরআন-সুন্নার খেলাফে আইন প্রণীত হইয়াছে। ডিক্টেটর আইয়ুব যা করিয়াছেন, নির্বাচিত পার্লামেন্ট তা কদাচ করিতে পারিত না। 'ডিক্টেটরি' শাসনে পাকি-স্তানে যা হইয়াছে, মিসরেও তাই হইয়াছে।

বলা যাইতে পারেঃ বুঝিলাম, ইসলাম রক্ষার জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র দরকার নাই। ধর্ম হিসাবে ইসলামের নিজস্ব গুণাবলী ও মুসলমানদের ঈমানই

ইসলাম রক্ষার জন্য যথেষ্ট। মানিয়া নিলাম, ইসলাম প্রচারে যেমন রাষ্ট্র-ক্ষমতার দরকার হয় নাই, ইসলাম রক্ষায়ও তেমনি রাষ্ট্র-ক্ষমতার দরকার নাই। কিন্তু পাকিস্তানের মত মুসলিম-প্রধান দেশে গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকিতে দোষ কি ? আবশ্যক না হইলেও অধিকন্তু হিসাবে শাসনতন্ত্রের অমন বিধান থাকিতে আপত্তি কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, অমন বিধান একদিকে যেমন অনাবশ্যক, অন্যদিকে তেমনি অহিতকর জটিলতা সৃষ্টিকারী। প্রথমতঃ, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন-তান্ত্রিক বিধান শুধু মুসলমানদের জন্যই করা যাইতে পারে, অমুসলমানদের উপর তা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। সেই জন্য '৫৬ সালের ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টই লেখা হইয়াছে, এইসব বিধান অমুসলমান পাকিস্তানীদের উপর প্রযোজ্য নয়। যে কথাটি ঐ দুই শাসনতন্ত্রে বলা হয় নাই অথচ সত্য, তা এই যে, ঐ সব বিধান অপাকিস্তানী মুসলমানদের উপরও প্রযোজ্য নয়।

এ ছাড়া আরও অসুবিধা আছে। পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মযহাব ও ফেরকা আছে। তাঁরা কোরআন-হাদিসের ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। ও-সব পার্থক্য এতই প্রবল এবং যার-তার ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ যে, এই মতভেদের জন্য অতীতে তাদের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সেজন্য পাকিস্তানের দুইটি ইসলামী শাসনতন্ত্রেই ঠিকই বিধান করা হইয়াছে যে, পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের ঐ সব ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করি-বার সময় ঐ সব মযহাব ও ফেরকার পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োগ করা হইবে। এ কথার সোজা অর্থ, আমাদের যে সব মত-ভেদ ও ফেরকাবন্দি এতদিন আমাদের ধর্মীয় জীবনে ও মসজিদে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে প্রসারিত করিয়া আমাদের অন্তর্বিরোধ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পাকা-পুখ্‌ত করা হইবে।

এটা তো গেল পাকিস্তানী মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জীবনের কথা। আসল পাকিস্তানী রাষ্ট্র, পাকিস্তানী জাতি ও পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রকেও বিপন্ন ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন করা হইবে। প্রথমতঃ, ঐ দুই শাসনতন্ত্রেই বিধান করা হইয়াছে যে, (১) মুসলমানদের ধর্ম-সংস্কৃতির উন্নয়ন বিধানের জন্য যে খরচ হইবে, সেটা পৃথকভাবে মুসলমানদেরই বহন করিতে হইবে; অমুসলমানরা তার ভাগ দিতে বাধ্য থাকিবে না; (২) অমুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম-সংস্কৃতি অনুসারে নিজস্ব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিবে; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-নীতি-সংস্কৃতি শিক্ষার কারিকুলাম হইলে অমুসলমানরা সে কারিকুলাম মানিতে বাধ্য থাকিবে না।

এ-সব পার্থক্য ও বিভিন্নতার যোগফল হইবে এই যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র গোটা পাকিস্তানী জাতির জন্য হইবে না; হইবে শুধু পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য। কোনও দেশের শাসনতন্ত্র সমগ্র দেশ ও গোটা জাতির জন্য নয়, গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় এর চেয়ে জাতীয় অপমান আর হইতে পারে না।

অথচ যে-সব অনাচার-উচ্ছৃংখলতা দূর করিবার জন্য আলেম-সমাজ ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবি করিতেছেন, তার একটাও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন নয়, সবই শাসনযান্ত্রিক ব্যাপার। শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন নয়। সাধারণ আইন বাতিল করা যায়, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এর একটাও করা যায় না।

অতএব, শাসনতন্ত্রে ইসলামী বিধান যোগ করিবার জন্য আজ একদল আলেম যে জোরদার ও জীবনপণ আন্দোলন করিতেছেন তার সময় এটা নয়। ও সব এখন স্থগিত রাখুন। ভবিষ্যতে পাকিস্তান পার্লামেন্ট কোন খারাপ আইন করিতে এবং ভাল আইন না করিতে চাহিলে শুধু তখনই এমন আন্দোলন করিবেন। দেশবাসী একবাক্যে তাঁদেরে সমর্থন করিবে। এ বিশ্বাস আলেমদের নিশ্চয়ই আছে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে তাঁরা যখন নির্বাচন করিতে যাইতেছেন এবং নির্বাচনে জয়লাভের আশাও করিতেছেন, তখন মুসলমানদের ধর্ম-প্রীতিতে তাঁদের নিশ্চয়ই আস্থা আছে। এই আস্থাই প্রমাণ করে যে, শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারা পাকিস্তানে ইসলাম রক্ষা করিতে হইবে না। এ দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারা মেজরিটি মুসলমানের নয়, মাইনরিটি অমুসলমানদের ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে। কারণ ভোটে তারা মাইনরিটি; গণতন্ত্রে মাইনরিটির ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষারই বিধান থাকে, মেজরিটির নয়।

ইত্তেফাক, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭০

৩

মুসলিম জাহানে দৈশিক জাতীয়তাবাদ

আজ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী। কৃতজ্ঞ দেশবাশী এই প্রাণত্যাগী জাতীয় নেতার স্মৃতি-দিবস পালন করিতেছে। এটা সবারই জানার কথা যে, কোন জাতীয় নেতার স্মৃতি পালনের সবচেয়ে বড় উপায় তাঁর জীবনাদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শনকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করিবার সার্বিক চেষ্টা। সেটা আমরা করিতেছি কি ?

শহীদ নেতৃত্বের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান তাঁর অসাম্প্রদায়িক পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান-সংগ্রামের 'দুইজাতি-তত্ত্বের' পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। সেই কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় তেইশ বছর পরেও আমরা পাকিস্তানী জাতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি নাই। এই কারণেই পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে আজ সমস্যার অন্ত নাই। নয়া রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সমস্যাসমূহ ছাড়াও তাই আমাদের চিন্তাজগতেও জটিল সমস্যা সৃষ্টি হইতেছে। তার ফলে বিভ্রান্তি, অনৈক্য ও জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্টতা আমাদের জাতীয় সংহতিকে বারে বারে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। এই কারণেই আমরা এতদিনেও একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দিতে পারিতেছি না। এই কারণেই আমাদের একদল রাজনীতিবিদ পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের স্থলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী তুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁরা বলিতেছেন, পাকিস্তান একটি ইসলামিক ইডিও-লজিক্যাল রাষ্ট্র। টেরিটরিয়েল ন্যাশনালিযম এ রাষ্ট্রে চলিবে না। এই ধরনের মতবাদ নেশন-স্টেট, হিসাবে পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে আঘাত করিতেছে। তারা টেরিটরিয়েল ধর্মীয় জাতীয়তার প্রভাবের দ্বারা এঁরা টেরিটরিয়েল রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে।

এসব কথা যাঁরা বলিতেছেন, তাঁরাও পাকিস্তানের হিতৈষী। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনিষ্ট করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া তাঁরা এই মতবাদ প্রচার করিতেছেন, তা নয়। তাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন, একমাত্র ইডিওলজিক্যাল স্টেট হিসাবেই পাকিস্তান টিকিয়া থাকিতে পারে; সেকিউলার জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে না।

পাশ্চাত্য সভ্য রাষ্ট্র ও আফ্রো-এশিয়ান সমস্ত নয়া-পুরান রাষ্ট্রের কথা না হয় বাদই দিলাম, দুনিয়ার আর সব মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে নযর দিলেই বুঝা

যাইবে, পাকিস্তানের এই শ্রেণীর চিন্তাবিদরা ভ্রান্ত। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াও মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র। সেখানেও দৈশিক জাতীয়তাবাদ চলিতেছে। কিন্তু তাদের আদর্শকে ইসলামী আদর্শের মডেল হিসাবে গ্রহণ করিতে সকলে রাযী নাও হইতে পারেন। তাই আমি এই প্রবন্ধে ইসলামের জন্মভূমি আরব জাহান ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক বিবর্তন ও দৈশিক জাতীয়তাবাদ গ্রহণের নযিরটাই এখানে পেশ করিতেছি।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে দৈশিক জাতীয়তাবাদ প্রচার শুরু হয় ঐ সব দেশের স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাস্তব প্রয়োজনে। ঐসব দেশেই এককালে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্হা হিসাবে রাজতন্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্হা হিসাবে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার উপরে ছিল তাদের দেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব। নিজ-নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় আযাদি হাসিলের সংগ্রাম করিতে করিতেই রাষ্ট্রনায়করা বাধ্য হইয়াই দৈশিক জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করেন। এর ফলে পরিণামে অনেক দেশে রাজতন্ত্রের স্হলে প্রজাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের স্হলে জাতীয় সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিতে নিতান্ত অবস্হাগতিকে বাধ্য হন। কারণ এটাই যুগের বাণী; গণতন্ত্রের এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

এটা আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম মিসর দেশে। ১৮৮১ সালে ইংরাজ মিসর দখল করে। পনর বছর যাইতে না যাইতেই ১৮৯৫ সালে মোস্তফা কামিল নামে প্যারিসে আইন অধ্যয়নরত একটি মিসরীয় যুবক মিসরে ইংরাজ আধিপত্যের কঠোর নিন্দা ও মিসরের স্বাধীনতার দাবিতে মর্মস্পর্শী এক বক্তৃতা করেন। ফরাসী সরকার তাতে বাধা দেন না। বরঞ্চ ইংরাজ সরকার মনে করেন যে, ফরাসী সরকার মিসরীয়দিগকে স্বাধীনতায় উস্কানি দিতেছেন। কথাটায় অনেকখানি সত্য ছিল। গোড়ারদিকে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন প্রবর্তনের শুরুতে যেমন এখানেও ফরাসী সরকার বাধা দিয়াছিলেন, মধ্য-প্রাচ্যের বেলাতেও তাই ঘটিয়াছিল। তৎকালে ইংরেজ-ফরাসীতে কলহ লাগিয়াই ছিল। যাহোক, ঐ বছরই মোস্তফা কামিল স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আইন-ব্যবসা শুরু করেন এবং 'আল্-হিযবুল-ওয়াতান' নামে একটি পার্টি গঠন করেন। পার্টির কাজ সাধারণতঃ গোপনভাবেই চলিত। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি খবরের কাগজ বাহির করেন এবং একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতেও ফরাসী সরকারের পরোক্ষ গোপন সাহায্য পাওয়া যাইত। কিন্তু ১৯০৪ সালে ইংরাজ-ফরাসীতে মিত্রতা স্হাপিত হওয়ায় মোস্তফা কামিলের পার্টি বেকায়দায় পড়ে।

তৎকালে ইউরোপীয় সমস্ত ও প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এশিয়াবাসী শক্তিশালী ও অপরাজেয় মনে করিত। মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহও তাই ভাবিত। কাজেই কোনও একটি ইউরোপীয় শক্তির সাহায্য না পাইলে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা যাইবে না, এটা আরব জাহানের চিন্তানায়করাও বিশ্বাস

...লেন। এই কারণে মোস্তফা কামিল দমিয়া গেলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে ...য়া রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাপান ইউরোপের বিশাল রাষ্ট্র রুশ মুল্লুককে সম্মুখ-যুদ্ধে ...রাইয়া দেওয়ায় সাধারণভাবে আরব জাহানে, বিশেষভাবে মিসরে আবার আত্ম-বিশ্বাস ও সাহসের উন্মেষ হইল। যে আরব জাহান ১০৯৯ হইতে ১২৮৯ সাল ...শ প্রায় দুইশ বছর ব্যাপী ক্রুসেডে ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সমবেত শক্তিকে ...স্ত করিয়াছিল এবং যে বিজয়ের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন মিসরের সুলতান ...উদ্দিন, তারাই আজ ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সকলের নয়, একটির বিরু-...ে মাথা তুলিতে ভয় পায়, এ কথা ভাবিয়া মিসরের তরুণরা লজ্জাবোধ করিল ...র সাহসের সংগে সংঘবদ্ধ হইল। তারা অল্পদিনেই শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ...রা সন্ত্রাসবাদী হইয়া উঠিয়াছে, এই যুক্তিতে ইংরাজরা এমন বর্বরোচিত ...পীড়ন ও দমননীতি অবলম্বন করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে মোস্তফা কামিলের ...ত্বে মিসরীয় জাতীয় আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। তার স্থান ...ল করিল শেখ মোহাম্মদ আবদুহুর নেতৃত্বে 'হিযবুল উম্মা' নামে একটি ...রেট পার্টি। এই পার্টির সুপারিশেই বৃটিশ পরিচালিত মিসর সরকার সাদ ...লুল নামে এক তরুণকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহু প্রধানতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন লইয়া ব্যাপৃত ...লেন বলিয়া সরকার তাঁর পার্টিকে মডারেট পার্টি মনে করিয়াছিলেন। ...সলে উহা মডারেট পার্টি ছিল না। শেখ আবদুহুও ইংরেজ শাসন ...কোনও মডারেট নেতা ছিলেন না। স্বাধীন মিসরে ভাবী জাতীয় নেতা ...গলুলকে নিজেদের পার্লামেন্টারী নেতা নিয়োগ করা হইতেই তা স্পষ্ট ...। এই যগলুলই পরবর্তীকালে ওয়াফদ পার্টি গঠন করেন এবং অসহ-...ে আন্দোলনে কারাবরণ ও নির্বাসন সহ্য করিয়া কূটনৈতিক দক্ষতার গুণে ... সালে মিসরের স্বাধীনতা হাসিল করেন।

...দিকে, মোস্তফা কামিলের দৃষ্টান্তে ঐ সময় তুরস্কেও 'ইয়ং টার্কি' নামক ... একটি দল গঠিত হয়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক দুর্বল ...সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধন করিয়া ১৯০৮ সালে ...নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এক শাসনতন্ত্র সুলতানকে দিয়া প্রবর্তন ...। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম-খৃষ্টান-...ইউরোপীয়-আফ্রিকা নির্বিশেষে সকলকে সমান রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক ...কার দেওয়া হয়। 'ইয়ং টার্কি' পার্টির এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া নয়া ...ী শাসনতন্ত্রে দেওয়া অধিকার বলে মোস্তফা কামিলের নেতৃত্বে নব গঠিত ...ন্যাশিয়ান পার্টি ইয়ং তুর্কী পার্টির সহিত যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এই ...মিসরের জাতীয় আন্দোলনকে খুবই জোরদার করিয়া তুলে। এই ...ই সময়ে এতটা শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তৎকালীন

মিসরের প্রধানমন্ত্রী কপটিক খৃষ্টান মিঃ মাত্রস গালীকে ইংরেজের দালাল দেশ-দ্রোহী আখ্যা দিয়া হত্যা করা হয়।

কিন্তু এই আরবী-তুর্কী ঐক্যজোট বেশীদিন টিকে নাই। ১৯০৮ সালে এই ঐক্যজোট ইস্তাম্বুলে 'আল-ইখওয়াতুল-আরাবী ওয়া উস্‌মানী' নামে পার্টি গঠন করিয়াছিল। সুলতান হামিদের 'জাতীয়নীতির' ফলে তা ভাংগিয়া যায়। এই সময় সুলতান তুর্কী ব্যতীত অন্য জাতির লোকের রাজনৈতিক পার্টি গঠন নিষিদ্ধ করিয়া ফরমান জারি করেন। ফলে 'ইয়ং টার্কি' পার্টি 'নিজের অস্তিত্ব রাখার খাতিরে' আরবদিগকে পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সময় হইতেই আরব তরুণদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় এবং মিসর ছাড়াও সিরিয়া ও ইরাকে আরব জাতীয়তাবাদ প্রসার লাভ করে। যতদিন ইখ্‌ওয়াতুল আরাবী-উস্‌মানী জীবিত ছিল, ততদিন এদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল, আরব-জাহান ও তুর্কী সাম্রাজ্যকে ইউরোপের প্রভাবমুক্ত করা এবং আরব দেশসমূহকে তুর্কী সুলতানের অনুগত তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করা। ইয়ং টার্কি পার্টি হইতে আরবী মেম্বরদেরে বাহির করিয়া দেওয়ায় আরব তরুণরা ও তাদের পার্টিসমূহ তুর্কী সাম্রাজ্যমুক্ত আরব রাষ্ট্রসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক বছর আগে ১৯১৩ সালে প্যারিসে অধ্যয়নরত সাতজন আরব ছাত্র তথায় আরব জাতীয়তাবাদীদের একটি পরামর্শ সভা ডাকেন। তাতে বিভিন্ন আরব দেশ হইতে মোট চব্বিশজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে এগার জনই ছিলেন আরবী খৃষ্টান। সুতরাং এই আরব জাতীয়তাবাদ যে গোড়া হইতেই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-নিরপেক্ষ সেকিউলার জাতীয়তাবাদ ছিল, তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। এই পরামর্শ সভায় একটি পার্টি গঠন করা হয়। এই পার্টির নাম রাখা হয় 'জমিয়তুল-আরাবী আল্‌ফাত্তা' (ইয়ং আরব এসোসিয়েশন)। ঐ বছরই সমিতির হেড অফিস প্যারিস হইতে দামেশ্‌কে স্থানান্তরিত করা হয়। প্যারিস বৈঠকে যে সব আরব নেতা উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা ঐ সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে জামিল মর্দম (পরবর্তীকালে সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী), আবদুল হামি (পরবর্তীকালে জাতিসংঘে সিরিয়ার প্রতিনিধি), তৌফিক-সুওয়ায়েদী (পরবর্তীকালে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমিতির হেড অফিস সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করিবার পর স্বল্পদিন মধ্যে সমিতির মেম্বরসংখ্যা দুই হাজারে উঠিয়া যায় এবং শুক্‌রি আল-কোয়াতলি (পরবর্তীকালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট)ও করিম আলখুরি (পরবর্তীকালে সিকিউরিটি কাউন্সিলে সিরিয়ার প্রতিনিধি)-ও সমিতির মেম্বর হন। কয়েক দিনের মধ্যেই বাগদাদে শাখা অফিস স্থাপিত হয়। এই শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হামরি-আল পাসাশি। ইনি ১৯৪৬ সালে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আল-ফাতাহ্ পার্টিরও আদর্শ ছিল তুর্কী সুলতানের অনুগত তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত সম্মিলিত আরব রাষ্ট্র স্থাপন করা। কিন্তু ঐ সময়েই দক্ষিণ-ইরাক ও পার্সিয়ান উপকূলবর্তী আরব নেতৃবৃন্দ মোহাম্মরা শহরে একটি আরব জাতীয়তাবাদী সম্মিলন আহ্বান করিয়া তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুলেন। ইহাতে আল-ফাতাহ্ পার্টির মধ্যেও কিছুসংখ্যক পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী নেতার আবির্ভাব হয়। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে তুরস্ক সরকার জেনারেল কামাল পাশার পরামর্শে সিরিয়া ও ইরাকে চরম দমননীতি প্রবর্তন করেন। বহু রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার ও চরমদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আরব জাতীয়তাবাদীদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনও গুপ্ত আন্দোলনে পরিণত হয়। মিসরসহ সমস্ত আরব জাহানে চাপা বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে থাকে।

১৯১৪ সালে আযিয মিসরী নামক তুর্কী সরকারের একজন মিসরীয় কর্মচারী চাকরিতে ইস্তেফা দিয়া 'আল্ আহাদ' নামে একটি বিপ্লবী পার্টি গঠন করেন। অল্পদিন মধ্যেই এই গুপ্ত সমিতির মেম্বর সংখ্যা চার হাজারে উন্নীত হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তুর্কী সরকারের সৈন্য বাহিনীর আরবী অফিসার। তুরস্কের সৈন্য বাহিনীর আরবী অফিসারদের অধিকাংশই ইরাকী ছিলেন বলিয়া আল্ আহাদ পার্টিতেও স্বভাবতঃই ইরাকীদের সংখ্যাধিক্য হইল। এইভাবে একই সময়ে আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দু'টি শক্তিশালী পার্টির জন্ম হইল। এঁদের মধ্যে আল-ফাতাহ্ পার্টি ছিল সিভিলিয়ানদের পরিচালিত এবং আল্-আহাদ ছিল সামরিক অফিসারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে ১৯১৫ সালের আগে পর্যন্ত এই দুই পার্টির মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না; দুই দলই নিজ নিজ মতে জাতীয়তাবাদী আরবদেরে সংঘবদ্ধ করিয়া চলিলেন। এঁদের প্রচারের ফলে আরব জাতির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া গেল। ১৯০৪ সালে যেখানে সমগ্র আরব জাহানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬টি, ১৯১৫ সালে সেখানে তাদের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৫২টি, অর্থাৎ দশ বছরে তের গুণ।

এই সময়ে ১৯১৪ সালের জুন মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত তুরস্ক সরকার এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। আরব জাতীয়তাবাদী নেতারা চান যে, সুলতান এই যুদ্ধে কোন পক্ষে জড়াইয়া না পড়েন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করিতেন, তুরস্ক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর এক পক্ষ আরব জাহান দখল করিয়া বসিবে। সেজন্য আল্-ফাতাহ্ ও আল্-আহাদ উভয় পার্টি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, 'যদি বৃটিশ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তুর্কী সাম্রাজ্য দখল ও নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিতে চায়, তবে নিজেদের সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া সমস্ত আরব পার্টিসমূহ সমবেতভাবে তুরস্কের পক্ষে লড়াই

করিবে।' কায়রো হইতে আখিয মিসরী আল্-ফাতাহ্ ও আল্-আহাদ উভয় পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে এইরূপ আবেদন করেন : 'আপনারা বর্তমান পরিস্থিতিতে আরব জাহানের স্বাধীনতার জন্য তুর্কী সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাদেরে বিব্রত করিবেন না। আরব জাতির সহায়তায় নিরাশ হইলে সুলতান বাধ্য হইয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের এক পক্ষের সহায়তার আশায় যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবেন। এটা হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। তাতে আরব জাতির ক্ষতিই হইবে।

এ-সব ছিল আরব জাতীয়তাবাদী নেতাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ। কিন্তু তুরস্ক সরকার আরব জাতির এই আপোস মনোভাবের সদ্ব্যবহার করিলেন না; আরব জাতীয়তাবাদীদেরে স্বায়ত্তশাসন দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বদলে তাঁরা জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিলেন। সকল দলের আরব জাতীয়তাবাদীরা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। বৃটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনী অতি সহজে একরূপ বিনা-বাধায় আরব জাহান দখল করিয়া বসিল যুদ্ধের পরে আরবদের স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতিতে। এদিকে ভারতীয় বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য মুসলমান হওয়ায় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্য অটুট রাখিবার প্রতিশ্রুতি না দিলে মুসলমান সৈন্যরা অস্ত্র ধারণ করিবে না বলায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ পার্লামেন্টের বক্তৃতায় তুর্কী সাম্রাজ্য অটুট রাখিবার ওয়াদা করিলেন। ফলে ইংরেজ শক্তি একদিকে জেনারেল ম্যাকমেহনের মারফত তুর্কী সাম্রাজ্য ভংগ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন আরব নেতৃবৃন্দের কাছে; অপর দিকে লয়েড জর্জের মারফত তুর্কী সাম্রাজ্য অটুট রাখিবার ওয়াদা করিলেন ভারতীয় মুসলমানদের কাছে। এই পরস্পর-বিরোধী ওয়াদার কোনটাই তাঁরা রাখিলেন না। যুদ্ধে জিতিয়া তাঁরা তুরস্ক সাম্রাজ্যকে টুকরা-টুকরা করিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বাধীন আরব রাষ্ট্র স্থাপন করিলেন না, নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইলেন। অন্তর্বিরোধে লিপ্ত আরব জাতীয়তাবাদী নেতারা কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁরা দেখিলেন যে, এক সাম্রাজ্যবাদ গিয়া আরেক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইল।

মুসলিম জাহানের এই অন্ধকার যুগে দুইজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব হইল : মিসরে সাদ যগলুল পাশা এবং তুরস্কে মোস্তফা কামাল পাশা। তলওয়ারের জোরে কামাল পাশা তুরস্ক সাম্রাজ্য নয়, তুরস্ক দেশ উদ্ধার করিলেন ১৯২৩ সালে। অসহযোগ আন্দোলন, কারাবরণ ও কূটনৈতিক বিচক্ষণতার দ্বারা সাদ যগলুল মিসর স্বাধীন করলেন ১৯২৪ সালে। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ কামালের কাজে সহযোগিতা করেন নাই। কামাল পাশা সুলতান আবদুল হামিদের বাদশাহি ঘুচাইয়া তুরস্কে রাজতন্ত্রের অবসান করেন এবং উহাকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। মিসরের বাদশা ফুয়াদও সাদ যগলুলের

মনোমত কাজ করেন নাই। তবু যগলুল তাঁকে অপসারিত না করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজার আসনে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নজিব রাজা ফারুককে অপসারিত করিয়া মিসরকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের প্রবর্তিত রিপাবলিকান দল এবং আরও একটি দল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তার নাম ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই দুই দলই পর্যায়ক্রমে নির্বাচনের মাধ্যমে তুরস্ক শাসন করিতেছে। মিসরে জেনারেল নজিবের শিষ্য ও প্রধানমন্ত্রী কর্নেল নাসের জেনারেল নজিবকে সরাইয়া মিসরে নিজের রিভোলিউশনারী কাউন্সিল পার্টির এক-পার্টি-গবর্নমেন্ট ও নিজের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে তিনি ইংরেজ-ফরাসীর হাত হইতে সুয়েজ উদ্ধার করিয়া আরব জাহানের নেতৃত্ব ও মিসরের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় সামগ্রিকভাবে মিসর ও ইরান তাদের স্বাধীনতা অংশতঃ হারাইয়াছিল। যুদ্ধ শেষে তারা আবার পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। সেই সংগে আরব জাহানের অবশিষ্ট অংশ সিরিয়া ও ইরাক স্বাধীন হইয়াছে। দুই রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সিরিয়া ও ইরাকের এইসব বিপ্লবী পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে বিপ্লবী আরব তরুণদের দ্বারা গঠিত বাস্ পার্টি। এই পার্টি সিরিয়া ও ইরাক উভয় দেশে এক প্রকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহারা মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রবর্তিত 'আরব সমাজতন্ত্রকেই' নিজেদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এদের মধ্যে মাঝে-মাঝে বিরোধ হইয়াছে। সিরিয়া কখন-কখন নাসেরের নেতৃত্বে মিসরের সহিত এক যুক্ত ফেডারেশন গঠন করিয়াছে, যার নাম দেওয়া হইয়াছে যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক)। কখনও যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ভাংগিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হইয়াছে। ইরাক তা করে নাই। না করিলেও সিরিয়া ও ইরাক, এমন কি অন্যান্য রাজতান্ত্রিক আরব রাষ্ট্রসমূহও প্রেসিডেন্ট নাসেরকে আরব জাতির নেতা বলিয়া মানে। এছাড়া উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, লিবিয়া সবগুলি রাষ্ট্রই আজ স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। এরাও সবাই মোটামুটি নাসেরের নেতৃত্ব মানিয়া চলে এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গের চেয়ে চীন ও রুশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের সাথেই বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলে। এমন কি, মিসরের [illegible] অংগরাজ্য সুদানও আজ স্বাধীন রাষ্ট্র হইয়াছে। এই সুদানেও [illegible] অনেক সরকার আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোনও সরকারই ধর্মের [illegible] দিয়া মিসরীয়দের সাথে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিতে চান নাই। [illegible] নাসেরের সমাজতন্ত্রকে ধর্মবিরোধী বলিয়া মিসরের সাথে যুদ্ধ করি- [illegible] নাই।

মোট কথা, সুদূর পশ্চিমে মরক্কো হইতে শুরু করিয়া সুদূর পূর্বে ইরান পর্যন্ত এবং অপরদিকে উত্তরে তুরস্ক হইতে দক্ষিণে এয়মেন পর্যন্ত কোনও আরব বা মুসলিম রাষ্ট্রই মুসলিম ঐক্যের নামে দৈশিক জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করিতে রাযী হয় নাই অথবা ইসলামী রাষ্ট্র ও কোরআন-সুন্নার দোহাই দিয়া রাজনীতিতে কুয়াশা সৃষ্টির চেষ্টা করে নাই। বরঞ্চ আরব জাহানের 'মুসলিম ব্রাদারহুড' পার্টি এবং বিশেষ করিয়া মিসরের 'ইসলামী উম্মা পার্টি'র মতবাদ যুক্তভাবে সকল রাষ্ট্রই দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে পাকিস্তানের জন্মের গোড়ার দিকে আরব রাষ্ট্রসমূহকে আরব জাতীয়তাবাদের বদলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ গ্রহণের যে অনুরোধ করা হইয়াছিল, সমস্ত আরব রাষ্ট্র তা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের আমল হইতেই রাষ্ট্রকে ধর্ম হইতে আলাদা করিয়া রাজনৈতিক সেকিউলারিযম্ গ্রহণ করিয়াছে। তুর্কী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সমস্ত রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতেছে। মিসর হইতে সুদান যখন আলাদা হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন সুদানী জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করিয়াই তা করিয়াছিল। মিসরের উম্মা পার্টি ও মুসলিম ব্রাদারহুড মুসলিম জাতীয়তার নামে মিসর সুদানের ঐক্যের কথা বলিয়াছিল। কিন্তু সুদানীরা সে দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পক্ষান্তরে মিসর সরকারের পক্ষ হইতেও মুসলিম ঐক্যের কথা বলিয়া সুদানীদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করা হয় নাই। প্রেসিডেন্ট নাসের একবার মিসর-সুদানের ঐক্যের কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুসলিম ঐক্যের নামে নয়, নীল উপত্যকার ঐক্যের নামে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে ১৯৫২ সালে একবার ও ১৯৫৭ সালে আরেক বার লেবাননের খৃষ্টান ও মুসলিম আরবদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ থামাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। উল্লেখযোগ্য যে, লেবাননের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মেরনী খৃষ্টান ও বাকী অর্ধেক মুসলমান। খৃষ্টানেরা পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টান ঐক্যের পক্ষপাতী এবং মুসলমানরা আরব ঐক্যের সমর্থক। এই মতবাদের ফলে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। তৎকালীন মেরনী প্রেসিডেন্ট এই প্রচারের শিকার প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মেরনী ধর্মযাজক এই মতবাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ ও মেরনী প্রেসিডেন্টের নিন্দা করিয়া খৃষ্টান-মুসলিম লেবাননী আরবদের ঐক্যের জোর সমর্থন দেওয়ায় লেবাননীদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গৃহযুদ্ধের আশংকা দূর হয়।

ফলতঃ সমগ্র আরব জাহানে আরব ঐক্যের স্থলে ইসলামী ঐক্যের নাম করিয়া আরব জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করিবার চেষ্টা কয়েকবার হইয়াছে। মুসলিম ব্রাদারহুড ও উম্মা পার্টি এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সফলতার ধারে-কাছেও যাইতে পারে নাই। তুর্কী-ইরান-জর্দানসহ গোটা আরব জাহানের

সবগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রেই সরকারী দল ও অপযিশন দল রূপে একাধিক দল ছিল; এখনও অনেক রাষ্ট্র আছে। মিসরে ওয়াফদ পার্টি ও ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টি, তুরস্কে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক, সিরিয়ায় বাস পার্টি ও সিরিয়ান ন্যাশনাল পার্টি, ইরাকে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ও বাস পার্টিই তার প্রমাণ। এর কোনটাই ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীর নামে চলে না।

কাজেই পাকিস্তানকে বাঁচিতে হইলে তাকে এক 'নেশন-স্টেট' রূপেই বাঁচিতে হবে। সেটা হইতে পারে একমাত্র সোহরাওয়ার্দী-প্রদর্শিত দৈশিক জাতীয়বাদের ভিত্তিতে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এখানে আত্মঘাতী।

পূর্বদেশ, ৫ ডিসেম্বর, '৬৯

৪

পাকিস্তানী জাতীয়তার জনক সোহরাওয়ার্দী

কায়েদে-আযম যেমন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পিতা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী তেমনি পাকিস্তানী জাতির পিতা। কথাটা অতিশয়োক্তি নয়। কৃতজ্ঞ ভক্ত-অনুরক্তের চাটুবাক্যও নয়। কথাটা সত্য এবং সর্বাংশে সত্য। পাকিস্তানী জাতীয়তার সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন কায়েদে-আযম নিজেই। কিন্তু সে সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া যাইতে পারেন নাই তিনি। সেটার প্রয়োগ করিয়াছেন শহীদ সাহেব।

তবেই মনে হইতে পারে, কায়েদে-আযমের সংজ্ঞাটাই যদি শহীদ সাহেব প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে আর এমন কি বড় কাজটা করিয়াছেন তিনি? কিন্তু বিষয়টা অত সোজা নয়; কারণ প্রকৃত অবস্থা তা ছিল না। শহীদ সাহেব পাকিস্তানে আসিবার আগেই কায়েদে-আযমের মৃত্যুর সাথে-সাথেই পাকিস্তানের শাসকরা কায়েদে-আযমের জাতীয়তার সংজ্ঞাটাকে কবরস্থ করিয়াছিলেন। কায়েদে-আযমের জীবদ্দশায় শহীদ সাহেব পাকিস্তানে আসেন নাই। তিনি ঐ সময় ভারতে থাকিয়া উভয় দেশের মাইনরিটির অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানের দলিল-স্বরূপ 'মাইনরিটি চার্টার' রচনায় ও উভয় দেশের গবর্নমেন্টের দ্বারা সে চার্টারের অনুমোদন লাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে উহাই নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বুনিয়াদ হইয়াছিল।

এ সব করিয়া যখন শহীদ সাহেব স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে আসেন, ততদিনে পাকিস্তানের নেতারা কায়েদে-আযমের সংজ্ঞা হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন; অপভ্রংশ, অপব্যাখ্যা ও অবাস্তবের আবর্জনার নীচে সে সংজ্ঞা চাপা দিয়াছেন। জনসাধারণ সে সংজ্ঞা ভুলিয়াই গিয়াছে। শুধু তাই নয়, কায়েদে-আযমের সংজ্ঞার খেলাফে নেতারা অনেক কথা বলিয়া ও অনেক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। এটা তো গেল আদর্শের দিকের কথা।

রাষ্ট্র পরিচালনায়ও শাসকরা একদলীয় শাসন ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁরা পাকিস্তানীদের শিখাইয়াছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকার একই বস্তু। কাজেই সরকারের বিরুদ্ধতা করা মানেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা। তাঁরা আরও শিখাইয়াছেন, শাসক পার্টি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধতা করাও পাকিস্তানের দুশমনি করা। ইসলাম ধর্মের এক খোদা, এক কোরআন ও এক পয়গম্বরের মতই তাঁরা এক রাষ্ট্রের এক পার্টি ও এক নেতার নীতি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। ফলে শাসকরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন একটা ডিক্টেটরশিপ। কিন্তু এই ডিক্টেটরশিপও পার্টি ডিক্টেটরশিপ ছিল না, ছিল ব্যক্তি

ডিক্টেটরশিপ। কারণ ততদিনে তাঁরা মুসলিম লীগের দরজাও জনগণের মুখের উপর সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শুধু মন্ত্রী-মেম্বররাই মুসলিম লীগের মেম্বর হইবার অধিকারী, অন্য কেউ নয়। তাঁরা এই মতবাদ প্রচার করিতেছেন যে, মুসলিম লীগকে জনতার হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার বিপদ আছে, কারণ, শিশু-রাষ্ট্র গঠনের সময় এটা, সমালোচনা করার সময় এটা নয়। পাকিস্তানের দুশমনরা ওৎ পাতিয়া আছে। তারাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধ প্রচারে এবং পাকিস্তান সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শনে নিয়োজিত আছে। এ সময়ে মুসলমান নিজেরা যদি সরকারের সমালোচনায় মুসলিম সংহতি নষ্ট করে, তবে তাতে দুশমনদেরই হস্ত সবল করা হইবে। গণ-পরিষদ ও আইন-পরিষদে এই সময় শুধু হিন্দু মেম্বররাই অপযিশনে থাকায় শাসকদের এ কথায় যথেষ্ট জোর বাঁধিয়াছে।

এই অবস্থায় পাকিস্তানকে শুধু মাত্র মুসলমানের দেশ বলিয়া চালাইয়া দেওয়ায় কোনও অসুবিধা হয় নাই। যুক্তিটাও হাতের কাছেই রহিয়াছে। 'দুই-জাতি তত্ত্বে'র বুনিয়াদে শুধু মুসলমানরাই পাকিস্তান চাহিয়াছে। হিন্দুসহ সব অমুসলমানই বিরোধিতা করিয়াছে। তাদের সব বিরোধিতা ঠেলিয়া শুধু-মাত্র মুসলমানরাই পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে। কাজেই এ দেশ একা মুসলমানের নয় তো কার? সুতরাং পাকিস্তানের অমুসলমানরা পাকিস্তানের পূর্ণ অধিকার-ভোগী নাগরিক হইতে পারে না। তারা পাকিস্তানের যিম্মি মাত্র। পাকিস্তান সরকার তাদেরে রক্ষা করিবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সরকার তা করিবেন ওরা পাকিস্তানের নাগরিক বলিয়া নয়, ওরা পাকিস্তানের আশ্রিত প্রতিপালিত মাইনরিটি বলিয়া।

কথাটা স্পষ্টতঃই স্পিরিট-অব-পার্টিশনের খেলাপ। তবু পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকরা তা বলিয়া চলিলেন। তাঁরা ভুলিয়া গেলেন কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু ও মুসলমান একমত হইয়া চুক্তি করিয়াই ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশে ভারত উপমহাদেশকে ভাগ করিয়াছে। সে বিভাগে আদম-এওয়াযের কোনও কথা ছিল না। বরঞ্চ এই চুক্তিই ছিল যে, দুই দেশের মাইনরিটিরা যার-তার দেশে মেজরিটির সমান পূর্ণ স্বত্বাধিকারী নাগরিক হইবে। তবু পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকরা মাইনরিটিকে যিম্মি করিয়া এই অগণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ করিলেন। এই নীতি নির্ধারণের সময় তাঁরা হিন্দুস্হানে ফেলিয়া-আসা পাঁচ কোটি মুসলমানের কথা একদম ভুলিয়া গেলেন। একবারও তাঁদের মনে পড়িল না যে, পাকিস্তানের মাইনরিটিকে পূর্ণ নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রকারান্তরে হিন্দুস্হানের মুসলমানদের নাগরিকত্বও ঐ সংগে কাড়িয়া নিলেন। আসল কথা এই যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চালু রাখিবার সাধন হিসাবে ভারতীয় মুসলমানদেরে ব্যবহার করা ছাড়া পাকিস্তানী শাসকদের কাছে ভারতীয় মুসলমানদের আর কোনও দাম ছিল না। তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের নিশ্চয়তা ও শারীরিক নিরাপত্তায় পাকিস্তানী নেতারা মোটেই ইন্টারেস্টেড

ছিলেন না। বরঞ্চ ভারতীয় মুসলমানদের অনিরাপত্তাই ছিল পাকিস্তানী শাসকদের রাজনীতিক মূলধন। এই অদূরদর্শী অবিবেচক নেতারা একবারও ভাবেন নাই যে, ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান যদি পাকিস্তানের মোহাজের হইতে বাধ্য হয়, তবে তার চাপে পাকিস্তানের অর্থনীতি ভাংগিয়া পড়িবে। বোধ হয় আমাদের শাসকরা সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। মোহাজের পুনর্বাসনে তাঁরা যে নিদারুণ হৃদয়হীনতা দেখাইয়াছেন, তাতে হাজার অত্যাচারিত হইয়াও ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে পা বাড়াইবে না, এ বিষয়ে বোধহয় পাকিস্তানী শাসকরা নিশ্চিত ছিলেন। তা'ছাড়া নিজেদের গদি রক্ষার চিন্তায় ও ফন্দি আবিষ্কারে তাঁরা এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, স্বয়ং পাকিস্তানের মুসলমানদের ভাল-মন্দ চিন্তা করিবারই তাঁদের সময় ছিল না, হিন্দুস্থানী মুসলমানরা কোন ছার ?

অতএব তাঁরা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বদলে নির্বিবাদে মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রচারে নিয়োজিত থাকিলেন। বলিতে লাগিলেন, ইসলাম রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার পুরাতন খান্দানী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ইসলাম রক্ষায় ব্যর্থ হওয়াতেই আল্লাহ এই কাজে পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হিসাবে পাকিস্তানই মুসলিম দুনিয়ার একমাত্র যোগ্য নেতা। এই দাবিতে তাঁরা করাচিতে 'মোতেমারে'-আলমে ইসলাম' ডাকিয়া সারা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে সরকারী লেভেলে সে সম্মিলনীতে প্রতিনিধি পাঠাইবার অনুরোধ করিলেন। সে দাওয়াতে উল্লেখযোগ্য সাড়া না পাইয়া তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পাকিস্তানী প্রতিনিধি পাঠাইলেন। এই প্রতিনিধি মধ্যপ্রাচ্য সফর করিয়া ঐ সব দেশের নেতৃবৃন্দকে আরব জাতীয়তাবাদ ও তুর্কী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি অন-ইসলামী জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করিয়া মুসলিম জাতীয়তাবাদ গ্রহণের উপদেশ দিলেন। পূর্বে মালয়-ইন্দোনেশিয়াতেও এই মতবাদ প্রচার করিলেন। পাকিস্তানী শাসকদের মতবাদ কেউ গ্রহণ করিলেন না। সরকারী পর্যায়ে কোনও দেশই মোতেমারে যোগ দিলেন না। বরঞ্চ শতবর্ষের গোলাম, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানীরা মুসলিম দুনিয়ার সর্দারি দাবী করায় সব মুসলিম রাষ্ট্রই পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইতে লাগিল। মাত্র দুই-এক বছর আগে পাকিস্তান সৃষ্টির দিনে যে মুসলিম দুনিয়া আনন্দ-উৎসবে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের ইনফেন্টাইল বাগাড়ম্বরে তারাই আজ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

এমনি দিনে শহীদ সাহেব পাকিস্তানে আসিলেন এবং পাকিস্তানী রাজনীতিতে 'নাক গলাইলেন'। পাকিস্তানের শাসকরা এটা পছন্দ করিলেন না। কারণ, তাঁরা শহীদ সাহেবের প্রতিভা ও মনীষা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। শহীদ সাহেব পাকিস্তানে আসিয়াই পাকিস্তানী রাজনীতির নয়া রূপরেখা ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেনঃ "পাকিস্তান গোটা পাকিস্তানী জাতির

রাষ্ট্র, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানে দুই জাতি নাই, একই পাকিস্তানী জাতি বিদ্যমান। ধর্ম-গোষ্ঠী ও ভাষা-নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানী মিলিয়াই এক জাতি। এই পাকিস্তানী জাতির সকলের এবং প্রত্যেকের পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর সমান অধিকার। পাকিস্তান শুধু মুসলমানরাই হাসিল করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্র শুধু মুসলমানের রাষ্ট্র হইতে পারে না। কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। তাই বলিয়া সেই যুক্তিতে স্বাধীন ভারত কি শুধু কংগ্রেসীদের ? অকংগ্রেসীদেরও কি স্বাধীন ভারতে সমান অধিকার নাই ? এমনকি যারা সারা জীবন এবং বংশানুক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা এবং ইংরাজ শাসকদের সমর্থন করিয়াছে, তারাও কি স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসীদের সমান অধিকার ভোগ করিতেছে না ?" আরও বাড়ির ধারের সহজ উপমা দিয়া শহীদ সাহেব বলিলেন : "কোনও এক ব্যক্তির বা সমিতির একার চেষ্টায় কোথাও স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ-হাসপাতাল বা মন্দির-মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইলে সে সবে কি শুধু প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের বংশধরদেরই অধিকার থাকিবে ? সকলের, এমনকি বিরোধীদেরও কি তাতে সমান অধিকার থাকিবে না ? নিশ্চয়ই থাকিবে। তেমনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর সমান অধিকার সকল ও প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীর।"

হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিল বলিয়া পাকিস্তানের শাসকরা কথায়-কথায় হিন্দুদের দেশানুগত্যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। এতে অমন ভাল মানুষ হিন্দুরও মনঃপীড়ার কারণ ঘটিত। শহীদ সাহেব হিন্দুদের আনুগত্য লইয়া এভাবে মন্তব্য না করিতে বিশেষভাবে শাসকদেরে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদেরে উপদেশ দেন। তিনি এ সম্পর্কে দৃঢ়তার সংগে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন : "পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য উন্মেষের জন্য হিন্দুদেরে যথেষ্ট সময় দিতে হইবে; কারণ মনের দিক দিয়া এ বিষয়ে প্রস্তুত হইবার সময় পাকিস্তানী হিন্দুরা পায় নাই।" এই ব্যাপারে তিনি পাকিস্তানী হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাবের তুলনামূলক বিচার করেন। তিনি বলেন ঃ "মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি হিন্দু-মেজরিটি দেশসমূহের মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলন করিবার সময়েই জানিত, তাদের জন্মভূমি পাকিস্তানে পড়িবে না। পাকিস্তান হাসিলের পরে তারা কি করিবে, মনের দিক দিয়া প্রস্তুত হইয়াই তারা পাকিস্তান দাবি করিয়াছে। পক্ষান্তরে সিলেট-কুমিল্লা ইত্যাদি মুসলিম মেজরিটি অঞ্চলের হিন্দুরা শেষদিন পর্যন্ত আশা করিয়াছিল, দেশ ভাগ হইবে না; কংগ্রেস-লীগের মধ্যে একটা আপোস হইয়া যাইবেই।" কিন্তু যেদিন সত্য-সত্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে, মাত্র সেইদিন হইতেই তারা চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছে।

যে সব হিন্দু একদিনের জন্যও পাকিস্তানে থাকিবে না মনে করিয়াছে, তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগে-সংগেই ভারতে চলিয়া গিয়াছে। যারা আজও যায় নাই, ধরিয়া নিতে হইবে, তারা সম্ভব হইলে পাকিস্তানে থাকিতে ইচ্ছুক। সে ইচ্ছা বাড়ানো-কমানো বা মানা না-মানার দায়িত্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের। তারা যদি স্পিরিট অব-পার্টিশন ও কায়েদে-আযমের ওসিয়ত মানিয়া চলে, হিন্দুদেরে যদি নিজেদের সমান অধিকার-ভোগী পাকিস্তানের নাগরিক মনে করে, পাকিস্তানে যদি হিন্দু ধর্মকৃষ্টি নিরাপদ হয়, তবে নিশ্চয়ই এসব হিন্দু অনুগত দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী হিসাবেই থাকিবে। কথায়-কথায় তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে বলিলে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হইবে না কেন? এই যে পশ্চিম পাকিস্তানী কতিপয় অপরিণামদর্শী মূঢ় মাঝে-মাঝেই পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের পাকিস্তান প্রীতিতে সন্দেহ প্রকাশ করে, তাতে আমরাই কি কম বিরক্ত হই? বস্তুতঃ কারো দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করার মত অপমান আর কিছুতেই হয় না।

এটাই ছিল শহীদ সাহেবের রাজনীতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। এ সাধনায় তাঁর সময় লাগিয়াছে। অনেক ত্যাগ করিতে ও দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে; নিজেরও অনেক সংস্কার, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। দেশবাসী তাঁকে ভুল বুঝিয়াছে; বন্ধু শত্রু হইয়াছে; সহকর্মীরা বিরুদ্ধতা ও নিন্দা করিয়াছে। কোন কিছুই তাঁকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই। কোন ত্যাগ স্বীকারকেই তিনি কষ্টসাধ্য মনে করেন নাই। পাকিস্তানকে একটা সেকিউ-লার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দিবার আশায় তিনি এককালে শাগরেদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর ক্যাবিনেটের দশ নম্বর মন্ত্রী হইতেও আপত্তি করেন নাই। আমরা তাঁর ভক্ত-অনুগত কর্মীরা একাজে আপত্তি করিয়াছি। তাঁর ব্যক্তিগত মানমর্যাদাহানির দোহাই দিয়াছি। জবাবে তিনি বলিয়াছেন: "পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র আমার ব্যক্তিগত মর্যাদার অনেক উপরে।" যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা করিলে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব যাইবে বলিয়া অনেকে তাঁকে হুঁশিয়ার করিয়াছেন। অকুণ্ঠচিত্তে দৃঢ়তার সংগে তিনি উত্তর দিয়াছেন: "পাকিস্তানী জাতীয়তাই পাকিস্তানকে নিরাপদ করিতে পারে। পাকিস্তানের নিরাপত্তা আমার প্রধান-মন্ত্রিত্বের নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বড়।" পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট ভাংগার বিরুদ্ধতা করায় রিপাবলিকান পার্টি শহীদ সাহেবের মন্ত্রিসভা সমর্থন করিবেন না, জানাইয়া দিলেন। কিন্তু শহীদ সাহেব অনমনীয়। রিপাবলিকানদেরে তিনি জবাব দিলেন: "এক ইউনিট ভাংগার পরিণাম পাকিস্তান ভাংগা।" ফলে রিপাব-লিকান পার্টি সমর্থন প্রত্যাহার করায় শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দিলেন। আমরা ভক্তেরা বলিলাম: "এই সামান্য ব্যাপারের জন্য প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিলেন!" উত্তরে তিনি বলিলেন, "প্রশ্নটা সামান্য নয়। ওটা পাকিস্তানের স্থায়িত্বের প্রশ্ন। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব আমার মন্ত্রিসভার চেয়ে অনেক বড়।"

এমনি বেপরোয়া আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ দেশসেবা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূর-দর্শী দেশপ্রেমের বলেই তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারিয়াছিলেন। তারই জোরে তিনি পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ 'যুক্ত-নির্বাচন' প্রথাকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন; নিজের পার্টি আওয়ামী লীগের দরজা অমুসলমানদের জন্য খুলিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টিতে শহীদ সাহেবের অবদান নিশ্চয়ই অসাধারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় অবদান তাঁর এই পাকিস্তানী জাতীয়তা। এই পাকিস্তান জাতীয়তা-বাদই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল নেশন-স্টেট হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিবে। পাকিস্তানের নেতারা যতশীঘ্র এই সত্য উপলব্ধি করেন, ততই মংগল।

ইত্তেফাক, ৫ ডিসেম্বর, '৬৯

৫

গণতন্ত্রের হায়াত ফুরাইয়াছে কি?

এক

পাকিস্তানের বয়স আজ বাইশ বছর। এই বাইশ বছরে এদেশে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। তার মধ্যে চরম বিস্ময়ের বস্তু দুইটা: এক, পাকিস্তান আজো টিকিয়া আছে; দুই, বাইশ বছরেও পাকিস্তান একটি শাসনতন্ত্র পায় নাই।

প্রথমটার কথাই আগে বলি। শুধু পাকিস্তানের দুশমনরাই নয়, অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিও, এমনকি অনেক হিতৈষীও মনে করিয়াছিলেন, পাকিস্তান টিকিবে না। তাঁরা সেই শেষদিনের অপেক্ষায় দিন গণিতেছিলেন। তাঁদের সে আশা ও আশংকা নিতান্ত ভিত্তিহীন ছিল না। যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের জন্ম, জন্মের পরেও ঝড়-তুফানের যে বিরামহীনতা, তাতে পাকিস্তান যদি ভাংগিয়া পড়িত, তবু তা বিস্ময়ের বিষয় হইত না, বরঞ্চ অত প্রতিকূলতার মধ্যে টিকিয়া থাকাটাই বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়াছে।

কিন্তু পাকিস্তানের এই টিকিয়া থাকার মূলে রহিয়াছে নীচের তলার অফিসারদের ও জনগণের অসীম ধৈর্য, বিরামহীন অধ্যবসায়, নিদ্রাহীন পাহারাদারি ও অমানুষিক ত্যাগ-তিতিক্ষা। উপরের তলার অফিসিয়ালদের ও রাজনৈতিক নেতাদের এতে কোনও কৃতিত্ব নাই। বরঞ্চ সত্য কথা কড়ুয়া ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বাইশ-বাইশটা বছর উপরের তলার অফিসিয়াল ও রাষ্ট্র-নেতারা হাতুড়ি-শাবল লইয়া পাকিস্তান ভাংগিবার সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। তবু যে পাকিস্তান চুরমার হইয়া ভাংগিয়া পড়ে নাই, তার প্রথম কারণ আল্লার মেহেরবানি, দ্বিতীয় কারণ নীচের তলার কর্মচারী ও জনসাধারণ ঘাড় ও মাথা পাতিয়া সে হাতুড়ির বাড়ি ও শাবলের আঘাত সামলাইয়াছে। আসল বিস্ময়টা এখানে।

তারপর দ্বিতীয় বিস্ময়ের বস্তুটাও কম বিস্ময়কর নয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ ভাগ হইয়া এক সংগে দুইটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম হইল: পাকিস্তান ও ভারত। একটির আকার চার আনা; অপরটির বার আনা। একটির কোনও সমস্যাই নাই, অপরটি সমস্যাসংকুল। তবু সমস্যাসংকুল ভারত তার শাসনতন্ত্র পাইল ১৯৪৯ সালের ছাব্বিশে নবেম্বর। অপর দিকে একরূপ সমস্যাবিহীন পাকিস্তান আজো শাসনতন্ত্র পাইল না। জন্মের নয় বছর পরে ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ যাও একটি শাসনতন্ত্রের মুখ দেখিয়াছিল,

[illegible] বুনিয়াদে কোনও নির্বাচন হইবার আগেই সে শাসনতন্ত্র বাতিল হইয়া 'মার্শাল ল' জারি হইল। মার্শাল ল'র ছাতার তলে বসিয়া ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব [illegible] সালে নিজেই স্বরচিত স্বনামে-ঘোষিত একটি শাসনতন্ত্র দিলেন। সেই [illegible] বাতিল হইয়া আবার 'মার্শাল ল' প্রবর্তিত হইল। এইভাবে বাইশ [illegible]সের স্বাধীন দেশ পাকিস্তান একটি শাসনতন্ত্রহীন দেশরূপে চলিয়া [illegible]ছে।

[illegible] অতি সহজেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র চলিবে কি না। প্রশ্ন-[illegible] হাতে-কলমে 'না' হইবার উপক্রম হইয়াছে। বর্তমান 'চীফ-মার্শাল ল' [illegible]ট্রেটর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান যত শীঘ্র সম্ভব, দেশের শাসন-[illegible] সরকারের হাতে ফিরাইয়া দিতে আগ্রহী। তিনি রাজনৈতিক দল-[illegible] ও অদলীয় নেতাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা বুঝিয়া [illegible] ঐকমতে আসিবার উপদেশ দিতেছেন। এইভাবে দেশময় সফর [illegible] বহু নেতার সাথে মোলাকাত করিয়া গত ২৮শে জুলাই জাতির [illegible] বেতার ভাষণ দিয়াছেন, তাতেই নেতাদের ব্যবহারে দেশবাসী নিরাশ [illegible]। তারই ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক যোগ্যতার প্রশ্ন আবার উঠিয়াছে। [illegible]দের একদল মুখে বলিতেছেন, 'আমরা নির্বাচন চাই', কিন্তু অপর দল [illegible] বলিতেছেন, 'আমরা নির্বাচন চাই না'। নিজেদের কথাটাই দেশবাসীর [illegible] বলাইতেছেন এইভাবেঃ দেশের কৃষক-শ্রমিক গরিব জনসাধারণ [illegible] না, শাসনতন্ত্রও চায় না। তারা চায় অর্থনৈতিক উন্নতি। গরিব [illegible] ভোটাধিকারের সাথে তাদের আর্থিক উন্নতির বিরোধ কোথায়, [illegible] এঁরা বলিতেছেন না।

দুই

[illegible] যেখানে ছিল, সেখানেই থাকিয়া যাইতেছে। সাবেক বহাল। এই [illegible] না; 'পাকিস্তানে গণতন্ত্র চলিবে না'। কথাটা প্রথমে তুলিয়া-[illegible]রাই। নেতারা প্রায় সকলেই উকিল। উকিলের মতই কথাটা [illegible]ছেন। সোজাসুজি গণতন্ত্র চলিবে না, বলেন নাই। বলিয়াছেনঃ [illegible] চলিবে না।' কায়েদে-আযমের অকাল আকস্মিক মৃত্যুর পর [illegible] বলিতে শুরু করেনঃ 'পশ্চিমা গণতন্ত্র পাকিস্তানের উপযোগী [illegible] ইসলামী রাষ্ট্র, আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে পশ্চিমা গণতন্ত্র [illegible] পাকিস্তান হাসিলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।' তার বদলে নেতারা [illegible] ইসলামী শাসনতন্ত্রের তালাশে নয়-নয়টা বছর অন্ধকারে হাত-[illegible]। অন্ধকার এই জন্য যে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের কোনও নযির [illegible] অতীতে বা বর্তমানে অথবা পুঁথি-পুস্তকে খুঁজিয়া [illegible]।

উপরের তলার সরকারী কর্মচারীরা ছিলেন অনেকেই বিলাত-ফেরত টাই-পরা সুধাভক্ত আধুনিক মানুষ। নেতাদের এই ইসলাম-প্রীতিকে তাঁরা প্রগতি-বিরোধী মনে করিলেন। তাঁদের প্রখরবুদ্ধি নেতা বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ সাহেব 'অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র' এই ধোঁকাবায নামে একটি আধুনিক শাসন-তন্ত্র দিবার মতলব করিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি গণপরিষদ ভাংগিয়া দিলেন। নেতারা বড়লাটকে হাইকোর্ট দেখাইলেন। আমাদের সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করিয়া এই সংকট হইতে জাতিকে বাঁচাইলেন। ফেডারেল কোর্ট নিরপেক্ষ রায় দিলেন। তাতে দুই পক্ষই জিতিলেন, দুই পক্ষই হারিলেন। বড়লাটও জিতি-লেন, নেতারাও জিতিলেন। নয়া গণপরিষদ গঠিত হইল। নয়া মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হইল। ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র' রচিত হইল। সর্বদলীয় এক সম্মিলনীতে নয়া শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদে দেশময় সাধারণ নির্বাচনের দিন-তারিখ নির্ধারিত হইল।

ঠিক এমন মোক্ষম মুহূর্তে দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি একটা বিপ্লব ঘটাইলেন। তিনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট হলেন। নিজমুখে ঘোষণা করিলেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির মুখ দিয়াও ঘোষণা করাইলেনঃ পাকি-স্তানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা রাজনৈতিক নেতারা অবশ্য খুব জোরসে প্রতিবাদ করিলাম। বলিলামঃ পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই। আসলে গণতন্ত্র প্রয়োগ করিতেই দেওয়া হয় নাই; দেয় নাই উপর তলার সরকারী কর্মচারীরা। আমরা যত চেষ্টা করিয়াছি, সরকারী কর্মচারীরা তত বাধা দিয়া আমাদের চেষ্টা ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছেন।

কথাটা মোটা ছেঁদাওয়ালা। কাজেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রনায়কদের নাকের ডগা দিয়া যদি সরকারী কর্মচারীরা গণতন্ত্র প্রয়োগে বাধা দিয়া থাকিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রনেতারাই গণতন্ত্রের অযোগ্য। নেতারা অযোগ্য হইলে তাঁদের অনুসারীরাও নিশ্চয়ই অযোগ্য। কাজেই বাইশ বছর পরেও আজ স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠিয়াছেঃ 'আমরা কি গণতন্ত্রের যোগ্য?' যাঁরা প্রশ্ন করেন, তাঁরাই উত্তর দেনঃ আমরা গণতন্ত্রের যোগ্য নই। তাঁদের পক্ষের যুক্তি এই যে, গণ-তন্ত্র চলিতে গেলে দেশের জনগণের শিক্ষিত হওয়া দরকার। পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাধিক লোক নিরক্ষর। কাজেই যতদিন দেশে নিরক্ষরতা থাকিবে, ততদিন গণতন্ত্র চলিবে না। আর যাঁরা বলেন, এখানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চলিবে না, তাদের যুক্তি এই যে, গণতন্ত্রের ঐ শিক্ষাগত গুণ ছাড়াও পার্লা-মেন্টারী গণতন্ত্রের জন্য দরকার সুসংগঠিত সুশৃংখল রাজনৈতিক দল। পাকি-স্তানে মাশাআল্লা পার্টির অভাব নাই। বযযলে খোদা প্রয়োজনের বেশীই আছে। কিন্তু তাদের খুব কমগুলিকে সুসংহত রাজনৈতিক পার্টি বলা যাইতে পারে।

ওগুলি আসলে দল নয়, কোন্দল। এইসব দলের নেতাদের মধ্যে আদর্শগত বা কর্মপন্থাগত প্রতিযোগিতার চেয়ে ব্যক্তিগত রেষারেষি ও দোষাদোষিই বেশী। এসব দেখিয়া যদি আমাদের গণতান্ত্রিক যোগ্যতায় কেউ সন্দেহ করে, তবে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

তিন

কিন্তু শুধু এইসব কারণেই যে পাকিস্তানবাসী গণতন্ত্রের অযোগ্য, তাও নয়। সারা দুনিয়ায় প্রায় ষাট কোটি মুসলমান প্রায় ত্রিশটি রাষ্ট্রের মালিক। এসবের কোনটাতেই গণতন্ত্র চলিতেছে না। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির দিক নযর চালাইলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এদের মধ্যে যারাই ইংরাজ-ফরাসী জাতির শাসন সংস্পর্শে আসিয়া গণতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, বিদেশী শাসকরা চলিয়া যাইবার পরপরই তারা ডিক্টেটরী অথবা মিলিটারী-শাসনে ফিরিয়া যাইতেছে। পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কেউ-কেউ বলিয়াছেন: 'মুসলিম দেশে গণতন্ত্র চলিবে না।' তাদের মতে মুসলমানদের শাসন করিতে স্ট্রং অথরিটি দরকার। সে অথরিটি ধর্মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। মুসলমানদের স্বভাব ও মর্যাদাবোধ শক্তিশালী নেতা চায়। তাদের ঐতিহ্য ও চিন্তারীতি তেমন নেতৃত্বেই বিশ্বাসী। তাদের শাসক ভিযিবল ও ট্যান্‌জিবল হইতে হইবে। অদৃশ্য ও অন্যান্যের বাইরে কোনও কর্তৃপক্ষে তারা সন্তুষ্ট নয়। এক কথায় মুসলমানরা ধর্মতন্ত্রে বিশ্বাসী বলিয়া গণতন্ত্রের যোগ্য নয় অথবা গণতন্ত্রই তাদের যোগ্য নয়।

তার উপর আছে সারা দুনিয়ার সর্বাংগীন উদ্বর্তনের কথা। পশ্চিমা গণতন্ত্র সর্বজন ভিত্তিক। দেশ শাসনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে সেখানে সকলের সমান অধিকার। ধনী-গরিব সকলের এক এক ভোট। দেওয়ানী আযাদি সেখানে নিরংকুশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুরক্ষিত। যথাসময়ে নির্বাচন সেখানে অনিবার্য। গণতন্ত্র সেখানে সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গণতন্ত্র সেখানে রাষ্ট্র-শাসনেই সীমিত। দেশের ধন-সম্পদে গণতন্ত্রের কোন প্রবেশাধিকার নাই। ধন-সম্পদ সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন। শিল্প ও তার উৎপন্নের অধিকারী মালিকরাই। ফলে ঐসব দেশে নিরংকুশ রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র সত্ত্বেও ধনী-গরিবের শ্রেণীভেদ আগের মতই আছে; বরঞ্চ বাড়িয়াছে।

সব দেশেই ধনীর চেয়ে গরিবের সংখ্যা বেশী। কাজেই যে-কোন দেশের বিপুল সংখ্যাধিক গরিবের মোকাবেলায় ধনী লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই বিপুল সংখ্যাধিক গরিবেরা দিন-রাত চোখের উপর দেখিতেছে, দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয়

লোক ভোগ করিতেছে। মেজরিটি কেবল সম্পদ উৎপাদনে খাটিয়াই মরিতেছে। এই ব্যবধানকে তারা স্বভাবতঃই এবং ন্যায়তঃই অবিচার মনে করে। এই অবিচারের প্রতিকার দাবি একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। এই দাবি হইতেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে-সাথে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথা উঠিয়াছে। পক্ষান্তের, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও জানমাল রক্ষার অধিকারও গণতান্ত্রিক অধিকার। কাজেই এখানে বিরোধ, এখানে সংঘাত। এই সংঘাতে সনাতন গণতন্ত্র আজ বিপন্ন।

অনেক দেশে সে বিপদ ঘটিয়াও গিয়াছে। সে-সব দেশে ভোটের মারফত নয়; বিপ্লবের মারফত, খুন-খারাবির মধ্য দিয়া 'উদার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের' উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চার

এই ত গেল সাধারণভাবে গণতন্ত্রের অবস্থার কথা। যে সব দেশে সনাতনী গণতন্ত্র চালাইবার চেষ্টা আজও চলিতেছে, সেখানেও রব উঠিয়াছে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আর চলিবেনা। তার বদলে প্রেসিডেনশিয়াল গণতন্ত্র চালাইতে হইবে। কথাটা এই শতকের গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে-পরেই উঠিয়াছে। দুনিয়ায় পার্লামেন্টারী শাসন-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নযির বৃটেন। আর প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নযির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানে বিশ্ব-নেতৃত্বের অনেকখানি চলিয়া যায় ইংরেজ জাতির হাত হইতে মার্কিন জাতির হাতে। প্রেসিডেন্ট উড্রু উইলসনের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক থাকায়, এই বিশ্ব-নেতৃত্ব হস্তান্তর খুব স্বাভাবিক হইয়াছিল। ফরাসী, জার্মানি ইত্যাদি উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলি ইতিপূর্বে মোটামুটি বৃটিশ পার্লামেন্টারী পদ্ধতি মানিয়া চলিতেছিল। বিশ্ব-নেতৃত্বের এই পরিবর্তনের ফলে এরা স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন পদ্ধতির সহিত পরিচিত এবং তার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইল। ফলে, পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণে তারা নতুন ধরনের পদ্ধতির পরখ-আযমায়েশ করিতে লাগিল। ফ্রান্সে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজাতন্ত্র এবং জার্মানের ওয়েমার শাসনতন্ত্র এই পরখ-নিরিখেরই ফল।

আগেই বলিয়াছি, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের এই আবর্তন-বিবর্তন শাসন-পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে-সাথে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের দাবিও এই সময়কার ঘটনা। এটা উঠে রাশিয়ার মত বিরাট দেশে। বৃটেনের অনুকরণে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বদলে

রাশিয়ার বিপ্লবী নেতারা রাজতন্ত্রের স্থলে শুধু প্রজাতন্ত্রই কায়েম করিলেন না, শাসন-পদ্ধতিতেও তাঁরা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁরা সোজাসুজি বলিলেন : 'ধনতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কানা-কড়ি দাম নাই। কারণ, সেখানে ভোট সমান ঠিকই, কিন্তু ভোটাররা সমান নয়।'

এর কয়েক বছর পরেই ইটালীতে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানিতে নাৎসীবাদ জন্ম নিল। উভয় মতবাদই গণতন্ত্রের তীব্র প্রচণ্ড বিরোধী। উভয়ের যুক্তি একই। বস্তুতঃ ফ্যাসিবাদের প্রবর্তক সিনর মুসোলিনীই নাৎসীবাদের প্রবর্তক হিটলারের দীক্ষা-গুরু। উভয় মতবাদের মূল শিক্ষা এই : 'জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা নাই। এদের চরিত্রে সাধুতা, সরলতা দুর্লভ। এরা সকলে আবেগ ও কামনায় দাস। এরা সবাই স্বার্থপর; নিজেকে লইয়া সবাই ব্যস্ত। দেশের ও দেশবাসীর সার্বিক সমস্যা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিবার শক্তি বা অবসর এদের নাই।' জার্মান দার্শনিক নিৎসের দার্শনিক মতবাদের রাজনৈতিক রূপকার এই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের প্রবর্তকরা। দার্শনিক নিৎসের মতবাদ এইরূপ : 'দুনিয়ায় প্রতি-ভাবান অতি-মানুষের সংখ্যা কম। জন্ম হয় এঁদের কালে-ভদ্রে। মানব সমাজে মূর্খ, নির্বোধ ও বে-আক্কেলের সংখ্যা বিপুল। এই বে-আক্কেলদের ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব শুধু অতি-মানবদের। অথচ অতি-মানবদের প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি বে-আক্কেল জনসাধারণ সহ্য করিতে পারে না; তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। তাদের প্রথম হিতাকাঙ্ক্ষী এই অতি-মানুষটিকে বে-আক্কেলরা নিজেদের দুশমন মনে করিয়া তাঁর উপর যুলুম করে, দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়; প্রাণে বধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বে-আক্কেলদের এইসব বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া তাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা নির্মূল করিয়া ঐ অতি-মানবরা যদি একবার নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তখন এই বে-আক্কেল জনতা ভেড়া-ছাগলের পালের মত অতি-মানব নেতার বাধ্য, অনুগত, অনুসারী হয় এবং তাঁদের আশ্রয়ে থাকিতে ও তাঁদের হুকুমে জান-কোরবানি করিতে আনন্দ পায়। এমন সব মহা-মানবকে জোর করিয়া ভোটের বলে বে-আক্কেলদের কথামত কাজ করিতে বাধ্য করার নামই গণতন্ত্র। এটা যেন গাছ-পালা ও পাহাড়-পর্বত কাটিয়া দেশকে সমতল করার প্রয়াস। এমন গণতন্ত্রকে আসলে মূঢ়তন্ত্র বলাই উচিত। এতে কদাচ মানুষের কল্যাণ হইতে পারে না।

দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানের মন্দাতে এই ধরনের মতবাদ সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। খোদ ইংগ-মার্কিন মুল্লুকেও এই মতবাদের ছোঁয়াচ লাগে। সেখানেও গণতন্ত্রের সমালোচক ও বিরোধীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাঁরা বলিতে শুরু করেন : 'গণতন্ত্র মানে মেজরিটি শাসন, মেজরিটি শাসন মানে মাথা গুণতি আইন। মাথা-গুণতির শাসন মানেই ঊনপঞ্চাশটি ঘোড়ার মোকাবিলায় একান্নটি গাধার শাসন।'

পাঁচ

সুতরাং দেখা গেল যে, সনাতন গণতন্ত্র আর আগের মত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নাই। তার বহু বিরোধী ও সমালোচক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানেও স্বাভাবিক কারণে দুনিয়া-জাহানের এই বিরূপ মনোভাবের কিছুটা প্রতিফলন হইবেই। উপরের আলোচনায় দেখা যাইতেছে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই কয়টি মূল তর্কের বিষয় দাঁড়াইয়াছে ঃ

(১) পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ত চলিবেই না, মোটেই গণতন্ত্র চলিবে না। কোনও মুসলিম রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র চলে নাই। কারণ—

(ক) মুসলমানরা সাধারণভাবে গণতন্ত্রের অযোগ্য। তারা গণতন্ত্রের চেয়ে নেতাতন্ত্রে অধিক বিশ্বাসী। ফলে, গণতন্ত্রও মুসলমানের যোগ্য নয়।

(খ) পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাধিক্য লোক নিরক্ষর।

(২) ধনতন্ত্রী সমাজে গণতন্ত্র একটা ধাপ্পাবাযি মাত্র। কাজেই আগে ধনতন্ত্র ধ্বংস না করিয়া গণতন্ত্র চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আগে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' স্থাপন করিতে হইবে। তারপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৩) গণতন্ত্র আসলে মূঢ়তন্ত্র। মাথাগুণতি শাসন। ঐ সব মাথার খুলিতে কিছু থাক আর নাই থাক, গণনায় শতকরা একান্নটা মাথা হইলেই হইল।

(৪) মাথা-গুণতি মূঢ়তন্ত্রে কাজের চেয়ে কথা বেশী। কেবল বক্তৃতা আর হট্টগোল। অমন 'বান্দর-নাচের' হট্টগোলে দেশের শৈল্পিক ও আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হয়। কাজেই শিল্প ও অর্থনীতিকে দ্রুত করিতে হইলে মূঢ় জনসাধারণের হাত হইতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কাড়িয়া আনিয়া অতি-মানুষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নেতার হাতে নিরংকুশ ক্ষমতা দিতে হইবে। অতএব গণতন্ত্র খতম করিতে হইবে।

(৫) যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, দুনিয়ায় গণতন্ত্রের বাঁচিয়া থাকার আশা কিছুটা আছে, তবু সেটা বৃটিশ ধরনের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র নয়, মার্কিনী ধরনের প্রেসিডেনশিয়াল গণতন্ত্র। বৃটিশ ধরনের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চলিবে না এইজন্য যে, ওতে রাজা ও হাউস-অব-লর্ডস লাগে। দুনিয়ার লোক আর লর্ড মানিতে রাযী নয়। পক্ষান্তরে মার্কিনী প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতিতে রাজারও দরকার নাই, লর্ডেরও দরকার নাই। কাজেই দুনিয়ার লোক মার্কিনী পদ্ধতি বেশী পছন্দ করিবে। বর্তমান দুনিয়াবাসী ইংরেজের সামাজিক অসাম্য অগ্রাহ্য করিয়াছে। মার্কিন জাতির সামাজিক সাম্যই তারা চায়।

ছয়

এখন আসুন, এই পাঁচটি তর্কিত বিষয়ের এক-এক করিয়াই আলোচনা করি :

(১) দুনিয়ার কোথাও যদি গণতন্ত্র না চলে, তবে পাকিস্তানেও না চলুক, এতে আমাদের আপত্তি নাই। দুনিয়ার অনেক দেশে চলিবে, শুধু আমাদের পাকিস্তানেই চলিবে না, এতেই আমাদের যত আপত্তি। পাকিস্তানে গণতন্ত্র না চলিবার যে-সব যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তার একটাও ঠিক নয়। প্রথমতঃ, মুসলমানরা গণতন্ত্রের অযোগ্য অথবা গণতন্ত্রই মুসলমানের অযোগ্য, যেভাবেই কথাটা বলা হউক না কেন, কথাটা অসার। কারণ, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মতে যে সামাজিক গণতন্ত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ, সেটা মুসলমান সমাজে যত বেশী আছে, আর কোনও সমাজে ততটা নাই। মনুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সমান অধিকার, সকলের নযরে সকলের সমান মানবিক মর্যাদা মুসলমানের ধর্মীয় ঈমানের অংগ। কাজেই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মতে মুসলমান সমাজই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানেরা গণতন্ত্রের চেয়ে নেতা-তন্ত্রে অধিক বিশ্বাসী বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তাও সত্য নয়। নেতাকে নির্ভুল ও বিচার সমালোচনার ঊর্ধ্বে জ্ঞান করা নেতা-তন্ত্রের মূল কথা। কিন্তু মুসলমানরা কোনকালেই নেতাকে বিচার-সমালোচনার অতীত মনে করে নাই। তাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ জীবন-মৃত্যুর অধীন সাধারণ মানুষ, এটা তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের শিক্ষা। খোলাফায়ে-রাশেদার আমলে খলিফার কোর্তার দৈর্ঘ্য ও খাবার পদ লইয়া প্রকাশ্য দরবারে আলোচনার ও স্বয়ং খলিফাকে প্রশ্ন করিবার নযির আছে। স্বয়ং বাদশাহকে আসামী হিসাবে আদালতে হাযির হইতে হইয়াছে। অধিকার ও দায়িত্ববোধ যে সমাজে এত তীব্র ও প্রখর, সে সমাজে গণতন্ত্র চলিবে না, তবে কোথায় চলিবে? মুসলমানদের গুরু-ভক্তি, পীর-ভক্তি ও নেতার প্রতি আনুগত্য দেখিয়া যারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন, ডঃ ইকবালের 'মর্দে খোদা' বা 'মর্দে মোমেনের' উল্লেখকে যাঁরা নেতাতন্ত্রের লক্ষণ মনে করিয়াছেন, তাঁদের খেদমতে আমাদের বক্তব্য এই যে, ওটা আসলে আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক নয়। সব জাতি, সব দেশ ও সব ধর্মের মধ্যেই ওটা আছে। রাজনীতিক কর্তব্যবোধ ঐ মনোভাবের দ্বারা কদাচ প্রভাবিত হয় নাই। বহু পীরের ভক্ত-মুরিদ-মোতেকাদরা পীরের আদেশ অমান্য করিয়া পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। আর রাজনৈতিক নেতার প্রতিও মুসলমানদের যে ভক্তি-আনুগত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেটা শুধু ক্যারিসম্যাটিক নেতাদের বেলায়ই সত্য। কিন্তু সেটা যুগ-যুগান্তরের ব্যাপার। প্রাত্যহিক ব্যাপার নয়। অমন নেতৃ-ভক্তি সব জাতির মধ্যেই আছে। শুধু ঐ কারণে কোনও জাতিকে গণতন্ত্রের অযোগ্য বলা হয় নাই। মুসলমানকেও বলা যাইবে না।

কোনও মুসলিম রাষ্ট্রেই বর্তমানে গণতন্ত্র চলিতেছে না, অতএব ভবিষ্যতেও কোনদিন চলিবে না, এটাকে অতি-সরলীকরণ বলা যায়। সত্য বটে, অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে ঘন-ঘন সামরিক অভ্যুত্থান দেখা গিয়াছে। এইসব ঘটনাবাহুল্যে এটাকে মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ প্রবণতা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই ভিত্তিতে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়শাস্ত্রের খেলাফ। বর্তমানে পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে ঘন-ঘন রাষ্ট্র-বিপ্লব হইতেছে দেখিয়া এটা ধরিয়া লওয়া ঠিক হইবে না যে, এটা চিরস্থায়ী ব্যাপার, অথবা এটা শুধু মুসলিম দুনিয়ার একার বৈশিষ্ট্য। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ছাড়াও আফ্রো-এশিয়ান ও লাতিন-আমেরিকান বহু দেশে এমন বিপ্লব প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। তারপর বর্তমানে ঘটিতেছে বলিয়াই চিরকালই ঘটিতে থাকিবে, এটাও খুব স্থূল যুক্তি। গণতন্ত্রকে তার প্রসব-বেদনাসহ অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ও আপদ-বিপদের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়।

পাকিস্তানীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের নিরক্ষরতাকে তাদের গণতান্ত্রিক অযোগ্যতার প্রমাণরূপে যাঁরা ব্যাখ্যা করেন, তাঁরাও আসলে গণতন্ত্রের তাৎপর্য ও মর্মবাণী বুঝেন না। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা এক জিনিস নয়। লেখাপড়া না জানিয়াও লোকেরা বড়-বড় সংসার ও কারবার চালায়। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দ বিষয়-জ্ঞানই গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। এই হিতাহিত জ্ঞান মানুষের সহজাত। লেখাপড়া এই জ্ঞানকে প্রখর করে; কিন্তু লেখাপড়া না জানিলেই রাজনীতিক চেতনা থাকিবে না, এ ধারণা ঠিক নয়। রাজনৈতিক চেতনা খুব টনটনা না থাকিলে এত বিরোধিতা, এত প্রতিকূলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টির পরেও নিরক্ষর ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিতে পারিত না। অশিক্ষিত হইয়াও যারা ভোট দিয়া পাকিস্তান সৃষ্টি করিতে পারে, তারা ভোট দিয়া পাকিস্তান চালাইতেও পারিবে। আর যাঁরা দেশের নিরক্ষরতা দূর না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রবর্তনের বিরোধী, তাঁরা বলিয়া দিবেন কি, জনগণের সরকার না হইলে ইতিমধ্যে জনগণের শিক্ষা প্রবর্তন করিবে কারা ?

সাত

(২) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় গণতন্ত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না; সেজন্য অর্থনৈতিক গণতন্ত্র কায়েম করিতে হইবে। এটা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন অর্থনৈতিক গণতন্ত্র কায়েম না হইবে, ততদিন রাজনৈতিক গণতন্ত্র বাদ দিয়া সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন করিতে হইবে, বর্তমান যুগে এ যুক্তি মানিয়া লওয়া যায় না। মহামতি কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এংগেলস খুবই পন্ডিত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একশ বছর আগে যে পরিবেশের মোকাবেলায় ক্রান্তিক ও সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সর্বহারার একনায়কত্বের কথা

বলিয়াছিলেন, সে পরিবেশ ও সমাজ-ব্যবস্থার অনেক রদ-বদল হইয়া গিয়াছে। আজ শিল্পের ব্যাপক উন্নতিতে, কল-কব্জার বিশালতায়, শ্রমিকের বিপুলতায় ও সংহতিতে তাদের কলেকটিভ বার্গেনিং ক্ষমতার প্রসারণে, শিল্পের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধিতে, ধনতন্ত্র ও তার শোষণ-ব্যবস্থায় আগের মত ধার আর নাই। শিল্প-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী বিবর্তন, ধনতন্ত্রের আত্মঘাতী সম্প্রসারণ, উৎপন্ন দ্রব্যের ফাযিল দাম' ইত্যাদি ব্যাপারে ঐ মহামতি পণ্ডিতগণের হিসাব-নিকাশের বুনিয়াদে বিরাট পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে মার্ক্সীয় অর্থ-নীতিবিদদের অনেকের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে শান্তি-পূর্ণ উপায়ে জনগণের আর্থিক মুক্তি সাধন সম্ভব ; সেজন্য রক্তাক্ত বিপ্লবের কোন দরকার নাই। অতএব কমিউনিযম আজ আর জাতীয়তা-বিরোধী আন্তর্জাতিকতাবাদ নাই। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদে আজ সহ-অবস্থানের একটা সমঝোতার সেতুবন্ধ রচিত হইয়া গিয়াছে। জাতীয়তাও আজ আর আত্ম-কেন্দ্রিক পররাজ্য-লোলুপ অন্ধ সংকীর্ণ স্বাদেশিকতারূপ আন্তর্জাতীয়তার দুশমন নয়। আজিকার সচেতন জাতীয়তা আসলে বিশ্ব-মানবতার বাণীবাহক আন্তর্জাতীয়তার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। তেমনি আজকার আন্তর্জাতীয়তাবাদ আর জাতীসমূহের রাষ্ট্রিক, কৃষ্টিক ও ভাষিক সীমা-সরহদ্দ বিলোপকারী সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাস নয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা আজ এইভাবে পরস্পরের পরিপূরক হইয়াছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যেও আজ নূতন করিয়া তেমন পরিচয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জ্ঞানী প্রবীণ যেমন তাঁর অতীত গৌরব লইয়া তরুণের পথ হইতে সসম্মানে সরিয়া দাঁড়ান, বুদ্ধিমান পিতা যেমন তাঁর মহিমাদীপ্ত ঐতিহ্য অটুট রাখিয়াই বিপুল সম্ভাবনাময় তরুণ পুত্রের হাতে সংসারের দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া অবসর লন, একদিনের কৃষ্টি-সভ্যতার স্রষ্টা ফিউডালিযম যেমন তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অহংকার ভুলিয়া ক্যাপিট্যালিযম নামক নিজের সন্তানের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কৃষ্টি-সভ্যতার বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, আজিকার ধনতন্ত্রও তেমনি তার এককালের মহিমামণ্ডিত ঐতিহ্য ও মানব-কল্যাণে সভ্যতা-বিস্তারে তার অসাধারণ অভূতপূর্ব অবদানের অহংকার বিসর্জন দিয়া, নয়া দুনিয়া সৃষ্টির খাতিরে নিজেরই সন্তান সমাজতন্ত্রের হাতে মানব-সমাজ পুনর্গঠনের দায়িত্ব দিয়া হাসিমুখে অবসর গ্রহণ করিবে; গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে এটা হওয়া সম্ভব। মারিয়া, পিটাইয়া, অপমান করিয়া বুড়া মুরুব্বি ধনতন্ত্রকে গদিচ্যুত করার দরকার হইবে না। বাপ-বেটার পরিচয় ঘটিলেই বৃদ্ধ পিতা তরুণ পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিবে। এই পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবে সে চেষ্টা না করিয়া চোখের-দেখা সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য

করিয়া শত বছর আগের-দেওয়া ফরমুলায় রক্ত-বিপ্লব ঘটাইতে হইবে কেন ? সে বিপ্লব ঘটাইবার অপেক্ষায় শোষিত ও অধিকার-বঞ্চিত জনগণকে তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার হতে বঞ্চিত রাখার কি সার্থকতা আছে ? অতএব এই যুক্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত করা চলে না।

আট

(৩) এর পরে আসে গণতন্ত্র বনাম নেতাতন্ত্রের কথা। নেতাতন্ত্রে ও এক-নায়কত্বে শৈল্পিক, আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন খুব দ্রুত হয়, এই কথাটি খুব জোরের সংগে চালু করা হইয়াছে। কথটা একেবারে মিথ্যা নয়। গণতন্ত্রী দেশে যে-সব উন্নয়নে শ' বছর লাগে, অনেক ক্ষেত্রে একনায়কত্বের দেশে তাই করা হইয়াছে বিশ-ত্রিশ বছরে। গণতন্ত্রী সরকার সুস্পষ্ট কারণেই একটু মন্থরগতি। গণতন্ত্রী দেশে আইন আছে, আইন পরিষদ আছে, ডিবেট আছে, খবরের কাগযের সমালোচনা আছে, জনমতের বাদ-প্রতিবাদ আছে। সে দেশে বাজেট করিয়া খরচ করিতে হয়, খরচ করিয়া হিসাব দিতে হয়; অপরপক্ষে ডিক্টেটরের দেশে এ-সব হাংগামা নাই। আইন নাই, আইনসভা নাই, খবরের কাগযের সমালোচনা নাই, সভার প্রতিবাদ নাই। বাজেটও নাই, খরচের হিসাব-নিকাশও নাই। গৌরী সেনের টাকা খরচ করেন এক ব্যক্তি তাঁর মর্যি-মোতাবেক। লোকটি সৎ হইলে এবং বুদ্ধি তাঁর অংকশাস্ত্রের দুই এ-দুই এ চারের মত নির্ভুল হইলে তিনি দেশের শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিতে পারেন আশ্চর্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে। এই কারণে দেশী-বিদেশী অনেকেই বলিয়া থাকেন, আফ্রো-এশিয়া নব-স্বাধীনতালব্ধ দেশসমূহের দ্রুত উন্নতির জন্য গণতন্ত্রের চেয়ে ডিক্টেটর শাসনই বেশী হিতকর। দেশবাসীর নাম করিয়াও এ কথা বলা হইয়া থাকে। বলা হয়, দেশের জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নতিই চায় আগে। এক শ' বছরের সাধনায় ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা স্বায়ত্তশাসনের যে স্তরে পেঁৗছিয়াছে, আফ্রো-এশিয়ান দেশের লোকেরা দশ-বিশ বছরে সে স্তরে পেঁৗছিতে পারে না। অথচ ওদের এক শ' বছরের শৈল্পিক, আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের দশ বিশ বছরেই করিতে হইবে। কাজেই আমাদের উন্নয়নের গতি বেগবান হইতে হইবে। সেজন্য দরকার একনায়কত্বের।

এই যুক্তিতে হিটলার জার্মানিতে, মুসোলিনী ইটালিতে, আইয়ুব পাকিস্তানে একনায়কত্ব চালাইয়াছিলেন। আইয়ুব সহেব পাকিস্তানের কি কি উন্নতি কতদূর করিয়াছেন, তার হিসাব আজো হয় নাই। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনী

জার্মানি ও ইটালির কি কি উন্নতি করিয়াছেন, তা চোখের সামনেই সকলে দেখিয়াছে। একনায়কত্ব দেশের খানিকটা উন্নতি দ্রুতগতিতে অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারে, এটা ঠিক। কিন্তু সে উন্নয়ন জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ব্যক্তিগত আযাদির যে মূল্যে কিনিতে হয়, সেটা উচিত মূল্য কি না, তা ভাবিয়া দেখা দরকার। গণতন্ত্রী সরকার ঐ সব উন্নয়ন সাধন করিতে পারিতেন না, তাও ঐ সংগে প্রমাণ করা দরকার। গণতন্ত্রী সরকারের গতি মন্থর হইতেই হইবে, আর ডিক্টেটরী সরকারের গতি বেগবান হইবেই, সকল ব্যাপারে তা বলা যায় না। গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন মুল্লুক যে মুদ্দতে চাঁদে মানুষ নামাইতে পারিল, ডিক্টেটরের দেশ রাশিয়া সে মুদ্দতে তা পারে নাই। এসব বিষয় চিন্তা করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এই সর্বসম্মত রায়ে আমাদেরও একমত হইতে হইবে যে, সকল গুণে গণতন্ত্রই আজো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম শাসন-ব্যবস্থা।

এ সত্ত্বেও যাঁরা বলেন, গণতন্ত্র এখানে বা ওখানে বা কোথাও চলিবে না, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বক্তারা কোনও বিশেষ মতলবে ও-কথা বলিতেছেন। অথচ এর উলটা কথাটাই খাঁটি সত্য। 'বর্তমান দুনিয়ায় কোনো দেশেই গণতন্ত্র চলিবে না' না বলিয়া বরঞ্চ বলা উচিত, 'বর্তমান দুনিয়ায় গণতন্ত্র ছাড়া কোনও দেশেরই চলিবে না।' আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, গণতন্ত্র ছাড়া বর্তমানে কোনও দেশ নাই। দৃশ্যতঃ তা রাজার দেশই হউক, আর ডিক্টেটরের দেশই হউক।

একটু ধীরভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে, গণতন্ত্রটা আসলে অংশতঃ পরিমাণের পার্থক্য, ডিফারেন্স-অব-ডিগ্রি, আর অংশতঃ যন্ত্রের পার্থক্য, ডিফারেন্স অব মেশিনারি। রুশোর আমলের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আজ আর চলে না। তার স্থলে প্রবর্তিত হইয়াছে পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধি-সরকার। প্রতিনিধিত্ব-মূলক নির্বাচিত সরকারই জনগণের পক্ষে জনগণের স্বার্থে জনগণের রাষ্ট্রের শাসন করিয়া থাকেন। বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে রেফারেন্ডাম করা ছাড়া জনগণ দেশের শাসন ব্যাপারে দৈনন্দিন হস্তক্ষেপ করে না। তার মানে, বহুর কাজ অল্প লোকের নামই গণতন্ত্র। এই অল্প লোকই দেশ চালায় বটে এবং দেশবাসী দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু যাঁরা দেশ শাসন করেন, তাঁরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে জনগণের মুখ ও মতের দিকে নযর রাখিয়াই তা চালাইয়া থাকেন। বহুর পক্ষে বহুর ইচ্ছায় দেশ শাসিত হইতেছে, গণতন্ত্রের এটাই সবচেয়ে বড় কথা। কতজন দেশ শাসন করিতেছে, কারা কিভাবে ক্ষমতার আসনে বসিয়াছে, এটা গণতন্ত্রের আকৃতির কথা, প্রকৃতির কথা নয়। এ পার্থক্য কাজেই পরিমাণগত। এই দিক হইতে বিচার করিলে রাজা-বাদশার দেশই হউক, আর ডিক্টেটরের দেশই হউক, সব দেশকেই গণতান্ত্রিক বলিতেই হইবে। কাজেই গণতন্ত্র-বিরোধীদের সুর বদলাইয়া বলিতে হইবে: বর্তমান দুনিয়ায়

গণতন্ত্র ছাড়া দেশ নাই। এইখানে গণতন্ত্রের বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির কথা সংক্ষেপে আলোচনা প্রাসংগিক হইয়া পড়িতেছে।



(৪) রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, কোনো দেশের রাষ্ট্ররূপে রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হউক, তার সরকারের আকৃতি ফেডারেল বা ইউনিটারীই হউক, শাসন-পদ্ধতিটা হয় প্রেসিডেনশিয়াল অথবা পার্লামেন্টারী হইতেই হইবে। পার্লামেন্টারী পদ্ধতির বড নযির ইংল্যান্ড, আর প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির বড় নযির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

গণতন্ত্র-বিরোধীদের সবাই রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী স্বাভাবিক কারণেই। এঁদের যাঁরা বাধ্য হইয়া গণতন্ত্র মানিতে আসেন, তাঁরা স্বভাবতঃই প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির পক্ষপাতী হন। আমাদের দেশের উপর তলার সরকারী কর্মচারীরা যে কারণে-অকারণে হঠাৎ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির নিন্দুক ও প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির ভক্ত হইয়া পড়েন, তার হেতু এই। পার্লামেন্টারী পদ্ধতির নিন্দায় এঁরা জনগণের ভাবপ্রবণতায় একটা দিক খুব কাজে লাগাইতে চান। দুই শ' বছরের ইংরাজের যালিম-শাহির যাঁতাকলের পেষণ-শোষণ হইতে সদ্যমুক্ত জনসাধারণের মধ্যে একটা ইংরাজ-বিদ্বেষ সহজাত বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই গণ-মনোভাবের সুযোগ নিয়া আর সব ব্যাপারে ইংরাজের অন্ধ অনুকারী হইয়াও আমাদের উপর তলার শাসকরা বলিয়া থাকেন, পার্লামেন্টারী পদ্ধতি নিলে ইংরাজের অন্ধ-অনুকরণ করা হয়। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন জাতি হিসাবে অপরের অন্ধ-অনুকরণ করা আমাদের সাজে না, ভাবখানা এই।

বর্তমান ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক ইংরাজ, একথা না মানিলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসন প্রবর্তন করিলেই ইংরাজের অন্ধ-অনুকরণ করা হইল, একথা সত্য নয়। ইংরাজের শাসন-পদ্ধতি হইলেই তা ভাল হইবে, তা যেমন সত্য নয়, ইংরাজের হইলেই তা খারাপ হইবে, তাও তেমনি সত্য নয়। এককালে অবশ্য তোষামোদীদের নযরে ইংরাজের সবকিছুই আদর্শ ছিল। 'বৃটিশ শাসন-পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ', 'বৃটিশ পার্লামেন্ট দুনিয়ার সব পার্লামেন্টের জননী' ইত্যাদি কথা এককালে বলা হইত কতকটা ইংরাজ শাসনপদ্ধতির গুণে, কিন্তু বেশীর ভাগ বলা হইত ইংরাজের বিশাল সাম্রাজ্যিক প্রভাবের ফলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সুরুজ ডুবে না, বৃটিশ নৌ-বাহিনী দুনিয়ায় সাত-সমুদ্দুরের রাণী, ব্যাংক-অব-ইংল্যান্ড দুনিয়ার সকল দেশের লেনদেনের ক্লিয়ারিং হাউস, ইংল্যান্ডের পাউন্ড দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের টাকার দাঁড়ি-পাল্লা, এসব কথাই

এককালে সত্য ছিল। সে যুগে ইংরাজের সবতাতে সৌন্দর্য দেখা ছিল সেকালীন দুনিয়ার ফ্যাশান। ইংরাজের শাসন-পদ্ধতিকেও শ্রেষ্ঠ বলা হইত এই যুগেই।

কিন্তু ইংরাজের সে গৌরবের যুগ আর নাই। ইংরাজের সাম্রাজ্য খতম হইয়াছে। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সুরুজ ডুবিত না, সেই ইংরাজের দেশ ইংল্যাণ্ডে সুরুজ একরূপ উঠেই না। কিন্তু তার মানে এই নয়, ইংরাজের সাম্রাজ্য-বাদের মত তার সব কিছুই খারাপ। সে সাম্রাজ্যের অবসানে তার সব কিছুর অবসান ঘটিয়াছে। সত্য বটে ইংরাজের অনেক-কিছু অমিশ্র খারাপ। কিন্তু তার অনেক-কিছু অমিশ্র ভালও। বেশীর ভাগ ভাল-মন্দের মিশ্রণ। তার মধ্যে আবার মন্দের চেয়েও ভাল বেশী।

বৃটিশ পার্লামেন্টারী পদ্ধতি এই শেষোক্ত শ্রেণীর বস্তু। এই পদ্ধতির দোষ মেলা। কিন্তু তার মূলনীতি নির্ভুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, ইটালি প্রভৃতি সব ইউরোপীয় রাষ্ট্র; জাপানের মত উন্নতিশীল এশীয় রাষ্ট্র এই মূলনীতি যার-তার শাসন-ব্যবস্থায় গ্রহণ করিয়াছে। কারণ বৃটিশ শাসন-পদ্ধতির এই মূলনীতিতে গণতন্ত্রের মূল কথাটিই রূপায়িত হইয়াছে। গণ-তন্ত্রের মূল কথাটি এই: জনগণই রাষ্ট্রের আসল মালিক। রাষ্ট্রের শাসনকার্য চলিবে জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাদের সম্মতিক্রমে। নির্ধারিত সময়ে দেশব্যাপী নির্বাচনই এই পরামর্শের বাস্তব রূপ। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের প্রয়োজনমত সরকার বদল করিয়া থাকে। এ অবস্থায় দেশের সরকার বদলের জন্য, নিজের গদি দখলের জন্য কোনও উচ্চাভিলাষী সামরিক-অসামরিক কর্মচারীকে খুন-জখমের বিপ্লব ঘটাইতে হয় না। ভোটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সরকার বদল হয়। এই সব সরকার পরিবর্তনের সাথে-সাথে দেশের সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য ও শোষণ দূর হয়। জনমতের প্রবল চাপের বন্যার সামনে ভুলুণ্ঠিত অধিকারীরা বিনা-প্রতিবাদে জনগণের অনুকূলে পথ ছাড়িয়া দেয়। শোষকেরা শোষিতের, আশরাফেরা আতরাফের, মালিকরা শ্রমিকের, জমিদাররা প্রজার সাথে এক কাতারে দাঁড়াইয়া সমান নাগরিকত্বের পরিবেশ মানিয়া লয়। গণতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারা এই। এক্ষেত্রে খুন-জখমের স্থান নাই।

এই মূল-নীতিভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে খুব স্বাভাবিক কারণেই। পার্লামেন্টারী পদ্ধতি তারই একটা রূপ। একে পার্লা-মেন্টারী বলা হয় এই জন্য যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান হিসাবে

পার্লামেন্টই এ ব্যবস্হার সর্বোচ্চ সার্বভৌম রাষ্ট্র-ক্ষমতার আধার। নির্বাচনে এই পার্লামেন্টে যে দল মেজরিটি হয়, তারাই সরকার গঠন করে। পার্টির নেতা হন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রীসভা, পার্টি ও সরকারের সকল কাজের জন্য একা দেশবাসীর কাছে দায়ী। সরকারের কোনও ভুলের জন্য তিনি কোনও মন্ত্রী-বিশেষ বা মেম্বর-বিশেষের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া রেহাই পাইবেন না কারণ তিনি সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন। কোনও মন্ত্রীকে ডিসমিস করার, এমন কি পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিয়া নতুন নির্বাচন ঘোষণা করিয়া ভোটারদের কাছে বিচারভার দিবার তাঁর অবাধ ক্ষমতা রহিয়াছে। এমন কি, রাজার বিয়ার বাধা দিবার অধিকারও তাঁর আছে।

দশ

কিন্তু সুস্পষ্ট কারণেই সকল দেশ বৃটিশ পদ্ধতি হুবহু গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ বৃটিশ শাসন-পদ্ধতির দুইটা বড় থাম্বা আছেঃ একটা রাজা, আরেকটা লর্ড সভা। প্রজাতন্ত্রে স্বভাবতঃই রাজা নাই। তবু বৃটিশ পদ্ধতির অন্যান্য গুণাবলীর জন্য প্রজাতন্ত্রীরাও এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে সংশোধিত রূপে। রাজার বদলে এরা পরোক্ষ-নির্বাচিত শাসন-ক্ষমতাহীন প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপ্রধান করিয়াছে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ পরিষদ নির্বাচন করিয়া লর্ড সভার স্হানে বসাইয়াছে।

প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতিতেও তেমনি অনেক গুণ আছে। এসব গুণের অনেকগুলিই পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে নাই। অনেক সংগ্রাম-সংঘাতের মধ্য দিয়া মার্কিন প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া তার মধ্যে এমন সব গুণ আছে, যার জন্য আফ্রো-এশিয়ান বহু নয়া জাতির পক্ষে এ পদ্ধতি মডেল বিশেষ। বস্তুতঃ বহু জাতি লইয়া রাষ্ট্রীয় নেশন গড়নে মার্কিন পদ্ধতির জুড়ি নাই। প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির এইসব বিশেষ গুণের জন্যই ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশে পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণে নয়া-নয়া শাসন-পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে।

তবে প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির তুলনায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির কতকগুলি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতিতে হেড অব দি স্টেট ও হেড অব দি গবর্নমেন্ট একই ব্যক্তি। পক্ষান্তরে, পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে হেড অব দি স্টেট যিনি, তিনি হেড অব দি গবর্নমেন্ট নন। এইদিক হইতে গণতন্ত্রের মূল কথা ঃ রাষ্ট্র ও সরকার এক নয়, এই সত্যটি পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে যেমন সুস্পষ্ট, প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতিতে তেমন নয়। এ পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সরকারের দোষের জন্য তার নিন্দা, সমালোচনা, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, শোভাযাত্রায় রাষ্ট্র-প্রধানের গায়ে কোনও ছোঁয়াচ লাগে না। ইংল্যান্ডের রাজার মতই তিনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে। অথচ প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতিতে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকারের প্রধান। সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে যত গাল-মন্দ, সব গিয়া লাগে সোজাসুজি রাষ্ট্রপ্রধানের গায়ে। এইভাবে সরকার-বিরোধিতা রাষ্ট্র-বিরোধিতায় তাল-গোল পাকাইয়া যায়। ফলে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবান সুগঠিত জাতি ছাড়া আর সকলের মধ্যে এই পদ্ধতির কুফল দেখা দিতে পারে। গঠনোন্মুখ উন্নতিশীল নয়া জাতিসমূহের জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রপতির প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রানুরাগে ঘুণে ধরিবার রিস্ক আছে।

তথাপি দেশ-ভেদে এই দুই পদ্ধতির যে-কোন একটা উপযোগী হইতে পারে। ভৌগোলিক অখণ্ডতা যে রাষ্ট্রের ভূমির গুণ, সে রাষ্ট্রের অবস্থাভেদে এই দুই পদ্ধতির যে কোনটা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ডতা যে রাষ্ট্রের নাই, তার জন্য প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। রাষ্ট্র পরিচালনে সকল অঞ্চলের নাগরিকদের সমান ও সমসাময়িক অংশীদারি ও অংশগ্রহণের যে সার্বজনীন মনোভাব গণতন্ত্রের ভিটামিন, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতি সে মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিই সেখানে একমাত্র রাস্তা। পাকিস্তানের বেলায় একথা অমোঘ সত্য। এখানে যাঁরা পার্লামেন্টারী পদ্ধতির বদলে প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার মূলে কুঠারাঘাত করিবেন।

অতএব দেখা গেল, দুনিয়ায় গণতন্ত্রও যেমন চলিবে, পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রও তেমনি চলিবে। তবু যুগে-যুগে, এমন কি আরও ঘন-ঘন সময়ে-অসময়ে রব উঠে, গণতন্ত্রের হায়াত ফুরাইয়াছে, ওটা আর চলিবে না। কিন্তু এটা মিছা কথা। গণতন্ত্রের হায়াত ফুরায় নাই। সে হায়াত অফুরন্ত। যতদিন জনগণ আছে, ততদিন গণতন্ত্র থাকিবে। জনগণেরও মৃত্যু নাই, গণতন্ত্রেরও মৃত্যু নাই। তবু মাঝে-মাঝে গণতন্ত্রের দম আটকাইয়া যায় আমাদের চোখের সামনেই। তার কারণ ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী পলিটিকাল এ্যাডভ্যানচারিস্টরা ওর গলা টিপিয়া ধরে। আলেকযাণ্ডার, তৈমুর, চেংগিস, নেপোলিয়ানের দিগ্‌বিজয়ের দিন শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাঁদের উচ্চাশা ও বীরত্বের খেয়াল শেষ হয় নাই। হিটলার-মুসোলিনিরা তার প্রমাণ। জনগণের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এঁদের বীরত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বুনিয়াদ। আগের বীরেরা পরের দেশ জয় করিয়া দিগ্‌বিজয়ী হইতেন। এখনকার বীরেরা নিজের দেশ দখল করিয়া ফিল্ড মার্শাল হন। রাজতন্ত্র ধ্বংস করিবার সাহস এঁদের নাই

বলিয়াই এঁরা গণতন্ত্র ধ্বংস করিবার চেষ্টা করেন। যে সব বীর রাস্তায় মার খাইয়া ঘরে ফিরিয়া বউ কিলাইয়া বীরত্ব যাহির করে, এরা সেই শ্রেণীর বীর।

গণতন্ত্র ধ্বংসের এদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এরা নিজেরাই ধ্বংস হইবে; গণতন্ত্র ধ্বংস হইবে না। গণতন্ত্রের হায়াত ফুরায় নাই। হায়াত ফুরাইয়াছে গণতন্ত্রের দুশমনদের। চারদিকেই তার চাক্ষুস প্রমাণ। চক্ষুষ্মানমাত্রেই তা দেখিতেছে।

আজাদ, ১৪ আগস্ট, '৬৯

৬

জাতীয়তাবাদ বনাম পুঁজিবাদ

পাঠক, হেডিং দেখিয়া চমকিয়া উঠিবেন না। ওটা ভুলে দেওয়া হয় নাই। জাতীয়তাবাদের সহিত পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। একদিকে জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ বা আদর্শবাদ, অপরদিকে পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদ বা সাম্যবাদ : এই বিতর্কের সাথেই আমরা পরিচিত। জাতীয়তাবাদের সাথে পুঁজিবাদের বিরোধটা প্রকট নহে। তাই ওটা অতি সহজেই আমাদের নযর এড়াইয়া যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে ব্যাপারটার দিকে জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

পুঁজিবাদের সাথে জাতীয়তাবাদের বিরোধ বরাবরই ছিল। সে বিরোধ উভয়ের বুনিয়াদের মধ্যেই নিহিত। জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম দিতেছে। সব জাতি-রাষ্ট্রই অর্থনীতিতে, সুতরাং কল-কারখানা ইত্যাদি উৎপাদন-যন্ত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাতে অবাধ পুঁজিবাদ বিকাশের বিঘ্ন হইতেছে। এডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মেলথাস হইতে আধুনিক রোস্টভ পর্যন্ত সকল পুঁজিবাদী অর্থবিজ্ঞানী এ বিষয়ে একমত যে, উৎপাদন যত বেশী, মুনাফাও তত বেশী। ভিন্ন-ভিন্ন নেশন-স্টেটের অস্তিত্ব এবং তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা পুঁজিবাদের এই কাজটিতেই বাধা দিতেছে। অথচ তাদের চেষ্টা সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃহৎ শিল্পের বহুল উৎপাদন যেমন হস্ত ও কুটির-শিল্পের অবসান ঘটায়, উন্নতমানের যন্ত্রের অধিকারী বৃহৎ রাষ্ট্র-সমূহের বহুল উৎপাদন তেমনি অনুন্নত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বিরোধ বাধে। পরিণামে রক্তক্ষয়ী সম্পদনাশা যুদ্ধও বাধিয়া যায়। স্থূল দৃষ্টিতে বিশ্বযুদ্ধ অস্ত্র উৎপাদনের দিক হতে পুঁজিবাদের পক্ষে লাভজনক বটে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সে লাভ দীর্ঘস্থায়ী লোকসানের তুলনায় নগণ্য। এই কারণে পুঁজিবাদ পৃথক-পৃথক সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের বিরোধী। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নামে আঠার শতকে ফরাসী ও মার্কিন বিপ্লবের পরে-পরে যখন বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

হয়, তখনও দূরদর্শী পুঁজিবাদীরা তার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত দেশসমূহের সাম্রাজ্য টুকরা-টুকরা করিয়া যেদিন অনেক-গুলি জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়, তখনও ভবিষ্যদ্দর্শী পুঁজিবাদের গণকরা তার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। গণতন্ত্রবাদী মিত্রশক্তির রাষ্ট্র-নেতারা পুঁজিপতিদের এই সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া বিশ্বযুদ্ধের পরে নয়া জাতি-রাষ্ট্রের সংখ্যা দশ-বিশ গুণ বাড়াইয়া দেন।

এতদিনে গণতন্ত্রী বৃহৎ শক্তিবর্গের কানে পানি গিয়াছে। নয়া জাতি-রাষ্ট্রের বুনিয়াদে জাতিসংঘ গঠিত হইয়াছে। খোদার ফযলে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রের সংখ্যা এক শ' বিশে উঠিয়াছে। এরাই আজ জাতিসংঘে বিপুল মেজরিটি। যদিও জেনারেল এসেম্ব্লিকে বিশেষ-কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, যদিও পাঁচ মোড়লের পারিবারিক মজলিস নিরাপত্তা পরিষদেই সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, তথাপি জাতিসংঘে, এমনকি নিরাপত্তা পরিষদেও, গণতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। মোড়লদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমনকি বিরোধিতা ঠেলিয়া, অনেক প্রস্তাব পাস হইয়া যাইতেছে। এর পরেও বৃহৎ শক্তির দেশসমূহের রাষ্ট্রনেতারা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও নেশন-স্টেটের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে মত বদলান নাই। বদলাইয়া থাকিলেও মুখে বলেন নাই। কিন্তু ঐসব দেশের যারা পর্দার আড়ালের নেতা, সেই পুঁজিপতি, সমরনায়ক ও বুরোক্রাটরা খোলাখুলি বলিতে শুরু করিয়াছেন, জাতীয়তাবাদের দিন শেষ হইয়াছে, আন্তর্জাতীয়তা-বাদের দিন আসিয়াছে। জাতিতে-জাতিতে বিরোধের অবসান ঘটইয়া মানব জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহামানব জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের বিলোপ-সাধন করিতে হইবে। দেশ ও জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না। থাকিবে শুধু বিশ্ব। বিশ্ব-মানবের খাতিরে বিশ্ব-সভ্যতা রক্ষার জন্য বিশ্ব-কমিউনি-যমের মোকাবিলা বিশ্ব-পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

পুঁজিবাদের জাতীয়তা-বিরোধী যিকিরের অন্ততঃ তিনটা জোর আছে। এক, বিশ্বমানবতার ডাকের নিজস্ব একটা আবেদন আছে। দুই, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহে মানুষ সত্যসত্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ। তিন, সাবেক সাম্রাজ্যবাদী নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের উপর সংগত কারণেই ক্রুদ্ধ। এই তিনটি বাইরের জোর ছাড়া পুঁজিবাদের নিজস্ব একটা জোর আছে। তিন নম্বরের কথাটাই আগে কই। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের খতম করিয়াছে এই নব উন্মেষিত জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদই এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপর অনেকগুলি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র গড়িয়াছে। তারা জাতিসংঘের মেম্বর হইয়া সাবেক

প্রভুদের সাথে সমান উঁচা চেয়ারে বসিয়া সামনে-সামনে কথা বলিতেছে। বিরুদ্ধে ভোটও দিতেছে। বাংলায় জমিদারি উচ্ছেদের পর জমিদারদের অবস্থা আর কি। এই রাগের আগুনে ইন্ধন যোগাইতেছে ঐ ঐ দেশের পুঁজিপতিরা।

আর যুদ্ধের কথা? দৃশ্যতঃ জাতিতে-জাতিতে বিরোধই দুই-দুইটা বিশ্ব-যুদ্ধের ও শতশত স্থানীয় যুদ্ধের হেতু, একথা সত্য; কিন্তু তার মূলে উস্কানিদাতা পুঁজিপতিরাই যুদ্ধের মুনাফাও লুটে পুঁজিপতিরাই। তবে প্রয়োজন-মত জাতীয়তাবাদকে দোষী করিয়া নিজেরা সাধু সাজিতেও পারে তারাই।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে দুনিয়া ছোট হইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবেশী-প্রীতি প্রসারিত হইয়াছে। সব-দেশের মহাপুরুষরা দেশ-জাতি-নির্বিশেষে মানব-সেবার কথা বলিয়াছেন। সব জাতির মহাকবিরা মানব প্রেমের গান গাহিয়াছেন। ফলে মানব মনে বিশ্ব-মানবতার ডাকে একটা আবেদন আছে। পুঁজিবাদীরা সেই কোমলতারই সুযোগ নিয়া নিজেদের সাথে দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব জাতির ঐক্যের কথা বলিতেছেন অবশ্য নিজ দেশের কালাদেরে বাদ দিয়া।

পুঁজিবাদের নিজস্ব জোরটা তার ঐতিহ্যের জোর। পুঁজিবাদ সামন্তবাদের শিকল হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়াছে। তখন ছিল পুঁজিবাদ একটা বিপ্লব। সে বিপ্লবে মানুষের দৈহিক, রাষ্ট্রিক ও আত্মিক মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল। পুঁজিবাদের এই ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু যতই গৌরবের হউক, সেটা অতীত। আজিকার নতুন আগামী কালের পুরাতন। একদিনের বিপ্লব, পরের দিনের প্রগতিশীলতা। গতিশীল প্রকৃতির এটাই বিধান। পুঁজিবাদের বেলাও তাই। কিন্তু সব পুরাতনের মতই পুঁজিবাদও নিজের ভূমিকার অবসান স্বীকার করে না। আমাদের দেশের মুসলিম লীগ আর কি? এর প্রতিও যেমন কিছু লোকের দরদ আছে, ওর প্রতিও তেমনি আছে।

এই পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের সাথে আপোস করিয়া বেশ কিছুদিন আরামেই কাটাইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারকে দিয়া নিজেদের কল-কারখানার আপ্-কোরাকি বিনা-মাইনার সুপারভাইযারি করাইয়াছে। সরকারী রক্ষণের ছায়ায় বসিয়া তারা মুনাফা লুটিয়াছে দুই হাতে। নয়া পুঁজিবাদের মনীষী উপদেষ্টা কেইন্সের পরামর্শে দিন যাইতেছিল বেশ। কিন্তু আর বুঝি চলে না। সব দেশের জনগণই আজ অধিকার-চেতন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। তারা আর শুধু ফর্মাল রাষ্ট্র-ক্ষমতায় সন্তুষ্ট থাকিতেছে না। দেশের গোটা অর্থনীতি-কে তারা নিজেদের সেবায় লাগাইবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প।

তাই পুঁজিবাদীরা তাঁদের পূর্বেকার 'লেসে-ফেয়ারে' ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। একাজে উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাঁরা

করিতেছেন। প্রথম চোটেই সোজাসুজি জাতি-রাষ্ট্রগুলি মুছিয়া ফেলা যায় না বলিয়া তাঁরা 'ইকনমিক কমিউনিটি' নামে সুপার-স্টেট গঠন শুরু করিয়াছেন। অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের নামে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এইড ক্লাব, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল, আঞ্চলিক করয-তহবিল ইত্যাদি হরেক নামের ও মতলবের আর্থিক সংস্থা আগে হইতেই করিয়া রাখা হইয়াছে। এদের অভীপ্সিত সুপার-স্টেটগুলি গঠিত হইয়া গেলেই আমদানি-রফতানি শুল্ক রহিত করা হইবে রাষ্ট্রের ক্ষতিকর, কিন্তু পুঁজিপতিদের লাভজনক, এমন সব কাজ একটার পর আরেকটা হইতে থাকিবে। সব দেশের শিল্পবাণিজ্য জাতীয় সরকারের বদলে ঐসব সুপার-কেবিনেটের নির্দেশেই চলিতে থাকিবে। এই ভাবে রাজস্বে ও ক্ষমতায় দুর্বল হইয়া তাঁরা নামমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র থাকিবে। আসলে তারা ঐসব পুঁজিঘাটি সুপার-স্টেটের অংগুলি হেলনে পরিচালিত হইবে।

জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নব-বলে বলীয়ান পুঁজিবাদের এই হামলা এতখানি বাস্তব আকার ধারণ করিয়াছে জাতিসংঘের জন্মের বিশ বছর পরে। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল এসেম্বলি জাতি-রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা ও অধিকার এবং জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের সনদ পাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। একাজ করিতে গিয়া সাবেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড বাধা পাইয়াছে। দুনিয়ার জাতি-রাষ্ট্রসমূহের এমন বিপুল মেজরিটি এতদিন পরে জাতি-রাষ্ট্র ও জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকে জাতিসংঘের চার্টারভুক্ত করিবার তাকিদ অনুভব করিলেন কেন, সেটা অনুসন্ধান করিলেই পুঁজিবাদের এই নয়া ষড়যন্ত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বিশ্ব-পুঁজিবাদের এই নয়া হামলা সব জাতি-রাষ্ট্রের মতই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটা হুমকি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পাকিস্তানের অনেক রাষ্ট্রনেতা এই হুমকির বিরুদ্ধে প্রস্তুত না হইয়া পুঁজিবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুশমন সমাজবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছেন। কেউ-কেউ জেহাদ পর্যন্ত ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ এঁরা কেউ পুঁজিবাদের সমর্থক নন, বরঞ্চ সমাজবাদের নিন্দা করার সাথে-সাথে তাঁরা প্রায় সকলেই পুঁজিবাদেরও কঠোর নিন্দা করিতেছেন। পুঁজিবাদের বিরোধী হইয়াও যে এঁরা পুঁজিবাদের সাথে যুদ্ধরত সমাজবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন, তার কারণ কি ?

বাহ্যদৃষ্টিতে এবং প্রচলিত জনমত অনুসারে সমাজবাজ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র। উৎপাদনযন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সরকারী মালিকানা

স্থাপন এবং অর্থ ও দ্রব্যের সুষম বণ্টনের নামই সমাজবাদ। এই হিসাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং শিল্পকারখানাদি উৎপাদন-যন্ত্র এবং ব্যাংক-ইনশিওরেন্সাদি আর্থিক সংস্থা জাতীয়করণ সমাজবাদের বিভিন্ন প্রয়োগ কর্মমাত্র। এটা লক্ষণীয় যে, যাঁরা সমাজবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁরা কিন্তু প্ল্যানিং বা জাতীয়করণের বিরুদ্ধতা করিতেছেন না। অনেকেই সমর্থন করিতেছেন। আবার অনেকে কল-কারখানার শ্রমিকদিগকে মালিকানায় অংশ দিবার প্রস্তাব করিতেছেন। এতে বোঝা গেল, সমাজবাদ বিরোধীরা তার অর্থনৈতিক দিকটার বিরোধিতা করিতেছেন না। বরঞ্চ তাঁরা স্পষ্টতঃই এটা বুঝিতেছেন, শাসনযন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানে যেমন মানুষের কল্যাণ হইয়াছে, উৎপাদন-যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানেও তেমনি মানুষের কল্যাণই হইবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক দিক ছাড়া সমাজবাদের একটা আদর্শিক দিকও আছে। সমাজবাদের এই আদর্শিক দিক নাগরিকদের গোটা জীবনটাই রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে চায়। গোটা সমাজ-ব্যবস্থাই ঢালিয়া সাজিতে চায়। কৃষ্টি-ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ সবকিছুই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। এর ফলে অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্র হইয়া পড়ে টোটালিটারিয়ান; সরকার হইয়া যায় একনায়কত্ব। দুনিয়ায় তার প্রচুর নযির বিদ্যমান। প্রয়োগের বেলায় যা, প্রবর্তনের বেলায়ও তাই। সমাজবাদীরা খোলাখুলিই বলিয়া থাকেন, ব্যালট-বাক্সের মাধ্যমে মামুলি গণতন্ত্রের পথে সমাজবাদ প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। সে জন্য দরকার গণ-বিপ্লব। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপের উপরই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্পষ্টতঃই পাকিস্তানসহ আফ্রো-এশিয়ান অধিক সংখ্যক দেশে এমন সমাজবাদ জনগণ গ্রহণ করিবে না। সমাজবাদ যদি ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তবে ধর্ম-বিশ্বাসীরা সমাজবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিবে না কেন? অথচ সত্য কথা এই যে, সমাজবাদের অর্থনৈতিক দিকটা অর্থ-শাস্ত্রের বিচারে তো বটেই, পুঁজিবাদের শোষণের মোকাবিলার জন্য কল্যাণের পথ হিসাবেও সবচেয়ে ফলপ্রসূ। সেজন্য পাকিস্তানসহ আফ্রো-এশিয়ান অনেক দেশে, এমনকি পশ্চিমের অনেক গণতান্ত্রিক দেশেও, সমাজবাদের রাষ্ট্রীয় আত্মিক আদর্শিক দিকটা বাদ দিয়া উহার অর্থনৈতিক দিকটা গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, ইসলামী সমাজবাদ, খৃষ্টানী সমাজবাদ, আরবী সমাজবাদ ইত্যাদি নয়া-নয়া স্লোগানের জন্ম হইয়াছে। এদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এটা সম্ভব কিনা? পরিণাম হইতে হেতু, সম্পাদন হইতে সম্পাদ্য এবং কায়া হইতে ছায়া পৃথক করা যায় কি না।

বরং আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও পাকিস্তানী জাতির কল্যাণের জন্যই সমাজবাদী ও সমাজবাদ-বিরোধীদের মধ্যে বাস্তবানুগ আপোস হওয়া অত্যাবশ্যক। পাঠক হাসিবেন না। এটা কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্টদের সহ-অবস্হানের আপোস নয়। এটা পরিচয়ের আপোস। এটা সম্ভব। এটা বাস্তব। সে আপোসে সোশিয়ালিযমের নাম হইবে ন্যাশনালিযম। এই নাম পরিবর্তনে অর্থনৈতিক বিপ্লব হিসাবে এর ধার ও ভার কোনটাই কমিবে না। একই মার্ক্সবাদ সোশিয়ালিযম ও কমিউনিযম দুই নাম গ্রহণ করায় কারো ধার মরে নাই। বরঞ্চ, নামের এই পার্থক্যের যৌক্তিকতা আজ স্বীকৃত।

আমার মতে গণতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্রে সমাজবাদের ফলিত নাম জাতীয়তাবাদ অযৌক্তিক হইবে না। বরঞ্চ, আদি উদ্দেশ্যের বিচারে এই নামই হইবে অধিকতর উপযোগী। 'সোসাইটি', 'ন্যাশনালিটি' ও 'নেশনে' পার্থক্য রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন। এ অবস্হায় কল-কারখানা ও ব্যাংকাদি ন্যাশনালাইযেশনের নাম গোড়াতেই যুক্তিযুক্তভাবেই হওয়া উচিত ছিল ন্যাশনালিযম। কিন্তু তা হয় নাই এই জন্য যে, মার্ক্সবাদীরা আগে বিশ্বাস করিতেন, পরিণামে রাষ্ট্র থাকিবে না। রাষ্ট্র ছাড়া নেশন হয় না। রাষ্ট্রহীন মানব গোষ্ঠীর নামই ন্যাশনালিটি, বরং সোসাইটি। এ কারণে মার্ক্সবাদীরা তখন ন্যাশনালাইযেশনকে সোশিয়ালাইযেশন বলিতেন। তাতেই পন্হাটির নামকরণ হইয়াছিল সোশিয়ালিযম। আমরা গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের পরিণাম বিলোপে বিশ্বাস করি না। বরঞ্চ বিশ্বাস করি, সরকারের গণতন্ত্রী রূপ ও রাষ্ট্রের জাতি-রূপ মানবসভ্যতার পূর্ণ বিকাশ, অতএব স্হায়ী। রাষ্ট্রায়ত্ত-করণকেও বলি আমরা ন্যাশনালাইযেশন, সোশিয়ালাইযেশন বলি না। অতএব, সমাজবাদের গণতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্হার নাম হওয়া উচিত ন্যাশনালিযম।

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করার এটাই সর্বোত্তম পন্হা।

ইত্তেফাক, ১লা মে, '৭০

৭

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বনাম আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

পাকিস্তান একটি ফেডারেশন। এক কানাডা ছাড়া দুনিয়ার আর সব ফেডারেশনের অংগরাজ্যকে স্টেট বলা হয়। শুধু কানাডাতেই ওদেরে প্রভিন্স বলা হয়। অস্ট্রেলীয় ফেডারেশনের শাসনতান্ত্রিক নাম কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া। আমাদের প্রতিবেশী ভারত ঠিক ফেডারেশন নয়। শাসনতান্ত্রিক নাম তার ইউনিয়ন। তবু তার অংগরাজ্যগুলিকে স্টেট বলা হয়, প্রভিন্স বলা হয় না।

সুতরাং নামে কিছু আসে যায় না। ফেডারেশন ও ফেডারেটিং ইউনিটগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনটাই আসল কথা। তবু আমাদের বেলা 'স্টেট' ও 'প্রভিন্স' দুইটা শব্দই খুব উপযোগিতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

দুনিয়াতে বহু ফেডারেশন আছে। তারা সকলেই উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাদের অনুসরণে আমরা পাকিস্তানেও ফেডারেশনে ও ইউনিটে ক্ষমতা বণ্টন করিতে পারিতাম।

কিন্তু আমাদের বেলা একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা অন্য কোনও ফেডারেশনের সামনে পড়ে নাই। সেটা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের প্রায় সর্বসম্মত মত এই যে, ফেডারেশনেও ভৌগোলিক অখণ্ডতা দরকার। এই অখণ্ডতাই আমাদের নাই। পাকিস্তান হাজার মাইল ব্যবধানে দুইটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বিভক্ত। সাধারণ অবস্থায় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় এমন দুই ভৌগোলিক ভূখণ্ড লইয়া এক রাষ্ট্র হয় না। আমাদের নেতাদেরও তেমন ধারণা গোড়াতে ছিল না। শেরে-বাংলার প্রস্তাবিত ও সাধারণ নির্বাচনে জনগণের সমর্থিত লাহোর প্রস্তাবের পরিকল্পনা তার ছিল দুইটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের। নির্বাচনের পরে নেতারা একটি মাত্র পাকিস্তান কায়েম করিয়াছেন। দুনিয়ায় এর নযির নাই; বই-পুস্তকেও কোনও নির্দেশ নাই। কাজেই রাজনীতিতে এটা সম্পূর্ণ এক্সপেরিমেন্ট। এ এক্সপেরিমেন্ট আমরা সফল করিবই। এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে হইলে আমাদের নযিরবিহীন মৌলিক উপায় বাহির করিতে হইবে। ঘটনাচক্রে এই বিশেষ দায়িত্ব পালনের একক

কর্তব্য ও দায় পড়িয়াছে পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর। ঘটনাচক্রটা এই যে, পাকিস্তানের রাজধানী পড়িয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। সমস্যাটা পূর্ব পাকিস্তানীদেরেই আঘাত করিয়াছে আগে। কাজেই সমাধানটাও বাহির করিয়াছে তারাই। এই সমাধানটাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন শব্দটা নতুন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই-এ এর ব্যবহার নাই। কারণ দুনিয়ার নয়া-পুরান কোনও রাষ্ট্রকেই এ-সমস্যার সমাধান করিতে হয় নাই। পাকিস্তানে এটা চালু হইলেই কিতাবে এর স্হান হইবে। আগেই বলিয়াছি, ফেডারেশনের ইউনিটগুলির দুই রকম নাম হইতে পারে। দুনিয়ার সব ফেডারেশনের মত তাদের নাম 'স্টেট' হইতে পারে অথবা কানাডার মত তাদের নাম 'প্রভিন্স'ও হইতে পারে। পাকিস্তান ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নাম 'স্টেট' হইলে তাদের অটনমিকে 'স্টেট' অটনমি বলা যাইতে পারিত; ইউনিটগুলির নাম 'প্রভিন্স' হইলে তাদের স্বায়ত্তশাসনকে প্রভিন্সিয়াল অটনমি বলা যাইত।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তানায়করা বরাবর পূর্ব-বাংলার দাবিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলিয়াছেন; প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলেন নাই। কারণ অতি সোজা। পূর্ব-বাংলা কোনও অর্থেই একটি প্রদেশ নয়। ইউনিটারি রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হিসাবেও না; ফেডারেল রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হিসাবেও না। বলা যাইতে পারে, পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তানায়করা প্রভিন্সিয়াল অটনমি দাবির বদলে 'স্টেট অটনমি' দাবি করিতে পারিতেন। তা কেন করেন নাই? তার বদলে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন', 'রিজিওন্যাল অটনমি' দাবি করিতেছেন কেন? দুই কারণে তা করেন নাই। এক, দুনিয়ার অন্যান্য ফেডারেশনের অংগরাজ্যেরা স্বচ্ছন্দে ও নিজেদের সুবিধার খাতিরে যে-সব বিষয় ফেডারেশনের হাওলা করিয়াছে, পূর্ব-বাংলা ভৌগোলিক কারণে তার সবগুলি ফেডারেশনকে দিতে পারে না। পূর্ব-বাংলা ঐ কারণে আরও কম বিষয় ফেডারেশনের হাতে দিতে বাধ্য। এই জন্যই স্টেট-অটনমি বলিলেও পূর্ব-বাংলার দাবির সবটুকু বোঝা যাইত না। দুই, পূর্ব-বাংলা নিজের স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবিবার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। তাদেরও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবিয়াছে। কি উপায়ে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, সে চিন্তাও পূর্ব-বাংলা করিয়াছে, কতকটা নিজের স্বার্থেই। এটা ঘটিয়াছে এইরূপেঃ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে ও থাকিতে পারে, পূর্ব-বাংলার সাথে তেমন সম্পর্ক নাই ও থাকিতে পারে না। সোজা কথায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি যে অর্থে পাকিস্তানের অংগরাজ্য বা প্রদেশ, পূর্ব-বাংলা সে অর্থে পাকিস্তানের অংগরাজ্য বা প্রদেশ নয়। এই দিক হইতে

বিচার করিলে এটা স্বতঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, একটিমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দিন পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিম অঞ্চলের চারটি প্রদেশের মতই একটি প্রদেশ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভৌগোলিক বাস্তবতার দিক হইতে পূর্ব-বাংলা একাই পশ্চিম অঞ্চলের চারটি প্রদেশ ও সবগুলি দেশীয় রাজ্যের যোগফলের সমান ছিল ও আছে। সহজ কথায় পূর্ব-বাংলা একাই একটি অঞ্চল, আর পশ্চিম পাকিস্তানের সকলে মিলিয়া আরেকটি অঞ্চল। লাহোর প্রস্তাবে এই দুইটিকে রিজিওন বলা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র রচনার সময় শাসনতান্ত্রিক বিধানে শাসনক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকার বণ্টনে এই দুই পৃথক আঞ্চলিক পার্থক্যের মাপকাঠিতে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। এই বাস্তব-জ্ঞান হইতেই পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-নায়করা বরাবর এটাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলিয়াছেন; প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বলেন নাই। স্পষ্টতঃই ও-দুই জিনিস একবস্তু নয়।

ফেডারেশন ও ইউনিটসমূহের মধ্যে বিষয় বণ্টনের মূলনীতি এই যে, যে-সব বিষয়ে সকল ইউনিটের স্বত্ব ও স্বার্থ এক বা 'কমন' এবং যে-সব বিষয় ইজমালিতে পরিচালন করিলে ফলের দিকে বেশী ও খরচের দিকে কম হয়, সেইগুলিই ফেডারেশনের হাতে দেওয়া হয়। আর যে-সব বিষয়ে সকল ইউ-নিটের স্বত্ব ও স্বার্থ এক ও কমন নয়, যেগুলির ইজমালি পরিচালনের কোনও বিশেষ সুবিধা নাই, সে সব বিষয়ই ইউনিটসমূহের যার-তার পরিচালনাধীন রাখা হয়।

কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম দুইটি। এক, দেশরক্ষা; দুই, পররাষ্ট্র। ফেডারেশন গঠন করিবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই প্রতিরক্ষা জোরদার করা। ফেডারেটিং ইউনিটসমূহের পৃথক-পৃথক প্রতিরক্ষা-ক্ষমতার চেয়ে ইজমালি ক্ষমতা নিশ্চয়ই বেশী। এই কারণে দুনিয়ার সব ফেডারেশনেরই দেশরক্ষা কেন্দ্রের হাতে দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানেও তাই থাকিবে। কিন্তু আমাদের ভৌগোলিক দ্বিখণ্ডতার দরুন দেশরক্ষার দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রাখি-য়াও বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশরক্ষা বাহিনীর সদর যে অঞ্চলে থাকিবে, তার অপর অঞ্চলের প্রতিরক্ষার শাসনতান্ত্রিক বিধান ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক অঞ্চলের প্রতিরক্ষা অপর অঞ্চলে অবস্থিত—এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ও অবাস্তব মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে।

তারপর থাকিল পররাষ্ট্র। পররাষ্ট্রও কেন্দ্রের হাতে থাকা অত্যাবশ্যক। দুনিয়ার সব ফেডারেশনেই পররাষ্ট্র ফেডারেল সাবজেক্ট। কারণ অতি সোজা। দেশের ভিতরে ফেডারেশন কয়েকটি রাষ্ট্রের সমন্বয় হইলেও বিদেশে সে একটি-মাত্র অখণ্ড রাষ্ট্র। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফেডারেশনের সভারেইনটি বিভক্ত হইলেও বহির্জাগতিক রাজনীতিতে তার সভারেইনটি একক ও অবিভক্ত।

এই কারণেই পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তানায়করা বরাবর এই দুইটি বিষয়ে কেন্দ্রের হাতে রাখিয়াই তাঁদের দাবি-দাওয়া প্রণয়ন ও পেশ করিয়াছেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়াও পূর্ব-বাংলার নেতারা আরেকটি বিষয় স্বেচ্ছায় কেন্দ্রকে দিয়াছেন। সেটি কারেন্সি বা মুদ্রা। ফেডারেশনে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকা অত্যাবশক নয়। বস্তুতঃ, মুদ্রা ছাড়া ফেডারেশন দুনিয়ায় আছে। কেবিনেট মিশন গ্রুপিং সিস্টেমে যে ভারতীয় ফেডারেশনের প্ল্যান দিয়াছিলেন এবং যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্ল্যানেও কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে ছিল না। তবু পূর্ব-বাংলার নেতারা মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় করিয়াছেন। তাঁরা এটাকে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতার সিম্বল হিসাবে রাখিতে চান।

এই তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় ইউনিটের হাতে থাকিবে। পূর্ব-বাংলার বেলা সে একাই এই ইউনিট। পূর্ব-বাংলার এ দাবি অন্যায়ও নয়, কেন্দ্রকে দুর্বল করার অভিপ্রায়ও এতে নাই। এর অতিরিক্ত আর কোন বিষয়েও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বত্ব ও স্বার্থ এক ও কমন নয়। সাধারণতঃ যে-সব বিষয় ফেডারেশনের হাতে থাকা উচিত এবং অন্যান্য ফেডারেশনে যে-সব বিষয় কেন্দ্রের হাতে আছে, তার মধ্যে যোগাযোগ, রেলওয়ে, ডাক ও তার, ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং, ইরিগেশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্ল্যানিং-এর নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ভৌগোলিক দ্বিধাবিভক্তির দরুন পাকিস্তানে এর একটাও কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে পারে না। সুখের বিষয় ও আশার কথা এই যে, খুব দেরীতে হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা এটা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিন বিষয়ের ফেডারেশন করিতে তাঁরা মোটামুটি রাযী হইয়াছেন। কোন-কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ কর ধার্যের ক্ষমতা লইয়া যেটুকু বিরোধ ও মতভেদ আজও দেখা যায়, জাতীয় ঐক্যবোধ ও বাস্তব জ্ঞান লইয়া সকলে আলোচনায় বসিলে সে-সব বিষয়েও সমঝোতা হইয়া যাইবে।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আগামী গণপরিষদ নিম্নলিখিত সমঝোতার ভিত্তিতে একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবে ঃ

(১) পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার সুনির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিশেষতঃ নৌবাহিনীর সদর দফতর চাটগাঁয়ে প্রতিষ্ঠার বিধানসহ দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ; এই তিন বিষয়ের ফেডারেশন হইবে। মনে রাখা দরকার, এই তিনটি বিষয় ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় স্বতঃই ফেডারেশনের এলাকায় থাকিবে, যথা ঃ ফেডারেল কোর্ট, ফেডারেল লেজিস্লেশন, ফেডারেল ইলেকশন, ফেডারেল ফাইনান্স, ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন ইত্যাদি। ট্যাক্স আদায়ের ক্ষমতা

ফেডারেশনের হাতেই থাকুক আর ইউনিটের হাতেই থাকুক, ফেডারেশনের প্রয়োজন মাফিক আয়ের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকিবেই। সে আয় পরিচালন ও বাজেট করিবার জন্য ফেডারেশনের ফাইনান্স মিনিস্ট্রিও থাকিবেই। শাসনতান্ত্রিক বিধানের ব্যাখ্যা, ফেডারেশন ও ইউনিটের মধ্যকার বিতর্কের বিচার করা ছাড়াও ফেডারেল কোর্ট পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত আপীল আদালত হইবে।

(২) ঐ তিনটি বিষয় বাদে অবশিষ্ট সব বিষয় ফেডারেটিং ইউনিটের হাতে থাকিবে। পূর্ব-বাংলার ইউনিটটি হইবে এক টায়ারের। পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিট হইবে দুই টায়ারের। পূর্ব-পাকিস্তানে এক চেম্বারের আইন পরিষদ, মন্ত্রিসভা, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট থাকিবে। হেড-অব দি স্টেট হইবেন গভর্নর। ইউনিটের নাম হইবে স্টেট।

(৩) পশ্চিম পাকিস্তানে সবগুলি প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত হইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যেসব বিষয় প্রাদেশিক তালিকায় ছিল, সেগুলি এবং দরকার মত আরও কিছু বিষয় ঐসব প্রদেশের বিষয় হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে আইন পরিষদ, মন্ত্রিসভা ও হাইকোর্ট থাকিবে। প্রদেশগুলির হেড্ অব দি স্টেট হইবেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর। প্রদেশগুলির নাম হইবে প্রভিন্স।

(৪) পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলি প্রদেশের সমন্বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ফেডারেল ইউনিট হইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এবং '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের যে-সব বিষয় ফেডারেল ও কনকারেন্ট তালিকাভুক্ত ছিল, কেন্দ্রের তিন বিষয় বাদে বাকি সবগুলি বিষয় পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটের বিষয় হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি ফেডারেল আইন পরিষদ, মন্ত্রিসভা ও সুপ্রীম কোর্ট থাকিবে। এই আইন পরিষদ সমস্ত প্রদেশের সমান-সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত হইবে। সুপ্রীম কোর্ট প্রাদেশিক-হাইকোর্টসমূহের আপীল আদালত হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের হেড অব দি স্টেট হইবেন গভর্নর। পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটের নাম হইবে স্টেট।

(৫) পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে স্থানান্তরিত হইবে। রাজধানীতে ফেডারেশন কোর্ট থাকিবে। নব-নির্মিত ইসলামাবাদ পশ্চিম পাকিস্তান স্টেটের রাজধানী হইবে।

উপরে যে কাঠামো দেওয়া হইল, এইটি বা এমনি ধরনের একটি প্ল্যানকে বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ধারিত সময়ের কম দিনেই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়া যাইবে।

ইত্তেফাক, ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৭০

৮

এল্ এফোর ছাঁচে ছয়-দফার বিচার

সুপ্রিম কোর্টের সাবেক চীফ জাস্টিস বিচারপতি মোহাম্মদ মুনির উপরোক্ত শিরোনামায় লাহোরের পাকিস্তান 'টাইমস'-এ একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি একাধিক ব্যাপারে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ হইলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর ও অসময়োপযোগী হইয়াছে। এই কারণে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

বিচারপতি মুনির প্রতিভাবান শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ব্যক্তি। পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতির সরকারী মর্যাদা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত মনীষার মর্যাদাও আছে। তিনি কতিপয় মূল্যবান আইন পুস্তকের রচয়িতাও বটেন। তিনি একজন উদার প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেশের প্রধান বিচারপতির অবসর জীবনে আবার সরকারী চাকুরি, বিশেষতঃ রাজনৈতিক পদ, গ্রহণ করা নীতিগতভাবে অবাঞ্ছনীয় হইলেও পাকিস্তানে এর নযির আছে। সেজন্য জাস্টিস মুনিরের পক্ষে আইয়ুব মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়াকে তাঁর চরিত্রের কলংক বলা যায় না। তাতে বড় জোর একথা বলা চলে যে, হয় তাঁর কোনও রাজনৈতিক মত নাই, অথবা তিনি প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সমর্থক। এসব সত্ত্বেও জাস্টিস মুনিরের আইনগত অভিমতের একটা নিজস্ব মূল্যও আছে। সে অভিমতের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধাও আছে। এমন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে দেশের বর্তমান সংকটকালে এমন কোনও কথা বলা উচিত নয়, যার দ্বারা শাসনতন্ত্র রচনার কাজ বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বিচারপতি মুনিরের আলোচ্য লেখাটা এমন ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে।

বিচাপতি মুনির তাঁর এই নিবন্ধে মোটামুটি পাঁচটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এক, আওয়ামী লীগের ছয়দফা প্রেসিডেন্টের এল. এফ. ও-বিরোধী। দুই, এই ছয়-দফার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। কারণ তার দুইটি ভিন্ন মযমুন কাগজে ছাপা হইয়াছে। তিন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেজরিটি আঞ্চলিক মেজরিটি মাত্র। পশ্চিমাঞ্চলে তাদের কোনও প্রতিনিধি নাই। চার, গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইলে শুধু পূর্বাঞ্চলের মেজরিটিতে তা করা চলিবে না। পাঁচটি প্রদেশ হইতেই মেজরিটি মেম্বরের সমর্থন পাইতে হইবে। পাঁচ, মাত্র তিনটি বিষয় লইয়া কোনও ফেডারেশন চলিতে পারে না। আওয়ামী লীগ নিজেরাই যখন কেন্দ্রীয় সরকার চালাইতে যাইতেছেন, তখন এত দুর্বল কেন্দ্র তাঁরা চাহিতেছেন কেন?

দেখা যাইতেছে, বিচারপতি মুনিরও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দেখাদেখি পাঁচ দফা খাড়া করিয়াছেন। পয়লা দফায় তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছয় দফা এল্. এফ্. ও'র ২০ ধারার ৪ উপধারার বিরোধী। এই ৪ উপধারায় বলা হইয়াছে: 'ফেডারেল সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে বিধান প্রণয়ন, শাসনযান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ সমস্ত ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে, যাতে ঐসব ব্যাপারে প্রদেশসমূহের সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন থাকে বটে, তবে ফেডারেল সরকারেরও নিজের দায়িত্ব পালনের উপযোগী বিধান বিষয়ক, শাসনযান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিবে। বিচারপতি মুনির মনে করেন, ছয়-দফায় ফেডারেল সরকারকে প্রত্যক্ষ 'কর ধার্যের' ক্ষমতা না দেওয়াটাই এল্. এফ্. ও'র এই বিধানের বিরোধী। কারণ প্রত্যক্ষ কর ধার্যের ক্ষমতা না থাকিলে এল্. এফ্. ও-বর্ণিত 'যথেষ্ট' ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের থাকে না। বিচারপতি মুনিরের এটা নিজস্ব অভিমত। এল্. এফ্. ও'র ঐ উপধারায় বা অন্য কোথাও 'পরোক্ষ' বা 'প্রত্যক্ষ' কোনও কর ধার্যের ক্ষমতার কথা নাই। এল্. এফ্. ও'তে আছে অর্থনৈতিক 'যথেষ্ট ক্ষমতার' কথা। সোজাসুজি নাগরিকদের উপর ট্যাক্স না বসাইলেই সরকারের ক্ষমতা 'অযথেষ্ট' হইয়া যায়, বিচারপতি মুনির এটা দেখাইতে পারেন নাই। ফেডারেল সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর প্রয়োজনীয় ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা পাইলে সেটা 'অর্থনৈতিক যথেষ্ট ক্ষমতা' হইবে না, এটাও বিচারপতি মুনির দেখাইতে পারেন নাই।

আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ মুজিবের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আলোচনায় দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়াও বিচারপতি মুনির বুঝিতে চাহেন নাই যে, ছয়-দফা ও এল্. এফ্. ও'র মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, দুই পক্ষের এক পক্ষ পিছু হটিয়াছেন। কথাটা আওয়ামী লীগ-নেতার প্রতি সুস্পষ্ট কটাক্ষ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর এল্. এফ্. ও. ঢিলা করিতে পারেন না। অতএব ইংগিতটা এই যে, শেখ মুজিবই ছয়-দফা কিছুটা ঢিলা করিয়াছেন। দেশের সর্বপ্রধান পার্টির নেতার প্রতি এমন বিরূপ কটাক্ষ করা বিচারপতি মুনিরের মত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। সাবেক বিচারপতির পক্ষে হঠাৎ রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ হওয়ার চেষ্টার বিপদ এইখানে।

তার দ্বিতীয় দফায় তিনি আইনজ্ঞ সাবেক বিচারপতি হিসাবেও ভুল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ছয়-দফায় তিনি দুইটি টেক্স্ট দুইটি খবরের

কাগজে পড়িয়াছেন। একটি উর্দু দৈনিক, অপরটি ইংরাজী দৈনিক। একটিতে ছয়-দফার পয়লা দফায় 'লাহোর প্রস্তাব-ভিত্তিক' স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হইয়াছে। অপরটিতে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ নাই। এটাকেই তিনি ছয়-দফার স্ববিরোধিতা বলিয়াছেন। আমি এখানে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, একজন সাবেক বিচারপতি সাক্ষ্য আইনের মূলনীতির কথা ভুলিয়া গেলেন কিরূপে? প্রাইমারি এভিডেন্সের খোঁজ না করিয়াই সেকেন্ডারি এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি রায় দেওয়া সংগত বিবেচনা করিলেন কেমন করিয়া? আওয়ামী লীগ অফিস হইতে ইংরাজীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ছয়-দফার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিমা ভাইদের বুঝিবার জন্যই এটা করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ পুস্তক বিতরণও করা হইয়াছে প্রচুর। তাতে ইতিমধ্যেই জাস্টিস মুনিরের মত পণ্ডিত ব্যক্তির হাতে তার এক কপি পড়ার কথা। তা যদি নাও হইয়া থাকে, তবু ছয়-দফা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া তার একটি অথারাইযড্ ভার্শন যোগাড় করা উচিত ছিল। ইচ্ছা করিলেই তিনি তা পারিতেনও। পিণ্ডি-লাহোর-করাচিতে আওয়ামী লীগের শাখা অফিস বিদ্যমান আছে। এ সব সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া বিচারপতি মুনির খবরের কাগজে প্রকাশিত, তাও আবার উর্দু তরজমা, ছয়-দফার টেক্স্টের ভিত্তিতে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিয়া তিনি সাবেক বিচারপতির যোগ্য কাজ করেন নাই।

তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ দফা দুইটি আরও মারাত্মক। তিনি আওয়ামী লীগের মেজরিটিকে আঞ্চলিক মেজরিটি বলিয়া শুধু উড়াইয়াই দেন নাই, শাসনতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতার তিনি এল্. এফ্. ও-তে নাই, এমনসব নতুন শর্তও জুড়িয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, পাঁচ প্রদেশের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মেজরিটির সমর্থন না পাইলে শাসনতন্ত্র শুদ্ধ হইবে না। ন্যায়নীতির দিক দিয়া কথাটা সমর্থনযোগ্য হইলেও আইনের দিক হইতে এই মত শুধু ভ্রান্ত নয়, বিপজ্জনকও বটে। কথাটা পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ খেলাফ। সকল প্রদেশের মেজরিটির সমর্থন না পাইলে কেন্দ্রীয় পরিষদে যদি কোনও আইন পাশ হইতে না পারে, তবে এমন কেন্দ্রীয় পরিষদের দরকারই কি? বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের মত লইয়াই কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় আইন রচনা করিতে পারেন। বলা যাইতে পারে, শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন নয়। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন রচনার ভিত্তির মৌলিক আইনগত পার্থক্য কি? পূর্ব বাংলার মেজরিটি যদি আঞ্চলিক মেজরিটি হয়, তবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার অর্থ কি? মেজরিটি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানী মেম্বররা যদি কোনও আইন রচনা করিতে না পারেন, তবে এমন মেজরিটির সার্থকতা কোথায়? শুধু পূর্ব পাকিস্তানী এই

দোষে যদি আওয়ামী লীগ পাকিস্তান শাসন করিতে না পারে, তবে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী এই দোষে আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনী এতদিন পাকিস্তান শাসন করিতে না পারা উচিত ছিল। জাস্টিস মুনিরের মত বিচারকের মনেও এই উপলব্ধি ঘটে নাই। পাকিস্তানের সবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যে পশ্চিমাঞ্চলে, এর ফলে কারও ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যে পূর্বাঞ্চলের উপর অবিচার হইতে পারে এমন কথা বিচারপতি মুনিরের মনেও পড়ে নাই। পূর্ব পাকিস্তানীরা যেসব অবিচারের অভিযোগ করিয়া থাকে, তাতেও বিচারপতি মুনিরের সন্দেহ আছে। যদি কিছু অবিচার হইয়াও থাকে, তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা তা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছে, এটাই জাস্টিস মুনিরের মত। পাকিস্তানের অখণ্ডতায় কারা বিশ্বাস করেন না ; আঞ্চলিক স্বার্থকেই কারা পাকিস্তানের স্বার্থ মনে করেন, জাস্টিস্ মুনিরের এই মতই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ব বাংলা-ভিত্তিক মেজরিটি পার্টি আজও কেন্দ্রীয় সরকার হাতে পায় নাই, আজও কেন্দ্রীয় দফ্‌তরের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক দফ্‌তরের সবগুলি বড় চাকুরি পূর্ব পাকিস্তানী দিয়া ভরিয়া ফেলে নাই। তেমন ইচ্ছা যে আওয়ামী লীগের আছে, এমন কথাও কেউ বলে নাই। আওয়ামী লীগ গণপরিষদে তাদের মেজরিটি বলে দেশে একটি শাসনতন্ত্র যদি দেয়ও, তবে সেটা শুধু এই কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণযোগ্য হইবে কেন ? সে শাসনতন্ত্র যদি আদর্শ গণতান্ত্রিক দলিল হয়, যদি তাতে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তান শোষণের অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের বড় প্রদেশ দ্বারা ছোট প্রদেশ শোষণের স্বাধীনতা ও ব্যবস্থা না থাকে, বরঞ্চ যদি তেমন শোষণের বিরুদ্ধে সেফ্‌গার্ড থাকে, তবু পশ্চিম পাকিস্তানীরা তেমন উৎকৃষ্ট দলিল অগ্রাহ্য করিবেন কেন ?

এর একমাত্র সহজ কাণ্ডজ্ঞানী জবাব হইতে পারিত, লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে দুইটি রিজিওন হিসাবে গণ্য করিয়াছে। এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলেও দুই অঞ্চলকে পাকিস্তানের দুইটি অটনমাস ও সভারেইন ইউনিট মানিতে হইবে। একমাত্র এই সভারেইনটি মানিয়া লইলেই পাকিস্তান ফেডারেশনের শাসনতন্ত্রের বেলা দুই ইউনিটের সম্মতি দরকার হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও নেতাই লাহোর প্রস্তাব মানেন না। পাকিস্তানের দুই উইংকে তাঁরা কেউ দুই রিজিওন বলেন না। তাঁরা বলেন, পাকিস্তানের ফেডারেটিং ইউনিট পাঁচটি প্রদেশ। এ অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রেজিওন্যাল অটনমি ও সভারেইনটি নয়। তা যদি হয়, তবে গোটা পাকিস্তানের মেজরিটি ভোটে আইন ও শাসনতন্ত্র রচিত হইবে না কেন ? সে মেজরিটি শুধু পূর্ব পাকিস্তানী বলিয়া কি ?

এই প্রসংগে জাস্টিস মুনির কেন্দ্রীয় পরিষদের সার্বভৌমত্বের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমান পরিষদের সার্বভৌমত্ব নাই। কথাটা বর্তমান আলোচনার জন্য নিতান্তই অবান্তর। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানী মেজরিটির বলে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে চাহিলেই পরিষদের সার্বভৌমত্ব নাই, আর পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের সম্মতি পাইলেই পরিষদ সার্বভৌমত্ব আছে, ব্যাপারটা তা নয়। তবু আওয়ামী লীগকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের সম্মতি লইবার উপদেশ দিতে গিয়া জাস্টিস মুনির পরিষদের সার্বভৌমত্বের অভাবের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্যটা অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। কথাটা যেভাবে যত ঘুরাইয়াই বলা হউক না কেন, পাকিস্তানের 'অবিভাজ্যতা ও অখণ্ডতা' লইয়া পশ্চিমা ভাইরা তেইশটা বছর এত গলাবাযি করিবার পরও সত্যসত্যই তাঁরা ঐ অবিভাজ্যতা ও অখণ্ডতায় বিশ্বাস করেন কিনা, আল্লার কুদ্রতে তারই আজ পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে।

পাঁচের দফায় জাস্টিস মুনির বলিয়াছেন, তিন বিষয়ে কোনও ফেডারেশন চলিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, তিন বিষয়ের ফেডারেশনের কোনও নযির দুনিয়াতে নাই। আওয়ামী লীগও জবাবে বলিতে পারে, দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানের দুইটি দেশ লইয়া এক রাষ্ট্র করিবার নযিরও দুনিয়ায় আর নাই। জাস্টিস মুনির বলিয়াছেন, আমাদের পড়শী ভারতে বহু ধর্ম, জাত, ভাষা ও কৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সেখানে ৯৭টি কেন্দ্রীয় বিষয় এবং ৪৭টি যুক্ত এলাকার বিষয় রাখা হইয়াছে। ভারত ভৌগোলিক অখণ্ডতার দেশ এবং সেদিক হইতে পাকিস্তানের সাথে তার কোনও তুলনা হয় না, একথা জাস্টিস মুনির নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তবু যখন তিনি ভারতের কথাটা তুলিয়াছেন, তখন এ কথাটাও তাঁর স্মরণে পড়া উচিত ছিল যে, ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপিং সিস্টেমের প্রস্তাবে তিন বিষয়ের ভারতীয় ফেডারেশনের কথা বলা হইয়াছিল। কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল।

জাস্টিস মুনির আরও বলিয়াছেন যে, আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবই যখন প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন এবং আওয়ামী লীগই যখন কেন্দ্রীয় সরকার শাসন করিতে যাইতেছে, তখন এত কম বিষয়ের দুর্বল কেন্দ্র তাঁরা কেন চাহিতেছেন? পশ্চিমা নেতাদের আরও অনেকে জাস্টিস মুনিরের মতই এই প্রশ্নটা করিয়াছেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পশ্চিমা নেতা ও চিন্তানায়করা পূর্ব-পশ্চিমের আঞ্চলিক সমস্যাটা আজও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁরা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতেই বিষয়টার বিচার করিতেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থ বণ্টনের দিকটা মোটেই বিচার করিতেছেন না। কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যয়ের সবটুকু সেখানেই হইতেছে। কেন্দ্রীয়

সরকার পিণ্ডিতে রাখিয়া যদি সে সরকার শুধু পূর্ব পাকিস্তানীরাই চালায়, তবু সরকারী ব্যয় সবটুকু পশ্চিমেই হইবে। এমন সরকার পরিবর্তনে আঞ্চলিক আর্থিক বৈষম্য দূর হইবে না। সেটা করিতে গেলে হয় কেন্দ্রীয় রাজধানী ঢাকায় আনিয়া সরকারী ব্যয় পূর্বাঞ্চলে করিতে হইবে, অথবা সরকারী খরচা সর্বনিম্ন পরিমাণে নামাইয়া শাসনতান্ত্রিক ও উন্নয়নমূলক সমস্ত রাষ্ট্রীয় খরচা উভয় অঞ্চলে বিতরণ করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। আওয়ামী লীগের ছয়-দফার একমাত্র উদ্দেশ্য তাই। এরই ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধানের একটা অপূর্ব সুযোগ আজও আসিয়াছে। এটাকে ব্যাহত বা বিঘ্নিত করা কোনও দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীর উচিত নয়।

ইত্তেফাক, ২৫শে জানুয়ারী '৭১

৯

জাতীয় স্বকীয়তার সন্ধানে পাকিস্তান

আজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাইশা জন্ম-বার্ষিকী। কিন্তু পাকিস্তানী জাতির কত জন্ম-বার্ষিকী? পাকিস্তানের পয়দায়েশ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। পাকিস্তানী জাতির জন্ম কবে? আজ এই প্রশ্নই উঠিয়াছে সোজাসুজিঃ পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাকিস্তানীরও কি জন্ম হইয়াছে? কবে? কোথায় তারা? পাকিস্তানে ত পাকিস্তানী দেখি না! সবাই ত দেখি বাইরে, বিদেশে, পাসপোর্টে। অর্থাৎ আমরা আজও কাগজী পাকিস্তানী। লিখি। বলি না। ভাবি না।

তবু এটা শরমের ব্যাপার নয়। আমরা পাকিস্তানবাসীরা আজো পাকিস্তানী জাতি হইয়া যাই নাই, এটাও লজ্জার কথা নয়। লজ্জার কথা এই যে, বাইশ বছরেও আমরা পাকিস্তানী জাতি গঠনের কাজ শুরুই করি নাই। দুনিয়ায় নয়া-পুরান অনেক রাষ্ট্র আছে, যারা জাতি মুখে লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। অনেক রাষ্ট্র আছে, যারা আগে জাতি, পরে রাষ্ট্র। কিন্তু এমন রাষ্ট্রও অনেক আছে, যারা আগে রাষ্ট্র, পরে জাতি। পাকিস্তান এই দ্বিতীয় কেটিগরির রাষ্ট্র। দুইটা বিশ্ব-যুদ্ধের, বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, পরিণাম-স্বরূপ আফ্রো-এশিয়ার বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন-মুক্ত হইয়া নয়া রাষ্ট্র-রূপ লাভ করিয়াছে। এরা সবাই কম-বেশী পাকিস্তানের সমবয়সী। এদের মধ্যে ত ঐ 'আগে রাষ্ট্র পরে জাতি' শ্রেণীর দেশ আছেই; এক শ বছরের পুরান কয়েকটি রাষ্ট্রও এই কেটিগরিতে পড়ে। তারাও আগে 'স্টেট' লাভ করিয়াছিল, পরে 'নেশন' হইয়াছে।

এই দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের দিকে নযর বুলাইলেই এটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এক শ্রেণীর রাষ্ট্রের লোকেরা আগে হইতেই এক-একটা পৃথক সত্তা-বিশিষ্ট জনসমষ্টি ছিল। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের বিচারে তাদেরে নেশন, ন্যাশনালিটি, রেস, গোষ্ঠী, পিপল, উপজাতি বা ট্রাইব, যাই বলা হউক না কেন, জাতি হিসাবে তাদের একটা পরিচয়, অবস্থিতি, আইডেনটিটি ও স্বকীয়তা আগে হইতেই ছিল। তাদের একটা কমন দেশ, একটা কমন ধর্ম, কমন ভাষা, কমন সমাজ ও কৃষ্টি ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরাধীনতাহেতু তাদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র ছিল না। যেদিন তারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হাসিল

করিয়া নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছে, সেইদিনই তাদের রাষ্ট্র সত্য-সত্যই নেশন-স্টেট হইয়াছে এবং তাদের জাতিও রাষ্ট্রীয় জাতি, স্টেট-নেশন হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের লোকেরা ঐরূপে কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠী ছিল না। এদের মধ্যে কারও কমন দেশ ছিল ত ধর্ম ছিল না; ধর্ম ছিল ত ভাষা ছিল না। অবস্থা-বিশেষে কোনও এক স্বার্থ বা প্রয়োজনের খাতিরে কোনও একটা কমন উদ্দেশ্য ও দাবিতে কোনও এক কমন দুশমনের বিরুদ্ধে লড়িয়া নিজেদের রাষ্ট্রীয়, ধর্মিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছে। এই রাষ্ট্রের সাফল্য ও স্থায়িত্বের তাকিদে তারা কালক্রমে ও ধীরে-ধীরে এক জাতিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রই সমান মর্যাদায় বিশ্ব-জাতিসংঘ 'ইউনাইটেড নেশনসের' স্বীকৃতি ও মেম্বরশিপ লাভ করিয়াছে। মেম্বর হইয়াছে তারা নেশন-স্টেট বা জাতি-রাষ্ট্র হিসাবেই। তার মানেই এদের সবারই স্টেট-হুডের বুনিয়াদ টেরিটরিয়াল ন্যাশনালিযম। অতএব এরা সবাই সেকিউলার স্টেট, কেউই ইডিওলজিক্যাল স্টেট নয়। সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতির বুনিয়াদও তাই।

জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিলেও এইসব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সে রাষ্ট্র কায়েম করিবার আগে হইতেই সুগঠিত জাতি ছিল, তা নয়। বরঞ্চ রাষ্ট্র গঠন করিবার পরে, বহু পরে, কালক্রমে এইসব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা রাষ্ট্র-জাতিতে বা স্টেট-নেশনে উন্নীত ও গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইটালি এবং নয়া রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তান ও ইসরাইলকে এই শ্রেণীর জাতি-রাষ্ট্র বলা যায়। এইসব ক্ষেত্রে জাতি রাষ্ট্র কায়েম করে নাই; রাষ্ট্রই জাতি গঠন করিয়াছে। মার্কিন বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য বিচার করিলেই আমরা এটা বুঝিতে পারি। মার্কিন বিপ্লব মার্কিন জাতি সংগঠন করিয়াছে। আর ফরাসী জাতি ফরাসী বিপ্লব সংগঠন করিয়াছে।

পাকিস্তান বিপ্লবও তেমনি আগে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই রাষ্ট্রের মাধ্যমেই পাকিস্তানী জাতি সৃষ্টি হইবার কথা। মার্কিন জাতি ও রাষ্ট্রের গঠন, উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ দুনিয়ার সকল নয়া রাষ্ট্রীয় জাতির অনুকরণযোগ্য এক মহান আদর্শ। বর্তমান বিশ্বে নেশন-স্টেট ছাড়া অন্য কোন রং-এর রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। তাই ইউনাইটেড নেশনসের স্বীকৃতি ও মেম্বর-শ্রেণীভুক্ত সব রাষ্ট্রই কাগজ-পত্রে জাতি-রাষ্ট্র বা নেশন স্টেট। এই কাগজী নেশন-স্টেটকে সত্যকার নেশন-স্টেটে রূপান্তরিত ও উন্নীত করাই বর্তমান দুনিয়ায় রাজ-

নৈতিক উন্নয়নের বড় লক্ষণ ও নির্ভুল প্রমাণ। বস্তুতঃ 'আগে জাতি পরে রাষ্ট্র' শ্রেণীর চেয়ে 'আগে রাষ্ট্র পরে জাতি' শ্রেণীর নেশনই পরিণামে অধিকতর জমাট-বাঁধা সচেতন জাতি বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। প্রথম শ্রেণীর জাতিসমূহকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতিসমূহের মত প্রারম্ভিক বিরোধ ও সংঘাতের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তারা মোটামুটি একই ধর্মবিশ্বাসী, একই ভাষাভাষী, একই রেস বা গোষ্ঠী জাতি হইতে এক রাষ্ট্র-জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাদের ধর্ম, কালচার ও ভাষায় আন্তর্জাতিক কোনও বিরোধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কোনও সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয় নাই। সোজা এক লাফে তারা রাষ্ট্রহীন এক জাতি হইতে রাষ্ট্রাধিকারী এক জাতিতে উন্নীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক রাষ্ট্রকে ধর্মিক, ভাষিক ও কৃষ্টিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ন্যাশনালিটি হইতে নেশনে পরিণত হইতে হইয়াছে। ফলে গোড়াতেই তাকে আন্তর্জাতিক বিরোধের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সে বিরোধকে আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যের রূপে জাতীয় শতদলের ভূষণ করিয়াছে। সুতরাং এমন জাতির শিকড় বহু বিস্তৃত ও গোড়া মজবুত।

পাকিস্তানের অধিবাসীদের এমনি একটি জাতি হওয়ার কথা। দেশের নামেই সে জাতির পরিচয় হইবে। ইরানের ইরানী জাতি, আফগানিস্তানের আফগান জাতি, তুরস্কের তুর্কী জাতি, ইংলন্ডের ইংরাজ জাতি, ফ্রান্সের ফরাসী জাতির মতই আমাদের জাতীয় পরিচয় হওয়া উচিত পাকিস্তানী জাতীয়তা। কিন্তু তা হয় নাই। আমরা পাকিস্তানী জাতি নই। আমাদের পশ্চিমা শাসকদের মতে আমরা মুসলিম জাতি। তাঁদের যুক্তি এই ঃ

(১) আমরা 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তান চাহিয়াছি ও পাইয়াছি, তার মানে আমরা মুসলমানরা একটা স্বতন্ত্র পৃথক জাতি। এই মুসলিম জাতিত্ব ছাড়িয়া পাকিস্তানী জাতীয়তা ধরিলে পাকিস্তানের সব অমুসলমানদেরও আমাদের জাতির অংগ স্বীকার করিতে হয়। তা করিলে লজিকের ধাক্কাতেই পাকিস্তানের বুনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে। কাজেই আমরা ইসলাম-ভিত্তিক জাতীয়তা ছাড়িতে পারি না।

(২) ইসলামের মূলনীতি আনুসারে জীবন গঠন, ধারণ ও পরিচালনের সুবিধার জন্যই আমরা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য এই হোমল্যান্ড পাকিস্তান কায়েম করিয়াছি। কাজেই পাকিস্তান একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রের মত এটা ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। এখানে সেকিউলার ন্যাশনালিযম চলিবে না। আদর্শভিত্তিক না হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি অযৌক্তিক ও তার অস্তিত্ব অহেতুক হইয়া পড়ে।

বাহ্যতঃ লজিক্যাল ও যুক্তিপূর্ণ এই মতবাদ দুইটির বিচার দুইদিক হইতে

করা যাইতে পারে। এক, তর্কশাস্ত্রের নৈয়ায়িক দিক। দুই, রাজনীতির প্রাগমেটিক বাস্তব দিক। এই দুই-এর যে-কোনও দিক হইতেই একটু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় যুক্তির মধ্যেই বড় রকমের ফাঁকি বা ফ্যালাসি আছে। প্রথমতঃ, নৈয়ায়িকের দিক হইতেই যুক্তি দুইটির বিচার করা যাক। দ্বিজাতি তত্ত্বের কথাটা পাকিস্তান দাবিতে মুসলমান পক্ষের কথা। সুতরাং মামলার বাদীপক্ষের আরযির যুক্তি। পাকিস্তান দাবির বিরোধীরা ছিল ঐ মোকদ্দমার বিবাদী পক্ষ। তারাও মুসলমান পক্ষের আরযির প্রতিবাদে জবাব দাখিল করিয়াছিল। সে জবাবে পাকিস্তান-বিরোধীরা দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে। মোকদ্দমায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে, যাকে বলে হট্‌লি কন্‌টেস্টেড্‌। বিবাদীর জবাবের রদ্দে-জবাব, তার আবার রদ্দে-জবাব হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে সাক্ষী-সাবুদ ও সওয়াল-জবাব পেশ করা হইয়াছে। অবশেষে মামলার, রায় ডিক্রি হইয়াছে। বাদীপক্ষ তরমিম ডিক্রি পাইয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সুতরাং যে রায় ও ডিক্রির বলে পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে, সেই রায় ও ডিক্রির উক্তি ও যুক্তিই আসল কথা। বাদী-বিবাদীর আরযি-জবাবের উক্তি ও যুক্তি আসল কথা নয়। সেটা আমাদের বিচার্যও নয়।

সকলেই জানে সেই রায় ও ডিক্রিতে মুসলিম বাদীপক্ষের দ্বিজাতি তত্ত্ব স্বীকৃত, গৃহীত ও প্রযুক্ত হয় নাই। সোজা কথায় দ্বিজাতি তত্ত্ব অগ্রাহ্য বা ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ভারতের অধিবাসীরা ভাগ হয় নাই। আদম-এওয়ায হয় নাই। ভারতের ভূখণ্ড ভাগ হইয়াছে মাত্র। সে ভাগ দুই পক্ষই মানিয়া লইয়াছে। একই বেতারের মুখে দাঁড়াইয়া দুই পক্ষের নেতারা সে মাটি-বাটোয়ারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁর-তাঁর পক্ষের লোককে তা মানিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন। সে নির্দেশে তাঁরা বলিয়াছেনঃ হে হিন্দু ও হে মুসলমান, তোমরা যার-তার জন্মভূমি ত্যাগ করিও না। যে যেখানে আছ, সেইখানেই থাক। নয়া দুই রাষ্ট্র কায়েম হইল বটে, কিন্তু কোনটাই শুধু হিন্দুর বা শুধু মুসলমানের নয়। উভয় রাষ্ট্রই হিন্দুর ও মুসলমানের।

এইভাবে দেশ বাটোয়ারায় মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব স্পষ্টতঃই বাতিল ও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কাজেই, পাকিস্তানী রাজনীতিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উত্থাপন শুধু অবান্তর নয়, পাকিস্তানী মুসলমানের প্রতি, পাকিস্তানী অমুসলমানের প্রতি এবং খোদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায়, অসংগত ও অবিচারমূলক। দেশ ভাগ হওয়ার পর, সীমাসরহদ্দ ঠিক করার বাদে, ঐ পরিত্যক্ত ইশুর পুনরুত্থাপন পাকিস্তানী মুসলমানদের প্রতি অন্যায়-অবিচারমূলক এই জন্য যে, তাতে ভারতে ফেলিয়া-আসা পাঁচ কোটি মুসলমানকে পাকিস্তানে

স্থান দিতে হইবে। অমুসলমানদের প্রতি অন্যায়-অবিচারমূলক এই জন্য যে, নিজের দেশের জাতীয়তায় তাদের স্থান না হওয়ায় দেশের বাইরে তাদের জাতীয়তার সন্ধান করিতে হইবে। খোদ পাকিস্তানের উপর অন্যায়-অবিচার-মূলক এই জন্য যে, সম্পদ ভাগের পর অতিরিক্ত নয়া দায়িত্ব এই নয়া রাষ্ট্রের কাঁধে চাপান হইবে।

নৈয়ায়িকের বিচারে ঐ দিককার দ্বিতীয় যুক্তিটাও টিকে না। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে পাকিস্তানী মুসলমানদের জীবন গঠন ও যাপন করিবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেই তাতে পাকিস্তানকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হইতে হইবে কেন? পাকিস্তান একটা মুসলিম সংখ্যাগুরু গণতান্ত্রিক দেশ; এইটুকুই মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত গ্যারান্টি। এর অতিরিক্ত যা-কিছু করা হইবে, তাতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলিম সমাজের এবং ইসলাম ধর্মের ক্ষতি হইবে। কালক্রমে অনেক অসমাধ্য জটিলতার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছিঃ (১) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে একদিকে পাকিস্তানী মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে; অপর দিকে ধর্ম-বিশ্বাসের মত ঈমান ও আকিদার বস্তুকে ভোটাভুটির বিষয়ে পরিণত করিয়া পাকিস্তানে ইসলাম ধর্মকে হাস্যাস্পদ করা হইবে। (২) অমুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। শুধু মুসলমানদের প্রতিই এই হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ থাকিবে। যে-সব বিদেশী মুসলমান কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক ব্যাপারে পাকিস্তানে অবস্থান করিবেন, তাঁরাও ধর্মীয় ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মানিতে বাধ্য থাকিবেন না। '৫৬ ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্র দুইটিই 'ইসলামিক'। তাতেও ঐ ব্যতিক্রম স্বীকৃত হইয়াছে। আইন ও ট্যাক্সের ব্যাপারে অমুসলমানদিগকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। ঠিকই করা হইয়াছে। ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রে এটা হইতে বাধ্য। তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বজনীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঐ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য।

এইবার আসুন, যুক্তি দুইটিকে রাজনৈতিক প্র্যাগমেটিক বাস্তবের মাপ-কাঠিতে বিচার করা যাক। ভারতের দুইটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরোধ মিটাইবার পন্থা হিসাবে ভারতবর্ষে দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করা হইয়াছে, যার একটি মুসলিম-মেজরিটি, অপরটি হিন্দু-মেজরিটি। রাজনৈতিক চেক্স এণ্ড ব্যালেন্স-অব-পাওয়ারের মাধ্যমে এই উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটি নিরাপদ হইয়াছে। কিন্তু এক শর্তেঃ উভয় রাষ্ট্রকেই সেকিউলার গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র হইতে হইবে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, এক রাষ্ট্রে ধর্মের ডাক অপর রাষ্ট্রে প্রতিধ্বনিত হইতে বাধ্য। পাকিস্তানের 'ইসলামী রাষ্ট্রের'

জবাব ভারতের 'রামরাজ্য'। এই উভয় ডাক উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটির আতংকের কারণ। পক্ষান্তরে, এই হুংকারের বদলে গণতান্ত্রিক আওয়ায যত জোরদার হইবে, উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটি তত নিশ্চিন্ত, শান্ত, অনুগত ও সক্রিয় নাগরিক হইবে। সংগে-সংগে দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার অনেক সমস্যা মিটিয়া যাইবে। দেশরক্ষা খাতে বাজেটের শতকরা ষাট টাকা খরচ না হইয়া সে টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে। সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক যাতায়াত, ভারতের উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে রেল চলাচল ইত্যাদি বহু ব্যাপারে পাক-ভারতের যুক্ত প্রকল্প ও প্রচেষ্টা দুই দেশের অচিন্তনীয় উন্নয়ন বিধান করিতে পারিবে। বস্তুতঃ এটাই ছিল স্পিরিট-অব-পার্টিশন। আপোসে দেশ ভাগ করিয়া দুই রাষ্ট্র কায়েম করতঃ জনগণের এইসব কল্যাণ সাধনই ছিল সে স্পিরিটের মূলকথা। একই রাষ্ট্রে চিরস্থায়ী দুই জাতির চিন্তা সে স্পিরিটের ধারে-কাছেও ছিল না।

তারপর থাকিল পাকিস্তানের আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ার কথা। যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁরা ভৌগোলিক সীমাহীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববাদের কথাই ভাবেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সত্যই বিশ্বে একটা নযিরহীন অবদান। দেশী-বিদেশী, রাজা-প্রজা, চাকর-মনিব ও কালা-ধলায় এমন সমান মানবিক মর্যাদা আর কোনও ধর্ম দিতে পারে নাই। সে মানবতাবোধ ভৌগোলিক সীমা ডিংগাইয়া যায়। ওটা ইসলামের বিরাটত্ব। কিন্তু ওটাকে যথাস্থানে রাখিয়া মানুষের কল্যাণ করিতে দেন না কেন? কেন তাকে রাজনৈতিক টেরিটরিয়ালিয়মের সাথে পাল্লা দিতে আনেন? রাজনৈতিক জাতীয়তা ভৌগোলিক হইতে বাধ্য। এটা শুধু একটা অনুভূতি নয়। নাগরিকতায় প্রসারিত হইয়া তাকে দায়িত্ব ও অধিকার-বোধে জমাট বাঁধিতে হয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রানুগত্যকে দাম্পত্য প্রেমের মতই একনিষ্ঠ হইতে হয়। সেখানে শরিকের জায়গা নাই। রাষ্ট্রানুগত্যে এক্সট্রাটেরিটরিয়াল আনুগত্যের জায়গা নাই। কারণ এই আনুগত্যে কোনও অস্পষ্টতা নাই। ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের প্রচলন ও প্রয়োগ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত ও অন্যান্য সংস্থা আজ জাতীয়তার ও আন্তর্জাতীয়তার মধ্যে পারস্পরিকতা স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। জাতীয়তার পথেই আজ আন্তর্জাতীয়তায় যাইতে হয়। জাতীয়তা ডিংগাইয়া আন্তর্জাতীয়তায় যাওয়া যায় না। হাজার উঁচা আদর্শের নামেও জাতীয়তার সীমা ডিংগাইলে সেটা হয় আজকাল সম্রাজ্যবাদ। গত যুগের প্যাপাসি, খিলাফত, প্যান-খৃষ্টিয়ানিটি ও প্যান-ইসলামের কথা না হয় নাই তুলিলাম, জাতীয়তার দামন যে আধুনিক দুশমন অবাধ বাণিজ্য-নীতির পতাকাবাহী আন্তর্জাতিক-

ক্যাপিটালিযম ও 'দুনিয়ার মযদুর এক হও' বাণীবাহক আন্তর্জাতিক কমিউনিযম, তারাও ভৌগোলিক জাতীয়তার পাথর-ঘাটায় আটকাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং পাকিস্তান আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র বলিয়া যাঁরা দাবি করিতেছেন, তাঁরা যত শীঘ্র এটা ভুলিয়া যান, ততই মংগল।

তাছাড়া, এর দরকারই বা কি? রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে আর যাই রক্ষার দরকার হউক, ধর্ম রক্ষার দরকার হয় না। ধর্মই নিজেকে রক্ষা করে। কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়াই যে ভারতীয় মুসলমানরা অত প্রতিকূল অবস্থার মুখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল, তারাই পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক সংবিধান ছাড়া ইসলাম রক্ষা করিতে পারিবে না, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ধর্ম হিসাবে ইসলামের প্রতি আর মুসলমান হিসাবে পাকিস্তানীদের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না। মুসলিম জাতীয়তাবাদ শুধু মুসলমান ও ইসলামের জন্য অনাবশ্যক নয়, পাকিস্তানের জন্য মারাত্মকরূপে অনিষ্টকর। বস্তুতঃ এই ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তার মধ্যেই পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। একটু তলাইয়া বিচার করিলেই তা স্পষ্ট বুঝা যাইবে: (১) মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানের অমুসলমানদেরে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ হইতে আলগা রাখিতেছে। (২) আমরা জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাতে অমুসলমানদের যোগদানের আহবান করিতেছি না; তার বদলে মুসলিম লীগ ও অনুরূপ ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক পার্টি চালাইতেছি। (৩) মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানের ইসলামী আদর্শ রক্ষার নামে আমরা সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন দাবি করিতেছি। (৪) রাজনৈতিক সমস্ত আন্দোলন ও দেন-দরবার শুধু আমরা মুসলমানরাই করিতেছি। এক কোটির উপর অমুসলমান পাকিস্তানীকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতেছি। ফলে তারা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন ও সে সত্তা রক্ষার দাবিতে মুখর হইতে বাধ্য হইতেছে। তাদের মধ্যে যাঁরা অল্পদিন আগেও পৃথক নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই এখন পৃথক নির্বাচন-প্রথা দাবি করিতেছেন। করিবেনই ত! গোটা জাতীয়তায় যাদের স্হান নাই, দেশের রুলিং পার্টিতে যাঁদের প্রবেশাধিকার নাই, তাঁরা আত্মরক্ষার খাতিরে স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করিবেন না, তবে কে করিবে? ফলে ১৯০৯ সালে অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যে যে ভবিষ্যতের সূচনা হইয়াছিল, আজ পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেই প্রসেস শুরু হইয়াছে। পরিণাম ভিন্ন হইবার কারণ নাই।

যে মুহূর্তে আমরা পাকিস্তানের জাতীয়তাকে ধর্ম-ভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ মনে করি, সেই মুহূর্তে আমরা পাকিস্তানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পার্শি আরও চার চারটা জাতির অস্তিত্ব মানিয়া লই। তা যদি হয়, তবে একদিকে

জাতিসংঘের মানবীয় অধিকার আইনের বলে এইসব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না মানিবার কোনও যুক্তি থাকে না। অপরদিকে বিশ্বের ষাট কোটি মুসলমানের মধ্যে ইচ্ছুকদের জন্য পাকিস্তানের নাগরিকতা খোলা না রাখার এবং ইরান-আফগানিস্তানের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখা রাখারও কোনও যুক্তি থাকে না। অথচ তাতে একদিকে যেমন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও জাতীয় সত্তা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িবে, অপরদিকে সে অস্পষ্ট বাউন্ডারি রক্ষার জন্য কোনও মুসলিম হামলাকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা চলিবে না। পাকিস্তানবাসী অমুসলমানকে সে কাজে আসিতে বাধ্য করাও যাইবে না।

তারপর আরও দেখুন। পাকিস্তানে ধর্ম-ভিত্তিক পাঁচ জাতি যদি মানিয়া নেন, তবে ভাষা ও গোষ্ঠী-ভিত্তিক জাতীয়তা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবেই। যদি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের পৃথক জাতিত্ব মানিয়া নেন, তবে বাংগালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচী, সিন্ধী জাতিত্ব মানিবেন না কোন্ যুক্তিতে? বিভিন্ন অঞ্চলে বাসকারী বিভিন্ন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী এই সব জাতিকে একই রাষ্ট্রে বাঁধিয়া রাখিবার কমন সূত্রটা কি? বাধ্য হইয়াই জবাব দিতে হয়ঃ ইসলাম। অনেকেই এ জবাব দিতেছেন। প্রায় সবাই। কিন্তু জবাবটা ভ্রমাত্মক। ধর্ম রাষ্ট্রীয় বন্ধন মজবুত করে; রাষ্ট্রীয় বন্ধন সৃষ্টি করে না। অন্যান্য দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম, নিতান্ত লাগোয়া প্রতিবেশী ভারত, ইরান ও আফগানিস্তানের মুসলমানরা ইসলামধর্মী হইয়াও পাকিস্তানী জাতীয়তার অংশ নয়। তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের পাকিস্তানীদের মধ্যে আগে একটা রাষ্ট্রীয় বন্ধন সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যের দোহাই দিয়া গোষ্ঠী ও ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার অবসান করা যাইবে না। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, ধর্ম-ভিত্তিক আত্মীয়তার চেয়ে গোষ্ঠী ও ভাষা-ভিত্তিক আত্মীয়তা অনেক বেশী বাস্তব ও ঘনিষ্ঠ।

কাজেই পাকিস্তানকে অটুট, অখণ্ড ও পাকিস্তানবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে পারে একমাত্র পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ অবাস্তব, অক্রিয় ও দুর্লভ। দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দিকে একবার নযর বুলাইলেই তা বুঝা যাইবে। পাকিস্তানেও সেই সত্যই প্রমাণিত হইতেছে। মুসলিম জাতীয়তাবাদ ধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তা। গোষ্ঠী ও ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাকে সে চাপা দিতে পারিবে না। বরঞ্চ পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা যত বেশী বলা হইবে, গোষ্ঠী-ভাষা-দেশ-ভিত্তিক জাতীয়তা তত বেশী মুখর হইবে। পাকিস্তানের বাইশ বছরের জীবনেও আজো যে বাংগালী, পাঠান, সিন্ধী জাতীয়তা এত সোচ্চার, তার কারণ এই যে, অবাস্তব মুসলিম জাতীয়তাবাদ বাস্তব পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করিতেছে। মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা তুলিয়া আমরা পাকিস্তানকে বড় করি না; কিন্তু ইসলামকে ছোট করি। ধর্ম হিসাবে

ইসলামকে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এবং রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে ভৌগোলিক সীমার বাহিরে নেওয়ার চেষ্টার অর্থ ঠিক তাই।

ভারতের দশ কোটি মুসলমানের হোমল্যান্ড হিসাবেই পাকিস্তান দাবি করা হইয়াছিল, এটা ধরিয়া নিলেও এটা ভুলিলে চলিবে না যে, একদিকে যেমন ভারতের সব মুসলমানকে পাকিস্তানে স্থান দেওয়া হয় নাই, অপরদিকে তেমনি এক কোটির বেশী অমুসলমানকে এখানে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অতএব ভারতে ফেলিয়া-আসা ঐসব মুসলমানকে বাদ দিয়া এবং দেশে পাওয়া এই সব অমুসলমানকে লইয়া আমাদিগকে নয়া রাষ্ট্র ও নয়া জাতি গঠন করিতে হইতেছে। পাকিস্তান দেশ যেমন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর কমন শরীকি আশ্রয়স্থল মাতৃভূমি হইয়াছে, পাকিস্তান জাতীয়তাও হইবে তেমনি ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর আত্মিক আশ্রয় স্থান জাতীয় পরিচিতি, ন্যাশনাল আইডেন্টিটি। 'ধর্মে আমি মুসলমান' এই পরিচয়ে আপনি গৌরব বোধ করেন আপনার ধর্মকে আপনি গর্বের বস্তু মনে করেন বলিয়া। 'জাতিতে আমি পাকিস্তানী' এই পরিচয়েও আপনি গর্ব করিবেন, যদি আপনি 'পাকিস্তানী জাতীয়তা'কে গৌরবের বিষয় মনে করেন। ঠিক তেমনি আপনার প্রতিবেশী ধীরেন বাবু ধর্মে হিন্দু পরিচয়ে যেমন গৌরব বোধ করেন, জাতিতে তিনি পাকিস্তানী পরিচয়েও যেদিন তিনি গৌরব বোধ করিবেন, সেইদিন হইবে পাকিস্তানী জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ। সেদিন সকল পাকিস্তানবাসী পাকিস্তান নাগরিকতাকে মূল্যবান সম্পদ মনে করিবে। সে সম্পদ হারাইতে ভয় পাইবে। সযত্নে তা রক্ষা করিবে। পাকিস্তানী জাতি সেদিন বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু কৃষ্টি পেটে ধরিবার মত বিশাল উদার উন্নত শক্তিশালী গর্বিত জাতিতে পরিণত হইবে।

এই রাষ্ট্রীয় সাধনায় আমরা যেন ইসলাম ও পাকিস্তানকে সমান দামের এওয়ায-বদলের বস্তু মনে না করি। ইসলাম খোদার দেওয়া ধর্ম। পাকিস্তান মানুষের তৈরী রাষ্ট্র। ইসলাম রক্ষা করিবেন খোদা নিজে। পাকিস্তান রক্ষা করিতে হইবে পাকিস্তানবাসী মানুষ নিজেদেরই। ইসলাম রক্ষার জন্য পাকিস্তানের দরকার ছিল না, ভারতীয় মুসলমান রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের দরকার ছিল। পাকিস্তান হাসিলে আজ ভারতীয় মুসলমান নিরাপদ হইয়াছে। এই কারণেই পাকিস্তানকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া পাকিস্তান অমুসলমানের অনিরাপত্তার কারণ হইবে না। অখণ্ড ভারতে মুসলমানরা বিপন্ন ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে অমুসলমানরা তেমন বিপন্ন থাকিবে না।

এই উভয় দিক রক্ষারই একমাত্র পথ পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ। এরই সন্ধানে পাকিস্তান আজো অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে; না পাইলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

পূর্বদেশ, ১৪ই আগস্ট, '৬৯

১০

সোহ্‌রাওয়ার্দী-প্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র পথ

আজ ৫ই ডিসেম্বর। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু-বার্ষিকী। তিনি ছিলেন পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক। জাতীয় নেতা। তাঁর মৃতু-বার্ষিকী তাই জাতীয় শোকের দিন।

এটা শুধু সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভক্ত-অনুসারী আমাদের জন্যই সত্য নয়, গোটা জাতির জন্যও সত্য। রাজনৈতিক নেতার প্রজ্ঞার প্রমাণ শুধু তাঁর জনপ্রিয় মতবাদেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরঞ্চ গোড়ায় অজনপ্রিয় যে-সব মতবাদ পরবর্তীকালে দূরদর্শী প্রমাণিত হয়, তার মধ্যেই নেতৃত্বের প্রমাণ মিলে বেশী। আমাদের জাতীয় নেতা হক সাহেব ও শহীদ সাহেব উভয়ের বেলাই এ কথা সত্য। তাঁদের অনেক কাজকেই মত পরিবর্তন বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। তাঁর সাধের লাহোর প্রস্তাবের কদর্থ ও ভ্রান্ত প্রয়োগ করা হইতেছে, এই অভিযোগে হক সাহেব ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। সেই হক সাহেবই ১৯৫৬ সালে লাহোর-প্রস্তাব-বিরোধী শাসনতন্ত্র সমর্থন করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনেও এমন বিচ্যুতি আছে। আজ তাঁর এই স্মৃতি-দিবসে তারই কয়টির আলোচনা করিব। গভীরভাবে একটু তলাইয়া বিচার করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, পাকিস্তানকে একটি নেশন-স্টেট হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সোহ্‌রাওয়ার্দী-প্রদর্শিত পন্হাতেই সেটা সম্ভব। অন্য পথ নাই।

এ-সবের মধ্যে তাঁর ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লী-প্রস্তাব পেশ করা, ১৯৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার' পরিকল্পনা করা, এই দুইটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগের ঘটনা। পাক-ভারতের মাইনরিটি চার্টার রচনা, দুই উইং-এর মধ্যে প্যারিটি ও পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ান ইউনিট ও যুক্ত-নির্বাচন প্রথা এই কয়টি পাকিস্তান হওয়ার পরের ঘটনা। আগের ঘটনা দুটির একটা দিল্লী-প্রস্তাব পেশ করিতে রাযী হওয়ার দরুন প্রতিপক্ষেরা তাঁকে বাহ্‌বা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর ভক্ত অনুরক্তেরা নিরাশ হইয়াছিলেন। সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার দরুন ভক্ত-অনুসারীরা তাঁর তারিফ ও প্রতিপক্ষরা নিন্দা করিয়াছিলেন। আজ ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, ঐ উভয়টাতেই শহীদ সাহেবের পন্হা নির্ভুল ছিল। শুধু আমাদের বুঝিতে দেরি হইয়াছে। শহীদ সাহেবের মতই হক সাহেবের অনেক কাজই তৎকালে আমরা ভুল বুঝিয়াছিলাম। ও-সব কাজের জন্য তাঁর নিন্দাও করিয়াছিলাম। আজ এতদিন পরে

বুঝিতেছি, হক সাহেবের অনেক কথাই নির্ভুল ছিল। শহীদ সাহেবের বেলাও তাই। এটাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ যে নেতার মতবাদ বুঝিতে দেশবাসীর যত-বেশী সময় লাগে তিনি সেই অনুপাতে তত বড় নেতা।

পাকিস্তানের পরের ঘটনা তিনটির মধ্যে যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দরুন পশ্চিম পাকিস্তানে শহীদ সাহেবের নিন্দা ও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর প্রশংসা হইয়াছিল। যুক্ত-নির্বাচন প্রথা আজো চালু আছে। এর সবটুকু প্রশংসা সোহ্‌রাওয়ার্দীর। বাকী দুইটা ঃ প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিট। ঐতিহাসিক সত্য ও ঘটনা-পরম্পরা যাই হোক, এই দুইটার জন্যই একা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দায়ী করা হইয়া থাকে। কোনও ঐতিহাসিক তর্কে না গিয়া আমি এই দুইটার জন্যই সোহ্‌রাওয়ার্দীর একক দায়িত্ব মানিয়া লইতেছি এবং তারই ভিত্তিতে এই আলোচনা করিতেছি। এই দুইটি কাজের দরুন এককালে শত্রু-মিত্র সবাই সোহ্‌রাওয়ার্দীর তারিফ করিতেন। আজকাল শত্রু-মিত্র সবাই তাঁর নিন্দা করিতেছেন। ভাবখানা এই যে, এই দুইটির দ্বারাই তিনি একাধারে গণতন্ত্রের, পাকিস্তানের এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। আজ-কার সামরিক সরকার দুইটাই বাতিল করিয়াছেন। মনে হয়, দেশবাসী সকলেই তাতে খুশী হইয়াছে। প্যারিটি হইতে আমরা জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বে ফিরিয়া আসিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলের ইউনিট বাতিল করিয়া চারটি প্রদেশ ও ট্রাইবাল এলাকা পৃথক করিয়াছি। কাজেই সোহ্‌রাওয়ার্দীর তথাকথিত 'ভুলগুলি' সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাজে পূর্ব-বাংলার ও পশ্চিমাঞ্চ-লের মাইনরিটি প্রদেশসমূহের যদি কোনও বিপদ হইয়া থাকে, তবে সে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। যাঁরা এটা করিয়াছেন, সব প্রশংসা তাঁদের, যদি এই বাতিলের দ্বারা দেশের ভাল হয়। যারা এই বাতিলের সমর্থন করিতেছেন, তাঁরাও ঐ প্রশংসার কিছু অংশ পাইবেন। কিন্তু যদি দুইটা বাতিল করিয়া দেশের ক্ষতি করা হইয়া থাকে, তবে তার পরিণাম ও নিন্দার ভাগী সবাইকে হইতে হইবে। এই কারণেই দেশের বর্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতি-দিবসে, প্রশ্ন দুইটির বিচার-আলোচনা হওয়া দরকার।

দুই অঞ্চলের প্যারিটি বনাম সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে 'ইত্তেফাক'সহ অনেক কাগজে আমি অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। তাতে আমি দেখাইয়াছি এবং এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী আঞ্চলিক প্যারিটি মানিয়া অসাধারণ দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছিলেন। এতে শুধু পাকিস্তানেরই ভাল করেন নাই, পূর্ব পাকিস্তানেরও ভাল করিয়াছিলেন। সে সব যুক্তির পুনরুক্তি না করিয়া শুধু এইটুকু পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি ঃ ১৯৫৫ সালের ঘটনা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা সবাই জানেন যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী

যখন প্যারিটির কথা লইয়া পূর্ব বাংলায় আসেন, তখন হক সাহেব ও মাওলানা ভাসানী উভয়েই তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করেন। হক সাহেব খবরের কাগজে বিবৃতি দেন এবং পল্টন ময়দানে জনসভা করেন। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের মিটিং-এ তাঁর তীব্র বিরোধিতার ব্যাখ্যা করেন। তারপর শহীদ সাহেবের সংগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর উভয় নেতাই প্যারিটি মানিয়া নেন। হক সাহেব শুধু একা মানিয়া নেন নাই, তাঁর কে. এস. পি. পার্টিকে দিয়া মানাইয়াছিলেন। ঐ সময়কার কে. এস. পি. পার্টিতে অনেক বিদ্বান, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাও সকলের জানা আছে। তাঁরাও প্যারিটি মানিয়া নেন। বস্তুতঃ প্যারিটিভিত্তিক '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র তাঁরাই রচনা করেন।

এতে এটাই প্রমাণিত হইল যে, পূর্ব-বাংলার তৎকালীন নেতারা চোখ বুজিয়া বিনা-বিচারে প্যারিটি মানিয়া নেন নাই। বরঞ্চ আগে তুমুল প্রতিবাদ করিয়া আলোচনার পরে মানিয়া লওয়ায় এটাই বুঝা গেল যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী প্যারিটির পক্ষে জোরদার যুক্তি দিয়াছেন এবং হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব এবং তাঁদের পার্টিদ্বয় বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়াই তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হক সাহেব ও তাঁর দলের বিশেষ দায়িত্ব এই যে, তাঁরা মন্ত্রী হিসাবে উহাকে শাসনতন্ত্রের ভিত্তি করিয়াছেন। এ দায়িত্ব তাঁরা নিশ্চয়ই দূরদর্শী রাজনৈতিক সংজ্ঞা লইয়াই পালন করিয়াছেন।

তারপর ধরুন, ওয়ান ইউনিটের কথা। এটি আইনে পরিণত হওয়ার আগে পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলি আইন পরিষদ এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছিল। রাজন্যবর্গ যাঁর-তাঁর রাজ্যের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কাজেই এটাও সোহ্‌রাওয়ার্দীর একার কাজ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারসমূহ নিশ্চয়ই এ পরিকল্পনার মধ্যে নিজেদের কল্যাণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অথচ ঐতিহাসিক সত্য এই যে, এই দুইটি স্কীমের একটিও সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরিকল্পনা মত হয় নাই। সোহ্‌রাওয়ার্দী আঞ্চলিক প্যারিটিকে পার্লামেন্টে সীমিত রাখিতে চান নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন দুই অঞ্চলের সার্বিক ও সামগ্রিক প্যারিটি। ওয়ান ইউনিটও তিনি ইউনিটারি সিস্টেমে চান নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন ফেডারেল সিস্টেমে। তাঁর পরিকল্পনা মত হয় নাই বলিয়া তিনি পরবর্তীকালে গণ-পরিষদে উহাদের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। ইউনিটারি ওয়ান ইউনিটকে 'খুরোইযম' বা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা বলিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিট কোনোটাই সোহ্রাওয়ার্দীর ইচ্ছা মত হয় নাই। তা সত্তেও এই দুইটাকেই সোহ্রাওয়ার্দীর পরিকল্পনা বলা হয়। বলা অন্যায়ও নয়। কারণ পরবর্তীকালে প্যারিটিকেই তিনি শতকরা আটানব্বই ভাগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলিয়াছিলেন। এর আরও পরে ওয়ান ইউনিট ভাংগাকে তিনি পাকিস্তান ভাংগার শামিল বলিয়াছিলেন। এই দুইটা কথাই শক্ত কথা, দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা। দ্ব্যর্থহীন উক্তি। এই দুইটা কথার জন্য তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরা ত বটেই, তাঁর ভক্তেরাও তাঁর দোষারোপ করিয়া থাকেন। বিরোধীরা বলিয়া থাকেন, পূর্ব বাংলার মেজরিটির বদলা প্যারিটি গ্রহণে তিনি পূর্ব বাংলার স্বার্থ পশ্চিমাদের কাছে বিক্রয় করিয়া এক অপরাধ করিয়াছিলেন। সে বিক্রয়টাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের শতকরা আটানব্বই বলিয়া আরেক অপরাধ করিয়াছিলেন। আর তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা কৈফিয়াতের সুরে বলিয়া থাকেন, সব নেতাই যেমন অল্প বিস্তর ভুল করিয়া থাকেন, সোহ্রাওয়ার্দীও তেমনি এই দুই ব্যাপারে ভুল করিয়াছিলেন।

কিন্তু সোহ্রাওয়ার্দী কোনও দিন এ সুরে কথা বলেন নাই; বরঞ্চ ঠিক তার উলটা। শতকরা আটানব্বইর ঐ বিখ্যাত বা কুখ্যাত উক্তিটি যখন তিনি করেন, তখন আমরা, তাঁর অনুচরেরা, তাঁকে 'গাযি-গাযি' করিয়া ধরিয়াছিলাম। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাতে আমাদের অনেকেরই চোখ খুলিয়াছিল। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আমাদিগকে বিস্মিত-পুলকিত করিয়াছিল। সে ব্যাখ্যাটির সারমর্ম ও উপসংহার তাঁর ভাষায় ছিল এই: '৪৬ সালে দিল্লী-প্রস্তাব পেশ করিয়া আমি লাহোর-প্রস্তাব 'বিট্রে' করিয়াছি, এটাই ছিল তোমাদের ক্ষোভ। প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে আজ পাকিস্তান লাহোর-প্রস্তাবের কাঠামোতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন তোমাদের ক্ষোভ দূর হওয়া উচিত।' আমাদের হইয়াছিলও তাই। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, লাহোর-প্রস্তাবে ভারতের দুই কোণে দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র পাকিস্তান হওয়ার কথা। দিল্লী-প্রস্তাবে ঐ দুইকে এক করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটি পেশ করেন সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব নিজে। এই প্রস্তাবে দুইয়ের জায়গায় এক পাকিস্তান হইয়াছিল বটে, কিন্তু লাহোর-প্রস্তাবের আর সবটুকুই অপরিবর্তিত ছিল। সে প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিমের দুইটি ভূখণ্ডকে দুইটি অঞ্চল বা রিজিওন করা হইয়াছিল। দুই রিজিওনে দুইটি স্বাধীন ফেডারেশন না হইয়া দুই রিজিওন মিলিয়া একটিমাত্র ফেডারেশন হওয়ায় রিজিওন দুইটি স্বতঃই অটনমাস ও সভারেন ইউনিট হইয়া গিয়াছিল। এটাই পরবর্তীকালে অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্তানকে মামুলিভাবে নামমাত্র ফেডারেশন ত করা হইলই, তার উপর পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশ ও অর্ধ-ডজন 'দেশীয় রাজ্যের ভিড়ের মধ্যে মাত্র

…টি 'প্রদেশ' গণ্য করা হইল। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে। এই দিক হইতে প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিটে লাহোর প্রস্তাবের পুনঃ…া হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া এটাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের শতকরা আটানব্বই বলা যায় কেমন করিয়া? সেটাও শহীদ সাহেব বুঝাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তার প্রমাণও দিয়াছিলেন। মারী চুক্তির প্যারিটির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি ছাড়া আরও দুইটি কথা ছিল: এক, সর্ব বিষয়ে সামগ্রিক প্যারিটি; দুই, যুক্ত-নির্বাচন। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে শুধু প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিটাই ছিল। বাকী দুইটা ছিল না। হক সাহেব ও তাঁর পার্টির সবাই যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক হইয়াও '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উহা ঢুকাইতে পারেন নাই। কারণ কোয়েলিশনের অপর পক্ষ মুসলিম লীগাররা পৃথক নির্বাচনকে ঈমানের অংগ ও পাকিস্তানের ভিত্তি মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সেই পৃথক নির্বাচনওয়ালাদেরই যুক্ত-নির্বাচন গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই কাজের ভিতর দিয়া সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রজ্ঞা ও নেতৃত্ব প্রখর ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুদিন গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকিলে পশ্চিমা ভাইদের দিয়া তিনি প্যারিটির বাকী শর্ত 'সামগ্রিক প্যারিটিও গ্রহণ করাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁর তখনও ছিল, পরেও সে বিশ্বাস ভাংগে নাই। আমি আজও বিশ্বাস করি, এ বিশ্বাস তাঁর ভিত্তিহীন ছিল না।

লাহোর প্রস্তাবের জন্য প্যারিটির গুরুত্ব যা, পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ান ইউনিটের গুরুত্বও অবিকল তাই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের যেমন দুইটা বাযু, লাহোর প্রস্তা-বেরও তেমনি দুইটা খুঁটি: এক, পশ্চিমাঞ্চলের রিজিওনাল ঐক্য; দুই, দুই রিজিওনের সাম্য ও সমতা। কাজেই ওয়ান ইউনিট করা অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু প্যারিটি যেমন সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত্-মত হয় নাই, ওয়ান ইউনিটও তেমনি তাঁর মত্-মত হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বজায় রাখিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলকে একটি ফেডারেল রিজিওনে সংঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পশ্চিমা নেতাদের কারও-কারও এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রায় সকলের চাপে প্রদেশগুলির বিলোপ সাধন করা হয়। এটা যে টিকিতে পারে না, তা সোহ্‌রাওয়ার্দী জানিতেন। কিন্তু এটা সংশোধিত হইয়া ফেডারেশনে পরিবর্তিত হওয়ার বদলে একেবারে ভাংগিয়া না যায়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। ওয়ান ইউনিট যদি ভাংগে, তবে সেটা মাইনরিটি প্রদেশ ও ট্রাইবাল এরিয়ার অনাস্থা ও পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাসের দরুনই ভাংগিবে। ঝগড়া করিয়া ভাংগিলে আর জোড়া লাগিবে ন। সেটা শুধু পশ্চিমাঞ্চলের জন্য বিপজ্জনক হইবে না, পূর্বাঞ্চলের জন্যও বিপজ্জনক হইবে। সে অবস্থায় পাকিস্তান

রাখিতে গেলে পূর্ব বাংলাকে হয় পাঁচ-ছয় প্রদেশের এক প্রদেশ হইয়া 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' লইয়া থাকিতেই হইবে, নয় স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আলাদা হইয়া পড়িতে হইবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দুই পরিণতির একটাও ঘটিতে দিতে রাযী ছিলেন না। তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করিতেন, প্যারিটির সুযোগে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে ঠকাইবার যে মতলব করিয়াছিল, সেটা তিনি যদি ঠেকাইতে পারেন, তবে ইউনিটের সুযোগ নিয়া তাঁরা মাইনরিটি প্রদেশ ও ট্রাইবাল এরিয়াকে ঠকাইবার যে আয়োজন করিয়াছে, সেটাও তিনি ঠেকাইতে পারিবেন। যুক্ত-নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনে পূর্ব বাংলাকে এক ধাপ জিতাইয়াছিলেন। কার্যক্ষেত্রে সামগ্রিক প্যারিটি মানাইয়া তিনি পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতেও পারিতেন। ঠিক তেমনি ওয়ান ইউনিটকে ফেডারেশনে রূপান্তরিত করিয়া গণ-বিরোধী শাসক-গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিতেন। প্রয়োগে ত্রুটি হইলেই স্কিমকে ভুল বলা যায় না। একযিকিউশনে ভুল করিয়া প্ল্যানকে ভ্রান্ত বলা যায় না। প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিট দুইটারই প্রয়োগ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছিল। তাই তাদের দ্বারা ইষ্টের চেয়ে অনিষ্ট হইয়াছে বেশী। তাই বলিয়া প্ল্যানের দোষ দিয়া উহা পরিত্যাগ করা যায় না। কাজেই অত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সোহ্‌রাওয়ার্দী প্যারিটি ও ওয়ান ইউনিট ছাড়িতে রাযী ছিলেন না। আরও ছাড়িতে রাযী ছিলেন না এই জন্য যে, এদের কোনও অল্টারনেটিভ নাই বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

আছে কি নাই, তারই পরীক্ষা হইবে আজ। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আজ নাই, প্যারিটিও নাই। ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া চারটা প্রদেশ ও ট্রাইবাল এরিয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের দুইটি অংগরাজ্যের জায়গায় ছয়টি অংগরাজ্য হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান দুইজনের একজন হইতে ছয়জনের একজনে অধঃপতিত হইয়াছে। পার্লামেন্টে পূর্ব বাংলা মেজরিটি আসন পাইয়াছে ঠিক, কিন্তু ছয়জনের এক-জন হওয়ায় তার স্টেটাস মর্যাদা ও অধিকার কমিয়াছে। এটার বিচারেরও সময় আজ আসিয়াছে। সারা পাকিস্তানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ায় এক দেশ, এক অর্থনীতি ও ইউনিটারি সরকার প্রতিষ্ঠার রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে। লাহোর প্রস্তাব শেষ বারের মত কবরস্থ হইয়াছে। 'শতকরা আটানব্বই' কথাটা সোহ্‌রাওয়ার্দী বলিয়াছিলেন অলংকার হিসাবে—'ওয়েল বিগান হাফ ডান' কথাটার মতই। প্যাকিস্তান রাষ্ট্রকে লাহোর প্রস্তাবের কাঠামোতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাকে 'ওয়েল বিগান হাফ ডান' বলা যায় কিনা, তারও বিচার করিবার সুযোগ আসিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলকে এক রিজিওনে সংঘবদ্ধ না করিয়া পূর্ব বাংলা রিজিওন হইতে পারে কিনা এবং 'ফুল রিজিওন্যাল অটনমি' পাইতে পারে কিনা, তাও যেমন দেখা হইবে, ছয় প্রদেশের এক প্রদেশ হইয়া 'ম্যাক্সিমাম প্রভিন্সিয়াল অটনমি' লইয়া পূর্ব বাংলা বাঁচিতে পারে কি না, তারও পরখ হইয়া যাবে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী-প্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র পথ, একথা আমি বলিতেছি না। সে পথ ছাড়াও চলিতে পারে। তবে সেটা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ভিত্তিক ফেডারেল পাকিস্তান হইবে না। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নীতি পরিত্যাগ করিয়া এক দিকে স্ট্রংসেন্টারের ইউনিটরি পাকিস্তান হইতে পারে। অপর দিকে স্বাধীন পূর্ব বাংলা (পরে বাংলা) ও স্বাধীন পাখতুনিস্তান হইতে পারে। লাহোর প্রস্তাবের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ভিত্তিক ফেডারেল পাকিস্তান রাখিতে হইলে সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রদর্শিত পথে চলিতেই হইবে। আর কোনও পথ নাই। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

ইত্তেফাক, ৫ই ডিসেম্বর, '৭০

১১

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদ

জাতীয়তাবাদ ও পুঁজিবাদ সামন্তবাদের মতই মানব-সভ্যতা ও সমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর মাত্র। পার্থক্য শুধু এই যে, সামন্তবাদের আয়ু শেষ হইয়াছে। পুঁজিবাদের আয়ু শেষ হইবার পথে। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদের আয়ু আজও অব্যয়। ভবিষ্যতের গর্ভে যতদূর নযর চলে, তাতে জাতীয়তাবাদের আয়ু শেষ হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এর সংগত কারণ আছে।

রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম ইউরোপে ও আমেরিকায়—প্রায় একই সময়ে আঠার শতকে। ফরাসী বিপ্লব ও মার্কিন বিপ্লবই এই জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা। ইংরাজ উপনিবেশবাদী শাসনকে মার্কিন দেশে বিদেশী শাসন বলিবার যুক্তি হিসাবেই মার্কিনবাসী বলিয়াছিলঃ 'আমরা মার্কিনবাসী ইংলন্ডবাসী হইতে পৃথক জাতি।' কথাটা বলা খুবই কঠিন ছিল। মার্কিনবাসী আসলে এক জাতের লোক ছিল না। তারা ছিল ইংলন্ড, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালি হইতে আগত মোহাজের মাত্র। তারা ছিল রেসে-ধর্মে, ভাষা-কৃষ্টিতে এক বিচিত্র শতরংগা লোক-সমষ্টি। তবু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তারা ইংলন্ডের ইংরাজদের শাসনের অবসান চাহিয়াছিল এবং এই কারণে নিজেদেরে এক জাতি এবং ইংলন্ডবাসী হইতে পৃথক জাতি বলিতে বাধ্য হইয়াছিল। এরই নাম মার্কিন জাতি।

ফরাসী বিপ্লবের মূলবাণী সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-প্রজাতন্ত্রের দাবি ছিল বটে, কিন্তু নেপোলিয়নের আবির্ভাবে সাম্য-প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিল। কিন্তু ফ্রান্সবাসীর স্বাতন্ত্র্যবোধের অবসান তাতে হইল না। বরঞ্চ নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসী জাতীয়তাবাদ আরও জোরদার হইল। ক্রমে সারা ইউরোপে এই জাতীয়তাবাদ ছড়াইয়া পড়িল। তার উপযুক্ত পরিবেশও ছিল তথায়। ইংলন্ডসহ সমগ্র ইউরোপে রোমের পোপের ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য চলিতেছিল বহু শতক ধরিয়া। ইংলন্ড স্বতন্ত্র চার্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া অংশতঃ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আর সব দেশ, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানি, কড়াকড়িভাবেই পোপের প্রভাবের আওতায় রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করিতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ও মার্কিন বিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাবে সর্বত্র দাবি উঠিলঃ 'এক দেশের লোক আরেক দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।' এই কথাটাই জাতীয়-স্বাতন্ত্র্যের রূপ ধারণ করিল। অবশ্য এক-এক দেশে এক-এক যুক্তিতে এই দাবি

উঠিয়াছিল। ফ্রান্স-জার্মানিতে এই দাবি ছিল দৈশিক জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের নামে। বলকান উপদ্বীপের খৃষ্টান অধিবাসীরা তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই দাবি তুলিয়াছিল ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের নামে। খোদ ইটালিতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের দাবির মওকা ছিল না। তাই সেখানে এই দাবি উঠিয়াছিল গণতন্ত্রের নামে। যেখানে যে যুক্তিতেই এই দাবি উঠিয়া থাকুক না কেন, পরিণামে তা দানা বাঁধিয়াছিল ভৌগোলিক সীমার মধ্যে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তায়।

এই জাতীয়তাবাদে মানুষের লাভ-লোকসান দুই-ই হইয়াছে। লাভ-হইয়াছে এই ঃ 'সাম্রাজ্যবাদের, মানে এক জাতির উপর আরেক জাতির শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে।' সব জাতিকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সব জাতিকে নিজ-নিজ ধর্ম-কৃষ্টি ভাষার উন্নয়নের সুযোগ দিয়াছে। সব দেশ খাদ্য-বস্ত্র ও শিল্প-কারখানায় তথা অর্থনীতিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সব দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাওয়ায় তাদের নিজস্ব দেশরক্ষা বাহিনী, শাসন-ব্যবস্থা, শাসক শ্রেণী, আইন পরিষদ, পার্লামেন্টারিয়ান, বিচার-বিভাগ ও বিচারকদল গড়িয়া উঠায় দেশের শিক্ষিত সমাজ সম্মানজনক জীবিকা অর্জন ও দেশ সেবার সুযোগ পাইয়াছে।

কিন্তু এ-সব লাভ ও উন্নতির যথাযোগ্য অংশ জনগণ পায় নাই। দেশ রক্ষার নামে যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকায় সব জাতি-রাষ্ট্রকেই প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। এই অর্থ ও সম্পদ দেশের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ও খরিদে প্রচুর অর্থ দেশে-বিদেশে ব্যয় হইতেছে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিদেশী প্রতি-যোগিতার হাত হইতে শিল্প রক্ষার উদ্দেশ্যে আমদানী-রফতানী শুল্ক ও ট্যারিফ বসান হইয়াছে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে পাঠান হইতেছে। বিদেশী প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সে-সব দ্রব্য বিদেশে সস্তায় বিক্রির ব্যবস্থা হইয়াছে। তাতে দেশে উৎপাদন-খরচা কমাইবার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতির মুনাফায় হাত না দিয়া শ্রমিকদের মজুরি কম করা হইয়াছে। দেশী শিল্প-কারখানায় কন্‌যিউমার দ্রব্যের চেয়ে রফতানী দ্রব্য বেশী উৎপাদন করা হইতেছে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ঐ একই উদ্দেশ্যে। যে-সব শিল্প-জাত দ্রব্য দেশে বিক্রয় হইতেছে, তারও দাম দেশবাসীর নিকট হইতে বেশী নেওয়া হইতেছে, আর বিদেশে সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। এইভাবে 'জাতীয় শিল্পকে' টিকাইয়া রাখিবার জন্য দেশবাসীকে ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করা হইতেছে। এটা করা হইতেছে পুঁজিপতিদের মুনাফার এক কড়ি না কমাইয়া বরঞ্চ তাদেরে বোনাস ভাউচার দিয়া।

এইরূপে দেশে-দেশে পুঁজিবাদ মজবুত হইয়া কায়েম হইয়াছে। পুঁজি-পতিদের আয়কে জাতীয় আয় বলা হইতেছে। পুঁজিপতি ও শোষিত জনগণকে

এক কাতারে ফেলিয়া মাথা-পিছু আয় হিসাব করা হইতেছে। কোন্ দেশ কত ধনী, কোন্ রাষ্ট্র কত শক্তিশালী, কোন্ জাতি কত উন্নত, তার বিচার হইতেছে পুঁজিপতিদের সম্পদ ও উন্নয়নের মাপকাঠিতে। এই পুঁজিপতিদের লাভ-লোকসানকেই জাতি-রাষ্ট্রের লাভ-লোকসান গণ্য করা হইতেছে। এই তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একদিকে বিশ্বযুদ্ধ বাধান হইতেছে, অপরদিকে শুল্ক ও ট্যারিফের 'বিশেষ সুবিধা' আদান-প্রদানের এবং 'উন্নয়ন ঋণ' গ্রহণের মাধ্যমে জাতি-রাষ্ট্রের 'সার্বভৌমত্ব' ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে। কিন্তু উভয়টাই করা হইতেছে পুঁজিবাদের স্বার্থে। জনগণের স্বার্থে কিছু করা হইতেছে না। বরঞ্চ উভয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী কোরবানি করিতে হইতেছে সব জাতি-রাষ্ট্রের জনগণকেই।

এ সব সত্ত্বেও বিশ্বের জনগণ আজও জাতীয়তাবাদ আঁকড়াইয়া আছে। কারণ বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণের দিক হইতে এই রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদই এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। জাতি-রাষ্ট্রের একমাত্র বিকল্প যে বিশ্ব-সরকার, তা আজো কবির কল্পনা ও দার্শনিকের স্বপ্নই রহিয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র যেমন দোষে-গুণেই শ্রেষ্ঠতম শাসন-ব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদও তেমনি দোষে-গুণেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো। মানুষ ফেরেশতা নয়। দোষে-গুণেই তারা মানুষ। তাই তাদের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ দোষে-গুণের ব্যবস্থা হইবেই। এ অবস্থায় যে বন্দোবস্তে অধিকাংশ মানুষের মংগল ও কল্যাণ হইবে, আপাততঃ সেটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। এই দিক হইতে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে। এটা স্বাভাবিক ও প্রকৃতির নিয়মের অনুসারী। জাতে-ধর্মে, ভাষা-কৃষ্টিতে ও শিল্প-সাহিত্যে বৈচিত্র্যময় হাজার ফুলের গুলবাগিচা আল্লার এই দুনিয়া। এই বৈচিত্র্যের বুনিয়াদে সকলের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-বিকাশের অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ। সমাজ স্বভাবতঃই ফেডারেল। 'পাঁচজনের' মতেই সমাজ চলে। এর নাম গণতন্ত্র। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াও নিজ-নিজ স্বতন্ত্র গৃহে ও পরিবারে বাস করে। এরই প্রসারিত রাষ্ট্রীয় রূপ জাতি-রাষ্ট্র।

কিন্তু নিজ-নিজ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'জাতিকে' হইতে হইবে জনগণের 'জাতি', আর গণতন্ত্রকে হইতে হইবে জনগণের 'গণতন্ত্র'। এইখানে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। সংগে-সংগে বুঝিতে হইবে দেশের মাটির জাতীয়তা ও দেশের মানুষের জাতীয়তার প্রভেদ। প্রজাতন্ত্রকেই গণতন্ত্র বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল। অথচ প্রজাতন্ত্র হইলেই গণতন্ত্র হয় না। তেমনি 'দেশজননী' বলিতে প্রায়শঃ জননীর সন্তানদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হয়। 'জাতির' অরণ্যে জনগণের গাছ-বৃক্ষ হারাইয়া যায়। 'জাতির' স্বার্থে জনগণকে কোরবানি করা হয়। 'নেশন' রক্ষার কামানের লুক্‌মা করা হয় পিপ্‌লকে।

'জাতীয়তার' উদ্দীপনা নাযিবাদ ও ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি যত 'আদর্শবাদ' সৃষ্টি করিয়াছে, সবই পুঁজিবাদ রক্ষার মুখরোচক চক্রান্ত মাত্র। দুনিয়ার সমস্ত ওয়াক্ফ, ট্রাস্ট ও দেবোত্তরের মোতাওয়াল্লী, ট্রাস্টি ও সেবায়েতরা যেমন সমস্ত আল্লার সম্পত্তিকে চিরকাল আল্লার নামে নিজেদের ভোগবিলাসে খরচ করিয়াছে, পুঁজিবাদী জাতি-রাষ্ট্রের শাসক-গোষ্ঠীও তেমনি ন্যাশনালিযমের নামে 'জাতির' সম্পদকে চিরকাল নিজেদের ভোগেই লাগাইয়াছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এখানে জনগণকে শোষণ করিয়া মুনাফা লুটিবার এবং সে লুটের মুনাফার টাকা ইন্টার-কন্টিনেন্টালের শাদ্দাদী বেহেশ্তে উড়াইবার স্বাধীনতা মাত্র। সেলুট ও ভোগকে নিরংকুশ করিবার উদ্দেশ্যে বিনা-বিচারে বন্দী ও খবরের কাগজের মুখে তালা লাগাইবার অর্ডিন্যান্স জারির স্বাধীনতার নামই জাতীয় স্বাধীনতা।

অথচ মানুষের কল্যাণের জন্য, বিশ্ব-শান্তির জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাফল্যের জন্য এবং বিজ্ঞানের সাফল্যকে জনকল্যাণে নিয়োগের জন্য গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। জাতীয়তাবাদকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র সমাজবাদ। দুই শ' বছরের অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন, আর অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কোনও মানে হয় না। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গগুলির মালিক দখলকার পুঁজিপতিরা থাকিলে, জাতীয় সম্পদগুলি 'বাইশ পরিবারের' কুক্ষিগত থাকিলে তাতে 'জাতির নামে বজ্জাতি' ও গণতন্ত্রের নামে পুঁজিতন্ত্র চলিতে পারে; সত্যিকার গণতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্র তাতে গড়িয়া উঠে না। দেশের এই অর্থনৈতিক দুর্গগুলি জনগণের স্বত্ব-দখলে আনিয়া জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন করিয়া গণতন্ত্রকে গণ-জীবনে বাস্তবায়িত করিতে পারে একমাত্র সমাজবাদ।

গণতন্ত্র যেমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজবাদ তেমনি একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র। গণতন্ত্রের মতে রাষ্ট্র যেমন জনগণের, ভোটারদের, সমাজবাদে তেমনি দেশের সব সম্পদ জনগণের, মেহনতী জনতার। সমাজবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্র, যথা—কল-কারখানা, প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা মাটি ও পানি, নদী ও সাগর, সবগুলির মালিকানা সমাজের, কোনও ব্যক্তির নয়। এ বিধান ধর্ম-বিরোধী হইতে পারে না। সামরিক শক্তিতে পরের দেশ দখল করিলে, দস্যুবৃত্তি করিয়া পরের সম্পত্তি দখল করিলে যেমন ওসব দখলকারীর হইয়া যায় না, জনগণকে শোষণ করিয়া পুঁজিবাদীরা যে-সব কলকারখানা বানাইয়াছে, সে-সবও তেমনি তাদের হইয়া যায় নাই। সৃষ্টিকর্তা যাদের জন্য এ-সব সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন, এসব তাদেরই। মানুষের তৈয়ারী উৎপাদন-যন্ত্র ও খোদার তৈয়ারী উৎপাদন-ক্ষেত্র, উভয়টার জন্যই এ কথা সত্য। তবু ধর্মের

দোহাই দিয়া যে অনেকে সমাজবাদের বিরুদ্ধতা করিতেছেন, তার কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন, সমাজবাদ ধর্মের অবসান ঘটাইতে চায়। সমাজবাদ যে ধর্মের অবসান ঘটাইতে চায় না, বরঞ্চ ধর্ম-বিধানকে গণ-জীবনে প্রয়োগ করিতে চায়, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র তার প্রমাণ ভূরি-ভূরি। বিলাতের লেবার পার্টি, ভারতে ইন্দিরা কংগ্রেস, মিসরের নাসের-প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদী ইউনিয়ন, ইরাক-সিরিয়ার বাস্ পার্টি, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টি সবই সমাজবাদী দল। এ ছাড়া লিবিয়া, আলজিরিয়া ও সুদান সব দেশের সরকারই সমাজবাদী সরকার। আলেম-ওলামাসহ ঐসব দেশের মুসলমানরা যাঁর তাঁর দেশের সরকার সমর্থন করিতেছেন। ইসলামী শিক্ষার পীঠস্থান মিসরের জামেউল-আযহারের আলেমগণ নাসেরের সমাজবাদী নীতির সমর্থন দিয়াছেন। কাজেই স্পষ্টতঃই সমাজবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিটা ধর্মের তরফে নয়, পুঁজিবাদের তরফে। সমাজবাদে ধর্মের অবসান হইবে না, অবসান হইবে পুঁজিবাদের। তবু পুঁজিবাদীরা ধর্মের দোহাই দিয়াই আপত্তি করিতেছেন, এডিশনাল যুক্তি হিসাবে। ধর্ম-প্রাণ আলেম-ওলামাদের অনেকে না বুঝিয়া পুঁজিবাদীদের স্লোগানে বিভ্রান্ত হইতেছেন।

কিন্তু পুঁজিবাদীরা শুধু ধর্মের উপরে, তথা শুধু আল্লার উপরে, নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। ধর্ম ও আল্লার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক পুঁজিবাদীরা নয়। কারণ ধর্ম ও আল্লার উপর আস্থাহীন লোকের সংখ্যা পুঁজিবাদের মধ্যেই বেশী। হক-নাহক ও হালাল-হারামকে বুড়া আংগুল দেখাইয়া চলিবার মত শক্তি বিবেকের মালিক তারাই। কাজেই আলেম-ওলামাকে ধর্মের দিক সামলাইবার ভার দিয়া পুঁজিবাদীরা নিজেরা অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক সামলাইতে লাগিয়াছেন। ধর্ম-বিশেষজ্ঞদের মতই অনেক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞও সমাজবাদের অপকারিতা বর্ণনায় লাগিয়া গিয়াছেন। আইয়ুবের আমলে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তনের জন্য বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও বিলাত ফেরত পি-এইচ. ডি. ডাক্তার পাওয়া গিয়াছিল। সমাজবাদের অপকারিতা বর্ণনায় তেমনি অনেক অর্থ-বিজ্ঞানীও পাওয়া যাইতেছে। তাঁরা বই-পুস্তক লিখিয়া, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া, এমনকি সাপ্লিমেন্ট বাহির করিয়া দেখাইতেছেন, সমাজবাদ প্রবর্তন করিলে দক্ষ পরিচালকের অভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কল-কারখানা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অর্থনীতি ভাংগিয়া পড়িবে। তাঁরা শুধু থিওরেটিক্যাল যুক্তি দিতেছেন না, বাস্তব ঘটনা হইতে নযির দিতেছেন। নযিরগুলি সত্যও। পাবলিক সেক্টরে শিল্প চালাইলে তা হয় আগা-গোড়া লোকসানের কারবার। সেই শিল্পটাই প্রাইভেট সেক্টরে কোনও পুঁজিবাদীর মালিকানায় দিয়া দেওয়ার পরদিনই সেটা এক লাফে লাভজনক হইয়া যায়। আমাদের পি. আই. ডি. সির. প্রায় সব শিল্পেই এমনটা ঘটিতেছে। হিন্দুদের

যে-সব কাপড়ের কল এতদিন প্রাইভেট সেক্টরে পুঁজিবাদীরা নিজেরা চালাইতেছিল, ততদিন দেশবাসী কাপড়ও পাইত, উৎপাদনও বেশী হইত; মুনাফাও হইত প্রচুর। ইদানিং হিন্দু মালিকরা চলিয়া যাওয়ায় ঐসব কল সরকারী পরিচালনায় আসিয়াছে। অর্থাৎ 'ন্যাশনালাইযড্ হইয়াছে'। এখন আর আমরা কাপড় পাই না, শ্রমিকরাও মজুরি পায় না। কারণ মিলই বন্ধ। এর পরেও জাতীয়করণের নাম কেউ মুখে আনিবেন?

সেদিন দৈনিক কাগজগুলির বীমা সাপ্লিমেন্ট পড়িলাম। বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ করিলে লক্ষ লক্ষ বীমা-কর্মীর ভাত মারা যাইবে। বীমাকারীদের সর্বনাশ হইবে। দেশের অনেক গঠনমূলক কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রমাণ? প্রমাণ ভারত। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার বীমা জাতীয়করণ করিয়াছিলেন। দশ বছর পরে সরকার নিয়োজিত তদন্ত কমিশন রিপোর্ট দিয়াছেন, বীমা জাতীয়করণ ব্যর্থ হইয়াছে। এর পরেও পাকিস্তানবাসী বীমা জাতীয়করণের কথা চিন্তা করিতে পারে?

এটাই পুঁজিবাদের প্রচারের ধারা। কি পাকিস্তানের পি. আই. ডি. সি. কি ভারতের বীমা জাতীয়করণ, কোনটারই শেষ কথাটি বলা হয় নাই। পি. আই. ডি. সি-র শিল্পগুলির ঐ অবস্থা হওয়ার কারণ বলিয়াছেন সেদিন একজন মুখপাত্র। তিনি বলিয়াছেন, যতদিন শিল্পগুলি কর্পোরেশনের হাতে থাকে, ততদিন তার কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্র আমদানি করিতে হয় বোনাস ভাউচারে। ঐ শিল্পটাই বেসরকারী পুঁজিবাদীর কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার পর সাধারণ বিদেশী মুদ্রায় কাঁচামাল ও স্পেয়ার পার্টস আনিবার সুবিধা পায়। তাছাড়া কর্পোরেশনের পরিচালনায় থাকিতে শিল্পগুলির শাসন-ব্যবস্থা থাকে মাথাভারী। এই দুইটি কাজই করেন সরকার। কাজেই পাবলিক সেক্টর বা জাতীয়করণকে ব্যর্থ প্রমাণের চেষ্টা কোথা হইতে হইতেছে, তা সহজেই অনুমেয়।

আর ভারতের নযিরটা? তদন্ত কমিশন বীমা জাতীয়করণের নিষ্ফলতার রিপোর্ট দিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তার কারণও দেখাইয়াছেন। সেজন্য ভারত সরকার বীমা জাতীয়করণ বাতিল না করিয়া এবার ব্যাংক জাতীয়করণ করিয়াছেন। ব্যর্থতার কারণ দূর করিয়াছেন।

এতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইল: এক, আলেম সাহেবানের চেয়ে শক্তিশালী কোয়ার্টার হইতে সমাজবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলিতেছে। দুই, আংশিক জাতীয়করণে সমাজবাদী অর্থনীতি আসে না।

ইত্তেফাক, ১৪ই নবেম্বর, '৭০

১২

গণ-মুক্তি কোন্ পথে ? বিপ্লবে, না নির্বাচনে ?

জনগণের স্বার্থের দোহাই দিয়া একদল রাজনীতিবিদ আসন্ন নির্বাচন বানচাল করিতে চান। তাঁদের শ্লোগানঃ 'নির্বাচনে নয়, বিপ্লবেই জনগণের মুক্তি নিহিত।' কৌতুক ও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁরা নিজেরাই নিজ-নিজ দলের নির্বাচিত নেতা বলিয়া দাবী করেন। সত্যসত্যই তাঁদের দলীয় নির্বাচন হয়ও। সে নির্বাচনে মেজরিটির দাবিতে বিরোধ ও দল ভাংগাভাগিও হয়। দল গড়িতে যাঁরা নির্বাচন মানেন, দেশের সরকার গড়িতে তাঁরাই নির্বাচন মানেন না। এটাই কৌতুক ও বিস্ময়ের কথা। এই কথাটাই থিওরি, প্র্যাকটিস ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করা দরকার।

আগে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাটাই বিচার করা যাক। জনগণ দেখিয়াছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগত ভাবেও নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করেন। কিন্তু শুধু এটাই নির্বাচনের বিরুদ্ধে যুক্তি হইতে পারে না। বিপ্লবীরাও বিপ্লবের পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন। অন্য লোক ছাড়াও খোদ বিপ্লবীরাই তার সাক্ষী। রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা ট্রটস্কির 'রিভলিউশন বিট্রেড' বইটিই তার প্রথম প্রমাণ। আমি এ কথা বলিয়া ট্রটস্কিবাদের সমর্থন করিতেছি না। লেনিন ও স্ট্যালিনের নীতির সমালোচনাও করিতেছি না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, বিপ্লবীদের মধ্যেই একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনিতে পারেন। এর আধুনিক প্রমাণ এই যে, সে অভিযোগ-প্রত্যভিযোগ আজও চলিতেছে। খোদ চীন-রুশিয়ার সংঘাত এবং পূর্ব-ইউরোপের সমাজবাদী দেশসমূহের সাথে রুশিয়ার সম্পর্কই তার প্রমাণ দিতেছে। এখানেও আমি কোনও দেশ বা দেশসমষ্টির পক্ষ লইতেছি না। শুধু দেখাইতেছি, খোদ সমাজবাদীরাও এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে, এক পার্টি অপর পার্টিকে, বিশ্বাসঘাতক, প্রতিবিপ্লবী, ওয়াদা খেলাফকারী, সংশোধনবাদী আখ্যা দিতে পারে। তার মানে বিপ্লবীদের মধ্যেও মতভেদ ও পথভেদ হইতে পারে।

তবে গণতন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপ্লবীদের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য রহিয়াছে। গণতন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকরা নির্বাচনের ফলে গদিতে বসিয়া নির্বাচনী ওয়াদামতে কাজ করেন না; সময়মত আর নির্বাচন না দিয়া গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন; বিরোধী পক্ষকে বিনা-বিচারে বন্দী করেন। পার্লামেন্টকে পাশ কাটাইয়া, প্রয়োজন হইলে পার্লামেন্ট ভাংগিয়া

দিয়া অর্ডিন্যান্স-বলে দেশ শাসন করিতে থাকেন। এই সবই তাঁরা করেন। কিন্তু একটা কাজ করেন না। বিরোধী দলকে জানে মারেন না। বিরোধী পক্ষের নেতাদেরে গুলি করিয়া হত্যা করেন না। এইটুকু মেহেরবানি গণতন্ত্রীরা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন তাঁরা শুধু বিনা-পার্লামেন্টে দেশই শাসন করেন না, বিরোধী দলকে শুধু আটকই করেন না, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে তাঁদেরে ইজমালিভাবে হত্যা করেন। আগের দিনের সহকর্মী, সমবিপ্লবী অথবা পার্লামেন্টের মন্ত্রী-মেম্বর বলিয়া কেউ রেহাই পান না। দেশের ভিতরে ত নয়ই, বিদেশে পলাইয়া গিয়াও রক্ষা নাই।

গণতন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকেরা নিজেদের দেশের সংবাদপত্রের টুঁটি চাপিয়া তাঁদেরে সত্য সংবাদ ছাপিতে ও সত্য কথা বলিতে দেন না, এটা ঠিক। কিন্তু বিদেশী সাংবাদিক, পর্যটক ও কূটনীতিকদের উপর তত কড়াকড়ি বিধি-নিষেধ আরোপ করেন না। এতে গণতন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকের দেশে কখন কি ঘটিয়াছে, দেশ-বিদেশের লোক তা জানিতে পারে। অনেকক্ষেত্রে কথাও বলিতে পারে। আবার নির্বাচন হইলে ভোটাররা স্বাধীনভাবে ভোটও দিতে পারে। সাত বছর এক পার্টি বা পার্টিহীন অর্ডিন্যান্সের রাজত্ব চালাইয়া পাকিস্তানের প্রথম যুগের সরকার আড়াই হাজারের মত বিরোধী দলের নেতাকে বিনা-বিচারে বন্দী করিয়াছিলেন; খবরের কাগজের মুখে লাগাম ও অফিসে তালা লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু তারপরেও ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগ সরকারকে বাতিল করিয়াছিলেন। ঠিক তেমনি এগার বছরের আইয়ুব-শাহি পাকিস্তানের জনগণ বিনা-অস্ত্রে শুধু আন্দোলনের জোরে খতম করিতে পারিয়াছিল। পাকিস্তানের তেইশ বছরের জীবনে কোনদিন এদেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ছিলেন না। কিন্তু আইয়ুবী মার্শাল ল' আমলের পৌণে চার বছরের মুদ্দতটির কথা বাদ দিলে এদেশে কোনও দিন বিপ্লবী সরকারও ছিলেন না। ঐ মুদ্দতটি বাদে অন্য সব সময়েই শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল। তার ফলে পাকিস্তানবাসীর দুরবস্থা ও অসন্তোষের খবর দেশী-বিদেশী সকলেই জানিত। কিন্তু 'বিপ্লবী' নেতাদের শাসিত দেশসমূহের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে কি ঘটে, বাহিরের লোক তা জানিতে পারে না। একদিকে শত্রুরা একঢালা বদনাম করে, অপরদিকে মিত্ররা পঞ্চমুখে তারিফ করে। আসল সত্য কেউ জানিতে পারে না। এই কারণেই এক বিপ্লববাদী দেশে এক নেতা একাদিক্রমে ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। দেশ-বাসী তাঁর অধীনে পরম সুখে দিন যাপন করে। দেশবাসীর কোন অভিযোগ-অসন্তোষ আছে, দেশবাসী ঘুণাক্ষরেও তা জানিতে পারে নাই। ঐ নেতার মৃত্যুর পর ঐ দেশবাসীর মুখেই বিশ্ববাসী সর্বপ্রথম জানিতে পারে যে, ঐ নেতার মত স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, যালেম আর হয় না। ঐ দেশবাসী ত্রিশ-ত্রিশটা বছর যে

সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করিয়াছে, অমন আর কোনও দেশে ঘটে নাই। এমন নযিরের উল্লেখ করিয়া আমি উক্ত নেতার নিন্দাপ্রশংসা করিতেছি না। শুধু দেখাইতেছি, ঐ নেতা বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত তাঁর দেশবাসী বা সহকর্মীরা তাঁর কুকর্মের প্রতিবাদ করেন নাই। কেন করেন নাই? গণতন্ত্রী যুলুম ও বিপ্লবী যুলুমের মৌল পার্থক্যের জন্যই প্রতিবাদ করিতেই পারেন নাই। এটা গেল বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।

এবার থিওরি ও প্র্যাকটিসের বিচারে আসা যাক। নির্বাচন-বিরোধী বিপ্লববাদীরা মার্ক্সবাদ হইতেই নিজেদের মতবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্থবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান উভয় দিককার বিচারে মার্ক্সবাদও একটা বিজ্ঞান। আর সব বিজ্ঞানের মতই মার্ক্সবাদও গতি, প্রগতি, উন্নয়ন ও পরিবর্তনশীল। বস্তুতঃ এটাই বিজ্ঞানের প্রাণ। এখানেই বিজ্ঞানের অমরত্ব নিহিত। কাজেই সব বিজ্ঞানের মতই মার্ক্সবাদের থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল উভয় দিকেই প্রতিনিয়ত পরিববর্তন ঘটিতেছে। বিজ্ঞানী হিসাবে আমি একথা বলিতেছি না। বিজ্ঞানের কাণ্ডজ্ঞানী উম্মি সমঝদার হিসাবেই এসব কথা বলিতেছি। বিজ্ঞানের আবিষ্কারটা করেন বিজ্ঞানীরাই। কিন্তু তার ফল ভোগ করে অবিজ্ঞানী উম্মি জনসাধারণ। বস্তুতঃ এদের জন্যই বিজ্ঞান। শুধু বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত শখ মিটাইবার জন্য নয়। এই কাণ্ডজ্ঞানী উম্মিলোক হিসাবে দৃঢ়তার সাথে আমি বলিতেছিঃ 'সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থার পরিরর্তন হইবে না' মার্ক্সবাদের এই সূত্র এককালে সত্য ছিল বটে, কিন্তু আজ আর সত্য নাই। এর কারণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি। ঐ কারণেই আগে এটা সত্য ছিল এবং ঐ কারণেই এখন ওটা মিথ্যা হইয়াছে। মার্ক্সবাদের সবচেয়ে বড় অবদান ডায়লেকটিক মেটিরিয়ালিযমের নিক্তির ওজনেই এটা ধরা পড়িয়াছে। তবু শিশু বিপ্লবীরা মার্ক্সবাদের ঐ এক শ' বছরের আগের সত্যটাকেই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মতই অপরিবর্তনীয় মনে করিয়া আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু মার্ক্সবাদের যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিদিন পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে তাল রাখিয়া বিজ্ঞান হিসাবেই মার্ক্সবাদের সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখুন।

মার্ক্স বলিয়া গেলেনঃ শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া অন্য কোথাও কমিউনিস্ট বিপ্লব হইবে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, ইংল্যান্ড-জার্মানির মত শিল্পোন্নত দেশে বিপ্লব হইল না। বিপ্লব হইল শিল্পে অনগ্রসর রুশিয়ায়। এইখানে মার্ক্সের কথা প্রথম ভুল প্রমাণিত হইল।

মার্ক্স এংগেলস্ রচিত 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'তে বলা হইলঃ বিশ্বের মেহনতী জনতার মুক্তি অবিভাজ্য। তার মানে, কোনও একটিমাত্র দেশে সাম্যবাদ চলিতে পারে না। কিন্তু লেনিন পরম সাফল্যের সাথে সমাধা করিয়া এবং

অকাট্য যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিলেন, এক দেশেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাঁর স্থলবর্তী স্ট্যালিন ও তাঁর বলশেভিক দল আরও প্রমাণ করিলেন যে, শুধু প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব নয়, গৃহ-যুদ্ধ ও বহিরাক্রমণ প্রতিহত করিয়া তেমন রাষ্ট্র টিকিয়াও থাকিতে পারে। এখানে মার্ক্সের কথা দ্বিতীয়বার ভুল প্রমাণিত হইল।

লেনিন যখন একদেশে সমাজবিপ্লবের সম্ভাব্যতা প্রচার করেন, তখন তিনি আশা করিয়াছিলেন, সাম্যবাদী রুশিয়া সমাজ-বিপ্লবের নেতা হিসাবে 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' স্লোগানে সবদেশে সমাজ বিপ্লব ঘটাইবে। কিন্তু লেনিনের উত্তরাধিকারীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিলেন, সমাজবিপ্লব এটাচি কেসে ভরিয়া রফতানীর বস্তু নয়। কাজেই দুনিয়ার সবদেশে সোজাসুজি সাম্যবাদ আসিবে না। বহু যুগ ধরিয়া বিভিন্ন দেশে সমাজবাদ চলিবে। তাতে সাম্যবাদী বিপ্লবের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মিত হইবে। এই ইনফ্রাস্ট্রকচারের বুনিয়াদে বহু বহু যুগ পরে সম্যবাদী বিপ্লব প্রবর্তিত হইবে। তাই আজ রুশ-চীনসহ দুনিয়ার কোনও দেশই সাম্যবাদী দেশ নয়। সব দেশই আজ সমাজবাদী দেশ মাত্র। এখানেও মার্ক্সের অভিমত ভুল প্রামাণিত হইয়াছে।

অবশেষে ধরুন সমাজবাদের রূপের কথা। মার্ক্স নিজে বলিয়াছিলেন, এবং বিপ্লবীরা বহুদিন ধরিয়া এই ধারণা পোষণ করিয়াছিলন যে, শুধু শিল্প-শ্রমিকদের মত সর্বহারারাই সমাজ বিপ্লব ঘটাইতে পারে। সে জন্য সমাজ-বিপ্লবকে তাঁরা বলিতেন 'সর্বহারার সমাজবাদ'। গণ-চীন প্রমাণ করিয়াছে, কৃষকরাও সমাজ বিপ্লব ঘটাইতে পারে। মার্ক্সের মত এখানেও ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

চিন্তার বিভ্রান্তি শুরু হইয়াছে এখান হইতেই। পুঁজিবাদিগণ বলিতেছেন ঃ মার্ক্সবাদ ব্যর্থ হইয়াছে। আর অতি-বিপ্লবীরা বলিতেছেন ঃ বিপ্লব বিট্রেড হইয়াছে। এই দুই মতই ভ্রান্ত। মার্ক্সবাদ ব্যর্থও হয় নাই, বিট্রেডও হয় নাই। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াইয়া প্রমাণ করিয়াছে, মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান। নিত্য-নতুন পরিবেশে নিত্য-নতুন সত্য আবিষ্কার করিয়া আগের দিনের সত্যকে নিজেই মিথ্যা স্বীকার করিবার ক্ষমতা ও সাহস একমাত্র বিজ্ঞানেরই আছে। অর্থ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান রসায়ন-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কারিগরি-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনারি-বিজ্ঞান প্রতিদিন অভিজ্ঞতার ফলে মত পরিবর্তন করিতেছে। আগের দিনের মত ভুল বলিয়া নিজেরাই স্বীকার করিতেছে। এতে ঐসব বিজ্ঞান মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে না। বরঞ্চ প্রমাণিত হইতেছে, ওগুলি বিজ্ঞান। ঠিক তেমনি মার্ক্সবাদও নতুন পরিবেশ আবিষ্কার করিয়া আগের দিনের মত ও পথ বদলাইয়া নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলা করিতেছে।

এই পরিবেশ পরিবর্তনের দরুনই মার্ক্সবাদ বুঝিয়াছে, সমাজবাদ প্রবর্তনের জন্য আজ আর রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের দরকার নাই। কেন নাই? কারণ সেটা ছিল রাজা-বাদশার যুগ। গণতন্ত্রের ক্ষমতা তখন সীমিত। রাষ্ট্র-ক্ষমতা তখন পুঁজিবাদীদের দখলে। সীমিত ক্ষমতার আইনপরিষদও তখন সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত নয়। শ্রমিকরা তখন কল-কারখানার যন্ত্র মাত্র। কৃষকরা সেকালে সামন্তদের ভূঁইদাস মাত্র। মানবীয় কোনও অধিকারই এদের নাই। এই পরিবেশে সশস্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া আর্থিক ও সামাজিক কোনও সংস্কার সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ কল-কারখানা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র আজ গণতান্ত্রিক। নির্বাচন আজ সার্বজনীন ভোটে। শ্রমিকরা আজ সংঘবদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়ন গড়িবার ও ধর্মঘট করিবার অধিকার আজ সরকার-স্বীকৃত ও আইনে লিপিবদ্ধ। জাতিসংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আই. এল. ও. স্থাপন করিয়াছে। এর নির্দেশনামা আজ সব রাষ্ট্রের উপর বাধ্যকর। সরকার যত বেশী জনগণের সরকার হইবেন, মেহনতি জনতার ক্ষমতা ও অধিকার তত বাড়িবে। এটা ঘটিবে নির্বাচনের মাধ্যমেই। অতএব গণ-মুক্তির জন্য আর বিপ্লবের দরকার নাই। নির্বাচনই যথেষ্ট।

আরেক কারণে বিপ্লব বাঞ্ছনীয় নয়। সমাজ-বিপ্লবের অংশীদার এখন কৃষকরাও। সব দেশেই মিল-শ্রমিকের চেয়ে কৃষকের সংখ্যা অনেক বেশী। এরা মিল-শ্রমিকদের মত সর্বহারা নয়। সর্বহারা হইতেও চায় না। এরা চায় নিজের চাষের জন্য জমি। 'লাংগল যার মাটি তার' এদের স্লোগান। আমাদের দেশের মত অনেক দেশেই বিনা-বিপ্লবে শুধু আইন করিয়া জমিদারি উচ্ছেদ করা হইয়াছে। 'লাংগল যার মাটি তার' আজও হয় নাই বটে, তবে হইবার পথে। বড় বড় জোতদারদের জমি বাযেয়াফত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা অনেক দেশেই হইয়াছে। অন্যান্য দেশের পার্টিরাও করিবে বলিয়া তাদের নির্বাচনী ওয়াদায় এ কথা বলিতেছে। আজ বাদে কাল তা হইবেও। সেটা হইবে নির্বাচিত আইন পরিষদেই।

এই কৃষকরা ছড়াইয়া আছে দেশের সর্বত্র। পক্ষান্তরে মিল-শ্রমিকরা জমায়েত হইয়া আছে শহরে ও উপকণ্ঠে। গোটা দেশবাসীর মধ্যে শহরবাসীর তুলনায় পল্লীবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী। দেশের তামাম সম্পদ, রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা, কৃষকদের অর্জিত সব ফসল, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ঐ গুটিকয়েক শহরে। এইভাবে শহরগুলি হইয়াছে বিশাল পল্লী এলাকার মরুভূমির মধ্যে কতিপয় ওয়েসিস বা মরু-বাগিচা। মিল-কারখানার শ্রমিকরাও কাজেই শহরেই সমষ্টিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষক ও শ্রমিক উভয়েই শোষিত। তাদের স্বার্থও এক। ঐক্যবদ্ধ হইলে নির্বাচনের মাধ্যমেই এরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিতে পারিবে। বিপ্লবের চেয়ে এতে সময় লাগিবে

বেশী ঠিকই। কিন্তু সবদিক বিবেচনায় নির্বাচনই শ্রেষ্ঠতর উপায়। বিপ্লবের খুনাখুনি ও খয়-ক্ষতি ছাড়াও আরেকটা বিপদ আছে। শ্রমিকদের সংহতির ও কৃষকদের অসংহতির দরুন যে-কোনও বিপ্লবের নেতৃত্ব ও পরিণামের রাষ্ট্র-ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে আসিতে বাধ্য। তাতে কৃষকদের স্বার্থহানি হইবে না বটে, কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতায় তারা সমান অংশীদার হইবে না। তাতে মেজরিটির উপর মাইনরিটির শাসনের অবিচারটা আবার অনুষ্ঠিত হইবে। চীনা-বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক ছাড়াও সৈন্য বাহিনীকেও বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার করা হইয়াছে। সেজন্য বিপদ সেখানে আরও বেশী। কৃষকদের মোকাবিলা সৈন্য-বাহিনী শ্রমিক-বাহিনীর চেয়েও অনেক বেশী সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র। কাজেই সশস্ত্র বিপ্লব করিবার যোগ্যতাও তাদের সকলের চেয়ে বেশী। এ অবস্থায় যে বিপ্লবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য-বাহিনীর সমবেত শক্তি নিয়োজিত হইবে, তার নেতৃত্ব এবং পরিণাম রাষ্ট্র-ক্ষমতা সৈন্য-বাহিনীর হাতে আসিবেই। এর নাম গণ-মুক্তি নয়। এক শ্রেণীর বদলে আরেক শ্রেণীকে ক্ষমতায় বসান মাত্র।

অতএব গণ-মুক্তি নিহিত একমাত্র সার্বজনীন ভোটের নির্বাচনে।

ইত্তেফাক, ১০ই অক্টোবর '৭০

১৩

বিপ্লব ও নির্বাচন এবং গণ-আন্দোলন

আমি এর আগের প্রবন্ধে বলিয়াছি, বিপ্লবে নয়, নির্বাচনেই গণ-মুক্তি নিহিত। কথাটা বলিয়াছিলাম বিপ্লবের মোকাবেলায় সার্বজনীন ভোটের নির্বাচনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া। আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম, বিপ্লব শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অগণতান্ত্রিকও বটে। বিপ্লবী সরকার জনগণের কল্যাণ করিতে পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের তিনটি শর্তের মধ্যে মাত্র একটি পূর্ণ করিয়া থাকেন। সম্যকরূপে গণতান্ত্রিক সরকার হইতে হইলে তাঁকে গবর্নমেন্ট 'ফর দি পিপল', 'বাই দি পিপল' এবং 'অব দি পিপল' হইতে হইবে। বিপ্লবী সরকার শুধু 'ফর দি পিপল' হইতে পারেন। বাকী দুইটি হইতে পারেন না। বিপ্লবীরা জনগণকে বিশ্বাস করেন না। নিজেদেরে ছাড়া আর কাউকেই বিশ্বাস করেন না। আর কাউকে সরকার চালাইতেও দেন না। দেশ শাসনে বা জনগণের কল্যাণে কি কি কাজ কিভাবে করিবেন, সে ব্যাপারেও জনগণের মতানুসারে চলেন না। অর্থাৎ নির্বাচন দেন না। এই কারণেই বিপ্লব করিয়া যাঁরা গদি দখল করেন, বিপ্লবের এত ভক্ত হইয়াও তাঁরা আর বিপ্লব চান না। আর কেউ যাতে আরেকটা বিপ্লব করিতে না পারে, তার কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিপ্লবের পরের বিপ্লবকে তাঁরা প্রতিবিপ্লব আখ্যা দেন। তেমন চেষ্টা কেউ করিলে তাঁকে প্রাণদণ্ড দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে নির্বাচন করিয়া যাঁরা গদিতে বসেন, নির্ধারিত মেয়াদ-মধ্যে তাঁরা নির্বাচন ত দেনই, বিপদ দেখিলে তার আগেও নির্বাচন দেন। অতএব দেখা গেল, বিপ্লবীরা বিপ্লবকে বিপদ মনে করেন। আর নির্বাচনীরা নির্বাচনকে বিপদে আসান মনে করেন। কাজেই আমার মতে নির্বাচনই গণ-মুক্তির একমাত্র পন্থা।

এই কথাটারই ভুল ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত প্রয়োগের আশংকা দেখা দিয়াছে সম্প্রতি। নির্বাচন-বিরোধী বামপন্থী বিপ্লবীদের মত ডানদিকেও একদল চরমপন্থী আছেন। তাঁরা নির্বাচন ছাড়া আর কিছু চিন্তাও করিতে পারেন না। সর্ব অবস্থাতে নির্বাচনকেই তাঁরা একমাত্র পথ মনে করেন। যে-সব পার্টি তাঁদের সকল শক্তি-সামর্থ্য দিয়া আন্তরিকভাবে নির্বাচন লড়িতেছেন, তাঁদের কোন-কোন নেতা বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলিতেছেন ঃ'নির্বাচনে যদি জনগণের দাবি-দাওয়া আদায় না হয়, তবে আমরা দেশময় গণ-আন্দোলন শুরু করিব।' এই উক্তিটিরই

পোষকতা ধরিতেছেন নির্বাচনে আস্থাবান কতিপয় গণতন্ত্রী। এই গণতন্ত্রী নির্বাচনবাদীরা উক্ত আন্দোলনবাদী নেতাদের উক্তির মধ্যে কণ্ট্রাডিকশন বা স্ববিরোধিতা আবিষ্কার করিতেছেন। তাঁরা বলিতেছেন, 'যাঁরা নির্বাচন লড়িতেছেন, তাঁদের মুখে আবার আন্দোলনের কথা কেন?' এই যুক্তিটা নিয়া আবার অনেকে ইংগিত করিতেছেন, আন্দোলনের ধমকটা আসলে নির্বাচনে হারিয়া যাওয়ার আশংকা হইতে উদ্ভূত।

নির্বাচনবাদীদের এই বিচার ত্রুটিপূর্ণ। সকল অবস্থায় সর্বদেশে নির্বাচন মাত্রকেই গণ-মুক্তির একমাত্র পথ বলা যায় না। যে সব দেশে গণতন্ত্র পাকাপোক্তভাবে স্থায়ী হইয়াছে, যে-সব রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই গণ-স্বার্থের ও দেওয়ানী আযাদীর সনদ, শুধু সেই সব দেশ ও রাষ্ট্রেই নির্বাচনকে গণ-মুক্তির একমাত্র পন্থা বলা যাইতে পারে। যে-সব দেশের জাতীয় সত্তা আজও ফর্মেটিভ স্তরে, যে-সব দেশে আজও শাসনতন্ত্রই রচিত হয় নাই, যে-সব রাষ্ট্রের শাসকদের সকলের অন্তরে আজও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দানা বাঁধে নাই, যে সব রাষ্ট্রে সিভিল বা মিলিটারী কু' হইবার আশংকা বিদ্যমান এবং যে-সব রাষ্ট্রে ইলেকশন 'রিগ' হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে-সব দেশ ও রাষ্ট্রে নির্বাচনই জনগণের শেষ হাতিয়ার নয়। দৃষ্টান্তের তালাশে বিদেশে না গিয়া নিজেদের দেশেরই দুইটি নযির লইতেছি। একটি, ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন; অপরটি ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেশের শতকরা সাড়ে সাতানব্বই জন ভোটার গদিনশিন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়াছিলেন। যুক্তফ্রন্টের নেতা শেরে-বাংলা ফযলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। পরাজিত মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে গদিনশিন ছিলেন। এক অজুহাতে এই কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত হক মন্ত্রিসভা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া পূর্ব-বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেন। নির্বাচন এখানে জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়।

১৯৬৫ সালে সারা পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনের প্রাইমারি স্তরে দেশের শতকরা আশি-পঁচাশিটা ভোট পাইয়াছিলেন মিস্‌ ফাতেমা জিন্নাহ্‌। কাজেই জনমত সুস্পষ্টরূপে বিপুল মেজরিটিতে মিস্‌ জিন্নার পক্ষে, তার মানে জেনারেল আইয়ুবের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ইলেক্টরেল কলেজের মেম্বরদের অধিকাংশ তাঁদের নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করিয়া আইয়ুবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। ফলে শতকরা ষাট ভোট পাইয়া আইয়ুব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচন এখানে জনমত প্রতিফলিত করিতে ব্যর্থ হয়।

এই দুইটি নযিরের মাপকাঠিতে পাঠক এইবার জনগণের, ভোটারদের তথা তাদের নেতাদের কর্তব্যের বিচার করুন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ-মনোনীত প্রার্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এই নেতারাই কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসিয়া পূর্ব-বাংলার নির্বাচিত সরকার ডিসমিস করিয়াছিলেন। তাঁদের এই কাজ সম্পূর্ণরূপে এবং নির্লজ্জভাবে অগণতান্ত্রিক হইলেও উহা বেআইনী ছিল না। তৎকালে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিধান-মোতাবেক ক্ষমতাবলেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার নির্বাচনটাকে কার্যতঃ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তার মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সামনে নির্বাচন এখানে নিষ্ফল প্রমাণিত হইল। এই অবস্থায় পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কি কর্তব্য ছিল? তাঁদের সামনে শাসনতান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক কোনও প্রতিকার ব্যবস্থা ছিল না। অতএব, জনমতের মর্যাদা, সম্মান রক্ষা ও ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নেতারা যদি তখন গণ-আন্দোলন করিতেন, তবে সেটা কি দোষের হইত? পূর্ব বাংলার নির্বাচিত নেতারা যে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদে গণ-আন্দোলন করেন নাই, সেটা কি তাঁরা ঠিক কাজ করিয়াছিলেন? কখনই না। বরঞ্চ আন্দোলন না করিয়া তাঁরা গণতন্ত্রের অমর্যাদা করিয়াছিলেন, গণতন্ত্র-বিরোধী স্বৈরাচারী শাসক-গোষ্ঠীর হস্ত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারী শাসক-গোষ্ঠী শুধু পূর্ব-বাংলার শতকরা সাতানব্বইজন ভোটারের নির্বাচিত সরকারই ডিসমিস করেন নাই, জনৈক মন্ত্রীকে মন্ত্রী-ভবন হইতে গ্রেফতার করিয়া জেলে পুরিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে নযরবন্দী করিয়াছিলেন। দুই হাজারের বেশী ছাত্র-নেতাকে বিনা-বিচারে আটক করিয়াছিলেন। এখানে গণ-আন্দোলনই কি গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল না? তেমন গণ-আন্দোলন যদি তখন হইত, সে আন্দোলন যদি সফল হইত, তবে তার ফল কি হইত? দেশে বিপ্লব হইত? তা নয়। পূর্ব বাংলার নির্বাচিত সরকারই পুনর্বহাল হইতেন। তাতে নির্বাচন-ভিত্তিক গণতন্ত্রেরই জয় হইত।

১৯৫৪ সালের পরিবেশে নেতাদের কর্তব্য যা ছিল, ১৯৬৫ সালের পরিবেশেও তাঁদের কর্তব্য ছিল অবিকল তাই। এখানেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সুস্পষ্ট জনমত প্রতিফলিত হয় নাই। এক্ষেত্রেও জনগণের রায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণ-আন্দোলন ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তৎকালে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিধান-মতেই ঐ অগণতান্ত্রিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ শাসনতন্ত্র অনুসারে তার প্রতিকারের কোনও বিধান ছিল না। কাজেই একমাত্র পন্থা ছিল গণ-আন্দোলন। আন্দোলনই জনগণের হাতে একমাত্র শেষ হাতিয়ার। তখন যদি গণ-আন্দোলন হইত, তবে সেটা ব্যক্তিগতভাবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে হইত না। তাঁর প্রবর্তিত

আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই সে আন্দোলন হইত। তখন-তখন না হই-লেও পরবর্তী কালে গণ-আন্দোলন হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের জোরেই আয়ুবকে অপসারিত করা গিয়াছে। নির্বাচনের দ্বারা তাঁকে অপসারিত করা যায় নাই। তার মানে নির্বাচন যেখানে ব্যর্থ হইয়াছিল, গণ-আন্দোলন সেখানে সফল হইয়াছে। গণ-আন্দোলন সফল হওয়ায় বিপ্লব হয় নাই। গণতন্ত্রই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই আমরা আসন্ন নির্বাচন করিতেছি।

এতে প্রমাণিত হইল যে, নির্বাচন ও গণ-আন্দোলন পরস্পরের সংগে নিবিড়-ভাবে সংযুক্ত। একটা আরেকটার সম্পূরক। ওটা এটার বডিগার্ড। যেখানে শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্তে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়, অথবা নির্বাচনের ফল জনগণ লাভ করিতে পারে না, সেখানেই আন্দোলন প্রয়োজন হয়। সে আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান। এখানেই বিপ্লব ও গণ-আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য। বিপ্লব সোজাসুজি সরকার দখল করে। গণ-আন্দোলন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার সংশোধন বা দখল করিতে চায়।

এই যুক্তিটাই আসন্ন নির্বাচনে প্রয়োগ করা যাক। জনগণের আর্থিক মুক্তি ও পূর্ব বাংলার প্রতি সুবিচারের ওয়াদা সবই করিতেছেন। এ অবস্থায় নির্বাচনের ফলে গণ-মুক্তি বা পূর্ব বাংলার প্রতি সুবিচার না হইবার কথা উঠে কেন? গণ-আন্দোলনের ধমক দেওয়ার দরকারই-বা কি? এটাই ত প্রশ্ন। এটা ঘটিতে পারে অন্ততঃ তিন রকমেঃ

এক, জনগণের আর্থিক মুক্তি ও পূর্বাঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকরা নির্বাচনে মেজরিটি না হইতে পারেন;

দুই, মেজরিটি হইয়াও নির্বাচনের পরে বিভিন্ন কারণে অনেকে বিশ্বাস ভংগ করিতে পারেন;

তিন, লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্কের অজুহাতে জনগণের ও পূর্ব-বাংলার অনেক ন্যায্য দাবি অগ্রাহ্য হইতে পারেন।

এই তিনটি সম্ভাবনাই যে নিতান্ত বাস্তব, তা বোঝা কঠিন নয়। এই সম্ভাবনা বর্তমান আছে বলিয়াই অনেকে নির্বাচন বয়কটের কথা বলিতেছেন। এঁদের এক-দল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অকর্মণ্যতার দোহাই দিয়া বিপ্লবের কথা বলিতে-ছেন। অপর দল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্কের দোহাই দিয়া নির্বাচন-বিরোধী প্রচারণা চালাইতেছেন। এ অবস্থায় যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সাথে-সাথে গণ-আন্দোলনেরও প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তাঁরা আসলে গণতন্ত্রের খেদমতই করিতেছেন। পক্ষান্তরে যারা গণ-আন্দোলনের নিন্দা করিয়া জনগণকে একান্তভাবে নির্বাচন-নির্ভর করিয়া তুলি-তেছেন, তাঁরা গণতন্ত্রের দুশমনি করিতেছেন, বিপ্লবের সহায়তা করিতেছেন।

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচনী ওয়াদা-মোতাবেক গণ-স্বার্থে রাষ্ট্র চালাইতেছেন কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব ও অধিকার ভোটারদের। কোনও নির্দিষ্ট ওয়াদা না থাকিলেও নির্বাচিত সরকারের সমালোচনা, প্রতিবাদ ও সংশোধনের জন্য সমবেত আওয়ায তোলার গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটারদের সব সময়েই আছে। ভোটারদের এই সমবেত আওয়াযের নামই আন্দোলন। বিশ্বাস-ভংগকারীদেরে আগামী নির্বাচনে ভোট না দিয়া শাস্তি দিবার আশায় ভোটাররা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য নন। তা করিলে গণতন্ত্রের তাতে কল্যাণ হইবে না, বরঞ্চ ঘোরতর ক্ষতিই হইবে। নির্বাচন ছাড়াও অন্য সময়ে ভোটাররা সমবেত আওয়ায তুলিয়া, মানে আন্দোলন করিয়া, নির্বাচিত সরকারকে সংশোধন করিতে অথবা আবার নির্বাচন দিতে বাধ্য করিতে পারেন। এটা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-স্বীকৃত অধিকার। এই অধিকার স্বীকৃত হইলে এবং এই অধিকার বলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরে ভোটারদের প্রভাবে না রাখিলে পরিণামে জনগণ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রেই বিশ্বাস হারাইবে; নির্বাচন-বিরোধী বিপ্লবীদের কথাই সত্য প্রমাণিত হইবে।

একথা অবশ্য সত্য যে, আজ যাঁরা গণ-আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি দিয়া ভোট নিতেছেন, তাঁরাও পরিণামে ওয়াদা খেলাফ করিতে পারেন। তাতেও গণতন্ত্রের উপকার হইবে। আন্দোলনের ওয়াদা খেলাফও অন্যান্য নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফেরই শামিল হইবে। তাতেও ভোটাররা এই শিক্ষাই লাভ করিবেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশ্বাস-ভংগের প্রতিকার গণ-আন্দোলন। অন্যান্য রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার মতই এই চেতনাও গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

ইত্তেফাক ১লা নভেম্বর, '৭০

১৪
পাকিস্তানের আসন্ন বিপদ কোথায় ?

'পাকিস্তান টিকিবে কি না, আসন্ন নির্বাচনেই তা নির্ধারিত হইবে।' কথাটা বলিতেছেন অনেক শ্রদ্ধেয় নেতাই। তাঁরা নিশ্চয় এই অর্থেই কথাটা বলিতেছেন যে, তাঁদের পার্টিকে এবার ভোট না দিলে পাকিস্তান টিকিবে না। যিনি যে উদ্দেশ্যেই কথাটা বলুন না কেন, কথাটা সাংঘাতিক। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পার্টিকে ভোট না দিলে পাকিস্তানের জন্মই হইত না, একথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার এতদিন পরে একটা নির্বাচনে ভোটাররা ভুল ভোট দিলেই পাকিস্তান খতম হইয়া যাইবে, এমন মারাত্মক অশুভ সম্ভাবনা যাঁরা কল্পনা করিতে পারেন, তাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থায়িত্বে আজও বিশ্বাস করেন না। অথচ এইসব নেতার অধিকাংশই বলিতেছেন, ইসলাম রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইবার পাঠকরা এইসব নেতার কথাটার বিচার করুন। ইসলাম রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি। অতএব পাকিস্তান যেদিন ধ্বংস হইবে, ইসলাম ধর্মও সেদিন শেষ হইবে। ইসলাম ধর্ম কিয়ামত তক জারি থাকিবে, ইহা হরেক মুসলমানের ঈমান। কাজেই যেদিন ইসলাম খতম হইবে, সেদিন কিয়ামত হইবে, এই মন্তেক অনুসারে আসন্ন নির্বাচনের ভোটা-ভুটির উপরই বিশ্ব-জগতের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। ঐ ঐ বক্তার পার্টিকে এবার ভোট না দিলে শুধু পাকিস্তান ধ্বংস হইবে না, ঐ সংগে ইসলাম ও দুনিয়া-জাহান ধ্বংস হইয়া যাইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাকিস্তানের একজন ভোটারও এমন উদ্ভট অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করিবেন না। যে-সব নেতা এ-ধরনের কথা বলেন, তাঁদেরও সকলে এমন উদ্ভট কথা বিশ্বাস করেন, তা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ভোটাররা এমন কথা বিশ্বাস করেন না বলিয়া ভোট-ধরা জাল হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইবে। তবু নির্বাচন-প্রার্থীরা যে এমন কথা বলিতেছেন, তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় যাই থাকুক, ভোটারদেরে ঠকাইবার বদলে নিজেরাই ঠকিতেছেন। সে কথা তাঁদের সকলে বুঝিতেছেন না বলিয়াই ঐ অশুভ ঘটনার ধমক দিয়া ভোট আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। অথচ ঐ অশুভ সম্ভাবনায় তাঁরা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। ধমকদাতাদের চোখে-মুখে সে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক। তাই ধমক-গ্রহীতারাও সে ধমকে ভয় পায় না। শিশুরাও যে এমন অসার 'ভুতের' ধমকে ভয় পায় না, প্রায় সব মা-বাবারাই তা অবগত

আছেন। তবু শুধু অশান্ত সন্তানের মা-বাবারাই যে অমন ভূতের ভয় দেখান, তা নয়। ইংরাজ শাসকরা স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে কাবুলী হামলার এবং কাবুলবাসীকে রুশীয় হামলার জুজু দেখাইয়াছেন। মুসলিম লীগাররা পশ্চিম বাংলার ভয় দেখাইয়া পূর্ব বাংলার ভাষার দাবি ও ভারতের ভয় দেখাইয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ নেতারাই আফগানিস্তানের ভয় দেখাইয়া সরহদ্দের পাঠানদের স্বকীয়তার ও স্বাধিকারের দাবি ঠেকাইয়া রাখিতেছেন। জুজুর ভয় দেখাইয়া স্হিতাবস্হা বজায় রাখার এই প্রচেষ্টা সনাতন ও আশু-ফলপ্রদ। তাই ঐ মতবাদের নেতারা পাকিস্তানের বিপদের এমন জুজুর ভয় দেখাইতেছেন।

অথচ ঐসব নেতার ঐ হুঁশিয়ারির মধ্যে একটা সত্য লুক্কায়িত আছে। আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলের উপর সত্য-সত্যই পাকিস্তানের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাঁরা যেদিক হইতে যে অর্থে বিপদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতেছেন, বিপদ সেদিক হইতে সে আকারে আসিবে না, বিপদ আসিবে অন্য দিক হইতে আরেক আকারে। অসাধু অসরলতায় দৃষ্টিহীন নেতাদের অনেকে তা বুঝিতেছেন না। সেই কারণেই ভোটারদেরেও বুঝিতে দিতেছেন না। আসল সত্য কথা এবং প্রকৃত বিপদ এই যে, নেতারা নিজেদের অজ্ঞতার সন্ধান না করিয়া ভোটারদের অজ্ঞতার তালাশ করিতেছেন। আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের নির্ভুল ভোটদানের উপর নয়, বরঞ্চ নির্বাচনের পরে প্রতিনিধিদের নির্ভুল পদক্ষেপের উপরই পাকিস্তানের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। এটা কোনও নতুন কথাও নয়। আমাদের ভোটাররা কোনও দিন ভুল করেন নাই। যত ভুল করিয়াছেন নির্বাচনের পরে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। পাকিস্তান হাসিলের আগে, পাকিস্তান হাসিলের সময়ে এবং পাকিস্তান হাসিলের পরে সবগুলি নির্বাচনেই ভোটাররা নিখুঁত নির্ভুলভাবে ঠিক-ঠিক ভোট দিয়াছেন। প্রতিবারই নির্বাচনের পরে প্রতিনিধিরা ভুল করিয়াছেন। সে ভুলের মাশুল দিতে হইয়াছে ভোটারদেরই বেশী। তবু ভোটাররা ঠিক-ঠিক নির্ভুল ভোট দিয়াছেন। রাগ করিয়াও তাঁরা একবারও ভুল ভোট দেন নাই। এ অবস্হায় নেতাদের ও নির্বাচন-প্রার্থীদের উচিত ভোটারদেরে উপদেশ না দিয়া ভোটারদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করা। নেতারা যে এটা করিতেছেন না, আমাদের বিপদ এইখানে। বরাবরের মতই প্রতিনিধিরা যদি এবারও ভুল করেন, তবে বরাবরের মতই তার শাস্তি ভোগ করিবেন ভোটাররাই। এবারকার নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব এই যে, এবারকার প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। এই শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভর করিবে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। নেতারা যদি এটা না পারেন, তবে ইসলামের কোনও ক্ষতি হইবে না। ক্ষতি হইবে পাকিস্তানের এবং তার জনগণের।

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বরাবরের মতই ভুল করিবেন না, তার কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ যে আন্ধা-চক্করে ঘুরিয়া আমাদের নেতারা পাকিস্তানের জীবনের মূল্যবান প্রথম আট-আটটা বছরেও শাসনতন্ত্র রচনা ও গণতন্ত্র কায়েম করিতে পারেন নাই, পরবর্তী পনর বছর যে আন্ধা-চক্কর আমাদেরে গণতন্ত্র ও আত্মমর্যাদা হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে, নেতারা আজও সেই চক্করেই ঘুরিতেছেন; দিন-দিন আমাদের সমস্যা বাড়াইয়াই চলিয়াছেন।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রো এশিয়ান নয়া রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পাকিস্তানের স্থানীয় মান অনেক উঁচুতে। এই নয়া রাষ্ট্রসমূহের জন্মে গণতান্ত্রিক বিশ্বে যে উল্লাসধ্বনি উঠিয়াছিল, সে ধ্বনিতেও পাকিস্তানের মর্যাদা ছিল অনেক উপরে। কালক্রমে সে নয়া রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে যাঁরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সুসংহত আধুনিক নেশন হিসাবে গড়িয়া উঠিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাদের মধ্যেও পাকিস্তানের স্থান নিতান্ত নিচুতে নয়। প্রধানমন্ত্রী হত্যা, মন্ত্রিসভা ডিসমিস, শাসনতন্ত্র বাতিল, দেশরক্ষা বাহিনীর গদি দখল ইত্যাদি ইত্যাদি রাজনৈতিক অনগ্রসরতা ও অস্থিরতার যতগুলি রোগ-লক্ষণ আছে, তার সবগুলিই আমাদের রাষ্ট্রদেহে উৎকট আকারে দেখা দিয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের এবং সচেতন নাগরিক হিসাবে পাকিস্তানবাসীর ইমেজ নষ্ট হইয়াছে। তার চেয়ে ঘোরতর বিপদের কথা এই যে, তেইশ বছরের স্বাধীন পাকিস্তানে আজও একটা স্থায়ী রাজনৈতিক রীতি, পলিটিক্যাল সিস্টেম, গড়িয়া উঠে নাই। তেইশ বছরে সে একটা সাধারণ নির্বাচন দেখে নাই। আসন্ন নির্বাচন হাতে লইয়াও মুখে তুলিবার আগে বিপদের আশংকায় শংকিত আছে দেশবাসী। কারণ এই তেইশ বছরে একটি মাত্র রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তা হইতেছে নির্বাচন অথবা তার ফল এড়াইয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতা আকড়াইয়া থাকার রীতি। এই রীতি ছাড়া এদেশে আর কোনও পলিটিক্যাল্ কালচার যে শুধু গড়িয়া উঠে নাই, তাই নয়, জাতীয় পরিচিতি, ন্যাশনাল আইডেনটিটি, আজো আমাদের ঠিক হয় নাই। আমাদের বড় বড় নেতারা তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে আজো বলিতেছেন: 'আমরা দৈনিক ও ভাষিক নেশন নই। আমরা কওম নই, আমরা মিল্লাত। আমাদের রাষ্ট্রও ভৌগোলিক রাষ্ট্র নয়, আদর্শিক রাষ্ট্র।' এইসব কথা বলিয়া নেতারা আমাদের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় নেশনহুড গঠনে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। 'আমাদের রাষ্ট্রের টেরিটরিয়াল বাউণ্ডারি নাই,' একথা বলা রাষ্ট্রের জন্য যেমন বিপজ্জনক, 'আমাদের জাতীয়তা আদর্শ ভিত্তিক,' এ কথা বলা নেশনের জন্যও তেমনি বিপজ্জনক।

জাতীয়তার সংজ্ঞা দেওয়া যেমন কঠিন, নেশন গড়াও তার চেয়ে কম কঠিন

নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাই নির্দিষ্ট অখণ্ড ভৌগোলিক চতুঃসীমার মধ্যেকার বাশেন্দাদের একত্রে এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় থাকিবার সংকল্পকেই জাতীয়তাবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক এই জাতীয়তার বুনিয়াদ সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। আধুনিক রাষ্ট্রকে তাই কথায় ও কাজে নেশন-স্টেট হইতেই হয়। ভৌগোলিক, অখণ্ডতা এবং ঐতিহ্যিক, ভাষিক ও রেশিয়াল-ঐক্য যে-সব নয়া রাষ্ট্রের ভিত্তি, গণতান্ত্রিক শাসনাধীনে তারা খুব অল্পদিনেই সুসংহত নেশনে সুগঠিত হইতে পারে। নাগরিকদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশ হইয়া থাকে। অবস্থা-গতিকে পাকিস্তানে এর সবকয়টি উপাদান না থাকার দরুন এমনিতেই জাতি গঠন আমাদের জন্য কঠিন কাজ। তার উপর রাষ্ট্রীয় জাতিত্বের কতকগুলি অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে। নির্ধারিত এলাকার বাশেন্দাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আঠার শতকে ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রজাতি-বোধ সৃষ্টি হয়। সুস্পষ্ট কারণেই জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদের স্রষ্টা ও রক্ষক হইয়া পড়ে। এই কারণেই জাতীয়তাবাদ মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। নীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পরস্পর-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্টরাই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়। মানুষে-মানুষে ও জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধাইয়াছে মূলতঃ এই জাতীয়তাবাদই। বর্তমান আগ্রাসনী যুগে জাতিসংঘ এই সংঘাতকে অনেকখানি সংযত করিয়াছে সত্য, কিন্তু নির্মূল করিতে পারে নাই।

শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নয়, দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও জাতীয়তাবাদ দেশবাসী জনগণের আর্থিক এবং অনেক সময় রাজনৈতিক ও সামরিক শোষণের অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদের জন্ম দিয়াছে, সে পুঁজিবাদই আজ জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করিয়া আন্তর্জাতিক ফ্রি ট্রেডের নামে পুঁজিবাদ রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। কারণ জাতীয়তাবাদ আজ সমাজের উপরের তলায় সীমাবদ্ধ নাই। জাতি আজ জনগণের জাতি। জাতীয় রাষ্ট্র আজ জনগণের রাষ্ট্র। কাজেই জাতীয় অর্থনীতিও আজ গণ-অর্থনীতি। এইভাবে গণতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের প্রচণ্ড সংঘাত বাধিয়াছে। পুঁজিবাদ আজ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ উভয়টার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট' ঐক্যের মোকাবিলা করিবার অজুহাতে পুঁজিবাদে আজ 'ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটালিস্ট' ঐক্যের স্লোগান উঠিয়াছে।' ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্ল্ড ইউনাইট' এই স্লোগানের জবাবে পুঁজিবাদীরা স্লোগান দিতেছে ঃ 'ক্যাপিটালিস্ট অব দি ওয়ার্ল্ড ইউনাইট।' শ্রমিকদের চেয়ে ধনিকরা স্বভাবতঃই অধিক বিত্তবান

ও বেশী সুসংহত। তবে শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ-বিত্তে পুঁজিবাদীরা বেশী হইলেও জনশক্তিতে তারা খুবই কম। সেজন্য প্রচার-প্রপাগাণ্ডার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করা তাদের প্রথম কাজ। এটম যুদ্ধ বাধান তাদের শেষ কাজ। যুদ্ধের প্রতিবন্ধক জাতিসংঘ। জাতিসংঘ ভাংগিতে হইলে আগে 'জাতি' ভাংগিতে হইবে। কিন্তু পুঁজিবাদ রক্ষা করিতে গিয়া মানবজাতি নির্মূল করা স্পষ্টতঃই পুঁজিবাদীদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করিতে পারিলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। এটা করিতে হইলে গণতন্ত্রের অসারতা ও জাতীয়তার সংকীর্ণতা প্রমাণ করা দরকার। পুঁজিবাদের উপকারিতা বয়ান করিয়া এটা করা সম্ভব নয়। তাই পুঁজিবাদীরা ধর্মকে তাদের প্রচারের হাতিযার করিয়াছেন। পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট বিলাসিতা, চরিত্রহীনতা, মিথ্যাচার ও দুর্নীতির মত পাপের জন্য গণতন্ত্রের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দুনিয়ার সর্বত্র ধর্মযাজক, 'শিবসেনা' ও 'হিয্বুল্লারা' এই পাপপূর্ণ দুনিয়ার 'কিংডম-অব গড' 'আল্লার বাদশাহি' বা 'রাম রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। গণতন্ত্র ধর্ম-বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-বিরোধী, ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় সব আল্লার সৃষ্টি; সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে চোখের পলকে এই অসমতা দূর করিতে পারিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি আপাতঃ-শ্রুতিমধুর কথা বলিয়া সুকৌশলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার 'শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম' চালাইয়া যাইতেছেন। সুযোগ ও যুক্তি মিলিয়াছে হাতের কাছেই। অখণ্ড ভারতের মুসলমানরা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিতান্ত রাজনৈতিক কারণে দেশ ভাগ করিয়াছে। মুসলমান রক্ষার এই ব্যবস্থাকে 'ইসলাম রক্ষার' ব্যবস্থা বলিয়া চাপাইয়া দেওয়া কঠিন হয় নাই। কাজেই বিশ্ব-পুঁজিবাদীদের গণতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামটা পাকিস্তানেই জমিয়াছে ভাল। জাতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র সমাজবাদ। তাই বিশ্বের সর্বত্র খাঁটি গণতন্ত্রীরা সমাজবাদী হইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজবাদের অর্থনীতিটা বিশ্ব-কমিউনিযমের অর্থনীতির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই কমিউনিযমের ধর্ম-বিরোধিতাকে সমাজবাদের উপর চাপাইয়া ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে ধর্মহীন রাজনীতি আখ্যা দিয়া আসন্ন রাজনৈতিক নির্বাচন-যুদ্ধটাকে নেতারা অরাজনৈতিক ধর্ম-যুদ্ধে রূপান্তরিত করিতেছেন।

আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিপদ এইখানে।

ইত্তেফাক, ৭ই নভেম্বর, '৭০

১৫
দেশ, রাষ্ট্র ও নেশন

পলিটিশিয়ান মাত্রেই স্টেট্‌সম্যান হন না। রাষ্ট্রনায়ক মাত্রেই চিন্তানায়ক হন না। হওয়া কঠিনও; হওয়ার দরকারও নাই। রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রের নিত্যকার প্রয়োজন। চিন্তা নায়ক জাতির যুগের প্রয়োজন। পলিটিশিয়ান পরিচালিত হন দেশের পলিটিক্‌সের দ্বারা। পলিটিক্‌স পরিচালিত হয় স্টেট্‌সম্যান দ্বারা। পলিটিশিয়ানের কাছে তাঁর নিজের সাফল্য বড়। জনপ্রিয়তা তাঁর ন্যায্য মূলধন। দেশের অনিষ্টের রিস্ক নিয়াও তাই পলিটিশিয়ান তাঁর জনপ্রিয়তা রক্ষা করেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তিনি অন্যায় জানিয়াও প্রচলিত জনমতের গড্‌ডালিকায় গা ভাসাইয়া দেন। যিন্দাবাদ বলিয়া শুধু মিসিলে শামিল হন না, আগের কাতারেও চলিয়া যান।

কিন্তু স্টেট্‌সম্যান তা পারেন না। নিজের সাফল্যের চেয়ে তাঁর কাছে দেশ বড়। জনপ্রিয়তার চেয়ে দেশের কল্যাণ বড়। সেজন্য আন-পপুলারিটি ও বিপদের রিস্ক নিয়াও তিনি প্রচলিত জনমত, প্রথা ও আইনের বিরুদ্ধে দেশের মংগলের কথা বলেন। এ-কাজে স্পষ্টতঃই বিপদ আছে। আছে বলিয়াই সে বিপদের ঝুঁকি সকলে নিতে পারেন না। নেওয়ার দরকারও হয় না। জাতীয় জীবনের যুগ-সন্ধিক্ষণ ছাড়া অন্য সময়ে এমন ত্যাগী দুঃসাহসী নেতার প্রয়োজন পড়ে না। নর্মাল অবস্থায় মামুলি সৎ-সাধু পলিটিশিয়ানই দেশের জন্য যথেষ্ট। জাতীয় জীবনে তেমন যুগ-সন্ধিক্ষণ প্রতিদিন আসে না। আসে যুগ-যুগান্তরে। কিন্তু তা যখন আসে, তখন পলিটিশিয়ান দিয়া কাজ চলে না, তাঁরা যতই সাধু-সৎ হউন না কেন। স্টেটসম্যানের আবির্ভাব তখন জাতীয় অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠন এমনি যুগ-সন্ধিক্ষণ। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে এমনি গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সন্ধিক্ষণ দেখা দেয়। ফলে এদের অস্তিত্বের জন্য দরকার হয় স্টেট্‌সম্যানের। সে স্টেট্‌সম্যান ছিলেন কায়দে-আযম জিন্নাহ্‌। তিনি আমাদেরে একটি রাষ্ট্র দিয়াছেন। এই রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের পাকিস্তানী জাতিরূপে গড়িয়া তুলিবার আগেই কায়েদে-আযম পরলোকগমন করেন। এই অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্য দরকার হয় আরেকজন স্টেট্‌সম্যানের। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন সেই স্টেট্‌সম্যান। এইখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে শহীদ সাহেবের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

দেশ হইতে জাতি। জাতি হইতে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হইতে নেশন। দেশ মাত্রেরই রাষ্ট্র নাও থাকিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র মাত্রেরই দেশ থাকিতে হয়। ১৯৪৭ সালের আগে আমাদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু দেশ ছিল না। আমরা জাতি ছিলাম, কিন্তু নেশন ছিলাম না। কারণ আমাদের রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্রের অভাবে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ছিল আমাদের অস্পষ্ট, অগভীর, ভাসা-ভাসা। আমরা তখন 'মুসলিম হ্যায় হাম সারা জাহাঁ হামারা।' 'নি-নাইয়ার দশ নাউ' এর মত। ইহুদী জাতির মতই আমরা তখন শুধু বিশ্ববাসী। সুতরাং দেশহীন ধর্ম-সম্প্রদায় মাত্র। পাকিস্তান হাসিল হওয়ায় আমরা গড়িয়া তোলার মত রাষ্ট্র পাইলাম। ভালবাসিবার মত দেশও পাইলাম। কিন্তু পরিচয় দিবার মত জাতি হইলাম না। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা-মতে আমরা পাকিস্তানী জাতি। কারণ পাকিস্তান আধুনিক রাষ্ট্র। বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের মেম্বর হইতে হইলে তাকে হইতে হইবে নেশন-স্টেট। 'নেশন' ও নেশন-স্টেটের' সংজ্ঞা পাকিস্তান সৃষ্টির এক শ বছর আগেই নির্ধারিত হইয়াছিল। বিশ্বের রাষ্ট্রীয় দরবারে স্থান পাইতে হইলে আমাদিগকে সে সংজ্ঞার সাথে খাপ খাইতে হইবে।

এইখানেই আমরা মুশকিলে পড়িলাম। বিভ্রান্তি শুরু হইল এইখান হইতেই। এই বিভ্রান্তির জটিলতা ও গভীরতাই শহীদ সাহেবের দায়িত্বের গুরুত্বের পরিমাপ। জাতি গঠন কোন-কোনও দিক দিয়া রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার চেয়েও কঠিন কাজ। ইটালির মুক্তি-সাধক, নয়া ইটালির প্রতিষ্ঠাতা গ্যারিবল্ডি অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে ইতালিকে মুক্ত করিয়া সম্মিলিত ইটালি গঠনের পরেও তিনি তাই বলিয়াছিলেনঃ 'আজ আমরা ইটালি রাষ্ট্র গঠন সমাধা করিলাম। এখন হইতে আমাদিগকে ইটালি নেশন গঠনের কাজ শুরু করিতে হইবে।'

পাকিস্তানের বেলা এ কাজ আরও বেশী কঠিন ছিল। পাকিস্তান হাসিল করিয়াছিলেন কায়েদে-আযম ভারতীয় মুসলমানদের নেতারূপে, মুসলমানদের পক্ষ হইতে, মুসলমানদের দাবি-মতে, মুসলমানদের 'হোমল্যান্ড' হিসাবে। সুতরাং স্বভাবতঃই এবং ন্যায়তঃই সকলের ধারণা হইল, পাকিস্তান একক মুসলমানদেরই রাষ্ট্র। এই ধারণা ভুল। কায়েদে-আযম এই ভুল ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করেন প্রথম সুযোগেই। ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট পাকিস্তান গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ 'আজ হইতে আমরা আর হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান-পার্শি জাতি নাই; আমরা সকলে এক পাকিস্তানী জাতি।'

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার এই ওসিয়তনামা শহীদ সাহেবের দায়িত্ব মোটেই লঘু ও সহজ করিতে পারে নাই। কারণ কাজটা এমনিতেই ছিল কঠিন। তার

উপর কায়েদে-আযমের রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারীরা তাঁর ওসিয়তনামার শুধু বরখেলাফই করেন নাই, উহাকে মনসুখ সাবেত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। পাকিস্তানকে তাঁরা শুধু মুসলিম রাষ্ট্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে চান নাই, ইহাকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' পর্যন্ত আখ্যা দিয়াছেন। তাঁদের এইসব কথা ও কাজকে অন্যায়, অসংগত, যুক্তিহীন বা লজিক-বিরোধী বলাও যায় না। ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি হইল। সে ধুয়ায় ভ্রান্তি-বিশ্বাসের যে গোলক-ধাঁধা রচিত হইল, তাতে আমরা আজও আটক পড়িয়া আছি বলিয়া মনে হয়।

কাজেই শহীদ সাহেবের দায়িত্ব ছিল বিপদ-সংকুল, বাধা ছিল পর্বত-প্রমাণ, পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু শহীদ সাহেব ছিলেন সংগ্রামী। বাধা যতই বেশী হইত, সংকল্প তাঁর ততই দৃঢ় হইত; কর্তব্য যত কঠিন হইত, প্রতিভা তাঁর তত তীক্ষ্ণ হইত।

সমস্যাও ছিল অত্যন্ত জটিল। 'হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি'-তত্ত্বের উপর পাইলাম পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলিমে এক জাতি হইবে কেমন করিয়া? পাকিস্তানের বুনিয়াদই যে তাতে ধ্বসিয়া পড়ে! হিন্দু-প্রভাবের কবল হইতে ইসলামী তহযিব-তমদ্দুন রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান করিলাম, এখন একে ইসলামী রাষ্ট্র বলিতে আপত্তি কেন? ঐক্য, ঈমান ও শৃংখলাই আমাদের রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রের অজুহাতে দল সৃষ্টি করিয়া সে ঐক্য-সংহতি নষ্ট করা চলিবে না। ইসলাম নিজেই গণতন্ত্রী ধর্ম। মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অন্য কোন পার্টি করা চলিবে না। গবর্নমেন্টের বিরোধিতা করার মানেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করা। পাকিস্তানের বিরোধিতা করা মানেই ইসলামের বিরোধিতা করা। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি বলিয়াই আমরা পৃথক নির্বাচন প্রথা চাহিয়াছিলাম। এই পৃথক নির্বাচন-প্রথার জোরেই আমরা পাকিস্তান পাইয়াছি। কাজেই পৃথক নির্বাচন-প্রথা আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।

এসব যুক্তির কোনটাই ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তার উপর রাষ্ট্র-নায়কদের হাজার বার পুনরুক্তিতে গণ-মনে ঐসব যুক্তি বিশ্বাস ও ঈমানের মতই দৃঢ়মূল হইয়াছে। সর্বোপরি ঐসব যুক্তির অনেকগুলি স্বয়ং সোহ্রাওয়ার্দীও দিয়াছিলেন দুই দিন আগে। কাজেই সোহ্রাওয়ার্দীকে কার্যতঃ যুগপৎভাবে তিন ফ্রন্টে লড়াই করিতে হইয়াছিল। এক, অদূরদর্শী রাষ্ট্র-নায়কগণ; দুই, বদ্ধমূল বিশ্বাসী জনসাধারণ; তিন, নিজের-দেওয়া যুক্তিসমূহ। অসীম ধৈর্য, দুর্জয় সাহস, অফুরন্ত কর্ম-শক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধারাল যুক্তি, অসাধারণ বাগ্মিতা ও উদার দৃষ্টিভংগির বলে তিনি শেষ পর্যন্ত সব ফ্রন্টেই

জয়লাভ করিয়াছিলেন। সে জয়ের মূলে তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস ছিল তাঁর বিশাল অন্তরের সুন্দর পাকিস্তানের বিরাট স্বপ্ন এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর অধীর আগ্রহ।

'দ্বি-জাতি-তত্ত্ব' খণ্ডনেই তাঁর সবচেয়ে বেশী শাণিত যুক্তি দিতে হইয়াছিল। কারণ এতে দরকার ছিল বিপ্লবাত্মক পরিবেশ পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আবশ্যক ছিল রি-থিংকিং। অখণ্ড ভারতে যা সত্য ছিল, পাকিস্তানে তা সত্য নাও হইতে পারে, এ-কথাটাও বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন ছিল। অখণ্ড ভারতে মুসলমানরা ছিল মাইনরিটি, হিন্দুরা বিপুল মেজরিটি। সেখানকার জাতীয় সংমিশ্রণে মুসলমানরা হিন্দুদের বিপুলতায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু পাকিস্তানে মুসলমানরাই বিপুল মেজরিটি। এখানকার জাতীয় সংমিশ্রণে হিন্দুদের মধ্যে বা অন্য কোনও অমুসলমানের মধ্যে আমাদের মিলাইয়া যাইবার কোন আশংকা নাই। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিলে তার স্বতঃসিদ্ধ পরিণামও মানিতে হইবে। আমরা যে যুক্তিতে অখণ্ড ভারতে পাকিস্তান বা 'ন্যাশনাল হোমল্যাণ্ড' দাবি করিয়াছিলাম, হিন্দুরাও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তেমনি একটি হোল্যান্ড দাবি করিতে পারিবে।

হিন্দুরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়াছিল। কাজেই তাদের লইয়া পাকিস্তানী জাতি গঠন করিতে হইলে তাদের প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর করা দরকার ছিল। পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানী হিন্দুদের আনুগত্য সম্পর্কে সোহ্‌রাওয়র্দী যে উক্তি করিয়াছিলেন, উহা ছিল জাতীয় নেতার উপযুক্ত উদার ও দূরদর্শী উক্তি। তিনি দেশবিভাগের পর-পরই বলিয়াছিলেন: 'পাকিস্তানের হিন্দু ও হিন্দুস্থানের-মুসলমানদের আনুগত্য বিচারে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজ-আলীগড়ের মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব করিলেও তারা জানিত তাদের আবাসভূমি পাকিস্তানে পড়িবে না। কাজেই তারা মনের দিক দিয়া আগে হইতেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বাংলা-পাঞ্জাব-সিন্ধু-সরহদ্দের হিন্দুরা শেষদিন পর্যন্ত আশা করিতেছিল, দেশ ভাগ হইবে না। কাজেই দেশভাগের পরে তাদের মানসিক এ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হইবে। এই মুহূর্তে তাদের আনুগত্য লইয়া খোঁচা-খুঁচি করা উচিত নয়।' সোহ্‌রাওয়ার্দী আরও বলিয়াছেন: 'আমাদের মনে রাখিতে হইবে, দেশের ভূখণ্ডই ভাগ হইয়াছে; দেশের বাশিন্দা ভাগ হয় নাই। লোক স্থানান্তরিত হইবে না, এই শর্তেই দেশ ভাগ হইয়াছে।'

পাকিস্তান মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া সম্পর্কে সোহ্‌রাওয়ার্দী কায়েদে-আযমের সুর সুরে মিলাইয়া বলিয়াছেন: 'পাকিস্তান পাকিস্তানীদেরই রাষ্ট্র,

কোন ধর্মসম্প্রদায়ের রাষ্ট্র নয়। শুধু মুসলমানরাই পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, এটাও যেমন সত্য নয়, সব মুসলমানই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করিয়াছে, এটাও তেমনি সত্য নয়। ডাঃ আম্বেদকারের নেতৃত্বে তপসিলী হিন্দুরা ও পূর্ব বাংলার বৌদ্ধরা পাকিস্তানের দাবির সক্রিয় সহায়তা করিয়াছে। পক্ষান্তরে বহু মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্র ও সক্রিয় বিরোধিতা করিয়াছে। তাছাড়া, শুধু মুসলমানরাই পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে, একথা যদি মানিয়াও লওয়া হয়, তবু পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র হইতে পারে না। শুধু কংগ্রেস একা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীন ভারত শুধু কংগ্রেসীদের এবং তাদের বংশধরদের দেশ হইয়া যায় নাই। ঠিক তেমনি, শুধু মুসলিম লীগ একা পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে বলিয়াই আযাদ পাকিস্তান মুসলিম লীগারদের ও তাদের বংশধরদের দেশ হইয়া যায় নাই। সব ভাল কাজেই উদ্যোগী হয় এবং নেতৃত্ব করে মুষ্টিমেয় লোক। তাই বলিয়া সে সব ভাল কাজ, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের ফলভোগের অধিকার ঐ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।' স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন মুষ্টিমেয় উদ্যোগী লোক। কিন্তু তার ফল ভোগ করে জনসাধারণ। তেমনি পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের জন্য অর্জিত হয় নাই, হইয়াছে সমস্ত পাকিস্তানীর জন্য।

আর ইসলামী তহযিব-তমদ্দুন রক্ষার কথা? এ বিষয়ে সোহ্রাওয়ার্দী বলিয়াছেনঃ 'পাকিস্তান মুসলিম-মেজরিটির দেশ। এটা শাসিত হইবে গণতান্ত্রিক পন্থায়। আইন-কানুন রচিত হইবে মেজরিটি ভোটে। কাজেই শাসনতন্ত্রে লেখা না থাকিলেও এদেশে ইসলাম ধর্ম, তহযিব ও তমদ্দুন সুরক্ষিত থাকিবেই।

নির্বাচন-প্রথা সম্পর্কে সোহ্রাওয়ার্দী বলিয়াছেনঃ পৃথক নির্বাচন প্রথা মাইনরিটির আত্মরক্ষার অস্ত্র। মেজরিটির পক্ষে তার দরকার নাই; সুতরাং সে দাবি অযৌক্তিক। রুগ্ন অবস্থার ঔষধ ও খাদ্য সুস্থ অবস্থায় চলে না। ঔষধ খাইয়া রোগ সারিয়াছে বলিয়া ভাল হইয়াও ঔষধ খাইয়া যাইতে হইবে? তাছাড়া হিন্দু-মুসলমানের জন্য পৃথক-নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করার মানেই দ্বি-জাতি-তত্ত্ব প্রয়োগ করা। কাজেই দ্বি-জাতি-তত্ত্বের স্বীকৃতির যা যা বিপদ, স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার মধ্যে সেই সেই বিপদ নিহিত রহিয়াছে।

গণতন্ত্রের যত ভিন্ন রূপই থাকুক না কেন পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন এখানে পার্লামেন্টারি ক্যাবিনেট সিস্টেম ছাড়া অন্য কোনও সিস্টেম চলিতে পারে না। একাধিক পার্টি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। তেমন পার্টি গঠনকে বিভেদ সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। কায়েদে-আযম নিজেই

এ বিষয়ে সাবধান করিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লীগ নেতাদের নির্বন্ধাতিশয়ে মুসলিম লীগ বজায় রাখিতে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্থলে রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে কাজ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী গভর্নর-জেনারেলের সেক্রেটারিয়েট হইতে এই মর্মে পাকিস্তান সরকারের একটি প্রেস-নোট বাহির হয়ঃ "গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ও তারপর করাচীতে লীগ কাউন্সিলের যে গোপন অধিবেশন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য। তখন লীগ সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিত। দেশ ভাগ হইবার পর লীগ এখন পার্টি হিসাবে কাজ করিবে। আগের মত গোটা মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবে না। তদনুসারে লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে।" এ সত্ত্বেও লীগনেতারা মুসলিম লীগকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান দাবি করিয়া চলিয়াছিলেন এবং অন্য কোনও পার্টি করাকে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা আখ্যা দিয়াছিলেন। বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে সোহরাওয়ার্দী অবশেষে আইন পরিষদে অপযিশন দলের সরকারী স্বীকৃতি আদায় করিয়া পাকিস্তানকে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থার আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন।

পাকিস্তান রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক অবদানের সংক্ষিপ্ত ইশারা-মাত্র উপরে করা হইল। তাঁর মিশনের দুঃসাধ্যতাই তাঁর নেতৃত্বের বিরাটত্বের সাক্ষী। সে মিশনের পূর্ণ সাফল্যে আরও অনেক দিন লাগিবে, তার সুস্পষ্ট লক্ষণ চোখের সামনেই দেখিতেছি।

আমাদের মহান নেতার এই স্মৃতি-দিবসে আমরা যদি তাঁর অসমাপ্ত আদর্শকে চূড়ান্ত রূপ দিবার সংকল্প নিতে পারি, তবেই তাঁর পুণ্য-স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখান হইবে।

ইত্তেফাক, ৫ই ডিসেম্বর, '৬৯

১৬

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কি সম্ভব ?

আজ কায়েদে-আযমের মৃত্যুবার্ষিকী। এই স্মরণীয় দিনে সকল কথার আগে মনে প্রশ্ন জাগে ঃ কায়েদে-আযমের অতিপ্রিয় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র কি পাকিস্তানে আর আসিবে না ? কায়েদে-আযম বলিয়াছিলেন ঃ 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে জনগণ নিজেরা।' কিন্তু নিজ হাতে নিজের পছন্দমত কোনও শাসনতন্ত্র যদি তিনি দিয়া যাইতেন, তবে সেটা নিশ্চয়ই হইত পার্লামেন্টারি। আমাদের দেশেই তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও নিজের নামে নিজের রচিত শাসনতন্ত্র জারি করিয়াছেন। কিন্তু কায়েদে-আযম তা করেন নাই। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পাকিস্তানে কেবিনেট সিস্টেমের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই কায়েদে-আযমের কাম্য ছিল। এই পদ্ধতির প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রাণের টান ছিল। এটা জানা কথা। তাই তাঁর সহকর্মীরা নানা বিভ্রান্তি সত্ত্বেও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রেই হাত মক্শ করিতেছিলেন। কিন্তু এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রেরই অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল জেনারেল আইউবের হাতে। তাকে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করিবার আয়োজনও প্রায় হইয়া গিয়াছিল। এমন হইয়াছিল যে, আমার মত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভক্তেরও ঈমান প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আইউব-শাহির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন যখন গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করিয়াছিল, সাফল্য যখন প্রায় আমাদের দুয়ারের সামনে, তখনও আমরা অনেকেই ভরসা করিতে পারি নাই যে, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন। বস্তুতঃ আমার চেয়ে জ্ঞানী অনেক রাজনীতিবিদ তখনও বলিয়াছিলেন ঃ আইউব-শাহি খতম হইবে ঠিকই, কিন্তু পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আসিবে না। কথাটা আমি প্রায় বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছিলাম। বিশ্বাস না করিয়াই বা উপায় কি ছিল ? যখন দেখিতাম, জাতীয় দৈনিক-পত্রিকার উচ্চ-শিক্ষিত সম্পাদকরা সম্পাদকীয় লিখিতেছেন ঃ 'দেশবাসী শাসনতন্ত্র চায় না, আপনি আইউব সাহেবের ব্যক্তিগত শাসন চায়', যখন দেখিতাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. অধ্যাপকেরা খবরের কাগজে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া এবং রেডিও-টেলিভিশনে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিয়া বুনিয়াদী গণতন্ত্রের বিস্ময়কর মহিমা কীর্তন করিতেছেন, যখন দেখিতাম, হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের বহুদর্শী বিচারপতিরা রায় দিতেছেন, 'পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে', তখন আমাদের মত অল্প বুদ্ধির লোকদের ভাবিবার বা বিচার করিবার আর ছিলই-বা কি ? এমনি বিভ্রান্তির ঘনঘটাপূর্ণ অমানিশায়

অকস্মাৎ বিজলি চমকের মতই আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি নির্বাচনের দিন-তারিখও স্থির করিয়াছেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই এই নির্বাচন হইবে, তাও বলিয়াছেন। এতে সেই বুদ্ধিমান সম্পাদকেরা, সেই পণ্ডিত অধ্যাপকেরা এবং আইউব-শাহির অতশত সমর্থকেরা, কি ভাবিতেছেন, জানি না। কিন্তু গোটা দেশবাসী ও তাদের নেতৃবৃন্দ সকলেই এতে খুশী হইয়াছেন। কাজেই পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। কায়েদে-আযমের বাঞ্ছিত ও অভীপ্সিত রাষ্ট্ররূপ বাস্তবায়িত হইতেছে, এটা আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু এর পরেও সমস্যা ও সংকট থাকিয়াই যাইতেছে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার কায়েম হইবে ঠিকই, কিন্তু তাতে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিও সাধিত হইবে কি ? এই প্রশ্নটাই আজ অনেকের, বিশেষতঃ আমাদের তরুণদের এক বিপুল অংশের, মনে দোলা দিয়াছে। দোলা দিয়াছে এই জন্য যে, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনও মূল্য নাই জনগণের জীবনে।

জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি মানেই সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা। কাজেই স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিয়াছে ঃ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি ? হইলই-বা সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত, হইলই-বা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠিত, তাতে জনগণের লাভ কি ? ধনতন্ত্রের উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত শুধু ভোটের দ্বারা কি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসিতে পারে ? মহামতি লেনিন বলিয়াছেন ঃ 'ধনতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থায় ভোটের গণতন্ত্র একটা প্রহসন মাত্র। কারণ, সে সমাজে ভোট সমান বটে, কিন্তু ভোটাররা সমান নয়।' কথাটার তাৎপর্য এই যে, ধনতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থায় টাকাওয়ালা নির্বাচন-প্রার্থীরা বিপুল অর্থব্যয়ে লক্ষ ভোটারের ভোট কিনিয়া আইন সভার মেম্বর নির্বাচিত হইতে এবং পরে মেম্বরদের মধ্যে টাকা বিতরণ করিয়া মন্ত্রী হইতে পারেন।

কথাটা মিথ্যাও নয় , আশংকাটা ভিত্তিহীনও নয়। কিন্তু আমাদের বিচার করিতে হইবে, এর কি কোনও প্রতিকার নাই ? বিচার করিতে হইবে এই জন্য যে, বর্তমান যুগের মানুষ একদিকে যেমন গণতন্ত্রকেই তাদের রাষ্ট্রীয় আযাদির একমাত্র হাতিয়ার মনে করে, অপরদিকে তেমনি সমাজবাদকেই তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র পন্হা মনে করে। এক কথায়, তারা গণতন্ত্রও চায়, সমাজবাদও চায়। দুইটাকেই তারা ভালবাসে। একটা ছাড়িয়া

অপরটা রাখিতে তারা পারে না। : একদিকে যেমন তারা অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় রাজনৈতিক ডিক্টেটরের গোলামি করিতেও রাযী নয়, অপর দিকে রাজনৈতিক আযাদির নামে ধনিকের শোষণের শিকার হইতেও তারা প্রস্তুত নয়। সোজা কথায় জনগণ ভোটের বদলে ভাত কিনিতেও রাযী না; আবার ভাতের বদলে ভোট কিনিতেও রাযী না। তারা ভাতও চায়, ভোটও চায়। সমস্যা ও সংকট এইখানেই। একদিকে সনাতনী গণতন্ত্র দেওয়ানী আযাদি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিতে নারায; অপরদিকে সনাতনী সমাজবাদ বিশ্বাস করে, বল প্রয়োগ ও সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্রের ভুঞ্জিত অধিকারীরা কিছুতেই 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' মনোভাবের বশবর্তী হইয়া আসন ত্যাগে অস্বীকার করিবে। এতএব বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ধনতন্ত্রের তৎকালীন অপ্রতিহত ক্ষমতা, তার পৃষ্ঠপোষক রাজতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং এ সবের মোকাবিলা অসংঘবদ্ধ অধিকারহীন অসহায় শ্রমিক শ্রেণীর যে পরিবেশে যে তথ্য ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ 'অবিরাম শ্রেণী-দ্বন্দ্বের' কথা বলা হইয়াছিল, তার কতটুকু বর্তমান পরিবেশে প্রযোজ্য? একটু অভিনিবেশ সহকারে তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, সে-সব তথ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বহুগুণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এক শ' বছর আগে মার্কস এংগেল্স্ ও পঞ্চাশ ষাট বছর আগে লেনিন যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার অনেকগুলি আজও তেমনি সত্য আছে বটে কিন্তু আবার অনেকগুলি সত্য নাইও। অতএব তাঁদের বর্ণিত মূল নীতির ভিত্তিতে নতুন অবস্থায় নতুন পরিবেশে সব কথাই আমাদের নতুন করিয়া চিন্তা করিতে এবং কর্মপন্হা নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধনতন্ত্রের আগেকার সেই 'লেসায-ফেয়ার' বা 'যা খুশী তাই' করিবার ক্ষমতা এখন আর নাই। সকল দেশের সরকাররাই আজ কোন-না-কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্হা শিল্প-বাণিজ্যের উপর চাপাইয়াছেন। কোন কোন সরকার সোজাসুজি ব্যাংক ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি ধনতন্ত্রের ঘাঁটি ও বহু শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। যেগুলি করেন নাই, তারও উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন। যেসব সরকার সোজাসুজি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন নাই, তাঁরাও 'পাবলিক সেক্টর' ও 'প্রাইভেট সেক্টর' নামে ধনিকদের এলাকা সংকুচিত করিয়াছেন।

অপরদিকে সরকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, তাঁদের ধর্মঘটের অধিকার,

সর্বনিম্ন মজুরি ইত্যাদি সকল ব্যাপারে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ায় শ্রমিকরা অনেক সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়াছে। তাদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলার অধিকার বা সাহস এখন আর কোনও মালিকের নাই। আই. এল. ও.র মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাইয়াছে।

এই অবস্থায় দেশের সরকার যদি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়, তবে একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্যের উপর ত বটেই, এমন কি ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প-বাণিজ্যেও শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার, এমন কি মালিকানা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কাগজে-কলমে শ্রমিকদের অনেক অধিকার থাকিলেও সরকার যদি জনগণের না হয়, অন্ততঃ শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয় তবে সরকারী প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সহায়তার মালিকরা শ্রমিকদের সে সব অধিকার সাবটাশ করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু জনগণের নির্বাচিত নির্বাচনী-ওয়াদাবদ্ধ সরকার গদিতে থাকিলে এটা সম্ভব নয়। অধিকন্তু আজ সব মালিকানা শেয়ারে বিভক্ত ও বিতরিত লিমিটেড কোম্পানি। জনগণের সরকার ইচ্ছা করিলেই আইন করিয়া সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের শেয়ারের ব্যবস্থা করিতে পারেন, এমন কি ম্যানেজমেন্ট ও ডাইরেক্টর বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশের সার্বভৌম আইন পরিষদে আইন পাস করিয়া জনগণের সরকার যদি এইভাবে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের মালিকানা ও পরিচালনার ব্যবস্থা করেন তবে তেমন আইন মানিবেন না এবং সে আইনের বিরুদ্ধে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স শুরু করিবেন, এমন ধনিক কোন দেশে কতজন আছেন ?

দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে এই ভাবে শ্রমিকায়ত্ত করিলে তার ফল সোজা-সুজি রাষ্ট্রায়ত্ত করার চেয়ে অনেক ভাল হয় শ্রমিকদের দিক হইতেও শিল্প-বাণিজ্যের এফিশিয়েন্সির দিক হইতেও। অনেক সময় দেখা গিয়াছে কোন শিল্পকে ন্যাশনালাইযেশন করিতে গিয়া কার্যতঃ তাকে ব্যুরোক্র্যাটাই-যেশনই করা হইয়াছে। কি শ্রমিকদের, কি রাষ্ট্রের তাতে কোনও লাভ হয় নাই। সোশিয়ালিযম ও স্টেট সোশিয়ালিযমের তুলনামূলক বিচার করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এই প্রসংগে বলিয়া রাখা ভাল যে, যে-সাধু উদ্দেশ্যে, কৃষক-প্রজার যে কল্যাণের আশায় আমরা জমিদারী উচ্ছেদের আন্দোলন করিয়াছিলাম, প্রাইভেট জমিদারির জায়গায় স্টেট ল্যান্ডলর্ডিযম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বরং তাতে কৃষক-প্রজার লাভের চেয়ে লোকসানই হইয়াছে বেশী। শিল্পের বেলাও তা না ঘটে, সেদিকে আমাদের অবশ্যই নযর রাখিতে হইবে। এই দিক হইতে গণতন্ত্রের পথই সমাজবাদ হাসিলের সহজতর পথ।

বর্তমানে গণতন্ত্রী দেশসমূহে বিশেষতঃ আফ্রো-এশিয়ার সদ্য-স্বধীনতা-প্রাপ্ত দেশসমূহে সমাজবাদ প্রবর্তনের প্রধান অন্তরায় এবং শক্তিশালী যুক্তি দুইটি। তার একটি এই যে, 'সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।' অপরটি এই যে, 'ধর্মের সাথে সমাজবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে, কাজেই ধর্মের ধ্বংসস্তূপের উপরই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আফ্রো-এশিয়ান এমন কি ল্যাটিন আমেরিকার উন্নতিশীল দেশসমূহেই সমাজবাদ প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন। অথচ এ-সব দেশের লোক ধর্মপ্রাণ বলিয়া এখানেই সমাজবাদ প্রবর্তন সবচেয়ে কঠিন। এই কারণেই এ-সব দেশে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে সোজাসুজি সমাজবাদের নাম মুখে আনা বিপজ্জনক। সেজন্য এ-সব দেশে, এমন কি ইউরোপের কোনও দেশেও ইসলামী সোশিয়ালিযম, খৃশ্চিয়ান সোশিয়ালিযম ইত্যাদি ভণ্ডামি ও ভাওতাপূর্ণ কথার মাধ্যমেই সোশিয়ালিযমের নাম মুখে আনিতে হয়। আর যে সব দেশে পূর্ণ বা আংশিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেও ডিক্টেটরি শাসনের আমলেই হইয়াছে, নির্বাচিত গণতন্ত্রী সরকারের হাতে হয় নাই।

আমাদের দেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিবিদ, বিশেষতঃ আলেম সম্প্রদায়, যে সমাজবাদের উপর এত খড়গহস্ত, সমাজবাদের বিরুদ্ধে যে তাঁরা এমন করিয়া তলওয়ার উঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং সেই ভয়েই কিছু সমাজবাদী যে 'ইসলামী সমাজবাদের' নামে ধর্মের আড়ালে আশ্রয় খুঁজিতেছেন, তার কারণ সমাজবাদের বিরুদ্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা। প্রচারের দ্বারা জনমন হইতে, আলেম-সমাজের মধ্য হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে। তাঁদেরে বুঝাইতে হইবে: (১) গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজবাদ আসিতে পারে, সশস্ত্র বিপ্লবের দরকার নাই, (২) ধর্মের সাথে সমাজবাদের কোনও বিরোধ নাই, বরঞ্চ ইসলামী আর্থিক মূলনীতির সাথে সমাজবাদের চমৎকার সামঞ্জস্য আছে। জনগণকে এই দুইটি কথা বুঝাইতে গিয়া কোনও প্রকার ভাওতা দিতে হইবে না। কারণ কথা দুইটি খাঁটি সত্য। তাঁদের উচিত, শান্তভাবে ব্যাপারটার বিচার করিয়া দেখা। আর যে সব গণতন্ত্রী জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র উপায় হিসাবে সমাজবাদের উপযোগিতা মানিয়াও শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ক্ষতি হইবে ভাবিয়াই সমাজবাদের বিরুদ্ধতা করিতেছেন, তাঁদেরও ধীরভাবে বিষয়টা তলাইয়া বিচার করা উচিত।

প্রথমতঃ, সমাজবাদের সহিত ধর্মের কোনও বিরোধ নাই—থিওরেটিক্যালিও না, প্র্যাকটিক্যালিও না। কোন ধর্মই শোষণ-যন্ত্র হিসাবে ধনতন্ত্রের সমর্থন করে না। বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম ত তেমন শোষণের বিরুদ্ধে কঠোরতাই দেখাইয়াছে। আমাদের আরও বিচার করিতে হইবে যে, সমাজবাদ বা সোশিয়ালিযম আর

সাম্যবাদ বা কমিউনিযম এক জিনিস নয়। সমাজবাদ ত দূরের কথা বর্তমানের কমিউনিযমও ধর্ম-বিরোধী নয়। রুশ, চীন, আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি কমিউনিস্ট দেশসমূহে ইসলাম, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম অবাধে চলিতেছে। মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি ধর্মস্থান নির্মাণে সরকারী জমি ও অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের গোড়ার দিকে বিপ্লবের নেতারা ধর্ম ও ধর্মস্থানের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তার কারণও ছিল। ধর্মস্থান হইতে ধর্মের নামে বিপ্লবের বিরোধিতা, ধনতন্ত্রী ও সামন্তবাদীদের সমর্থন, এমন কি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করা হইত। কাজেই ধর্ম ও ধর্মস্থানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা বিপ্লবের সাফল্যের খাতিরেই দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব বাংলার কোন কোন রাষ্ট্রনেতা যে কৃষক-প্রজার জমিদারি উচ্ছেদের দাবিকে ইসলাম-বিরোধী বলিয়াছিলেন, ভাগ্যিস তাঁদের সে ফতোয়া জমিদারি উচ্ছেদ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। মাঝে হইতে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে জমিদারি রক্ষার মত অসৎ কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া তাঁরা ইসলাম ধর্মেরই অপমাননা করিয়াছিলেন। এমনিভাবে ধর্মকে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োগ করিবার লোক সে যুগেও ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র ছাড়া যেমন আমাদের রাজনৈতিক আযাদি নাই, সমাজবাদ ছাড়াও তেমনি আমাদের অর্থনৈতিক আযাদি নাই। এ কথাটাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সশস্ত্র বিপ্লবের আশায় বা অপেক্ষায় নির্বাচন বয়কট করিয়া বসিয়া থাকিলে তাতে সমাজবাদের কাজ আগাইবে না, বরঞ্চ সমাজবাদের বিরোধীদেরই সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। তার বদলে কৃষক-শ্রমিকদেরে সংঘবদ্ধ করিয়া তাদেরই মনোনীত ও নির্বাচিত মেম্বর দিয়া আইনসভা দখল ও মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে পারিলেই সমাজবাদ প্রবর্তনের পথ খোলাসা হইবে। গণতন্ত্রের মারফতে সমাজবাদ প্রবর্তনে একটু সময় লাগিবে বটে, কিন্তু বিনা-রক্তপাতে বিনা-যুদ্ধে শুধুমাত্র ব্যালটের বিপ্লবের মধ্যদিয়া সমাজবাদ প্রবর্তন করিতে পারিলে তাতেই গোটা মানবজাতির অধিকতর কল্যাণ হইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দেই ঃ দেশের সরকার যতদিন ধনতন্ত্রীদের কবজায় থাকিবেন, ততদিন আন্তর্জাতিক সম্পর্কও স্বভাবতঃই এককভাবে ধনতন্ত্রী দেশসমূহের সাথেই রাখা হইবে। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাউক। পাকিস্তান নয়া রাষ্ট্র। প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের দেশ ভরা। কিন্তু এই সব সম্পদ ব্যবহার করিবার মত মেশিনাদি, সে মেশিনাদি কিনিবার মত বিদেশী মুদ্রা এবং সে মেশিনাদি চালাইবার মত কারিগর আমাদের দেশে নাই। সবই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিদেশী মুদ্রাও ঋণ ও খয়রাতে যোগাড় করিতে হয়।

নিজের দেশকে উন্নীত ও শিল্পায়িত করিতে এইসব প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া দেশবাসীর ও রাষ্ট্রের উপকার করিতে স্বভাবতঃই সরকার বন্ধু দেশসমূহের নিকট ঋণ বা ভিক্ষা চান। বন্ধু দেশসমূহও ঋণ ও দানের বিনিময়ে আমাদের দেশকে আঞ্চলিক সামরিক জোটে যোগ দিতে বলেন। সেন্টো, সিটো ইত্যাদি জোটে আমাদের জড়াইয়া পড়ার আসল ইতিহাস এই। অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই জানেন যে, এই ঋণ ও খয়রাত দিবার সময় ধনতন্ত্রী দেশসমূহ আমাদের পাবলিক সেক্টরে ঋণ না দিয়া প্রাইভেট সেক্টরে দিবার জন্য যিদ করেন। আমরা তাই নিতে বাধ্য হই। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহ আমাদিগকে ঋণ দিবার সময় প্রাইভেট সেক্টরে না দিয়া পাবলিক সেক্টরে দিবার যিদ করেন। ইহার কারণ অতি সোজা। ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ আমাদের দেশে ধনিক পয়দা করিতে এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পাদি প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ আমাদের দেশে ধনিকদের বদলে রাষ্ট্রকেই শক্তিশালী করিতে চায়। ধনতন্ত্রীরা চায় আমাদের দেশের ধনিকদেরে শক্তিশালী ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাবশালী করিতে। আর সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ চায় আমাদের সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত হইতে।

কাজের বুঝা গেল, দেশের সরকার জনগণের প্রভাবাধীনে আসিলেই দেশে সমাজবাদ প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়। এজন্য সশস্ত্র রক্ত-বিপ্লবের দরকার হয় না। রুশ দেশের আধুনিক থিওরিস্টরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, আফ্রো-এশিয়ার নয়া রাষ্ট্রসমূহে সমাজবাদ প্রবর্তনের জন্য রক্ত-বিপ্লবের দরকার হইবে না। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তা আনা সম্ভব।

কথাটা যুক্তিসংগত। আমাদের দেশে কৃষক ও শ্রমিককে মিলাইয়া দেশের অধিবাসীর শতকরা নব্বইজন। সার্বজনীন ভোট ব্যবস্থায় আমরা কৃষক-শ্রমিক-রাই সুষ্ঠু ও সংঘবদ্ধ নির্বাচনের মধ্য দিয়া সব আইনসভা ও মন্ত্রিত্ব দখল করিতে পারি। তা করিতে পারিলে আমরা দেশের সব আইন কৃষক-শ্রমিকের অনুকূলে সংশোধন করিতে পারি। বর্তমান সরকার যেমন শিল্পপতিদেরে 'ট্যাক্স হলিডে' দেন, আমরাও তখন 'কৃষকদেরে খাযনা হলিডে' দিব। আইন পাস করিয়া তখন শ্রমিকদেরে শিল্পের মালিক এবং চাষীদেরে জমির মালিক করিয়া দিব। ভোটের বাদশাহী মানেই কৃষক-শ্রমিকের বাদশাহী। ভোট আমাদের, আইনসভা আমাদের, মন্ত্রিসভা আমাদের। কে আমাদেরকে ঠেকাইবে? কাজেই গণতন্ত্রের পথে সমাজবাদ প্রবর্তন সম্ভব। আমাদের শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ। কৃষকদেরে ঠিক তেমনভাবে ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ করা যাইবে না। তার দরকারও নাই। তাদেরে সচেতন করিলেই কাজ হইয়া যাইবে।

পূর্বদেশ, ১১ই সেপ্টেম্বর, '৬৯

১৭

কায়েদের মহাপরিকল্পনা কি সফল হইবে না ?

গত পরশু যথারীতি কায়েদে-আযমের বাইশা মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়া গেল। সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত ছুটি পাইল। কওমী নিশান অর্ধনমিত হইল। জাতির পিতার আদর্শ-উদ্দেশ্য বয়ান করিয়া বাণী বিবৃতি প্রচারিত হইল। সেমিনার-আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হইল।

এ-সব পড়িয়া-শুনিয়া একটি কথাই সারাক্ষণ আমার মনে খোঁচা দিতে থাকিল। কথাটি এইঃ 'পাকিস্তান দিবসে' আমরা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' মানে লাহোর প্রস্তাবের প্রতি যতখানি আন্তরিক আনুগত্য জানাই, কায়েদের এই স্মৃতি-দিবসেও জাতির পিতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই ঠিক ততখানি। দুইটি ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিকতার রকম ও ওযন অবিকল একই। 'লাহোর প্রস্তাবকে' আমরা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' আখ্যা দেই। প্রস্তাব পাসের দিন-টিকে বলি 'পাকিস্তান দিবস।' সাড়ম্বরে পালনও করি দিনটি। কিন্তু সে প্রস্তাবের কথাগুলিকে আমরা পাকিস্তান-বিরোধী মনে করি। ঐ কথাগুলির সমর্থকদিগকে আমরা পাকিস্তানের দুশমন আখ্যা দেই। অবিকল তেমনি, কায়েদে-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে আমরা পাকিস্তানের স্রষ্টা, জাতির পিতা আখ্যা দেই। তাঁর জন্ম-মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কাজে-কামে আমরা তাঁর ওসিয়ত অমান্য করি। তাঁর মতবাদকে আমরা পাকিস্তান-বিরোধী মনে করি। 'পাকিস্তান প্রস্তাবের' ভাষা কোট্‌ করা যেমন পাকিস্তানে নিষিদ্ধ, জাতির পিতার ওসিয়তের ভাষা কোট্‌ করাও তেমনি জাতির জন্য নিষিদ্ধ। লাহোর প্রস্তাব 'বাতিল' করিবার উদ্দেশ্যে যেমন দিল্লী প্রস্তাবের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিবৃতি ঢুকাইয়া দেই, জাতির পিতার ওসিয়তনামা বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে তাঁর মুখে মনগড়া আমাদের পছন্দ মত কথা ঢুকাইয়া দেই। লাহোর প্রস্তাবের সুস্পষ্ট নির্দেশ এড়াইবার মতলবে আমরা যেমন ঐ প্রস্তাবের ভাষায় বৈয়াকরণিক ও রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক ত্রুটি দেখাই-বার চেষ্টা করি, জাতির পিতার ওসিয়তনামার সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করি-বার অসাধু উদ্দেশ্যে তেমনি সেই ওসিয়তের আদর্শগত ত্রুটি বাহির করিবার চেষ্টা করি। নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে এসব অসাধু কাজ করিবার জন্য যে কারণে আমরা পাকিস্তান প্রস্তাবকে লাহোর হইতে দিল্লী লইয়া গিয়াছি, ঠিক

সেই কারণেই আমরা পাকিস্তানের রাজধানীকে কায়েদে-আযমের করাচী হইতে 'পিন্ডি' লইয়া গিয়াছি। এসব কাজে আমরা একজন বিখ্যাত মওলানা সাহেবের পদাংক অনুসরণ করিয়াছি। মুসলিম-ঐতিহ্যবাহী লাহোরে বসিয়া পাকিস্তানকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যাইবে না, এ কথা বুঝিতে পারিয়া সেই মওলানা সাহেব যে কারণে লাহোর হইতে তাঁর আস্তানা তুলিয়া হিন্দুস্থানের পাঠানকোটে লইয়া গিয়াছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়করা সেই কারণেই কায়েদের ঐতিহ্যবাহী করাচী হইতে পাকিস্তানের রাজধানীটি 'পিন্ডি' লইয়া গিয়াছেন। জেনারেল আইউব আমাদের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে অসংখ্য মন্দ কথার মধ্যে দুই-একটা ভাল কথাও বলিয়াছিলেন। সেই ভাল কথার একটি এই: 'এই মওলানা সাহেবরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাকিস্তানের হাত হইতে বাঁচাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এখন এই মওলানা সাহেবরাই পাকিস্তানকে মসুলমানদের হাত হইতে বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।' আইউব সাহেবের এই কথাটি খাঁটি সত্য। কিন্তু কথাটি বলিবার সময় তিনি আলগোছে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে ঐ মওলানা সাহেবেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া কায়েদের রুহানী প্রভাব হইতে পাকিস্তানকে বাঁচাইবার চেষ্টাতেই করাচী হইতে রাজধানী 'পিন্ডি' সরাইয়া কায়েদের পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের পিন্ডি চটকাইয়াছেন। এই অপরাধ লাঘব করিবার জন্য তিনি পিন্ডির এক অংশের নাম রাখিয়াছেন ইসলামাবাদ। এ যেন সদকায়ে জারিয়া দিয়া সুদের আয় হালাল করিবার চেষ্টা। এই ভণ্ডামি ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিচারপতি কায়ানী ওর নাম দিয়াছিলেন 'ইসলাম বিবি'। কায়ানী শুধু বিচারপতি ছিলেন না, তিনি দূরদর্শী বিচারকও ছিলেন। তাই তিনি ঐ 'ইসলাম বিবির' সেবাযত্ন এড়াইয়া পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া পরলোকগমন করিলেন। কায়ানীর-দেওয়া নামেরই জয় হইল। রাজধানীর রেডিও-টেলিভিশনের নাম হইল: 'রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদ কেন্দ্র।'

এ সবের পরিণাম যা হইবার, তাই হইতে চলিয়াছে। এতদিন শুধু কায়েদে-আযমকে অমান্য করা হইয়াছে। আজ তাঁকে গাল দেওয়া শুরু হইয়াছে। জাতির পিতাকে গাল দেওয়া! আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। সকলেই জানেন, খারাপ-যাদা না হইলে কেউ বাপকে গাল দেয় না। কিন্তু এটা কি কেউ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, পাকিস্তানে দাঁড়াইয়া 'পাকিস্তান প্রস্তাব'কে গাল দেওয়ার পরের অধ্যায়ই জাতির পিতাকে গাল দিতে শুরু করা? পাকিস্তান প্রস্তাবকে গাল দেওয়া হইতেছে ঐ প্রস্তাব যে কথা বলিয়াছে, তা বলার অপরাধে। আর জাতির পিতাকে গাল দেওয়া শুরু হইয়াছে, যে কথা তিনি বলেন নাই, সে কথা না বলার অপরাধে।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছে এইভাবে। পাকিস্তান হাসিল-কর্তা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অবসান ঘটিল, এই সুস্পষ্ট লিখিত শর্তে কায়েদে-আযম পাকিস্তানের অন্যতম পার্লামেন্টারী পার্টি হিসাবে পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠনের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কায়েদে-আযমের মৃত্যুর পর হইতে এই মুসলিম লীগের নেতারাই দাবি করিতে লাগিলেন যে, যে-মুসলিম লীগ পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে, এটা সেই মুসলিম লীগ। সেই সংগে তাঁরা এই কথাটাও বলিতে লাগিলেন যে, কায়েদে-আযম পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করিতে চাহিয়াছিলেন। এই বানাওট কথাটা তাঁরা অবশ্য বলিলেন শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে। দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোনও নযির নাই বলিয়া আমাদিগকে একটা 'ইউনিক' শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইতেছে। সেজন্য একটু বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। এই অজুহাতকে যুক্তিপূর্ণ করিবার জন্য রাষ্ট্র-নায়করা দিনের-পর-দিন বলিয়া চলিলেন যে, পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করিবার জন্য কায়েদে-আযমসহ সকল মুসলিম লীগ নেতাই দেশবাসীর কাছে ওয়াদাবদ্ধ। বস্তুতঃ ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের ওয়াদা করিয়াই পাকিস্তানের পক্ষে তাদের ভোট আদায় করা হইয়াছিল, এই দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগ-নেতারা কায়েদে-আযমের বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির বিকৃত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত মযমুন প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশটি বছর ধরিয়া এই বানাওট কথাটার পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি হইল। পক্ষান্তরে এই দাবির বিরোধী কায়েদে-আযমের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি ও ঘোষণাগুলি এবং এ বিষয়ে তাঁর অথরিটেটিভ ফরমান টেপ-রেকর্ড করা এবং সরকারী তৎকালীন রিপোর্টে মুদ্রিত ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্টের গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতাটি সযত্নে গোপন রাখা হইল। ফলে অধিকাংশ পাকিস্তানবাসী, বিশেষতঃ আমাদের তরুণ ও আলেম সমাজ বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছেন যে, কায়েদে-আযম ও নিখিল ভারত মুসলিম প্রতিষ্ঠান সত্যসত্যই 'ইসলামী রাষ্ট্রের' ওয়াদা করিয়াই ১৯৪৬ সালে ভারতের মুসলমানদের ভোট আদায় করিয়াছিলেন। অথচ সত্য কথা এই যে, যে-লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি করা হইয়াছিল, যে-প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটি অসংখ্য প্রস্তাবাদি দীর্ঘ ছয়টি বছর ধরিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং যে-প্রস্তাবের বুনিয়াদে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল, তার কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দ ও 'ইসলামী রাষ্ট্রের' উল্লেখ ছিল না। ঐ ছয় বছর মুদ্দতের মুসলিম লীগের গৃহীত অসংখ্য প্রস্তাবাদি এবং তাদের সমর্থনে কায়েদে-আযমের দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তৃতার মধ্যে ধর্মীয় রাষ্ট্রের নাম গন্ধও ছিল না। সরকারী দলিল-পত্রে, তৎকালীন সংবাদপত্রে এবং 'গেযেটিয়ার' ও 'রেজিস্টারে' সে সব প্রস্তাব

ও বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণী মুদ্রিত আছে, তাতে 'ইসলামী রাষ্ট্রের' দোহাই বা ওয়াদার সাক্ষাৎ মিলিবে না। তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কত নেতা-কর্মীই কত কথা বলিয়া থাকিবেন। তার জন্য কায়েদে-আযম বা মুসলিম লীগকে দায়ী করা চলিবে না। একমাত্র মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাব এবং তার সমর্থনে কায়েদের বক্তৃতার জনাই তাঁদেরে দায়ী করা যাইতে পারে। তথাপি কায়েদে-আযমের সামনে বা তাঁর জানা-মতে কোন মুসলিম লীগ নেতাই ইসলামী রাষ্ট্র বা শরিয়তী শাসনের কথা বলিতে পারেন নাই। ১৯৪৪ সালে মাহ্মুদাবাদের তরুণ রাজা সাহেবের একটি উক্তি ও কায়েদের প্রতিবাদই এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান ও চূড়ান্ত প্রমাণ। রাজা সাহেব তাঁর এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন: 'পাকিস্তানে শরিয়তী শাসন চালু করা হইবে।' কথাটা সংবাদপত্রে বাহির হওয়ার সংগে সংগে কায়েদে-আযম টেলিগ্রামে রাজা সাহেবকে তিরস্কার করেন ও ভবিষ্যতে অমন উক্তি না করিতে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। কায়েদের টেলিগ্রামটি খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছিল।

কায়েদে-আযম বলিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, পাকিস্তানকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' করিবার সম্পূর্ণ অধিকার পাকিস্তানবাসীর আছে। কায়েদে-আযম দেশকে কোনও শাসনতন্ত্র দিয়ে যান নাই। বরঞ্চ বলিয়াছেন: 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের জনগণই রচনা করিবে।' কাজেই পাকিস্তানের জনগণ যদি তাদের রাষ্ট্রকে 'ইসলামী' করিতে চায়, তবে তাতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও নাই। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচার করিবারও অধিকার ইচ্ছুক নেতাদের আছে। সে প্রচারে কারও আপত্তি থাকিতে পারে না। আপত্তি শুধু মিথ্যা করিয়া কায়েদের নাম ব্যবহারে। আপনার যত ইচ্ছা বলুন: 'আমি ইসলামী রাষ্ট্র চাই'। শুধু বলিবেন না: 'কায়দে-আযম ইসলামী রাষ্ট্র চাহিয়াছিলেন।' কায়েদে-আযম যা বলেন নাই, তাঁর মৃত্যুর পরে সে কথা তাঁর মুখে পুরিবেন না। তাতে শুধু ইতিহাসই বিকৃত করা হয় না, কায়েদের ইমেজও বিকৃত করা হয়—কায়েদে-আযম ও লীগ নেতৃত্বের বিরোধীদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়।

সম্প্রতি এই অস্ত্রই ব্যবহার করিয়াছেন 'ইসলামী রাষ্ট্রের' সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবক্তা ঐ মাওলানা সাহেব। তিনি তাঁর দলের বার্ষিকী পালনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন: 'পাকিস্তানের স্রষ্টারা কোনদিনই পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করিতে চান নাই।' পাকিস্তানের স্রষ্টারা মানে কায়দে-আযম একা। তিনি যে কোনওদিনই ইসলামী রাষ্ট্র চান নাই, মওলানা সাহেবের এই কথাটা সত্য। আমরাও এতদিন ধরিয়া এই কথাটাই বলিয়া আসিতেছি।

মওলানা সাহেব বলিয়াছেন ঃ 'যদি পাকিস্তানের স্রষ্টারা ইসলামী রাষ্ট্র চাহিতেন, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগে-সংগেই অন্ততঃ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাসিক প্রিন্সিপল, বুনিয়াদী অসুল, রচনা করিয়া ফেলিতেন।' এটাও আমাদেরই খাঁটি। কায়েদে-আযম যদি 'ইসলামী রাষ্ট্র 'চাইতেন, তবে তাঁর এক ফরমানেই জারি করিতে পারিতেন। পাকিস্তানবাসী একবাক্যে তা মানিয়াও লইত। কিন্তু তিনি ছিলেন হাড়ে-মজ্জায় গণতন্ত্রী। গণতান্ত্রিক পাকিস্তানই তিনি চাহিয়াছিলেন। তাই জনগণের হাতেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। 'পাকিস্তানের স্রষ্টারা' মানে কায়েদে-আযম যে ইসলামী রাষ্ট্র চান নাই, এটা ঐ মওলানা সাহেব গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। মওলানা সাহেব যখন ওটা বুঝিয়াছিলেন, তখন মুসলিম ইন্টেলিজেনশিয়া এবং জনগণও নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন। বেশ-কম শুধু এই যে মওলানা সাহেব ঐ কারণে পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আর মুসলিম ইন্টেলিজেনশিয়া এবং জনগণ ঐ কারণে তা সমর্থন করিয়াছিলেন।

মওলানা মযকুরের ঐ বক্তৃতায় মুসলিম লীগাররা খুব চটিয়াছেন। আমরাও কম চটি নাই। মুসলিম লীগাররা চটিয়াছেন, হাটে তাঁহাদের হাঁড়ি ভাংগিল বলিয়া। আর আমরা চটিয়াছি জাতির পিতাকে গাল দেওয়া হইল বলিয়া। 'ইসলামী রাষ্ট্র' চাহেন নাই বলিয়া মওলানা মযকুর কায়েদের দোষারোপ করিয়াছেন। এই দোষারোপ তিনি ১৯৪১ সাল হইতেই করিয়া আসিতেছেন। তাই কায়েদের এন্তেকালের বাইশ বছর পরে নতুন করিয়া এ দোষারোপের দরকার ছিল না। কায়েদে ভণ্ডামি জানিতেন না। তাঁর সারা রাজনৈতিক জীবনটাই একটি খোলা কিতাব; আয়নার মতই স্বচ্ছ। তিনি আজীবন গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এই কারণেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। এই কারণেই পাকিস্তান দাবি করিয়াছিলেন। দুইটা একই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের এপিঠ-ওপিঠ। এই কথাটাই পাকিস্তানের সমর্থক অনেক মুসলিম লীগারও বুঝেন নাই। পাকিস্তান বিরোধী অনেক আলেমও বুঝেন নাই। তাই আজিকার এই কলহ তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একদল বলিতেছেন ঃ 'কায়েদে-আযম ইসলামী রাষ্ট্র চাহিয়াছিলেন; আমরাও তাই চাহিতেছি।' আরেক দল বলিতেছেন ঃ 'কায়েদে-আযম ইসলামী রাষ্ট্র চান নাই। আমরা ইসলামী রাষ্ট্র চাহিয়া কায়েদের ভুল সংশোধন করিতেছি।'

কার্যতঃ দুই দলই কায়েদের পথ হইতে সরিয়া গিয়াছেন। তাতে তাঁরা শুধু জাতির পিতার গণতান্ত্রিক ইমেজই বিকৃত করিতেছেন না, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অনিষ্ট করিতেছেন; পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ

করিয়া দিতেছেন। দুইভাবেঃ এক, পাকিস্তানের মুসলমানদিগকে গণতন্ত্রের অযোগ্য প্রতিপন্ন করিয়া হেয় করিতেছেন। দুই, ভারতে ফেলিয়া-আসা মুসলমানদিগকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিতেছেন। স্মরণীয় যে, হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ মীমাংসার পন্থা হিসাবেই উপমহাদেশ দুইভাগ করা হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতি গৃহীত হইবার পর তাদের সামনে দুইটি অল্টারনেটিভ থাকে। এক, আদম-এওয়ায করিয়া সব হিন্দুকে এক রাষ্ট্রে ও সব মুসলমানকে অপর রাষ্ট্রে গুঞ্জায়েশ করা। দুই, যে যেখানে আছে, সেখানে থাকার ভিত্তিতে দুইটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা। প্রথম পন্থা গ্রহণে হিন্দুদের অসুবিধা ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা দুইটি দূরবর্তী অঞ্চলে দ্বিধাবিভক্ত থাকায় তাদের পক্ষে প্রথম পন্থা মানা অসম্ভব ছিল। তাই দ্বিতীয় পন্থা গৃহীত হয়; দুইটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয়ঃ একটি হিন্দু-মেজরিটি, অপরটি মুসলিম-মেজরিটি। কায়েদের মতে এই ব্যবস্থায় উভয় রাষ্ট্রের মুসলমানদের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, কৃষ্টিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষিত হইবে। পাকিস্তানে হইবে এখানে মুসলিম মেজরিটি বলিয়া, ভারতে হইবে পাকিস্তানী মাইনরিটির প্রতি মেজরিটির ব্যবহারের প্রতিদানে এবং প্রতিবিম্বে। এটাই কায়েদের দূরদর্শী মহা-পরিকল্পনা। শতকরা পঁচাশিজন হিন্দুর দেশ ভারতে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের দরকার নাই। শতকরা আশিজন মুসলমানের দেশ পাকিস্তানেও সে দরকার নাই। গণতন্ত্রই উভয়ের রক্ষাকবচ। এটাই কায়েদের মহা-পরিকল্পনা। এটা কি সফল হইতে আমরা দিব না?

ইত্তেফাক, ১২ই ডিসেম্বর, '৫০

১৮

পলিটিক্যাল ইকনমি মানে রাজনৈতিক অর্থনীতি

প্ল্যানিং কমিশনের ইকনমিক প্যানেলের অর্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম আঞ্চলিক ভিত্তিতে মতভেদ হইয়াছে। এ খবর পাঠকরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে পর্বত-প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে তা দূর করিবার উপায় নির্ধারণ ও সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে বারো-জন অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি প্যানেল গঠন করা হয়। এই অর্থ-বিজ্ঞানীরাই অঞ্চল-ওয়ারি দুই দলে ভাগ হইয়া পড়িয়াছেন। দুই দল দুইটি পৃথক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে। অর্থশাস্ত্র একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিচারে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদ নাই। অথচ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা এমন একটা ব্যাপারে একমত হইতে পারিলেন না।

কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ রিপোর্ট দুইটি নির্ভেজ অর্থ-নৈতিক নয়, অনেকখানি রাজনৈতিক। বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক রিপোর্ট লিখিয়াছেন এই জন্য যে, তাঁদের বিচার্য বিষয়টাই আসলে রাজনৈতিক। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভূগোলের বিচারে কার্যতঃ দুইটা দেশ। দুই দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দুই রকম হইবে, এটা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক হইয়াছে এইজন্য যে, এই দুইটি ভূখণ্ড একই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। একই রাষ্ট্র-দেহের, বডিপলিটিকের দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ।

পাকিস্তান পুঁজিবাদী দেশ। ভদ্র ভাষায় বলা হয়, স্বাধীন অর্থনীতির দেশ। কাজেই এদেশেও অর্থনীতি আপন নিয়মে নিজের শক্তিতে চলিবে। সেই শক্তিতেই দুই অঞ্চলের মধ্যে পর্বত প্রমাণ ডিস্প্যারিটি দেখা দিয়াছে। সেই শক্তিতেই হস্তক্ষেপের দরকার হইয়াছে। সরকারও হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত আছেন। কি পন্থায় করিবেন, তারই সুপারিশ করিবার জন্য অর্থ-বিজ্ঞানীদের প্যানেল বসাইয়াছেন। যেহেতু সরকারের প্রশ্নটা রাজনীতিক, অর্থ বিজ্ঞানীরাও উত্তরটা দিয়াছেন রাজনীতিক। পূর্ব পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়াছেন; পশ্চিম পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়াছেন। বিজ্ঞানী হইলেই লোক দেশ-প্রেমিক হয় না, এ কথা কেউ বলিতে পারিবে না।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য দূর করাটাই শুধু রাজনৈতিক নয়, এই বৈষম্যের সৃষ্টিটাও রাজনৈতিক। বৈষম্যটা সরকার দূর করিবেন এই জন্য যে, এটা সৃষ্টিও করিয়াছেন সরকারই। যিনি গিরো লাগাইয়াছেন, তিনিই গিরো খুলিবেন। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা। বিষস্য বিষমৌষধং। এই কারণে কিছুকাল যাবৎ সরকার এই বৈষম্য দূরীকরণের ওয়াদা করিয়া আসিতেছেন। আইউবী আমলে দশ বছর ডিস্‌প্যারিটি দূর করার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিতে হইবে।

স্পষ্টতঃই বোঝা যাইতেছে যে, স্বাধীন অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিলে এ বৈষম্য কোনও দিন দূর হইবে না। জনশিক্ষার মতই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেলাতেও উন্নতির সাথে গতি-বেগও বাড়ে। স্বভাবতঃই উন্নত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির গতি-বেগ ক্রমে আরও বাড়িবে। আঞ্চলিক ডিস্‌প্যারিটি আরও বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই দুই পাকিস্তানের ডিস্‌প্যারিটি দূর করিতে হইলে আমাদিগকে অর্থনীতির প্রচলিত আইন-কানুন ভাংগিয়াই তা করিতে হইবে। আইন-ভংগের কথা শুনিয়া পাঠক ঘাবড়াইবেন না। কারণ দুই অঞ্চলের মধ্যে যে ডিস্‌প্যারিটি সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাও হইয়াছে অর্থনীতিক আইন ভাংগিয়াই। আইন ভাংগিয়া যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, আইন ভাংগিয়া সেই বৈষম্য দূর করিলে তাতে আইন ভাংগার অপরাধ হইবে না। রাষ্ট্র-প্রধান গোলাম মোহাম্মদ অর্ডিন্যান্স করিয়া 'ওয়ান ইউনিট' ও 'প্যারিটি' প্রবর্তন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র-প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া অর্ডিন্যান্স বলেই ও-দুইটার অবসান ঘটাইয়াছেন। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের বেলা এই নযিরই যথেষ্ট হইবে।

অর্থনীতির কোন্ আইন কিভাবে ভাংগিয়া দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তা জানা না থাকিলে ঐ বৈষম্য দূর করা যাইবে না। তাই সেই আইন ভাংগার পুরান ইতিহাসটা স্মরণ করা দরকার। সমাজবাদী রাষ্ট্র ত বটেই, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও আজকাল রাজনীতির দ্বারা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্ল্যানিং তার প্রমাণ। কিন্তু নয়া রাষ্ট্রের বেলা প্ল্যানিং ছাড়াও সরকারকে গোড়াতে জাতীয় অর্থনীতির গতি নির্দেশ করিতে হয়। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁর দ্বারা পি. আই. ডি. সি. স্থাপনই পাকিস্তানী অর্থনীতির গতি-নির্দেশক প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু সেটা ছিল শিল্পায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিল্পায়ন ছাড়াও নয়া জাতির সামগ্রিক অর্থনীতির

গতি-নির্দেশের দরকার। পাকিস্তানের মত নয়া নামের নয়া জাতির নয়া রাষ্ট্রের জন্য একজন অসাধারণ প্রতিভাধর অর্থ-বিজ্ঞানীর উপদেশের দরকার ছিল। পাকিস্তানের সৌভাগ্যবশতঃ এমন একজন মনীষীর সাহায্য পাওয়া গেল। ইনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক। ইনি অক্সফোর্ডের ছাত্র, ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক। অধ্যাপক ইয়ং ও অধ্যাপক পিগাওর মত বিশ্ববিখ্যাত ও সম্মানিত অর্থবিজ্ঞানীদের ছিলেন ইনি সহকর্মী। অর্থনীতি বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাঁদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এই মনীষীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বহুদিন অস্ট্রেলিয়ায় থাকিয়া ইনি ১৯৫৩ সালে দেশে ফিরিয়া যান। ইংলন্ডে তিনি এখন রয়েল ইকনমিক সোসাইটির ফেলো এবং লন্ডনের ইন্সটিটিউট অব ইকনমিক রিসার্চের ডিরেক্টর। বৃটিশ সরকার সহ কলম্বো প্ল্যানের সকল মেম্বর রাষ্ট্রের সমবেত চেষ্টায় এই মনীষী পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংগঠনের জটিল কাজে সহায়তা করিতে রাযী হন; অস্ট্রেলিয়া হইতে বিলাত যাইবার পথে পাকিস্তানে অবস্থান করেন। তিনি প্রয়োজনীয় ভ্রমণ, পরিদর্শন, অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করিয়া একটি তথ্যবহুল সারগর্ভ রিপোর্ট দাখিল করেন। সে রিপোর্ট পুস্তকাকারে ছাপা হয়। এটা ১৯৫৩ সালের ঘটনা। পাকিস্তান সরকার এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে কাজ ত করিলেনই না, পুস্তকটির বিতরণ ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। কারণ পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা অধ্যাপক কলিন ক্লার্কের রিপোর্ট পছন্দ করেন নাই। উপরে কলিন ক্লার্কের গুণাবলীর যে পরিচয় দিয়াছি, আপাতঃ ওসব অপ্রাসংগিক হইলেও এই কারণেই তা করিয়াছি, পাঠকরা বুঝুন, কি ধরনের বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদরা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আরও বলা দরকার, উপরের পরিচয়টাই অধ্যাপক ক্লার্কের গুণাবলীর সম্যক বর্ণনা নয়। মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা ইনি লর্ড কিনেসের, এমন কি এডাম স্মিথের বহু মতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশ্বজোড়া নাম করিয়াছেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'সার্ভিসেস' অর্থাৎ শাসনকার্য (সরকার), শান্তি রক্ষা (পুলিশ), প্রতিরক্ষা (আর্মি), শিক্ষা (স্কুল-কলেজ), স্বাস্থ্য (হাসপাতাল), যোগাযোগ (রেল, ডাক, তার ও রাস্তাঘাট) ইত্যাদির খরচকে উন্নয়ন লগ্নি (ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট) বলিয়াছেন। বহুদিন চিন্তা ভাবনার পর ইংলন্ড ও আমেরিকার সরকার সরকারী ব্যয়কে উন্নয়ন খাতার অন্তর্ভুক্ত করিতে কলিন ক্লার্কের মত মানিয়া লইয়াছেন। এই জন্য

অনেক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ক্লার্ককে ইবনে-খালদ্নের সাথে তুলনা করেন। ছয় শ' বছর আগে আরবের এই স্বানমধন্য ঐতিহাসিক দার্শনিক অর্থ-বিজ্ঞানী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সাহিত্য, এমন কি সংগীত বাবদ খরচকেও উন্নয়ন লগ্নির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

এমন প্রতিভাধর মনীষী ক্লার্কের সুপারিশ পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদরা কেন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন? কারণ তাঁর সুপরিশের মূল কথা ছিল এই যে, পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে কৃষায়িত করায় অগ্রাধিকার দিতে হইবে। যাঁরা অধ্যাপক কলিন ক্লার্কের অর্থনৈতিক মতবাদের সাথে পরিচিত, তাঁরাই জানেন, তাঁর ইকনমিক থিওরি অনুসারেই এই সুপারিশ করিয়াছিলেন। কলিন ক্লার্কের অর্থনৈতিক মতবাদের মূল কথা তিনটিঃ (১) অর্থনৈতিক অগ্রগতি পুঁজি-লগ্নির ক্ষুধার মুদ্দত (ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হাংগ্রি পিরিয়ড) ও পুঁজি-লগ্নির তৃপ্তির মুদ্দত (ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সেটেড পিরিয়ড) এই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে। (২) জনপ্রতি প্রকৃত আয়ই জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতির একমাত্র মাপকাঠি। (৩) জনপ্রতি আসল আয়ের বৃদ্ধি হয় তিন স্তরেঃ প্রাথমিক শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও সার্ভিসেস শিল্প।

একটু গভীরভাবে বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, অধ্যাপক ক্লার্ক পাকিস্তানের বেলা এই তিনটি মূলনীতিই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ছোট, বসতি ঘন। এখানে কৃষির উন্নতির অবকাশ থাকিলেও প্রসারণের অবকাশ একেবারেই নাই। অথচ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রচুর কাঁচামাল এখানে আছে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন বড়, কিন্তু বসতি কম। প্রাথমিক শিল্প হিসাবে কৃষির উন্নতি ও প্রসারের অবকাশ সেখানে অফুরন্ত। তা ছাড়া রাষ্ট্রের রাজধানীসহ সমুদয় কেন্দ্রীয় সংস্থা, দেশরক্ষাবাহিনী ও বিদেশী মিশনের সব খরচা পশ্চিমাঞ্চলে হইতেছে। তার উপর শিল্পায়নের খরচটাও একই অঞ্চলে হইতে দিলে সেখানে সকল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইবে, পূর্বাঞ্চল শুকাইয়া মরিবে। অধ্যাপক ক্লার্কের থিওরি মতে, ঐ মুদ্দতটা ছিল 'পুঁজি-লগ্নি ক্ষুধা'র সাইকেল। তার উপর 'কোরিয়া বুমের' সমস্ত মুনাফা করাচীর সওদাগরদের হাতে পড়ায় তাঁদের 'লগ্নি-ক্ষুধা' উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়নের কাজ আগে শুরু করিলে এই লগ্নি-উন্মত্ত পুঁজি পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পায়নকে 'সেচারেশন পয়েন্টে' লইয়া যাইবে। গলাতক পেট ভরিয়া খাওয়া হইবে। হজমী খাইবার জায়গাও থাকিবে না। আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল এই

শিল্প একদিকে কাঁচামাল আমদানিতেই বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হইয়া যাইবে, অপরদিকে শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ ঐ কারণে মহার্ঘ হইবে। তাতে কি দেশী কনযিউমারদের জন্য, কি রফতানীর প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য, কোনও দিক হইতেই দেশবাসীর উপকারে লাগিবে না।

পক্ষান্তরে শিল্পায়নের পুঁজি পূর্ব বাংলায় খাটান হইলে দেশের উন্নয়নলগ্নী (ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট) দুই অঞ্চলের মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িবে।

একদিকে সরকারী ব্যয়ের ও কৃষায়নের এবং বিদেশী মিশনের সব খরচা হইবে পশ্চিম পাকিস্তানে। আর শিল্পায়নের খরচা হইবে পূর্ব পাকিস্তানে। ফলে দেশের সাকুল্য লগ্নী ও সম্পদ এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইবে না। পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত শিল্প দেশী কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল হইবে। তাতে শিল্পজাত দ্রব্য সস্তা হইবে। দেশী কনযিউমার ও রফতানী উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় আমরা প্রথম স্থান অধিকার করিব। মনে রাখা দরকার, শিল্পায়ন প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানে হইলেও কৃষায়নের অংগ হিসাবে সিন্ধু, গণ্ডাহিকা, গোলাম মোহাম্মদ ব্যারাজ, তারবেলা, মংলা, সুই গ্যাস ও পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি কৃষায়নের অংগ হিসাবেই হইয়া যাইবে। সরকারী ব্যয়সহ এইসব ইনভেস্টমেন্টের যোগফল সমুদয় শিল্পায়নের চেয়ে কোনও অংশে কম হইবে না। ইহাই ছিল কলিন ক্লার্কের সুপারিশের উদ্দেশ্য।

এইবার পাঠক কল্পনা করুন, কলিন ক্লার্কের সুপারিশমত কাজ হইলে ১৯৫৩ সাল হইতেই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ইমভেস্টমেন্ট সমান হইত। দুই অঞ্চলের উন্নয়ন সমান তালে হাতে হাত ধরিয়া অগ্রসর হইত। দুই অঞ্চলে বৈষম্য এমন মর্মান্তিক ও বিপজ্জনক স্তরে আসিয়া পেঁৗছিত না।

তৎকালীন সরকার ও তাঁদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা কি তা বুঝেন নাই? যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে এটা কেন করেন নাই? একমাত্র উত্তর: তাঁরা জাতীয় অর্থনীতিকে আঞ্চলিক রাজনীতি করিয়াছিলেন। পলিটিক্যাল ইকনমিকে তাঁরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি না করিয়া রাজনীতিক অর্থনীতি করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্লার্কের সুপারিশ মানিতে হইলে পি. আই. ডি. সি. হেড অফিস সেইদিনই করাচী হইতে ঢাকায় আনিতে হইত। অনেক কর্মচারীকে হয় দেশ ছাড়িয়া 'বাংলা মুল্লুকে' আসিতে হইত অথবা চাকরি ত্যাগ করিতে হইত। যে মনোভাব হইতে তেইশ বছরের জীবনেও পাকিস্তান একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে অর্থমন্ত্রী পাইল না, যে মনোভাবের ফলে প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান-ডেপুটি চেয়ারম্যান একজন পূর্ব

পাকিস্তানী হইতে পারেন নাই, যে মনোভাব হইতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলের প্রাদেশিক প্ল্যানিং বোর্ড প্রথম সুযোগেই ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যে মনোভাবের দরুন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত চাটগাঁর অটনমাস কনট্রোলার ও এডিশনাল ডি. জি. এস. এন্ড ডি'র অফিস ডাউনগ্রেড করিয়া তাঁদের ক্ষমতা কেন্দ্রে নেওয়া হইয়াছিল, ১৯৫৩ সালে কলিন ক্লার্কের সুপারিশ সেক্রেটারিয়েটের কবুতরের খোপে ভরিয়াছিল সেই মনোভাব।

দুই অঞ্চলের অর্থবিজ্ঞানীরা অঞ্চলওয়ারী কাতারবন্দী হওয়ায় দুই অঞ্চলের 'দুই অর্থনীতির' কথা আজ চূড়ান্তরূপে সত্য প্রমাণিত হইল। অতএব অর্থবিজ্ঞানীদের কাজ তাঁরা করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাজ এখন দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র প্ল্যানিং কমিশন গঠন করা। পশ্চিমা নেতাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই সর্বপ্রথন 'সেনস্-অব-পার্টিসিপেশনের' কথা বলিয়াছেন। চতুর্থ প্ল্যান প্রয়োগের আগে তিনি যদি কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং-এর বদলে আঞ্চলিক প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন, তবে তিনি পাকিস্তানের সংহতির পথে আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করিবেন।

ইত্তেফাক, ১৭ই মে, '৭০

১৯

আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান কি সম্ভব ?

এর আগের প্রবন্ধে বলিয়াছি, ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সরকার অধ্যাপক কলিন ক্লার্কের সুপারিশ অমান্য করিয়াছিলেন। অমান্য করিয়াছিলেন মানে উল্টা করিয়াছিলেন বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। আবার উল্টা করেন নাই বলিলেও ভুল করা হইবে। অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক উপদেশ দিলেনঃ পশ্চিম পাকিস্তানকে কৃষায়িত করুন। আর পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করুন। পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তান কৃষায়িত না করিয়া শিল্পায়িত করিলেন? এইখানে পাকিস্তান সরকার অধ্যাপক ক্লার্কের উপদেশের উল্টা করিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে উল্টা করিলেন মানে কি পূর্ব পাকিস্তানেও উল্টা করিলেন? পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত না করিয়া কৃষায়িত করিলেন? জি না। পাকিস্তান সরকার তা করিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলা কলিন ক্লার্কের মত সুধীজনের উপদেশ অমান্য করিয়াই পাকিস্তান সরকার অনুতপ্ত হইলেন। আবার পূর্ব পাকিস্তানের বেলাও ভদ্রলোকের উপদেশের উল্টা কাজ করিয়া মানে পূর্ব পাকিস্তানকে কৃষায়িত করিয়া ডবল অপরাধ করিতে পাকিস্তান সরকারের মন চাহিল না। কাজেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই না করিয়া অন্ততঃ একদিকে কলিন ক্লার্কের সম্মান রক্ষা করিলেন।

অখণ্ড মনোযোগে পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন করিতে লাগিলেন। সে অখণ্ড মনোযোগ আজও চলিতেছে। ব্যাপারটা একটু আন্দায করিবার জন্য ১৯৫৪-৫৫ হইতে ১৯৫৯-৬০ সালের সরকারী হিসাবটাই একটু দেখুন। এই ছয় বছরে পূর্ব পাকিস্তান বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করিয়াছিল ছয় হাজার তিন শ' পঞ্চাশ টাকা-। পূর্ব পাকিস্তানে তা হইতে খরচ হইয়াছেল তিন হাজার চার শ' বিশ টাকা। উপার্জনের অর্ধেক মাত্র। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তান বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল চার হাজার সাত শ' পঞ্চাশ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তান খরচ করিয়াছিল সাত হাজার তিন শ' আশি টাকা। উপার্জনের প্রায় দ্বিগুণ। ঐ মুদ্দতে পাকিস্তান সরকার বিদেশী সাহায্য ও ঋণ পাইয়াছিলেন চার হাজার তিন শ' বিশ টাকা।

তার মধ্য হইতে পশ্চিম পাকিস্তান পাইয়াছিল তিন হাজার চার শ' আশি টাকা। পূর্ব পাকিস্তান পাইয়াছিল আট শ' ষাট টাকা। পূর্ব-পশ্চিম আঞ্চলিক অনুপাত ১ঃ৪। আর হিসাবের দরকার নাই। মোটামুটি এই হার ও নিয়ম পরের দশ বছরও চলিয়াছে এবং চলিতেছে।

এটা না করিয়া পাকিস্তান সরকার যদি কলিন ক্লার্কের সুপারিশের গোটাটাই উলটাইয়া করিতেন, যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিবার সাথে-সাথে পূর্ব পাকিস্তানকে কৃষায়িত করা শুরু করিতেন, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইত সে কথাটা পাঠক একবার বিচার করিয়া দেখুন। কৃষি উন্নয়ন মানে চাষবাসের আধুনিকীকরণ, উর্বরতা বৃদ্ধি, পতিত জমি আবাদ, একাধিক ফসল উৎপাদন, সার উৎপাদন, কীট-পতংগনাশক ঔষধ তৈয়ার ইত্যাদি ত করিতে হইতই, সেই সংগে ইরিগেশন ও ফ্লাড কনট্রোলও করিতে হইত। কৃষি উন্নয়নের সহিত সংযুক্ত পশু-কর্ষণ, মৎস্য শিল্প, ডেইরি ফার্মিং, ক্যানিং, ফুড ও ফ্রুট প্রসেসিং, চা-শিল্প, রেশম-শিল্প, বন-বিজ্ঞান, কাঠ শিল্প ইত্যাদি ইত্যাদি সবই করিতে হইত। এর মধ্যে ইরিগেশন ও ফ্লাড কনট্রোলটাই সবচেয়ে কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি-উন্নয়নের ত বটেই, সামগ্রিক উন্নয়নের মূলভিত্তি, ইনফ্রা-স্ট্রাকচার, এই ইরিগেশন ও ফ্লাড কনট্রোল। এটা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের কোনও উন্নয়নই প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদ হইতে পারে না। বন্যায় প্রতি বছর গড়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোটামুটি এক শ' কোটি টাকার ফসল ও গরু-মহিষাদি সহায়-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হইয়া থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয়ই মাত্র কম-বেশী আট শ' হইতে নয় শ' কোটি টাকা। তার মধ্যে যদি নিয়মিতভাবে প্রতি বছর এক শ' কোটি টাকার সম্পদ বন্যায় ভাসাইয়া নিয়া যায় তবে পূর্ব পাকিস্তান কতদিন এটা বরদাশত করিতে পারে ? বন্যা নিয়ন্ত্রণ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এমন মরা-বাঁচার প্রশ্ন বলিয়াই সোহ্‌রাওয়ার্দী-নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া প্রথম কাজ করিয়াছিলেন ক্রুগ মিশন নিয়োগ। ক্রুগ মিশনের সুপারিশ কার্যে পরিণত করিবার মত যথেষ্ট সময় পর্যন্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভা টিকে নাই সত্য, কিন্তু ক্রুগ মিশনের মূল্যবান রিপোর্টটি আজও আছে। সে রিপোর্টে লম্বা-মেয়াদী পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ছিল চার শ' কোটি টাকা। ওটা সফল করিতে হইলে ভারত সরকারের সহ-যোগিতা দরকার হইত। এটা অসম্ভব ছিল না। এমন জন-কল্যাণের গঠনমূলক কাজে সে মুদ্দতে আমরা ভারত সরকারের সহানুভূতির কোনও অভাব দেখি নাই। বস্তুতঃ মাত্র তিন বছর পরে ১৯৬০ সালে সিন্ধু-অব-বাহিকা-পরিকল্পনা-চুক্তি সই করিতে যে সহানুভূতি লইয়া পণ্ডিত নেহরু

পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়াছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-ইরিগেশন সমস্যা সম্বন্ধে তেমনি সহানুভূতি লইয়া চুক্তি স্বাক্ষর করিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানেও আসিতেন, তৎকালে তেমন আশা ও বিশ্বাস আমাদের ছিল। পূর্ব পাকিস্তানীদের বরাত মন্দ। ছয় শ' কোটি টাকার পশ্চিমা স্কিমটি সম্পন্ন হইতে পারিল, চার শ' কোটির পূরবী স্কিমটা সম্পন্ন হইতে পারিল না। চার শ' কোটি ত চার শ' কোটি, মাত্র পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার যে খাট-মেয়াদী ব্রহ্মপুত্র-বাঁধ ও পানি-বিজলি পরিকল্পনাটি ছিল, তাও কার্যকরী করিবার মত টাকা পাকিস্তান সরকারের হাতে আসিল না।

এইভাবে কৃষায়নে অবহেলা করার দরুনই পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত হইল, আর পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার দরুনই কৃষায়ন অবহেলিত হইল, ফল দাঁড়াইল এই যে, ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ষাট টাকা, ১৯৬৫-৬৬ সালে সেখানে দাঁড়াইল শতকরা চল্লিশ টাকা।

এই সংগে বিচার করুন পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির কথা। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের খাতে পাবলিক সেক্টরে ধরা হইল চার শ' কোটি। পশ্চিম পাকিস্তানে ধরা হইল পাঁচ শ' পঁয়ত্রিশ কোটি। প্রাইভেট সেক্টরসহ জনপ্রতি পূর্ব পাকিস্তানে ধরা হইল ১২৫ টাকা। পশ্চিমে ধরা হইল ২২৫ টাকা। পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হইয়াছে প্রাইভেট সেক্টরসহ মাত্র জনপ্রতি ৮০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ টাকা প্রায় সবটুকুই খরচ হইল। পূর্ব পাকিস্তানে কৃষিখাতে ঐ টাকা কি পরিমাণ খরচ হইয়াছিল, তার আন্দায করা যাইবে একটিমাত্র আইটেম হইতে। সরকারী শস্যভাণ্ডার নির্মাণ কৃষি উন্নয়নের প্রধান শর্ত। স্বাধীনতা লাভের বছর পূর্ব বাংলায় এই শস্যভাণ্ডার ছিল ১৫০টি। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৯০টি। প্রথম পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শস্যভাণ্ডারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১১টি। আর পশ্চিম পাকিস্তানে দাঁড়ায় ৫০৮টি।

পাঠক ভুল বুঝিবেন না। আমি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের অনাচারের তালিকা দিতেছি না। কারণ তার দরকার নাই। গত পনর বছর ধরিয়াই সে সব তালিকা খবরের কাগজে পড়িয়া এবং সভা-সমিতিতে শুনিয়া আসিতেছেন। তথাকথিত গণতন্ত্রী আমলে যে অবিচার শুরু হইয়াছিল, আইউব-শাহিতে তা দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়িয়াছে, এটা ধরিয়া নিতে পারেন। কিন্তু সে কারণে এ সবের উল্লেখ করিতেছি না। পশ্চিমা নেতারা

ও শাসক-গোষ্ঠী অহরহ বলিতেছেন যে, পূর্ব-পশ্চিমের ডিসপ্যারিটি তাঁরা অতি সত্বর দূর করিয়া ফেলিবেন। তাঁদের আশ্বাসের আন্তরিকতায় সন্দেহ না করিয়াও আমি দেখাইতে চাই, তাঁরা অসত্য প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। আঞ্চলিক ডিসপ্যারিটি তাঁরা দূর করিতে পারিবেন না। কারণ, কার্যতঃ এটা অসম্ভব। পশ্চিমা নেতারা হয়ত তা মনে করেন না। আর করিলেও মুখে স্বীকার করেন না। পলিটিশিয়ানরা ও শাসক-গোষ্ঠী স্বীকার না করিলেও দুই-একজন অর্থ-বিজ্ঞানী স্বীকার করিয়াছেন। খোদ প্ল্যানিং কমিশনের একজন বড় অফিসার স্পষ্টই বলিয়াছেনঃ 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ডিস্প্যারিটি দূর করা যাইবে না। সবিশেষ চেষ্টা করিলে বৈষম্যটা কমান যাইতে পারে। আরও যাতে না বাড়ে, তা করা যাইতে পারে।'

অফিসারটি সত্য কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। বোধগম্য কারণেই সবটুকু সত্য বলিতে পারেন নাই। সবটুকু সত্য এই যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর ত করা যাইবেই না, কমানও যাইবে না। বৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধিও ঠেকান যাইবে না। এটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যে লোক সুস্থ, তাজা ও সবল হইয়াছে, তাকে অসুস্থ, রুগ্ন ও দুর্বল করা যায় না। যে অতি-বৃদ্ধিতে লম্বা হইয়াছে, তাকে খাট করা যায় না। যে আগাইয়া গিয়াছে, সে বসিয়া থাকিয়া অপেক্ষা না করিলে পিছনের লোক তাকে ধরিতে পারিবে না। পশ্চিম পাকিস্তান তার অগ্রগতি থামাইয়া পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষায় রাস্তার পাশে বসিয়া জিরাইবে, এটা আশা করা যায় না। যতই দিন যাইবে, বৈষম্য ততই বাড়িবে এই জন্য যে, গোড়ায় উন্নয়নের গতি চলে গাণিতিক প্রগ্রেশনে, উন্নয়ন শুরু হইলে তার গতি চলে জ্যামিতিক প্রগ্রেশনে।

অনেকের ধারণা, পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ করিলেই আঞ্চলিক ডিস্প্যারিটি দূর হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সে চেষ্টাও করা হইয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? ঐ পরিকল্পনায় মোট চার হাজার কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ধরা হইল দুই হাজার এক শ' কোটি। আর পশ্চিম পকিস্তানে ধরা হইল এক হাজার নয় শ' কোটি। প্ল্যান মুদ্দত প্রায় শেষ। শোনা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের খাতে বরাদ্দ করা দুই হাজার একশত কোটি টাকার মধ্যে এক হাজার এক শ' কোটি আজো খরচ হয় নাই। অতএব শর্টফলের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে শতকরা ষাট টাকা। সেজন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার, নেতৃবৃন্দ ও অর্থনীতিবিদরা সমস্বরে তৃতীয় পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের শর্টফলের এই টাকা খরচ না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনা স্থগিত রাখার

দাবি করিতেছেন। শর্টফলের দরুন পাঁচসালা পরিকল্পনা স্থগিত রাখা উচিত বা সম্ভব কিনা, সেটা আলাদা প্রশ্ন। এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, অর্ধেক টাকাও খরচ হয় না, এটা কোন্ ধরনের পরিকল্পনা? এমন পরিকল্পনা কারা করেন? কেন করেন? কিসের বুনিয়াদে করেন? পরিকল্পনা ত শুধু কল্পনা-বিলাসিতা নয়। দেখিবার জন্য ছবি আঁকাও নয়, ওটা বাস্তবায়িত করিবার কার্যক্রম মাত্র।

অথচ তিন-তিনটা পাঁচসালা পরিকল্পনা আসিল, গেল। তিনটারই একই অবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানের খাতে যে টাকা বরাদ্দ হয়, তা খরচ হয় না। অথচ পরের পরিকল্পনায় আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই ভাবে প্রতি বছরই ডিসপ্যারিটি বাড়িতেছে। তবু বলা হইতেছে, আগামী পরিকল্পনায় ওটা কমিয়া যাইবে। কেন কি উদ্দেশ্য এই তামাশা করা হইতেছে? কেন একই কথা ও কাজের পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে?

এর উত্তরই আজ দেশবাসী জানিতে চায়।

ইত্তেফাক, ৩১শে মে, '৭০

২০

অর্থনৈতিক সমস্যা বনাম রাজনৈতিক সমস্যা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবারকার আযাদি দিবসের বাণীতে বলিয়াছেন: 'পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতেই আমাদের মুক্তি নিহিত আছে; একমাত্র গণতন্ত্রের মাধ্যমেই আমরা ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত ও সমৃদ্ধিশালী পাকিস্তান গড়িতে পারিব।' প্রেসিডেন্ট কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলিয়াছেন। তবে ঐ কথাটাই এইভাবে বলিলে সম্ভবতঃ আরও ভাল হইত: 'গণতন্ত্রের মাধ্যমেই আমরা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানী জাতি, সুসংহত পাকিস্তানী রাষ্ট্র ও সমৃদ্ধিশালী পাকিস্তানী জনগণ গড়িতে পারিব।' এই কথাটা প্রেসিডেন্টের কথার চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট। এই সুস্পষ্টতার দরকার আছে। অস্পষ্ট ভাল কথা আমরা অনেক বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বেশীর ভাগ বিপদের জন্য দায়ী আমাদের কথার অস্পষ্টতা। পরিষ্কার কর্তব্য-বোধের জন্য পরিচ্ছন্ন চিন্তার দরকার। পরিচ্ছন্ন চিন্তার জন্য সোজা-সরল কথা বলা দরকার। সিরাতুল মুস্তাকিমের জন্য এর চেয়ে সহজ পথ আর নাই। এই সহজ কথার সোজাপথে না গিয়া আমরা অস্পষ্টতার বাঁকাপথে হাঁটিয়াছি। অস্পষ্ট, অবাস্তব, ভাবালু, শ্রুতি-মধুর, মুখরোচক, কবিত্বপূর্ণ ও রোমান্টিক কথা বলিয়া আমরা শুধু দেশবাসীকে ও দেশকেই ফাঁকি দেই নাই, নিজেরাই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। ফাঁকির বন্দী হইয়াছি। সহজ-সরল মাথা-গণতির গণতন্ত্র না দিয়া শতকরা আশিজন মুসলমানের দেশ এই পাকিস্তানকে তেইশটা বছর ধরিয়া কতই-না যন্ত্রণা দিয়াছি। আর না। বিলম্বে হইলেও আজ হইতে আমাদিগকে সহজ কথা বলা শুরু করিতে হইবে। 'ইসলামী রাষ্ট্র', 'ওয়েলফেয়ার স্টেট', 'পিপলস ডেমোক্রাসি', 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' ইত্যাদি উচ্চাংগের মিঠা অথচ ভোগা কথার বদলে রাষ্ট্রের মালিক জনগণের সহজবোধ্য কথা বলুন। রাষ্ট্রের কাঠামো কি হইবে, সরকারী ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হইবে, জনগণের আর্থিক আযাদির কি ব্যবস্থা হইবে, সেই সব কথা বলুন। পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও সমৃদ্ধির এজমালি কথা না বলিয়া পাকিস্তানী জাতির ঐক্য, পাকিস্তানী রাষ্ট্রের সংহতি ও পাকিস্তানী জনগণের সমৃদ্ধির কথা বলা এইজন্যই দরকার। পাকিস্তানের তেইশ বছরের জীবনেই দেখা গিয়াছে,

জনগণ কপর্দকহীন হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। পাকিস্তানী জাতি শতধা বিভক্ত ও দুর্বল থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান রাষ্ট্র সুসংহত ও তার সরকার অত্যন্ত 'স্টেব্‌ল' হইয়াছে। এই কন্ট্রাডিকশন আর চলিতে দেওয়া জাতি রাষ্ট্র ও জনগণ কারও পক্ষেই নিরাপদ নয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্য গণতন্ত্রের রক্ষাকবচের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আইউবী বুনিয়াদি গণতন্ত্র দেখিবার পর তাতেও আর আশ্বস্ত হওয়া যাইতেছে না।

পাকিস্তানের ভৌগোলিক বিভক্তির দরুনই রাষ্ট্রের কাঠামো ও সরকারী ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নটা এত যরুরি। দুনিয়ায় এমন ভৌগোলিক বিভক্তির নযির নাই বলিয়াই এ সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। কমবেশী উন্নত এলাকা সব দেশেই কিছু কিছু আছে। সেটা আমাদের সমস্যা নয়। কাজেই পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের কেউ-কেউ যে ঐ অঞ্চলের অনুন্নত এলাকা দেখাইয়া পূর্বাঞ্চলকে সান্ত্বনা দিতে চান তাঁরা হয় আমাদের আঞ্চলিক সমস্যাটা বুঝেন নাই, অথবা বুঝিয়াও না-বোঝার ভান করিতেছেন। পশ্চিমাঞ্চলের প্রাদেশিক বৈষম্য শাসনযান্ত্রিক অবিচারের ফল। কিন্তু পূরবী-পশ্চিমা বৈষম্য ভৌগোলিক ব্যবধানের ফল। পশ্চিমাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য দূর হইবে রাষ্ট্রীয় ফায়দার প্রসারণে। আর পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য দূর হইবে রাষ্ট্রের ফায়দা স্থানান্তরে। একটা এক্‌স্টেনশন, অপরটা ট্রান্সফার। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহের সুবিধা তাদের পারস্পরিক সংলগ্নতা ও রাধানীর নৈকট্য। পূর্বাঞ্চলের অসুবিধা পশ্চিম হইতে বিচ্ছিন্নতা ও রাজধানী হইতে দূরত্ব। বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া হাজার গণতান্ত্রিক সংস্থাতেও এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কুফল এড়ান যাইবে না। এই বিচ্ছিন্নতাই পূর্বাঞ্চলকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ও ফায়দা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

পশ্চিমা রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই সর্বপ্রথম এই কথাটা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ পূর্ব পাকিস্তানীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদারি অনুভব করিতে পারিতেছে না। তাই সেন্স অব-পার্টিসিপেশন হইতে তারা বঞ্চিত। কথাটা সত্য। কিন্তু অংশতঃ সত্য। তাই জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দিয়া তিনি অংশতঃ তার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছেন। অংশতঃ এই জন্য যে, শুধু পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ও চাকুরিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের মেজরিটি দিয়াও আসল বৈষম্যের প্রতিকার করা যাইবে না। কারণ, তাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সেন্স-অব-পার্টিসিপেশন নেওয়া হইবে বটে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ফায়দা দেওয়া হইবে না।

এই কথাটাই অনেক পশ্চিমা নেতা বুঝিতেছেন না। ১৯৫৬ সালে গণ-পরিষদে শাসনতন্ত্র বিলের আলোচনাকালে আমি বলিয়াছিলাম, আওয়ার প্রবলেম ইস্ মোর ইকনমিক দ্যান পলিটিক্যাল। আমাদের সমস্যা রাজনৈতিকের চেয়ে অর্থনৈতিকই বেশী। এই পনর বছরে এই কথাটাই আমার চেয়ে অনেক যোগ্য অর্থবিজ্ঞানীরা আরও ভাল করিয়া বলিয়াছেন। ভৌগোলিক অখণ্ডতার অভাবে আমাদের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন যে এক নয়, এ কথা আজ সুস্পষ্ট। যেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা, সেখানেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অবস্থিতি। রাজধানীতেই রাষ্ট্রের বিপুল অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হয়। পানির স্রোতের মতই এটা কেউ ঠেকাইতে পারে না। পাকিস্তানের রাজধানীটা পশ্চিমাঞ্চলে। মন্ত্রী-মেম্বর চাকুরিয়া যে অঞ্চলেরই হোন, তাঁদের অর্জিত অর্থ পশ্চিমাঞ্চলেই খরচ হইবে। শাসন-ব্যয় উন্নয়নের লগ্নি। দুনিয়ার প্রায় সব অর্থ-বিজ্ঞানীই আজ এ কথা মানিয়া লইয়াছেন। এইভাবে একাদিক্রমে তেইশ বছর ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিদেশী মিশনসমূহের সকল ব্যয় পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন লগ্নিরূপে খাটিতেছে। এই ব্যয়ের মোটা অংশ পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত এই একতরফা উন্নয়ন চলিতেই থাকিবে।

পশ্চিমাঞ্চলের নেতারা প্রায় সবাই শক্তিশালী কেন্দ্র চান। শক্তিশালী কেন্দ্র অর্থে তাঁরা যত বেশী সম্ভব বিষয় কেন্দ্রে স্তূপীকৃত করিতে চান। পক্ষান্তরে, পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ নেতা তিন বিষয়ের কেন্দ্রের পক্ষপাতী। তিন বিষয়ের কেন্দ্রের কথা শুনিলেই অধিকাংশ পশ্চিমা নেতা রাগ করেন। তাঁরা বলেন, পূরবী নেতারা কেন্দ্রকে দুর্বল করিতে চান। পূরবী নেতারা যত বলেনঃ 'আমরা শক্তিশালী কেন্দ্রের চেয়ে শক্তিশালী পাকিস্তান চাই', পশ্চিমা নেতারা ততবেশী মাথা নাড়েন। তাঁরা বুঝিতেই চান না যে, পূরবী নেতারা কেন্দ্রকে দুর্বল করিতে চান না, তাঁরা কেন্দ্রের শাসন-ব্যয় কমাইতে চান মাত্র। রাজধানী পশ্চিমে রাখিয়া প্রতিকারের উপায় মাত্র এই একটি। রাজধানী পূর্বাঞ্চলে হইলে পশ্চিমারা নিজেরাই একথা বলিতেন। দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি-অব-লেবার-ক্যাপিটাল নাই বলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের এবং আনুষংগিক সকল খরচ হইতে রাজধানীওয়ালা অঞ্চলই সবটুকু ফায়দা পায়। অপর অঞ্চল সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে। এ অবস্থায় রাজধানী স্থানান্তরের তর্ক এড়াইতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ব্যয় যথাসম্ভব কমাইতে হইবে। পূরবী নেতারা তিন বিষয়ের কেন্দ্রের কথা বলিয়া এইভাবেই সমস্যাটা মিটাইতে চান। রাজধানী পূর্বে আনিলে পশ্চিমা

তাঁহাদের এই একই অসুবিধা হইবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারে খরচা কমানই একমাত্র সমাধান। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যয় যত কম হইবে, সরকারী ব্যয়ের দরুন আঞ্চলিক বৈষম্য তত কম হইবে।

এই গজকাঠি দিয়া পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের কথিত তিন বিষয়ের কেন্দ্রের বিচার করুন। এই তিনটি বিষয়ঃ দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা। শেষেরটাই আগে কওয়া যাক। মুদ্রা ফেডারেল কেন্দ্রের অত্যাবশ্যক বিষয় নয়। তথাপি পূর্ববী নেতারা মুদ্রাকে কেন্দ্রের বিষয় করিতে চান পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীকরূপে। মুদ্রা রাষ্ট্রীয় শক্তির দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতির দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মুদ্রা ও কারেন্সির উপাদান রং, আকার ও প্রতীক ঠিক করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত, মুদ্রিত ও নির্মিত মুদ্রা হইবে সারা দেশের কারেন্সি। বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের একটি কারেন্সি চলিবে। দুনিয়া জানিবে, পাকিস্তান এক অখণ্ড রাষ্ট্র; তার মুদ্রাও এক। এটা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার সম্পূরক হইবে।

জাতিসংঘের মেম্বরগিরি হইতে শুরু করিয়া সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশীদের আগমন-নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। যে পররাষ্ট্র দফতরের মারফত বহির্বিশ্বের পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ, সেই গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র দফতর কেন্দ্রের হাতে থাকিলে কেন্দ্র কদাচ দুর্বল হইতে পারে না। রুশিয়ার মত শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীনেও কয়েকটি ইউনিয়ন রিপাবলিকের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার আছে। অথচ পাকিস্তানে আমরা পররাষ্ট্রকে এককভাবে কেন্দ্রীয় বিষয় রাখিতে চাই।

তারপর ধরুন দেশরক্ষা দফতরের কথা। এমনি গুরুত্বপূর্ণ দফতর এটি যে, এই একটিমাত্র বিষয় লইয়াই কেন্দ্র শক্তিশালী হইতে পারে। পাকিস্তানের মত নয়া রাষ্ট্রে ত বটেই, সব রাষ্ট্রেই বিশেষতঃ পাকিস্তানে জাতীয় দেহের সবচেয়ে সবল ও পরিপুষ্ট অংগ আমাদের সৈন্যদল। আমাদের জাতীয়-জীবন যেগুলি উপকরণ দ্বারা গঠিত, তার মধ্যে সবচেয়ে সুসংহত, শৃংখলাবদ্ধ সংস্থা দেশরক্ষা বাহিনী। শক্তি ও ক্ষমতার দিক হইতে রাষ্ট্র-দেহের এটিই সবচেয়ে পেশীবহুল অংগ। অন্য কোনও দফতরের সাথে এর তুলনাই হয় না। বিশেষতঃ, কেন্দ্রের হাতে যত কম বিষয়ই থাকুক না কেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় প্রয়োজনমত যে-কোনও বিষয় কেন্দ্রের হাতে নিবার শাসনতান্ত্রিক

ক্ষমতা তার থাকিবে। এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার শক্তিও এই সৈন্য-বাহিনীই।

দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রের মত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উভয়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক দিক হইতে একটি লক্ষণীয় ও বাঞ্ছনীয় বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্বটি এই যে, ইহাদের শাসন-ব্যয় আঞ্চলিক বৈষম্য খুব কমই সৃষ্টি করিবে। এই দুইটি বিষয় এমনি যে, এদের ব্যয় রাজধানী-নিরপেক্ষ। রাজধানীর অবস্থিতির সাথে এদের খরচা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নয়। প্রথমে ধরুন পররাষ্ট্র দফতরের কথা। এই দফতরের প্রধান ব্যয় রাষ্ট্রদূতদের বেতন-ভাতা ও দূতাবাসমূহের খরচা। এ সবই বিদেশে হয়। ফলে এই খরচা আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধির সহায়ক হয় না। তারপর পররাষ্ট্র দফতরের বিভাগগুলি এমন যে, তাদের প্রধান কয়টি রাজধানীর কাছে রাখিয়া বাকী সবগুলি অপরাঞ্চলে স্থাপন করা যাইতে পারে। তাতে এদের শাসন-ব্যয় উভয় অঞ্চলে সমভাবে বিতরণ করা যায়। পাকিস্তানে স্থাপিত বিদেশী মিশনগুলি সম্বন্ধেও এই নীতি পালিত হইতে পারে।

দেশরক্ষা সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। পূর্বাঞ্চলে নৌ-দফতর ও পশ্চিমাঞ্চলে বিমান-দফতর হইলেই এদের খরচা উভয় অঞ্চলে মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত হইবে। দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি রাজধানীর কাছে থাকিবেন। ডিপুটি প্রধান সেনাপতি থাকিবেন অপরাঞ্চলে। অস্ত্রের কারখানা ও মিলিটারি একাডেমিও হইবে দুই অঞ্চলেই। তার দরকারও হইবে। প্রাকৃতিক কারণেই দুই অঞ্চলের যুদ্ধনীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অস্ত্রের শ্রেণী ও ট্রেনিং যার-তার ফিল্ডক্র্যাফ্ট অনুযায়ী ভিন্ন হইবে। পশ্চিমাঞ্চলে যে ভারি যুদ্ধাস্ত্র লাগিবে, পূর্বাঞ্চলে তা লাগিবে না। পূর্বাঞ্চলের ডিফেন্স ডেপ্থ সংকীর্ণ হওয়ায় এখানে জনবল লাগিবে বেশী ও ভিন্ন ট্রেনিং-এর। স্বভাবতঃই সৈন্যবাহিনীর জনবল ও অফিসার যার-তার অঞ্চলেই সর্বাধিক দক্ষতার সাথে প্রতিরক্ষায় কাজ করিবে। ফলে এদের বেতন-ভাতা আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়াইবার হেতু হইবে না। তাতে মবিলিযেশন, ডেপ্লয়মেন্ট ও ট্র্যান্সফার বাবত সরকারী খরচাও অনেক কম লাগিবে। এইভাবে দেশরক্ষা কেন্দ্রের হাতে থাকিয়াও তার খরচাটা উভয় অঞ্চলে মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত হইবে।

এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচার অর্থনৈতিক ফায়দা সমভাবে দুই অঞ্চলের কাজে লাগিবে। উভয় অঞ্চল কেন্দ্রকে সমান ভালবাসিবে। তাতেই কেন্দ্র হইবে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। এটা না করিয়া যাঁরা আবশ্যক-অনাবশ্যক সব বিষয়ের স্তূপ কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইতে চান, তারা কার্যতঃ

কেন্দ্রের খরচা বাড়াইয়া সে বাড়তি খরচায় আঞ্চলিক বৈষম্য তীব্রতর করিতে চান। রাজধানীর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত যত বেশী বিষয় কেন্দ্রে দেওয়া হইবে, রাজধানীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তত বাড়িবে। রাজধানীর দাবিতে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাও ততই বাড়িবে। পশ্চিমা ভাইদের 'স্ট্রং-সেন্টারের' দাবির জবাবে পূর্বাঞ্চলে রাজধানী আনার দাবি ইতিমধ্যেই জোরদার হইয়াছে। স্পষ্টতঃই সংহতির পথ ওটা নয়।

ইত্তেফাক, ১২ই আগস্ট, '৭০

২১

আসন্ন নির্বাচন মামুলি নির্বাচন নয়

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দিন যতই কাছাইয়া আসিতেছে, দেশবাসীর মন ততই আশা-আশংকায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। এই আশা-আশংকা শুধু নির্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তি ও পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণভাবে গোটা দেশবাসী ও বিশেষভাবে ভোটারগণও উদ্বেগে দিন কাটাইতেছে। কারণ গোটা দেশবাসীই এই নির্বাচনকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার, আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেল প্রথম প্রতিষ্ঠার, মাধ্যম মনে করিতেছে। অবশ্য যাঁরা নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে যাঁরা সং-সাজা রাজনীতি আখ্যা দেন, তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের ছাড়া আর গোটা দেশবাসীই বিশ্বাস করে, আসন্ন নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, শুধু নির্ভর করিতেছে না, ক্ষীণসূতায় ঝুলিতেছে। এক-দিকে আশা, আরেকদিকে আশংকা এই কারণেই।

সে অবস্থাটা এই যে, আমাদের দেশে পার্টির সংখ্যা মা'শাআল্লাহ একেবারে তের। পার্টি-সংখ্যার এই বাহুল্যও চিন্তার কারণ হইত না, যদি অত পার্টি করিবার সংগত কারণ থাকিত। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় পার্টি-বাহুল্য হওয়া স্বাভাবিক। তেইশ-তেইশটা বছরের স্বাধীনতার জীবনেও পাকিস্তানে একটা সাধারণ নির্বাচন হয় নাই। এত দীর্ঘদিন ধরিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পাকিস্তানী জাতির ফর্মেটিভ পিরিয়ড চলিতেছে। পাকিস্তানবাসী শুধু আর্থিক ও শারীরিক দুর্গতিই পোহাইতেছে না, জাতীয় অনিশ্চয়তার মানসিক দুর্গতিও সহিতেছে। আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় জীবনের এই অমানিশা কাটিবে, গণতন্ত্রের সুবেহ-সাদেকের স্ফুরণ হইবে, এটাই দেশবাসীর আশা। সম্ভাব্য আসন্ন সে সুবেহ-সাদেক কোনও অনিশ্চিত আকস্মিক দুর্ঘটনায় সুবেহ-কাযেব হইয়া না যায়, সেটাই দেশবাসীর আশংকা। যে দেশের প্রাসাদ-চক্রান্ত নয়-নয়টা বছর শাসনতন্ত্র রচনা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, শাসনতন্ত্র রচনার পরেও নির্বাচনের প্রাক্কালে যে দেশের দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধান এক তুড়িতে শাসনতন্ত্র বাতিল ও নির্বাচন ভণ্ডুল করিয়া দশ-দশটা বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে ডিক্টেটরি করিতে পারেন, সে দেশের জনগণের পক্ষে এমন আশংকা খুবই স্বাভাবিক। অন্যথায় পার্টি-বাহুল্যের প্রতিকার ভোটাররা নিজেরাই করিত।

যদি শাসনতন্ত্র রচনায় অযথা বিলম্ব না হইত, হইবার পরেও যদি অমন করিয়া শাসনতন্ত্র বাতিল না হইত, তবে কম করিয়া হইলেও দেশে তিন-তিনটা সাধারণ নির্বাচন হইয়া যাইত। সে নির্বাচনের ঝাড়াই-বাছাই-এ পার্টি-সংখ্যা তিন-চারটায় নামিয়া আসিত। ভোটারদের এই চাপে শুধু পার্টি-সংখ্যাই কমিত না, তাদের চরিত্রও সংশোধিত হইত। গণতান্ত্রিক প্রয়োজনে শাসনতান্ত্রিক উপায়েই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আজ জনগণের গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিত। তা না হওয়া উল্টা হইল। গণতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের বদলে দেশ বিপরীত দিকে চলিল। গণতন্ত্র নিহত ও রাজনীতি নিষিদ্ধ হইল। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুখে অত-অত পার্টি গজাইয়া উঠিল। যে দেশে নির্বাচন হয় না, পার্টি-পরিচালনায় সেখানে গণসমর্থনের দরকার হয় না। যেখানে পার্টির অস্তিত্বের জন্য গণসমর্থন দরকার নাই, সেখানে পার্টি স্থাপনে কোনও ল্যাঠা নাই। যে কেউ ইচ্ছা করিলেই একটা কেন, দুই-তিনটা পার্টি করিতে পারেন। আগামী নির্বাচনে এবং ভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালে আরও নির্বাচন হইতে পারিলে ভোটাররাই ঠিক করিবেন, দেশে কতটা পার্টি এবং কোন্-কোন্ পার্টি থাকিবে। সব নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই গোড়ায় অমন পার্টি-বাহুল্য থাকে। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ঝাড়াই-বাছাইর ফলেই তাদের পার্টি-সংখ্যা যুক্তিসংগত পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। এই দিক হইতে পার্টি-সংখ্যা-বাহুল্য আমাদের চিন্তার কারণ নয়। চিন্তার কারণ অন্যখানে। যে কারণে পার্টি-সংখ্যা এত বেশী হইতে পারিয়াছে, সেই কারণেই পার্টি-আনুগত্য তত কম হইতেছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও নির্বাচনের অভাবে পার্টির শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনবোধ ও পার্টি-অনুগত্য আজও তেমন দানা বাঁধে নাই। পার্টির প্রয়োজনবোধ ও আনুগত্যের এই অভাব শুধু ভোটার ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক নেতা-উপনেতার মধ্যেই এর অভাব আছে। এই অভাবের দরুনই দেশে যত না হইয়াছে পার্টি, তার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে ফ্যাক্‌শন। বস্তুতঃ একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশে যতগুলি রাজনৈতিক দল নিজেদেরে পার্টি বলিয়া দাবি করিতেছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই আসলে ফ্যাক্‌শন। একই নামের একই দলের একই স্লোগানের তিন-চারটা করিয়া পার্টির অস্তিত্ব একথাই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিতেছে। এক নামের এতসব তথাকথিত পার্টির অস্তিত্ব জনসাধারণ ও সংবাদপত্র পাঠকদের এমন বিভ্রান্তির কারণ হইয়াছে যে, ব্রাকেটে তাদের বিশেষণ লাগাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিশেষণগুলিও

ব্যক্তিবাচক। এই হইতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এগুলি শুধু ফ্যাক্শনই নয়, নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফ্যাক্শন। এইখানেই রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও পৌর-বিজ্ঞানের কিতাবে বর্ণিত পার্টি ও ফ্যাক্শনের সংজ্ঞার কথা মনে পড়িয়া যায়। এই সংজ্ঞা মতে পার্টির উদ্দেশ্য গোটা দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ। আর ফ্যাক্শনের উদ্দেশ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির স্বার্থ। আমাদের দেশে বর্তমানে এই দুরবস্থাই চলিতেছে। সাধারণ অবস্থায় এই দুরবস্থা চিন্তার কারণ না হইলেও আসন্ন নির্বাচনের মুখে এটা বিপজ্জনক।

আসন্ন নির্বাচনটা শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রথার সাধারণ নির্বাচন নয়। সরকার বহাল-বদল এই নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্যও নয়। এই নির্বাচনে যে-সব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, তাঁরা সাধারণ পার্লামেন্ট বা আইনসভা গঠন করিবেন না। প্রাথমিক স্তরে তাঁরা গঠন করিবেন গণ-পরিষদ। এঁরা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র রচনায় সফল হইলে পরে এঁরাই হইবেন পার্লামেন্ট। তখনই তাঁরা মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই জন্য আসন্ন নির্বাচনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একথা সবাই বলিতেছেন। বুঝিতেছেনও। কিন্তু কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা খুব কম নেতাই চিন্তা করিতেছেন। গণ-পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে না পারিলে পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে, মার্শাল ল' চলিতে থাকিবে, গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে না, এসব দৃশ্যমান সহজ কথা। সত্যও। কিন্তু ওখানেই ওর শেষ নয়। এই পরিস্থিতির পরিণাম আরও গুরুতর, ঘোরতর ও সুদূরপ্রসারী। ভয়াবহ। বিপজ্জনক। দেশের দুর্ভাগ্য, এই নেতাদের বেশির ভাগই যেন এই বিপদের আশংকার বাস্তবতা ও আসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রচারণায় অধিকাংশ নেতা লঘু-চিত্ততা দেখাইতেছেন, সেটাই এর প্রমাণ। তাঁদের কথাবার্তায় বুঝা যায়, তাঁরা যেন সোজাসুজি সরকার গঠনের জন্যই নির্বাচন করিতেছেন। অবশ্য এ কথা বিনা-তর্কে মানিয়া লওয়া উচিত যে, সরকার গঠন করিলে তাঁরা কি কি জনহিতকর কাজ করিবেন, তা বলাও এই নির্বাচনে নিতান্ত প্রাসংগিক ব্যাপার। শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিলে তাঁহারাই মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। সে উদ্দেশ্যে নতুন করিয়া আর নির্বাচন হইবে না। কাজেই সরকার গঠন করিতে পারিলে তাঁরা কি কি করিবেন, তেমন নির্বাচনী ওয়াদা করিবার সময় এটাই। কাজেই নির্বাচন-প্রার্থী দলীয় প্রধানরা 'এটা করিব, ওটা করিব' বলিয়া যে-সব ওয়াদা করিতেছেন, তার একটাও বেহুদা নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে, নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেই

তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্যটাই ভুলিয়া যাইতেছেন। পূর্ব বাংলার কতিপয় পার্টি ছাড়া সারা পাকিস্তানের আর কোনও পার্টিই শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট কথা বলিতেছেন না। এ সম্পর্কে তাঁরা 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' এবং 'কোরআন ও সুন্না মোতাবেক আইন' রচনার কথা বলিয়াই নিজেদের কর্তব্য সমাপন করিতেছেন। স্পষ্টতঃই এতে দুইটা দোষ ঘটিতেছে। এক, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ভোটারদেরে বুঝিতে দেওয়া হইতেছে না। দুই, এ সম্পর্কে ভোটারদের কোথাও ম্যাণ্ডেট লওয়া হইতেছে না। শাসনতন্ত্র রচনার পর তাতে জনগণের র‍্যাটিফিকেশন বা অনুমোদন করিবার কোনও বিধান প্রেসিডেন্টের 'ফ্রেমওয়ার্কে' নাই। সে কারণে শাসনতন্ত্রের রূপ-রেখা সম্পর্কে নির্বাচন-প্রার্থীদের ধারণা আগে হইতেই ভোটারদের সামনে পেশ করা অত্যাবশ্যক। এটা না করা শুধু অন্যায়, অসংগতই নয়, অগণতান্ত্রিকও বটে।

দুঃখের সাথে বলিতে হইতেছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ দল ও দলীয় নেতা এই অসংগত, অগণতান্ত্রিক কাজটিই করিতেছেন। 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' ও 'কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আইন' খুবই উচ্চাংগের ভাল কথা। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক রূপ-রেখার দিক হইতে এ সবই অস্পষ্ট, সুতরাং মূল্যহীন কথা। ঠিক তেমনি 'সমাজতন্ত্র' বা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' অথবা 'ইসলামী মুসাওয়াত'ও খুব উঁচুদরের অর্থনৈতিক সাম্যের কথা। শাসনতান্ত্রিক রূপ-রেখার দিক হইতে ও-সব সমভাবেই অস্পষ্ট, সুতরাং অর্থহীন। অস্পষ্টতার, অর্থহীনতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, 'ইসলামী শাসনতন্ত্র'-ওয়ালারা নিজেরাই এ বিষয়ে একমত হইতে পারিতেছেন না। পারিতেছেন না বলিয়াই তাঁরা আট-নয়টা পার্টি চালাইতেছেন এবং পরস্পরকে [illegible] গাল দিতেছেন। 'ইসলামী শাসনতন্ত্র'-ওয়ালাদের সম্বন্ধে যে কথা সত্য, সমাজতন্ত্র'-ওয়ালাদের সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য। আসলে ইসলামী শাসন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা আসিবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে। রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে আসিলে তারা নিজ হাতেই তা করিবে। পরের হাতের দান তারা নিবেও না, নিলেও কোনও কাজে লাগিবে না।

পশ্চিমা নেতাদের এই সার্বজনীন অস্পষ্টতার মধ্যেও একটা ব্যাপারে কিন্তু তারা খুবই স্পষ্ট। সে সুস্পষ্টতা এই যে, তাঁরা 'স্ট্রং সেন্টারও' চান, [illegible]টাও চান। দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক ব্যবধানের কথা তুলিলে কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার দূরত্বের নযির দেন। পূর্ব বাংলার বন্যা-নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিবার দাবি করিলে পশ্চিম পাকিস্তানেও বন্যা হয়,

বলেন। অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ না করিলে আঞ্চলিক তিক্ততা পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করিতে পারে, এমন আশংকা প্রকাশ করিলে কোনও কোনও নেতা সদম্ভে ঘোষণা করেন ঃ 'ইসলাম ধর্ম ও দেশরক্ষা বাহিনীই পাকিস্তানের সংহতির রক্ষাকবচ।' একদিকে শাসনতান্ত্রিক রূপ-রেখা সম্বন্ধে পশ্চিমা নেতাদের সকলের ইসলামী ঐক্য ও স্ট্রং-সেন্টার-মুখরিত নীরবতা, অপর দিকে দুই-একজনের মুখে একমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ও দেশরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় সংহতির হাতিয়ার ঘোষণা; এটাই আমাদের দুশ্চিন্তার বড় কারণ। শধু ধর্মীয় ঐক্য ও কমন শত্রু-ভীতি যদি মানুষকে সংহতিবদ্ধ রাখিতে পারিত, তবে ইসলামী ঐক্য ও কমন শত্রু ইসরাইলের দুশমনি সত্ত্বেও জর্ডন-সিরিয়া ও ফিলিস্তিন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া দশ হাজার মুসলমান মুসলমানের হাতে নিহত ও লক্ষ মুসলমান গৃহহীন হইত না। কাজেই পশ্চিমা ভাইরা ঐসব ভাবালু অবাস্তব কথা রাজনীতি-ক্ষেত্রে যত কম বলেন, পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের ইয্যতের জন্য ততই মংগল।

পশ্চিমা নেতাদের সকলেই ঐ মতে বিশ্বাসী, একথা আমি বলিতেছি না। কথাটা সত্যও নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অধিকারে সমান শরিকানার ভিত্তিতে দুই অঞ্চলের ঐক্য ও একতার উপর পাকিস্তানের সংহতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজে তাঁদের অন্যতম প্রধান। নির্বাচনী প্রচার-ভংগি দেখিয়া তাঁরাও নিশ্চয়ই চিন্তাযুক্ত হইয়াছেন। তাই তাঁদের কেউ-কেউ প্রস্তাব দিয়াছেন যে, নির্বাচনের আগেই সকল দলের নেতাদের একটা গোল-টেবিল সম্মিলনী হওয়া উচিত। তাঁদের মত এই যে, সেই গোল-টেবিল-বৈঠকেই একটি সর্বসম্মত শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচিত হওয়া দরকার। প্রস্তাবটি খুবই ভাল। গণ-পরিষদে শাসনতন্ত্রের কোনও খসড়া পেশ হইবার আগে সকল দলের নেতৃবৃন্দের অনুমোদন পাইলে শাসনতন্ত্র রচনা যেমন সহজ ও ত্বরান্বিত হইবে, রচিত শাসনতন্ত্রও তেমনি দেশবাসীর গ্রহণযোগ্য হইবে। কাজেই এমন একটি নেতৃসম্মিলনীর ব্যাপারে কেউ দ্বিমত হইবেন বলিয়া আমি মনে করি না। তবে এই সম্মিলনীটা নির্বাচনের আগেই হইবে, না পরে হইবে, সে বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত মত এই যে, নির্বাচনের পরে কিন্তু গণ-পরিষদ ফরম্যালি বসিবার আগে এই সম্মিলনী বসিলে ভাল হয়। দুই কারণে নির্বাচনের আগে সেই সম্মিলনী হওয়া উচিত নয়। এক, এটা অগণতান্ত্রিক হইবে। দুই, এর সাফল্যের সম্ভাবনা কম। তার চেয়ে ভাল হয় বিভিন্ন পার্টি যার-তার পরিকল্পিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর গাইড-লাইনগুলি ভোটারদের সামনে পেশ করিবেন। তারই আলোকে নির্বাচনের পরে ঐ নেতৃসম্মিলনীতে একটা

সমঝোতায় আসা যাইবে। সেই সমঝোতার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত ও গণ পরিষদে অনুমোদিত হইবে।

এখানে প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, গণ-পরিষদের মেয়াদ এক শ' কুড়ি [illegible]। সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিবার যে পরামর্শ [illegible] কেউ দিয়াছেন, ওটা কোনমতেই দেশের কল্যাণ করিবে না। বরঞ্চ তাতে অকল্যাণ হইবে। কাজেই প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়। বরঞ্চ নির্বাচনের পরে অনুষ্ঠিত গোল-টেবিল বৈঠক ও গণ-পরিষদের দৈনন্দিন কার্যবিবরণী সাধারণ্যে যত বেশী আলোচিত হইবে, সে-সব আলোচনার আলোকে গৃহীত শাসনতন্ত্র তত বেশী নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হইবে।

ইত্তেফাক, ২৬শে সেপ্টেম্বর, '৫০

২২

নির্বাচনের বিরোধিতা করেন কারা ?

আসন্ন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা আজও চলিতেছে। বাহ্যতঃ অহেতুক হইলেও এই আশংকা অনেকের মনেই জাগিতেছে। অনেকেই খোলাখুলি সে আশংকা প্রকাশও করিতেছেন। আশংকার কোন যুক্তি থাকে না। কিন্তু এই আশংকাটার যুক্তিও আছে। মনে হয়, দৃশ্য-অদৃশ্য হাতের সমবেত চেষ্টা যেন নির্বাচন ভণ্ডুল করিবার কাজে নিয়োজিত আছে। প্রশ্ন জাগেঃ এরা কারা ?

এটা সত্যই অদৃশ্য। অদৃশ্য হইলেও পরম শক্তিশালী এটা। বিনা মেঘে-বজ্রপাতের মতই এর পদ্ধতি আকস্মিক ও অব্যর্থ। এটার নাম প্রাসাদ-চক্রান্ত। পাকিস্তানে কয়েকবার ঘটিয়াছে। আবারও যদি ঘটে, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ঘটিয়া গেলে দোষটা অবশ্য পড়িবে জনগণের ঘাড়েই। বলা হইবে, জনগণই গণতন্ত্রের অযোগ্য। তারাই উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতা আনিয়া দেশটা প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। ত্রাণকর্তা আসিয়া বাঁচাইয়া দিলেন। বজ্রপাতটা আসমানী, অতএব আন্তর্জাতিক। তাই ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশেও এটা ঘটিয়াছে। কাজেই এতে জনগণের কোনও করণীয় নাই।

কিন্তু অপর যে শক্তি নির্বাচনের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে, তাঁহাদের আমরা চিনি। আমাদের সামনে আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা লইয়াই তাঁরা নিজেদের কাজ করিতেছেন। কারণ এটা করিতেছেন তাঁরা জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়া। এঁরা আবার দুই দলে বিভক্ত। একদল বলিতেছেনঃ 'ভোটের আগে ভাত চাই,' 'বন্যা-নিয়ন্ত্রণ না হইলে ব্যালট বাক্স জ্বালাইয়া দিব' ইত্যাদি। এঁদেরও আবার দুই দল। একদলের মতলব ভাত ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ। নির্বাচন বর্জনটা হুমকি মাত্র। অপর দলের মতলব নির্বাচন বর্জন। ভাত ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাহানা মাত্র। এই দুই দলের উদ্দেশ্যে পার্থক্য থাকিলেও তাঁদের কাজের পরিণাম-ফলে কোনও পার্থক্য নাই। উভয়ের কাজের পরিণাম নির্বাচন বানচাল হওয়া। যাঁরা জনগণের ভাত-কাপড় ও পূর্ব বাংলার জীবন-মরণ-সমস্যা বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপর সর্বাধিক জোর দিবার উদ্দেশ্যে ঐ দুইটি ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দিতে চান, তাঁদের সাথে কারও, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার কারও, দ্বিমত নাই।

কিন্তু দাবি দুইটার উপর এম্‌ফ্যাসিস্‌ দেওয়ার জন্য যখন তারা বলেন ঃ ‘ও-দুইটা না হইলে নির্বাচন হইতে দিব না’, অথবা ‘ব্যালট বাক্স জ্বালাইয়া দিব’, তখনই তারা সীমা লংঘন করেন। এতে ভাত মিলিবার বা বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজ এক পা আগাইবে না; কিন্তু নির্বাচনের তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ এক শ’ পা পিছাইয়া যাইবে। অথচ এই এম্‌ফ্যাসিস্‌টাই অন্যরূপে দেওয়া যাইত। তাতে দাবিটার উপর সমান জোরও পড়িত। নির্বাচনের উপরও আঘাত হানা হইত না। বলা যাইত ঃ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি অবিলম্বে ভাত ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করেন, তবে তাঁদের একদিনও মন্ত্রী-মেম্বর থাকিতে দেওয়া হইবে না। ব্যালট বাক্স পোড়াইবার হুমকির বদলে মেম্বর-মন্ত্রীদের বাড়ি জ্বালাইবার হুমকি দিলেও সেটাকে আমরা গণতন্ত্রের অতবড় দুশ্‌মনি মনে করিতাম না। কারণ তাতে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে চান্‌স দেওয়া হইত।

এম্‌ফ্যাসিস্‌টা এ-ভাবে না দিয়া ও-ভাবে দেওয়ায় এঁদের দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্যটা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সমর্থিত হইয়া গেল। এই দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্য নির্বাচন ভণ্ডুল করা। ভাত ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণটা তাঁদের অজুহাত মাত্র। কেন এঁরা নির্বাচন-বিরোধী তা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। বিনা-যুক্তিতে নির্বাচন-বিরোধিতা করিয়া এঁরা আসলে সামরিক শাসনের ‘স্টেটাস্‌কে’ বজায় রাখিতে চান। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় এঁদের ও প্রথমোক্ত প্রাসাদ-চক্রান্তের হোতাদের মধ্যে স্পষ্টতঃই কোনও পার্থক্য নাই। অথচ এঁরা বামপন্থী কর্মী-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। আশ্চর্য নয় ?

নির্বাচনের বিরুদ্ধে অপর যে শক্তিটি ক্রিয়া করিতেছে, তাঁদের কাজে গোপনীয়তা বা ভণ্ডামি নাই। তাঁদের যুক্তিতে কোনও অস্পষ্টতা নাই। তাঁদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তাঁরা নীতিতঃই নির্বাচন-বিরোধী। পার্লামেন্টারী রাজনীতিকে তাঁরা বুর্জোয়া সংসদী রাজনীতি বলেন। তাঁদের মতে এই নির্বাচনে জনগণের কোনও উপকার হইবে না। বরং ক্ষতি হইবে। জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হইলেও এই পার্লামেন্ট আসলে জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধি নয়। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় গণতন্ত্র একটা প্রহসন, একটা তামাশা। এই ব্যবস্থায় ভোট সমান বটে, কিন্তু ভোটাররা সমান নয়। এমন নির্বাচনে শুধু ধনী পুঁজিবাদী বড়লোকেরাই নির্বাচিত হয়। কৃষক-শ্রমিক ইত্যাদি গরিবদের এতে নির্বাচিত হইবার কোনও আশা নাই।

কথাগুলির দুইটা দিক আছে। একটা নীতির দিক। অপরটা বাস্তবের দিক। বাস্তব দিকটা বিচার করিলে কথাগুলির মধ্যে অনেক জোর আছে। প্রথমতঃ, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে ত বটেই, দলগতভাবেও অনেক

সময় নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করিয়া থাকেন। অতীতেও করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও করিতে পারেন। ফলে ভোটের সময় জনগণের মধ্যে যে আশা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়, নির্বাচনের পরে সে আশায় নিষ্ঠুর আঘাত ও উদ্দীপনায় বিদ্রূপের ময়লা পানি নিক্ষেপ করা হয়। এ-সব দেখিয়া-শুনিয়া সরলমনা জনগণ সহজেই এই ধারণা করিয়াছে যে, ভোটটা সত্য-সত্যই বড়লোকদের একটা ভেল্কিবাযি। জনগণের এই হতাশা-নৈরাশ্য ও ঔদাসীন্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে নির্বাচন-বিরোধীরা। ভোটাধিকারের অস্ত্রের ধার যে পরবর্তী নির্বাচনে বিশ্বাস-ঘাতকদেরে শায়েস্তা করিবার কাজে লাগিতে পারে, এটাও ক্রমে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একবার গদিতে বসিতে পারিলে আর নির্বাচন দেন না। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচন দিলেও পরবর্তী নির্বাচনে নয়া যাঁদেরে ভোট দেওয়া হইবে, তাঁরাও আগের প্রতিনিধিদের মতই বিশ্বাস ভংগ করিবেন। এমনি চলিতে থাকিবে চিরকাল।

এর প্রতিকারের জন্য কৃষক-শ্রমিক ইত্যাদি গরিবেরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, তারও উপায় নাই। কারণ যদিও সার্বজনীন ভোটের ব্যবস্থা, যদিও ভোটারদের শতকরা নব্বই জনই কৃষক-শ্রমিক-গরিব-মেহনতী লোক, তবু তারা নিজেরা নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারে না। বড়লোকের সরকার ও নির্বাচন কমিশন প্রার্থী হইবার ডিপসিটের পরিমাণ এত বেশী রাখিয়াছেন যে, অত টাকা দাখিলের আওকাত কৃষক-শ্রমিকদের নাই। তাছাড়া নির্বাচন-খরচার বিপুলতা ও নির্বাচনী এলাকার বিশালতা ত আছেই। এইভাবে গোটা নির্বাচনী আইনটাই এমনভাবে করা হইয়াছে যে, কৃষক-শ্রমিকদের শুধু ভোট দিবারই অধিকার আছে, ভোট পাইবার অধিকার নাই।

নির্বাচন-বিরোধীরা এইসব দেখাইয়াই জনগণকে নির্বাচন-বিমুখ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁরা বলিতে পারেনঃ 'ইয়ে নির্বাচন ধোঁকা হ্যায়', 'ইয়ে আযাদি ঝুটা হ্যায়'। এ-সবই প্রতিকারযোগ্য অবিচার ও অব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই এ-সবের প্রতিকার করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্বাচন-বিরোধীরা সে সব প্রতিবিধানের দাবি করেন না। এইসব ত্রুটির দোহাই দিয়া তাঁরা গোটা নির্বাচনটারই বিরোধিতা করিয়া থাকেন। এঁরাই আমাদের দেশের আসন্ন নির্বাচনটা ভণ্ডুল করিবার চেষ্টায় মাতিয়াছেন। গণতন্ত্রের ত্রুটি গণতন্ত্র নিজেই সংশোধন করিতে পারে বলিয়াই এঁরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই বিরোধিতা করিতেছেন। এঁরা বিশ্বাস করেন এবং অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একবার খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে সে দেশে আর গণ-বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। গণ-বিপ্লব আনিতে গেলে জনগণকে সামরিক শাসনের বেকায়দায় ও স্বৈরাচারী শাসনের যুলুমের যাঁতাকলে

রাখিতে হইবে। জনগণের উপর আর্থিক ও সামাজিক যত বেশী অবিচার-অত্যাচার হয়, গণ-মনের অসন্তোষ তত বেশী তীব্র হয়। এই অত্যাচারিত অসন্তুষ্ট জনগণই বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র। নির্বাচনে বাধা দিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঠেকাইয়া দেশে বিপ্লব আনাই এই নির্বাচন-বিরোধীদের উদ্দেশ্য। সেকথা খোলাখুলি তাঁরা বলিয়াও থাকেন।

বিপ্লব করিয়া এঁরা কি আনিতে চান? অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক ভেদাভেদের অবসান করিতে চান। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা সমাজবাদ কায়েম করিতে চান। এই সমাজবাদ প্রবর্তনের একমাত্র উপায় বিপ্লব; গণতন্ত্রের মারফত এই সমাজবাদ প্রবর্তন করা যাইবে না; এটাই তাঁদের সবচেয়ে বড় যুক্তি। অতএব "নির্বাচন নয়, বিপ্লবই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র পথ।" এটাই বিপ্লবীদের শ্লোগান।

এখন জনগণকে বিচার করিতে হইবে, বিপ্লবীদের এ-সব কথা ঠিক কি না। গণতন্ত্র সত্যই ঝুটা কি না, নির্বাচনটা সত্যই বুর্জোয়া ধোঁকাবাযি কি না, গণ-তন্ত্রের পথে পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজবাদ প্রবর্তন সম্ভব কি না, বিপ্লবই গণ-মুক্তির একমাত্র পথ কি না, বিপ্লবটা আসলে কি, কি ধরনে সে বিপ্লব হইবে, কারা সে বিপ্লব সাধন করিবে, কখন করিবে; এ সব প্রশ্নই এই প্রসংগে বিচার করিতে হইবে। সে বিচার চলিতেছেও। আমাদের দেশেও। আমাদের জনসাধারণ, বিশেষতঃ আমাদের ইন্টেলিজেনশিয়া ও ছাত্র-তরুণেরা খুব গভীর মনোযোগেই এ সবের বিবেচনা করিতেছে। আফ্রো-এশিয়ান সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সবগুলি দেশেই এর বিচার-বিবেচনা চলিতেছে। প্রায় সব দেশের সমস্যাই আমাদের অনুরূপ। আমাদের দেশের মতই ঐসব দেশের জনগণকেও সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণ মুক্ত করার আশু প্রয়োজন পড়িয়াছে। ঐসব দেশেরও ইন্টেলিজেনশিয়া ও ছাত্র-তরুণেরা চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। সেখানকার চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্র-নায়ক-দের মধ্যেও বিপ্লব ও গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। অনেক দেশেই সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমা ছাড়াইয়া সামরিক উত্থান-পতনের আকার ধারণ করি-তেছে। সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ঘন-ঘন সরকার পরিবর্তন হইতেছে। তাতে অহেতুক খুনাখুনি হইতেছে। দেশরক্ষা বাহিনীর মধ্যে বিপজ্জনক দলাদলি ও বাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হইতেছে। এটাকেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিপ্লব বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ বিপ্লবের আসল উদ্দেশ্য যে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সাম্য, সে কাজ খুব কমই হইতেছে। এই ধরনের 'বিপ্লবের' দ্বারা যে জনগণের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হয় বেশী, আমাদের দেশের 'আইউবী বিপ্লব'ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তবু এ ধরনের কাঁচা চিন্তার পরিণাম এটাই। তাই এ ধরনের চিন্তা ও পন্থাকেই ইনফেন্টাইল লেফ্‌টিয্‌ম্‌, বলা হয়। বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় গণবিপ্লবের মারফত জনগণের আর্থিক মুক্তি ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তনের পথে যে-সব দেশ অনেক দূর সফল হইয়াছে, সে-সব দেশের চিন্তা-নায়করাই এ ধরনের 'শিশু-সুলভ অতি বিপ্লবের' বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁদের অনেকেই আজ স্বীকার করিতেছেন যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজবাদ প্রবর্তন সম্ভব। যাঁরা তা স্বীকার করেন না, তাঁরাও বলেন যে, জনগণের গণতন্ত্র আনিতে হইলেও আগে জাতীয় স্বাধীনতা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র কায়েম করিতে হইবে।

তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের বিপ্লবীরা নির্বাচনের তথা 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিতেছেন। এঁরা যে 'শিশু বিপ্লবী' এঁদের মতের অস্পষ্টতাই তার প্রমাণ। এঁদের নিজেদের মধ্যেকার আত্ম-কলহ, দলাদলি ও গালাগালিই এঁদের মতবাদের অস্পষ্টতার প্রমাণ। 'ইসলামী শাসনতন্ত্র'-ওয়ালাদের মতই এঁদেরও বহু মত, বহু দল। তাঁদের মতই এই অতি বিপ্লবী-রাও পরস্পরকে অতি-বিপ্লবী, প্রতি-বিপ্লবী ও রিভিশনিস্ট বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ কাফেরি ফতোয়া দিয়া থাকেন।

কাজেই এঁরা অন্ধ। অন্ধেরা অপরকে সুপথ দেখাইতে পারে না। শুধু বিপদের পথে নিতে পারে। এঁরাও কার্যতঃ তাই করিতেছেন। পরিণাম-ফলের দিক দিয়া এঁরা ও প্রাসাদ-চক্রান্তকারীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রথম ও তৃতীয় দল বিপরীত উদ্দেশ্যে কাজ করিয়াও নির্বাচন ভণ্ডুল করিবার একটিমাত্র কাজ করিতেছেন। দ্বিতীয় দলটি হয় ত কোনও কিছু না বুঝিয়াই ঐ দুইটি দলের সহায়তা করিতেছেন। এঁরা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দাবির দরখাস্ত ও অপূরণের পরিণামের হুমকিটা নির্বাচনের আগের ব্যাপার নয়, পরের ব্যাপার। কেয়ার-টেকার মিলিটারী সরকারের উপর না দিয়া এটা নির্বাচিত সরকারের উপর দিতে হয়।

এঁদের খেদমতে আমার আরয, নির্বাচনের আগে সব আন্দোলন বন্ধ রাখুন। দাবি-দিবস ও প্রতিবাদ-দিবস পালন করুন নির্বাচনের পরে। নির্বাচনটা আগে হইতে দিন। প্লিয্‌ গিভ্‌ ডেমোক্র্যাসি এ চান্‌স।

ইত্তেফাক, ৪ঠা অক্টোবর, '৭০

২৩

নির্বাচন রাজনৈতিক বিদ্যালয়

একটা ভুল ভাংগিল। এতদিন জানিতাম, পাকিস্তানে রাজনৈতিক পার্টির সংখ্যা তের। নির্বাচন কমিশনের প্রতীক বিতরণের তালিকা পড়িয়া বুঝিলাম, তের নয়, মা'শাআল্লাহ, চব্বিশ। এইসব পার্টির প্রত্যেকে কম-সে-কম পঁচিশ-জন করিয়া প্রার্থী দাঁড় করাইবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন। খুশির কথা। নির্বাচন জমিবে ভাল। ভোটাররা অনেক জ্ঞান লাভ করিবেন। কারণ নির্বাচন তাঁদের রাজনৈতিক পাঠশালা।

পার্টি-সংখ্যা এত বেশী না হইলেই ভাল হইত। কিন্তু এতেও ভয়ের কোন কারণ নাই। নির্বাচন হইতে-হইতে ভোটারদের ইচ্ছামতই পার্টি-সংখ্যা কমিয়া আসিবে। না কমিলেও ক্ষতি নাই। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নাকি পার্টি-সংখ্যা এক শ' তেইশ। কেউ কেউ বলেন, দুই শ'। পঞ্চাশটি স্টেটের প্রত্যেকটিতে চারটি করিয়া পার্টি থাকার সম্ভাবনা বিচার করিলে দুই শ' হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মার্কিনবাসীর ইচ্ছামতই ঐসব পার্টি জীবিত আছে। কিন্তু দুইটার বেশী প্রেসিডেন্ট-পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না মার্কিন ভোটারদের ইচ্ছামতই। আমাদের দেশেও কালক্রমে এমন হইতে পারে। পার্টি-সিস্টেম ছাড়া গণতন্ত্র চলিতে পারে না, একথা আজ সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন। এ অবস্থায় এক-পার্টির দেশের চেয়ে বহু পার্টির দেশ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক। এই বিচারে আমাদের দেশে এত বেশী পার্টি থাকা আশা ও স্বস্তির কথা। কারণ এখানেই এক পার্টি হওয়ার আশংকা ও সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশী।

তবে এটা চিন্তার কথাও বটে। এইসব পার্টির প্রোগ্রাম কি? পার্টিতে-পার্টিতে পার্থক্য কোথায়? কি বিচারে, কিসের ভিত্তিতে, ভোটাররা কোন্ পার্টিকে ভোট দিবেন? জনগণ সমর্থন দিবেন? এ-সব প্রশ্নের জবাব থাকিতে হইবে প্রত্যেক পার্টির মেনিফেস্টোতে। সে-সব জবাব হইতে হইবে সুস্পষ্ট। জনগণের সহজবোধ্য। ব্যক্তি-জীবনের মতই রাষ্ট্রের জীবনেও এক শ' একটা সমস্যা। সে-সব সমস্যার সমাধানও হইতে পারে বিভিন্ন রকমে। তাছাড়া আছে তাদের প্রাইওরিটি, পূর্বাপরতা। ব্যক্তি-জীবনে যেমন, রাষ্ট্র-জীবনেও

তেমনি, সব সমস্যার সমাধান একেবারে একসংগে করা যায় না। এমনকি এক-সংগে আলাপ-আলোচনা ও ভাবনা-চিন্তাও করা যায় না। একটা-একটা করিয়া করিতে হয়। তারই জন্য আগেরটা পাছেরটা নির্ধারণ করিতে হয়। জাতির তরফ হইতে রাষ্ট্রের জন্য এই কাজটিই করিয়া থাকেন বিভিন্ন পার্টি। তাঁরা দুই নির্বাচনের অন্তর্বর্তী মুদ্দতে জাতীয় সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে যাঁদের-তাদের ধ্যান-ধারণামত সমস্যাগুলির প্রাইওরিটি ও তাদের সমাধানের পন্হা নির্ধারণ করেন। এইগুলিই হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো। নির্বাচনের সময়ে এইসব মেনিফেস্টো জনগণের সামনে পেশ করা হয়। বক্তৃতা-বিবৃতি ও বই-পুস্তিকায় সে-সবের ব্যাখ্যা করা হয়। এইভাবেই নেতারা ও নির্বাচন-প্রার্থীরা নিজেদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সহিত ভোটারদেরে পরি-চিত করান। জনসাধারণ ও ভোটারদেরে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও সংকল্প-সিদ্ধান্তের শরিক করেন। যাঁদের এবং যে পার্টির মতের সংগে অধিকাংশ ভোটারের মতের মিল হয়, তাঁরাই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। নির্বাচন শেষ হইলেই ভোটারদের কাজ আপাততঃ সম্পাদিত হইল। কিন্তু নির্বাচিত মেম্বর ও বিজয়ী পার্টির কাজ শুরু হইল। নির্বাচনী ওয়াদামাফিক তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার ও আইন কানুন রচনার কাজ আরম্ভ করিবেন। তাঁরা ঠিকমত কাজ করেন কি না, অপযিশন পার্টি, বিজয়ী পার্টির মেম্বর ও কর্মীগণ এবং ভোটাররা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। এ সবই গণতন্ত্র ও নির্বা-চনের মামুলি কথা। যে-সব পুরান রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্হা কায়েম হইয়াছে, সে-সব দেশের বেলাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের কথা বলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মত নয়। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কর্তব্য আরও বড় বিস্তীর্ণ এবং কাজেই অসাধারণ, বিশেষতঃ আসন্ন নির্বাচনের বেলায়। এই নির্বাচনের প্রতিনিধিদিগকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মেম্বরদের মতই রাষ্ট্র পরিচালনার সব কাজ ত করিতে হইবেই, তার উপর দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্রও রচনা করিতে হইবে। এই শাসনতন্ত্রই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুনিয়াদি কানুন, ব্যাসিক ল'। এই কানুনটিকে ভিত্তি করিয়াই অতঃপর আমাদের সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হইবে। এই দিক হইতে আসন্ন নির্বাচনের প্রতিনিধিদের কর্তব্য সম্বন্ধে পার্টি নেতারা এবং নির্বাচন প্রার্থীরা যেমন নিজেরা সচেতন হইবেন, ভোটারদিগকেও তেমনি সচেতন করিবেন। এই সচেতনতার পয়লা শর্ত হইল পার্টি-প্রোগ্রামের সুস্পষ্টতা। এই সুস্পষ্টতা যেমন থাকিবে মন্ত্রিসভার কার্যক্রম সম্বন্ধে, তেমনি থাকিবে শাসনতান্ত্রিক বিধান সম্বন্ধেও। শাসনতান্ত্রিক বিধান সম্বন্ধে কর্তব্যটাই বেশী

জটিল। জাতীয় রূপ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো, উভয় দিক হইতেই আমরা আজও ফর্মেটিভ পিরিয়ডে। শাসনতন্ত্রেই সে রূপ প্রাথমিক স্পষ্টতা লাভ করিবে। এ ব্যাপারেও অন্যান্য নয়া রাষ্ট্র হইতে আমরা কোনও শিক্ষা ও নযির পাইব না। কারণ দুইখণ্ড পাকিস্তানের ভৌগোলিক ব্যবধান ভাষিক, কৃষ্টিক ও আর্থিক বিভিন্নতা আমাদের এদিককার কাজকে যেমন কঠিন তেমনি বেনযির করিয়াছে। এ-সবই পুরাতন কথা। সংবাদপত্র পাঠকেরা সাধারণভাবে এবং রাষ্ট্র-নায়করা বিশেষভাবে, এ-সব জটিলতার কথা জানেন। তবু এ-সব কথা স্মরণ করাইতেছি এই জন্য যে, এ-সব কথা শুধু নিজেরা জানিলেই হইবে না, আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের কাছে এ-সবের সমাধানের যাঁর-তাঁর কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, তাতে ভোটারদের অনুমোদন লইতে হইবে। সাধারণ ভোটররা শাসনতন্ত্রের কি বুঝিবে? তাদের কাছে ও-সব কথা বলিবার দরকার নাই। গণ-পরিষদে বসিয়া অবস্থা বুঝিয়া যা হয় একটা করিয়া ফেলিলেই চলিবে। এ ধরনের কথা বলা ও চিন্তা করা উচিত হইবে না। অপরদিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করিব। কল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপন করিব। পূর্ব বাংলার প্রতি সুবিচার করিব। এই ধরনের অস্পষ্ট ভাল কথা বলিয়া ভোটারদের ধোঁকা দেওয়াও চলিবে না। এই উভয় পন্থাই অন্যায়।

কারণ নির্বাচন শুধু গণতন্ত্রের বুনিয়াদ নয়, যুগপৎভাবে ওটা গণতন্ত্রের বিকাশ-বৃদ্ধিও বটে। এক-একটা সাধারণ নির্বাচন রাজনৈতিক জ্ঞান বিকাশে দেশবাসীকে এক-একটা যুগ আগাইয়া লইয়া যায়। এজন্য নির্বাচনকে জনগণের রাজনৈতিক ট্রেনিং বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যেমন বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সাথে সাথে আত্ম-পরিচয় লাভ করে, আত্মমর্যাদা-বোধে সচেতন হয়, নির্বাচনেও তেমনি ভোটাররা ও গোটা দেশবাসী রাজনৈতিক জ্ঞান, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব-বোধ লাভের সংগে সংগে আত্ম-শক্তি ও আত্মমর্যাদা-বোধে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। এই ভাবে নির্বাচন জনগণকে শুধু রাজনৈতিক অধিকারই নয়, মানবিক অধিকারেও সচেতন করিয়া তুলে। শুধু নাগরিক অধিকার-বোধেরই নয়, মানবিক মার্যাদা-বোধেরও উৎস গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন ভোটারের মনে শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার বোধই জাগায় না ভোট পাওয়ার অধিকার বোধও জাগায়। আজ যাঁরা নির্বাচিত হইতে যাইতেছেন, তাঁরা আমাদের শুধু ইলেক্‌টেড রিপ্রেযেনটেটিভ নন, তাঁরা আমাদের এপয়েন্টেড ডেলিগেট ও বটেন। তার মানে, আমরা অমনি-অমনি তাঁদেরে ভোট দিতেছি না; একটা ওয়াদার ভিত্তিতে একটা চুক্তিমূলেই তাঁদেরে ভোট দিতেছি। তাঁরা নির্বাচিত হইলে এই-এই কাজ করিবেন বলিয়া ওয়াদা করাতেই তাঁদেরে

আমরা ভোট দিতেছি। এঁরাই মেম্বর হইয়া সরকার গঠন করিবেন। সেই সরকার দেশ শাসন ও আইন প্রণয়ন করিবেন। কাজেই সরকার আমাদের ইচ্ছায় গঠিত এবং আমাদের কাছে চুক্তি-বদ্ধ একটা সাময়িক সংস্হা মাত্র। কোন ওয়ারিসিপ্রাপ্ত রাজা-বাদশা বা নৈসর্গিক ক্ষমতাবান কোনও স্বর্গীয় প্রতিনিধি নন। আমাদের মতই কিছু লোক দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত একটা সমিতি। এই ধরুন গিয়া, একটা বড় আকারের ইউনিয়ন কাউন্সিল আর কি? এই উপলব্ধি হইতেই আসে আত্ম-বিশ্বাস। একটা চালাইতে পারিলে আরেকটা পারিব না কেন? সাধারণ নাগরিকের মনে এই আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টিই গণতন্ত্রের মহা অবদান। মানবিক মর্যাদা-বোধের বুনিয়াদ যে ঐক্য, সাম্য ও সমতা তারও স্ফুরণ, বিকাশ ও প্রসার হয় গণতন্ত্রেই। বড়-ছোট, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের উচ্চ-নিচতা-বোধ একদিনে দূর হয় না সত্য, কিন্তু গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন ঐ ব্যবধান অবসানের থিওরেটিক্যাল বুনিয়াদ পত্তন করে। তাই ক্রমে বাস্তবে রূপায়িত হয়। গণতন্ত্রের জোরেই কাঠুরিয়া ও কাঠ-মিস্ত্রি একদিন ক্যাবিনেট-মন্ত্রী হইতে পারে; হইয়াছেনও কেউ কেউ। সেই জন্যই বোধহয় কাঠ-মিস্ত্রিকে ক্যাবিনেট মেকার বলা হয় এবং ক্যাবিনেট মানে মন্ত্রিসভা। একদিকে সাধারণ নাগরিক ভাবেন: রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টারও আমার সমান অধিকারের ভোটার মাত্র। অপর দিকে, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টার জনসভায় দাঁড়াইয়া বলেন: আমি আপনাদের হুকুমের চাকর মাত্র। এমনটা একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব। আর কোনও তন্ত্রে সম্ভব নয়। এটাই বিশেষভাবে সকলের স্মরণে আসে নির্বাচনের সময়।

সাধারণভাবে দেশবাসীর এবং বিশেষভাবে ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনের সময়ে এই উপলব্ধি আসিতে পারে কি করিলে? সব পার্টির নেতারা এবং নির্বাচন-প্রার্থীরা যদি যাঁদের-তাঁদের প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিষ্কারভাবে দেশবাসী ও ভোটারদের সামনে পেশ করেন, তবেই। অন্যথায় নির্বাচনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। নির্বাচনের এই উদ্দেশ্য দেশবাসীকে রাজনৈতিক ট্রেনিং দেওয়া। সে উদ্দেশ্যে ভোটাররা যাতে প্রার্থীকে ভোট না দিয়া কার্যক্রমকে ভোট দেন, সে শিক্ষা তাঁদের দিতে হইবে নেতাদেরই। এটা সম্ভব হইবে তবেই, যদি পার্টি-কার্যক্রম সুস্পষ্ট এবং জনগণের সহজ-বোধ্য হয়। একই নামে, একই আদর্শের একাধিক পার্টি করা হইল কেন, অথবা একটা ভাংগিয়া তিন-চারটা হইলই-বা কেন, কোন্-কোন্ বিষয়ে কি-কি মতভেদের দরুন নেতারা ভিন্ন-ভিন্ন অথচ একই নামের পার্টি গঠন করিতে বাধ্য হইলেন, এ-সব কথাই জনগণকে বুঝাইতে হইবে এবং নির্বাচনের সময়ই এটা করিতে হইবে। তিন-তিনটা মুসলিম লীগ,

চার-চারটা ইসলামী জমাত বা জমিয়ত, দুই-তিনটা ন্যাপ থাকার আমি নিন্দা করিতেছি না। একই নামের, একই মতাদর্শে বিশ্বাসীদের মধ্যেও প্রয়োগের খুঁটি-নাটিতে মতভেদ থাকিতে পারে এবং সেজন্য বিভিন্ন পার্টি করাও আবশ্যক হইতে পারে। এটা 'মুসলিম'-পন্থী, 'ইসলাম'-পন্থী সমাজবাদী-সাম্যবাদী, লেফ্‌টিস্ট-সেকিউরালিস্ট সবার মধ্যেই হইতে পারে। অতএব আমি ধরিয়া লইতেছি, শুধু ব্যক্তিগত নেতৃত্বের জন্য নয়, বরঞ্চ কার্যক্রম ও মতাদর্শের গুরুতর পার্থক্যের দরুনই একই নামের একই উদ্দেশ্যের ভিন্ন-ভিন্ন পার্টি গঠিত হইয়াছে।

তেমন পার্থক্য যে আছে, তা দেখাইতে হইবে। নেতাদেরই সেটা করিতে হইবে ভোট চাহিবার সময়েই। একই 'ইসলামী শাসনতন্ত্র', 'পাকিস্তানের সংহতি' ও 'দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূরীকরণের' ওয়াদা সবাই করিতেছেন। তাঁদের মধ্যে বাছাই করিয়া ভোটাররা আপনার দলকেই ভোট দিবেন কেন, সে-কথা ভোটারদেরে বুঝাইয়া দিবার দায়িত্ব আপনারই। এ কাজ করিতে গিয়া আপনাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, ঐ তিনটি কাজ আপনার পার্টি কি ভাবে করিবে। আপনার বুঝাইতে হইবে, ভোটারের বুঝিতে হইবে এটা, যদি আপনি করিতে পারেন, তবে তাতেই নেতা হিসাবে আপনার কর্তব্য সমাধা হইয়া যাইবে। নির্বাচনে কোন্ প্রার্থী বা কোন্ পার্টি জয়লাভ করিলেন, শুধু এটাই নির্বাচনের বড় কথা নয়। কোন্ প্রার্থী বা কোন্ পার্টি সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ভোটারদেরে রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু দিতে পারিলেন, সেটাও বড় কথা।

নেতারা যদি সাফল্যের সাথে এটা করিতে চান, তবে তাঁরা ঃ এক, নির্বাচনী প্রচারে শুধু অন্তর ও প্রাসংগিক কথাই বলিবেন; দুই, অবান্তর ও অপ্রাসংগিক কথা বাদ দিবেন; তিন, নিজের কাছে যা সুস্পষ্ট নয়, শুনিতে হাজার ভাল হইলেও তেমন কথা বলিবেন না। এই তিনটি সূত্রই মূলতঃ একই সূত্রের বিভিন্ন দিক মাত্র। অন্তর-অবান্তর, আবশ্যক-অনাবশ্যক এবং স্পষ্ট-অস্পষ্টের বিচার করিবেন শুধুমাত্র রাজনীতির দিক হইতে। রাজনীতি মানুষের জীবনের বহু দিকের একটা দিক মাত্র। তাই 'পরিপূর্ণ জীবনবিধি'র কোনও ব্যাপার নির্বাচনের বিষয়বস্তু করিবেন না। এই ব্যাপরটাই আরও খোলাসা করিয়া বলিতে গেলে দুই-একটা নযির-দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান দরকার। এই কাজ আমি এর আগের এক প্রবন্ধে করিয়াছি। আজ শুধু এইটুকু বলিতেছি যে, আমাদের নেতাদের অধিকাংশেই রাষ্ট্র-নায়কের যোগ্য কাজ করিতেছেন না। নির্বাচনী প্রচারে তাঁরা অন্তর-অবান্তর, প্রাসংগিক-অপ্রাসংগিক, আবশ্যক-অনাবশ্যক সব ভাল ভাল

কথার জট পাকাইয়া ফেলিতেছেন। তাতে আস্তর, প্রাসংগিক ও দরকারী সহজ কথাগুলিও কঠিন ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। ফলে শুধু ভোটাররা ও জনসাধারণই নয়, স্বয়ং নেতারাও বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হইতেছেন। অপরকে ফাঁকি দিতে গিয়া নিজেরাই ফাঁকিতে পড়িতেছেন। এটা এড়াইবার জন্যই তাঁরা ধর্ম-নীতি, ন্যায়-নীতি ও আচরণ-নীতির মত উচ্চাংগের কথা বলিতেছেন। এতে নেতাদের ও ভোটারদের সমান অনিষ্ট হইতেছে। তারচেয়ে বড় কথা রাষ্ট্র বিপদের দিকে যাইতেছে।

এখানে গোড়ার কাথাটাই আবার স্মরণ করাইতেছি। নির্বাচন জনগণের রাজনৈতিক বিদ্যালয়। নেতারা ও নির্বাচন-প্রার্থীরা সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁরা ছাত্রদেরে সুশিক্ষার বদলে কুশিক্ষা দিবেন না। যা নিজেরা বুঝেন না. ছাত্রদেরে তা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন না। নিজেরা যাতে বিশ্বাস করেন না, ছাত্রদেরে তা বিশ্বাস করিতে বলিবেন না। যদি করেন, তবে তার কুফলে শুধু ছাত্ররাই ভুগিবে না, শিক্ষকদেরও ভুগিতে হইবে।

ইত্তেফাক, ১৬ই অক্টোবর, '৭০

২৪

নির্বাচন-প্রচারণায় বিভ্রান্তিকর অস্পষ্টতা

আগের প্রবন্ধে আমি অভিযোগ করিয়াছি যে, অধিকাংশ পার্টি-নেতা ও নির্বাচন-প্রার্থীরা তাঁদের প্রচার-কাজে স্পষ্ট ও ভোটারদের সহজবোধ্য কথা বলিতেছেন না। তার বদলে যা বলিতেছেন, তার বেশীর ভাগই দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর। তাতে ক্ষতি হইতেছে নির্বাচন-প্রার্থী ও ভোটার উভয়েরই। নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া তাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে আরও বেশী।

আসন্ন নির্বাচনটা হইতেছে একাধারে দুইটি উদ্দেশ্যে। এক, শাসনতন্ত্র রচনা; দুই, নির্বাচিত সরকার গঠন। নির্বাচন-প্রচারণায় এই দুইটি ব্যাপারেই ভোটারদের কাছে তাদের সহজবোধ্য ভাষায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওয়াদা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। অধিকাংশ পার্টি-নেতা ও নির্বাচন-প্রার্থী এই কাজ-টিই করিতেছেন না। স্পষ্ট কথা তাঁরা মোটেই বলিতেছেন না, তা নয়। কোনও কোনও ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট কথা বলিতেছেন। আবার অনেক ব্যাপারে অস্পষ্ট অবোধ্য কথাও বলিতেছেন। এইসব স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উক্তিগুলির শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যাইবে, স্পষ্ট কথাগুলির অধিকাংশ মন্ত্রিসভার করণীয় ব্যাপারে, এবং অস্পষ্ট কথাগুলির অধিকাংশ শাসনতন্ত্র রচনায় করণীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ।

সংবাদপত্র-পাঠকরা একটা কথা ইদানিং রোযই পড়িতেছেন। নেতারা এবং নির্বাচন-প্রাথীরা তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলিতেছেনঃ 'আমি ও আমার দল ক্ষমতায় গেলে এই এই কাজ করিব।' ওয়াদা-করা 'এই-এই কাজ'গুলি দুই প্রকারের। এক প্রকারের কাজ শাসনতান্ত্রিক বিধানের বস্তু। অপর প্রকারের কাজ মন্ত্রিসভার করণীয় বস্তু। অনেক নযিরের মধ্যে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দুই প্রকার কাজের পার্থক্য দেখাইতেছি। 'ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করিব' এই উক্তিটি শাসনতান্ত্রিক বিধান-বিষয়ক ওয়াদা। 'এই পরিমাণ জমির খাযনা মওকুফ করিয়া দিব' এই উক্তিটি মন্ত্রিসভার কর্তব্য-বিষয়ক ওয়াদা। শাসনতন্ত্র রচনা হইবার পরই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। কাজেই উপ-রোক্ত ওয়াদা দুইটির একটি আগের কাজ, অপরটি পরের কাজ। আগে শাসন-তন্ত্র রচনা সারিতে হইবে। পরে 'ক্ষমতায়' যাইতে হইবে। নির্বাচনে যাঁরা

মেজরিটি হইবেন, তাঁরা তাঁদের ওয়াদা-মোতাবেক শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। সেই শাসনতন্ত্র অনুসারে তাঁরা সরকার গঠন করিবেন। সেই সরকার খাযনা মওকুফ করিবেন। এই দুইটি ওয়াদার মধ্যে খাযনা রেহাইর ওয়াদাটি আমরা সব ভোটাররাই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ওয়াদাটি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। এই না-বুঝার কারণ আছে। শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে 'পার্লামেন্টারি', 'প্রেসিডেনশিয়াল', 'ফেডারেল', 'ইউনিটারি', এসব কথা আমরা বুঝিতে পারি। কারণ দুনিয়ার অনেক দেশে এসবের নযির আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সারা মুসলিম দুনিয়ার কোথাও 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের' কোন নযির নাই। দুনিয়ার কোথাও নযির না থাকিলেই পাকিস্তানেও হইতে পারিবে না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, আমাদের দেশে এমন নযিরবিহীন, একটি শাসনতন্ত্র যাঁরা প্রবর্তন করিতে চান, দেশের জনসাধারণকে, বিশেষতঃ ভোটারগণকে, আগেই, নির্বাচনের সময়েই, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হইবে। এই কাজটিই 'ইসলাম'-পন্থী রাজনীতিক নেতারা করিতেছেন না। পক্ষান্তরে সরকারী কার্যক্রমের ব্যাপারে নেতারা এ ভুল করিতেছেন না। অবশ্য এইদিককার ওয়াদার দুই-একটিতেও অস্পষ্টতা ও অবোধ্যতা আছে। যেমন অনেক নেতা বলেনঃ 'আমরা ক্ষমতায় গেলে দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিব' অথবা 'দুই অঞ্চলের আর্থিক বৈষম্য দূর করিব'। এই ধরনের গুল-গুল্ কথা স্পষ্টতঃই মূল্যহীন। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ওয়াদা করিবার সময় মানুষ স্পষ্ট কথার বদলে অস্পষ্ট দ্ব্যর্থ-বোধক কথা বলে পরিণামে প্রয়োজন-মত ওয়াদা খেলাফ করিবার আশায়। নির্বাচনের সময়ে যেসব নেতা অমন দ্ব্যর্থক ওয়াদা করেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য অমন অসাধু, একথা বলিতেছি না। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁদের যাই হোক, পরিণাম একই হইতে বাধ্য। কাজেই ঐ ধরনের ওয়াদায় না ভুলাই ভোটার-দের কর্তব্য। তবে ঐ ধরনের ওয়াদা ছাড়া এই দিককার সব ওয়াদাই সুস্পষ্ট। উপরোক্ত রকমে 'খাযনা রেহাই দিব', 'পাটের দাম মণপ্রতি পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া দিব'; 'চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন পাঁচশত টাকা ধার্য করিব', এই ধরনের ওয়াদায় অতিশয়োক্তি, ভাঁওতা অথবা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথন থাকিতে পারে, কিন্তু কোনও অস্পষ্টতা নাই। ভোটাররা এসব কথায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন কথাগুলি তাঁরা বুঝিতে পারেন। বলিতে পারেন, এ ধরনের লম্বা-লম্বা ওয়াদা না করাই ভাল। অনেক বাস্তববাদী নেতা এ বিষয়ে বক্তাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়াও থাকেন। এ হুঁশিয়ারি মূল্যবান লোভনীয় ওয়াদা করিয়াই যাঁরা নির্বাচন জয় করিতে চান, জয়ী হইলেও তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবেন। তা' ছাড়া গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎও

তাঁরা বিপন্ন করিবেন। এ-সবই ঠিক। কিন্তু আমার আজকার আলোচনার বিষয় তা নয়। আজকার আলোচনার বিষয় নির্বাচনী ওয়াদার স্পষ্টতা। ওয়াদার ন্যায্যতা এ আলোচনার বিষয় নয়।

মন্ত্রিসভার কর্তব্য সম্বন্ধে এত সুস্পষ্ট ওয়াদা সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে নেতাদের অধিকাংশই যে দুর্বোধ্য অস্পষ্ট কথা বলিতেছেন, তার পরিণাম কি হইতে পারে, তা ভাবিয়া দেখা উচিত। পার্টি-নেতাদের বক্তৃতা ও তাঁদের পার্টি-ম্যানিফেস্টো বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, পূর্ব বাংলার কয়েকটি পার্টি ছাড়া সারা দেশের আর সব পার্টি শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের মনের কথা ভোটার-দের কাছে বলিতেছেন না। তার বদলে যেসব কথা তাঁরা বলিতেছেন, তাতে ভোটাররা কিছু বুঝিবার বদলে অধিকতর বিভ্রান্তই হইতেছেন। এই ধরনের বহু উক্তির মধ্যে মাত্র তিনটি উক্তি বাছিয়া লইতেছি। এক, ইসলামী শাসন-তন্ত্রের উপর আস্থা; দুই, পাকিস্তানী আদর্শ-সংহতির দিকে জোর; তিন, 'আঞ্চলিকতা' ও 'প্রাদেশিকতা'র বিরুদ্ধে নিন্দা।

দুনিয়ায় ইসলামী শাসনতন্ত্রের কোনও নযির না থাকায় এ বিষয়ে নেতাদের যা করণীয় ছিল, তা তাঁরা করিতেছেন না। তাঁদের পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের কাঠা-মোর কোনও রূপ-রেখা ভোটারদের সামনে পেশ করিতেছেন না। ৫৬ ও ৬২ সালের দুইটি শাসনতন্ত্রই দাবি করিয়াছিল তারা 'ইসলামিক'। ইসলাম, কোর-আন ও সুন্না সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রের প্রিয়েম্বল হইতে ভিতরের বিধান পর্যন্ত অনেক ভাল ভাল কথা ছিল। এই দুইটি শাসনতন্ত্রের ঐসব বিধানকে আজকার 'ইসলাম-পন্থী' নেতারা যদি ইসলামিক শাসনতন্ত্রের বিধান বলিয়া মানিয়া লইতেন, তবে ভোটাররা এ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিতেন। কিন্তু 'ইসলামপন্থী' নেতারা তা বলিতেছেন না। বরঞ্চ কেউ-কেউ ওগুলিকে ভাঁওতা বলিতেছেন। কেউ বলিতেছেন, ওগুলি যথেষ্ট নয়। ফলে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' সম্বন্ধে ভোটাররা অন্ধকারেই থাকিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় জনসাধারণের আতংকিত হওয়ারই কথা। যে ৫৬ সালের 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' রচনা করিতে মুসলিম লীগ নেতাদের নয়টি বছর লাগিয়াছিল, সেটাও যদি যথেষ্ট 'ইসলামিক' না হইয়া থাকে, তবে 'যথেষ্ট ইসলামী শাসনতন্ত্র' রচনায় কয়টি নয়-বছর লাগিবে, এটাই দেশবাসীর দুশ্চিন্তার কারণ। জেনারেল আইউবের মত ডিক্টেটরের 'আমার-দেওয়া' ৬২ সালের ইসলামিক শাসনতন্ত্রও যখন যথেষ্ট ইসলামিক হয় নাই, তখন 'যথেষ্ট ইসলামিক' শাসনতন্ত্র রচনায় কয়জন ডিক্টেটর লাগিবে, সে কথা চিন্তা করিয়াও দেশবাসীর চোখে ঘুম নাই।

তারপর সংহতির কথা। 'জাতীয় সংহতি' কথাটা অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু

দেশের অধিকাংশ নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব নেতাই 'জাতীয় সংহতি'র নামে রাষ্ট্রীয় সংহতিই বেশী চাহিতেছেন। 'পাকিস্তানী আদর্শ' কথাটা আরও বেশী সাংঘাতিক। এ কথার দ্বারা তাঁরা বুঝাইতে চাহিতেছেন, পাকিস্তান একটা আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র। তার মানে, এটা ভৌগোলিক রাষ্ট্র-নয়। এ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আদর্শভিত্তিক। এ রাষ্ট্রের জাতীয়তা পাকিস্তানী জাতীয়তা নয়, মুসলিম জাতীয়তা। এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁরা সরল আন্তরিক বিশ্বাসের বশেই বলিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু জাতিসংঘের মেম্বর-রূপে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের খাতিরে 'নেশন স্টেট' হিসাবে পাকিস্তানের সত্তার ভিত্তি-মূলে আঘাত করে এ-সব কথা। এসব উক্তি শুধু বিশ্বের দরবারে নয়, খোদ মুসলিম দুনিয়ায়ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ও শত্রুতা-ব্যঞ্জক ধারণার সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব, এমন গুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী ব্যাপারে রাষ্ট্রের আসল মালিক যে-জনগণ, তাদের পূর্ব-অনুমতি লওয়া দরকার। তাই এ ব্যাপারে দেশবাসী নেতাদের মুখে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য কথা শুনিতে চায়।

এই শ্রেণীর নেতাদের চিন্তার লঘুচিত্ততা ও কথার অস্পষ্টতার আরেকটি প্রমাণ তাঁদের 'আঞ্চলিকতা' ও 'প্রাদেশিকতা'র নিন্দা। পাকিস্তান দুইটি অঞ্চলে ও পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত। গণতন্ত্রে জনগণের স্বার্থই রাষ্ট্রের স্বার্থ। জনগণ দুই অঞ্চলে ও পাঁচ প্রদেশে বাস করে। অতএব আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রাদেশিক স্বার্থই বস্তুতঃ জনগণের তথা রাষ্ট্রের স্বার্থ। এই দুইটি অঞ্চলের একটিকে ভাংগিয়া চারটি প্রদেশ করা হইয়াছে। তাদের জন্য পৃথক-পৃথক চারজন গবর্নর ও চিফ সেক্রেটারি নিযুক্ত এবং আলাদা-আলাদা সেক্রেটারিয়েট খোলা হইয়াছে। ঐ চারটি প্রদেশ একত্রে থাকিবার জন্য পনর বছর ধরিয়া এক 'ইউ-নিটে'র পরখ করিয়াছে। কিন্তু তাদের 'প্রাদেশিক' স্বার্থ এমনি পরস্পর-বিরোধী যে, এজমালি ঘর-সংসার করা চলিল না। তাই পনর বছর পরে আবার পৃথক সংসার পাতিয়াছে। নব-নিয়োজিত গবর্নর ও সেক্রেটারিরা প্রদেশসমূহের এতদিনের এজমালি সংসারের সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করিতেছেন। যাঁর-তাঁর প্রদেশের স্বার্থ ও সম্পত্তি অটুট রাখিবার তীব্র প্রতিযোগিতা করিতেছেন। সিন্ধু নদীর পানিও ভাগ করিতেছেন। কারও অংশ কম না পড়ে, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। এসব করিয়া গবর্নর ও সেক্রেটারিরা কি 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা' দেখাইতেছেন? শীঘ্রই ঐ চার প্রদেশে চারটি পৃথক ও স্বায়ত্ত-শাসিত আইন পরিষদ গঠিত হইবে। তারা ঐ ঐ প্রদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন করিবে। নবগঠিত নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকাররা নিজ-নিজ প্রদেশের স্বার্থ রক্ষার ও উন্নয়নের সার্বিক চেষ্টা করিবেন। সে-সব কাজ কি 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা' হইবে?

ঠিক সেইরূপ পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের স্বার্থে বিভিন্নতা আছে। ভৌগোলিক ব্যবধানের দরুন দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি-অব-লেবার-ক্যাপিটাল নাই। ফলে এক অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে অপর অঞ্চলের কোনও বেনিফিট হয় না। পশ্চিমাঞ্চলের সরকারী খরচা হইতে পূর্বাঞ্চলের জনগণ এবং পূর্বাঞ্চলের সরকারী খরচা হইতে পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ কোন ফায়দা পায় না। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকার যাঁর-তাঁর অঞ্চলের স্বার্থ ও সুবিধা-অসুবিধার কথা বলিবেন না ? পাকিস্তানের মাইনরিটির অধিবাস পশ্চিমাঞ্চলে রাষ্ট্রের রাজধানী থাকিলে অধিকাংশ পাকিস্তানীর অসুবিধা ও লোকসান হয়, এ কথা মেজরিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা বলিবেন না ? বলিলেই 'আঞ্চলিক সংকীর্ণতা' হইবে ? এই অপবাদের ভয়ে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের ভাল-মন্দের কথা বলিবেন না ? রাষ্ট্রের সংহতির খাতিরে রাজস্বের সব টাকা পিন্ডিতে রাজধানী নির্মাণের কাজে ব্যয় করিবার বাজেটে ভোট দিয়া পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হাসিতে-হাসিতে বাড়ি ফিরিবেন ? আর তাঁদের ভুখা ভোটাররা 'যিন্দাবাদ' দিবেন ? নিশ্চয়ই 'সংহতি'-বাদীরা এটা আশা করেন না।

তবে তাঁরা কোন্ জিনিসটাকে 'প্রাদেশিকতা' ও 'আঞ্চলিকতা' বলিয়া নিন্দা করিতেছেন ? ওয়ান ইউনিটের 'সংহতি' ভাংগিয়া পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বার্থ স্বীকার করিয়া লওয়ার পর সেখানে নাকি প্রাদেশিকতার অবসান হইয়াছে। ভারি মজার কথা ত ! 'প্রাদেশিকতা' স্বীকার করিয়া 'প্রাদেশিকতা'র অবসান ! বিষস্য বিষমৌষধম্ ? তবে ত 'আঞ্চলিকতা' দূরীকরণেরও ভাল ঔষধ পাওয়া গেল ! 'আঞ্চলিক' স্বার্থ, সত্তা ও দাবি-দাওয়া মানিয়া লইলেই 'আঞ্চলিকতা'র অবসান হইয়া যাইতে পারে। পশ্চিমা নেতারা কি এটা বুঝিবেন ? যে সুন্দর পন্থায় তাঁরা পশ্চিমাঞ্চলের প্রাদেশিকতা দূর করিয়াছেন, ঠিক সেই পন্থায় তাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের আঞ্চলিকতার অবসান করিবেন ?

এই কথাটাই অধিকাংশ নেতা, বিশেষতঃ পশ্চিমা নেতারা, তাঁদের নির্বাচনী ওয়াদা ও মেনিফেস্টোতে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন না। মাঝে-মধ্যে কথা উঠিলে বলেন ঃ 'আঞ্চলিক দাবি-দাওয়া পাকিস্তানের সংহতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।' তা ত বটেই। কিন্তু ঐ সামঞ্জস্যের বিচারটা করিবেন কে ? যদি কেন্দ্র ইউনিটারি হয়, তবে কেন্দ্র, আর যদি ফেডারেল হয়, তবে ইউনিটরাই তা ঠিক করিবে। এই কথাটাই তাঁরা স্পষ্ট করিয়া বলুন। সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে।

ইত্তেফাক, ২৫শে অক্টোবর, '৭০

২৫

‘ওয়াদার রাজনীতি’ ও ‘নির্বাচন ভোট-রংগ’

গণতন্ত্রের প্রকাশ ও বিকাশ নির্বাচনে। জনমত জানিবার একমাত্র উপায় নির্বাচন। জনমত সুস্পষ্ট ও সুগঠিত করিবার উপায়ও নির্বাচন। নির্বাচন ব্যর্থ হইলেই গণতন্ত্র ব্যর্থ হইল। নির্বাচন ভণ্ডুল করা যায় দুই পথে। এক, বাহির হইতে। দুই, ভিতর হইতে। বাহির হইতে এটা করা যায় নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া। ‘বিপ্লবীরা’ তা করিতেছেন। ‘নির্বাচনটা আসলে পুঁজিবাদীদের-পাতা ফাঁদ মাত্র।’ ‘নির্বাচনে কোনও দিন জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসিবে না।’ ‘তাতে বরঞ্চ পুঁজিবাদী শিকল আরও মজবুত হইবে।’ ‘ভোটের আগে ভাত চাই।’ এইসব মুখরোচক শ্রুতিমধুর স্লোগান দিয়া বিপ্লবীরা নির্বাচন নিজেরা বয়কট করিয়াছেন, ভোটারদের দিয়া বয়কট করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এ সবই বাহিরের চেষ্টা। কাজেই এসব চেষ্টার মুখে সাবধান হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা ভোটারদের আছে। অতএব বিপ্লবীদের এ কাজ তত বিপজ্জনক নয়।

বিপজ্জনক হইতেছে ভিতরের শত্রুতা। বিপজ্জনক এইজন্য যে, এ শত্রুতা শত্রুরা করিতেছেন না, করিতেছেন মিত্ররা। এটা করিতেছেন তাঁরা ঘরের মধ্যে বসিয়া। তবু এঁদের ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ বলা যায় না। কারণ এঁরা শত্রুর এজেন্ট হিসাবে, অথবা জানিয়া-বুঝিয়া, এ শত্রুতা করিতেছেন না। করিতেছেন গণতন্ত্রের হিতৈষী হিসাবে। এঁরা আন্তরিকভাবেই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিপ্লবের এঁরা বিরোধী। তবু এঁদের কার্য-কলাপ, প্রচার-প্রাগেন্ডা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিল্প-সাহিত্য সবই নির্বাচনের, সুতরাং গণতন্ত্রের, বিরুদ্ধে যাইতেছে। এঁরা সমাজের ইন্টেলিজেনশিয়া, দেশের চিন্তা-নায়ক। এঁরা সম্পাদক-সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-গায়ক, জন-নেতা রাজনীতিবিদ। এঁরা দেশবাসীর জনমত গঠন ও প্রকাশ করেন। সুতরাং এঁরা গণতন্ত্রী হইলে দেশে গণতন্ত্র চলিবে। এঁরা গণতন্ত্রী না হইলে দেশে গণতন্ত্র চলিবে না। সৌভাগ্যবশতঃ এঁরা সবাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এঁরা সবাই দেশবাসীর মৌলিক স্বত্ব, ভোটাধিকার, দেওয়ানী আযাদি, খবরের কাগজের নিরংকুশ স্বাধীনতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার চান।

অথচ আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে এ'দের অনেকে তাঁদের সম্পাদকীয় ক্ষমতা, সাংবাদিক অধিকার, সাহিত্যিক প্রতিভা, শিল্পক মনীষা ও রাজনৈতিক মেধার এমন অপব্যবহার করিতেছেন, যাতে ভোটারগণ ও জনসাধারণের মনে নির্বাচনের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইতেছে। এসব না হইলেও অন্ততঃ নির্বাচনের প্রতি ভোটাররা উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই উদাসীনতার ফলে যদি ভোটাররা সকলে অথবা অধিকাংশে ভোটকেন্দ্রে হাযির হইতে গাফলতি করিয়া বসেন, তবে তার ফল শাসনতন্ত্র রচনায়, সরকার গঠনে এবং পরিণামে জনগণের স্বার্থ উদ্ধারে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এই কাজটিই করিতেছেন আমাদের চিন্তানায়কদের অনেকে। রোযনার খবরের কাগজ খুলিলেই চোখে পড়েঃ 'ভোট-রংগ', 'নির্বাচনী ডামাডোল', 'নির্বাচনী জ্বর', 'নির্বাচন না গদির লড়াই', 'নির্বাচন না জ্বালাতন' ইত্যাদি ইত্যাদি শিরোনামায় শ্লেষাত্মক প্রবন্ধে, বিদ্রূপাত্মক কার্টুনে আমাদের চিন্তানায়করা গোটা নির্বাচনটাকেই একটা হাস্যকর প্রহসনের রূপে চিত্রিত করিতেছেন। নির্বাচন-প্রার্থীরা সবাই যেন ব্যক্তিগত স্বার্থ-শিকারী। 'নির্বাচনের ডামাডোলে' নাকি আমাদের চিন্তা-নায়কদের শান্তি ভংগ হইতেছে। 'নির্বাচনের জ্বালাতনে' নাকি তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। নির্বাচনী মাইকের আওয়াযে এবং কর্মীদের যিকিরে নাকি তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে। হায়রে ঘুম! আইউব শাহির নিস্পন্দ নিথর এগারটা বছুরের নির্বাচনহীন শান্তির ঘুমে কি তাঁদের ঘুমের সাধ মিটে নাই?

নির্বাচন-প্রার্থীরা প্রচার-প্রপাগেন্ডায়, ইশতাহার-হ্যান্ড-বিলে, ফেস্টুনে-শোগানে প্রতীক প্রদর্শনে দেদার টাকার অপচয় করিতেছেন দেখিয়াও আমাদের চিন্তানায়কদের মিতব্যয়ী-প্রাণে নাকি দারুণ আঘাত লাগিতেছে। আইউবের মহিমা-কীর্তনে, অভিনন্দন-অভ্যর্থনায়, তোরণ নির্মাণে, বাজী পোড়ানে, শাহী মিনারে এগারটি বছর ধরিয়া যখন কোটি-কোটি টাকার অপচয় হইয়াছিল, তখন এইসব মিতব্যয়ীরা কোথায় ছিলেন? আইউবের ডিক্টেটারির কথা ছাড়িয়া দিলেও বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন-মওসুমের খবর কি আমাদের এই চিন্তা-নায়করা রাখেন না? মার্কিন-বিলাত, ফ্রান্স-জার্মানি ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ নির্বাচনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবে কত কত টাকা খরচ হয়, তার হিসাবটা কি আমাদের চিন্তানায়করা ঐ দেশের খবরের কাগজে পড়েন নাই? হইবেই ত। গণতন্ত্রে এটা যে জাতীয় উৎসব। নির্বাচনটা যে জনগণের আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস। তাদের নিজের উৎসব। এ উৎসবে তারা আনন্দ করিবে না? আর সব আনন্দ-উৎসবের

মতই এতেও জনগণের জীবন-প্রাচুর্য ফাটিয়া পড়িবে মুক্তিসুখের উল্লাসে। অর্থ-ব্যয় তাতে হইবেই। এক যুগের ডিক্টেটরি আমলের হাত-পা বাঁধা রুদ্ধকণ্ঠ মানুষের আত্মপ্রকাশের দুর্জয় বাসনা বাঁধ ভাংগা বন্যার পানির মতই দু'কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। মিতব্যয়িতা ও সাবধানে পা ফেলার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তার উপর এ উচ্ছ্বাস শুধু জনগণের অতীত জয়ের উল্লাসই নয়, এটা তাদের ভবিষ্যতের সংকল্পের হুংকারও বটে। চিন্তা-নায়ক ও গণ-নেতাদের কর্তব্য এ গণ-উচ্ছ্বাসে নিরুৎসাহের পানি ঢালা নয়, এ প্রাণ-চাঞ্চল্যকে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত করা, নির্বাচন যুদ্ধকে জীবন-মরণের শান্তিপূর্ণ জন-যুদ্ধের মর্যাদা দেওয়া, নির্বাচনের ফলে গণ-দাবির প্রতিফলন ঘটানো। নির্বাচনকে ভোট-রংগের প্রহসন আখ্যা দিয়া চিন্তা-নায়করা এখানেই ভুল করিতেছেন।

এঁদের চেয়েও মারাত্মক অন্যায় করিতেছেন ঐসব চিন্তা-নায়ক সম্পাদক-সাংবাদিক ও নেতৃবৃন্দ, যাঁরা আসন্ন নির্বাচনকে 'ওয়াদার রাজনীতি' আখ্যা দিতেছেন। নির্বাচনের মুখে সকল দলই যার-তার দলীয় মেনিফেস্টোতে নানা রকম ওয়াদা করিতেছেন। আমাদের চিন্তা-নায়কদের অনেকেই এই কাজটার দোষারোপ করিতেছেন। বলিতেছেন, এইসব ওয়াদাকারী দল অতীতে বহু নির্বাচনী ওয়াদা করিয়া গদিতে চড়িয়া সে সব ওয়াদা খেলাপ করিয়াছেন। অতএব, এঁদের নির্বাচনী ওয়াদার চাকচিক্যে না ভুলিয়া সাধু-সচ্চরিত্র বিশ্বস্ত প্রার্থীগণকে ভোট দিবার পরামর্শ দিতেছেন। এই ধরনের উপদেশ দেশবাসীকে যাঁরা দিতেছেন, তাঁরা পরোক্ষভাবে তঁ বটেই, একরূপ সোজাসুজিই বলিতেছেন, নির্বাচনে নির্বাচনী ওয়াদার দরকার নাই। ইলেকশন মেনিফেস্টোকে 'ওয়াদার রাজনীতি' নামে বিদ্রূপ করিয়া তাঁরা ভোটারদেরে এ কথাই বুঝাইতেছেন যে, যাঁরা নির্বাচনী ওয়াদা করিয়া ভোট চান, তাঁরা আসলে ধাপ্পাবায মাত্র। তাঁদেরে ভোট দেওয়া উচিত নয়।

এই উপদেশটির সাথে আরেকটি দাবি যোগ করিয়া দেখুন। খ্যাতিমান কোনও-কোনও ব্যক্তি কোনও পার্টিতে যোগ না দিয়া 'স্বাধীন' প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। নিজেদের এই 'স্বাধীনতার' সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়া এঁরা কেউ-কেউ পার্টি-মনোনীত প্রার্থীর চেয়ে 'স্বাধীন' প্রার্থীর দাবির প্রাধান্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁরা বলিতেছেন, পার্টি মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হইলে স্বাধীনভাবে ও মুক্ত-মনে দেশের কল্যাণ-চিন্তা করিতে পারিবেন না। পার্টি-মেনিফেস্টো ও দলীয় শৃংখলায় এঁদের মস্তিষ্ক ও হাত-পা বাঁধা থাকিবে। অতএব দলীয় প্রার্থীর চেয়ে 'স্বাধীন' প্রার্থীরা নির্বাচিত হইলে তাতে দেশবাসী বেশী উপকৃত হইবে।

এই দুইটা অভিমতই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-বিরোধী কথা। গণতন্ত্র নির্ভর করে পার্টি সিস্টেমের উপর। পার্টি হইলেই তার মেনিফেস্টো থাকিতে হইবে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রথম-পাঠের এসব পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিতে স্বভাবতঃই আমি সংকোচ বোধ করিতেছি। কারণ, তাতে আমাদের চিন্তা-নায়কদের জ্ঞানের অপমান করা হইবে। তবু অবস্থা-গতিকে, বিশেষতঃ পাঠকগণের সুবিধার খাতিরে, সংক্ষেপে কথা-কয়টির উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্র-মাত্রেই জানেন, গণতন্ত্রের সাথে-সাথেই পার্টি-সিস্টেমের জন্ম হইয়াছে। এটা মানব-চরিত্রের দিক হইতে যেমন স্বাভাবিক, তাদের জীবন-ধারায় ডায়লেকটিকসের থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিসের নিয়মের দিক হইতেও তেমনি অনিবার্য। 'যত মুনি তত মত' এই কথাটা গোটা মানব-সমাজ সম্বন্ধেই সত্য। আমাদের জীবন-সমস্যার সব প্রশ্ন সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। এত বহু মত লইয়া রাষ্ট্র চলে না বলিয়াই সে-সব মতের কাতারবন্দি অত্যাবশ্যক হয়। এই কাতারবন্দিতেও এক কাতারের সব লোকই পুরাপুরিভাবে একমতের, তা নয়। মোটামুটি একমতের বা কাছাকাছি মতের লোকের মধ্যেই কাতারবন্দি হয়। রাজনৈতিক এই কাতারবন্দির নামই পার্টি। দেশবাসীর লক্ষ মতকে সংকুচিত, সমবেত ও সীমায়িত করিয়া দুই-চারটি মতে সারিবদ্ধ করাই পার্টির কাজ। এই কাতারবন্দি ছাড়া গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার চলিতে পারে না।

পার্টির সমবেত চিন্তা-ধারার রূপরেখার লিপিবদ্ধ দলিলের নাম পার্টি মেনিফেস্টো। পার্টি ছাড়া যেমন গণতান্ত্রিক সরকার চলিতে পারে না, পার্টি মেনিফেস্টো ছাড়া তেমনি পার্টি চলিতে পারে না। পার্টি যেমন দেশবাসীকে সারিবদ্ধ করে, পার্টি মেনিফেস্টো তেমনি রাষ্ট্রের করণীয় কাজগুলির কাতারবন্দি করে। রাষ্ট্রের কাজ আগের মত এখন আর শুধু প্রতিরক্ষা ও শান্তিরক্ষার কাজে সীমাবদ্ধ নাই। আজকার রাষ্ট্র দেশবাসীর খাদ্য-বস্ত্র ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মত সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই দায়ী। এইসব অসংখ্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের মধ্যে কোন্টা আগে, কোন্টা পরে, কোন্টা কিভাবে কবে কতদিনে করা হইবে, এসব চিন্তা করিবার এবং প্রতিকারের পন্থা বাহির করিবার দায়িত্ব পার্টিসমূহের। তাদের চিন্তার ফল পার্টি-মেনিফেস্টো। এই মেনিফেস্টো লইয়াই পার্টি-সমূহ নির্বাচনে নামেন। ভোটারদের সামনে তা পেশ করেন। যাঁর-তাঁর প্রস্তাবিত কার্যক্রমের পক্ষে যুক্তি দেন। ঐসব যুক্তি দেশবাসী গ্রহণ করিল কি না, তার পরখস্বরূপ পার্টিসমূহ যাঁর-তাঁর পক্ষে নির্বাচন-প্রার্থী খাড়া করেন। যে

পার্টির মনোনীত পার্থীরা জয়ী হইলেন, সেই পার্টির মেনিফেস্টো দেশবাসী, মানে ভোটাররা, গ্রহণ করিলেন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়।

এই মেনিফেস্টোকে 'ওয়াদার রাজনীতি' বলিয়া বিদ্রূপ করিলে এবং 'সাধু-সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ত' বলিয়া স্বাধীন প্রার্থীকে ভোট দিবার উপদেশ দিলে গণতন্ত্রের বুনিয়াদই ভাংগিয়া ফেলা হয়। তাতে রাজনীতি ও নির্বাচন আর প্রোগ্রাম-ভিত্তিক থাকে না। তা হইয়া পড়ে নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আজ এসব কথা যাঁরা বলিতেছেন, তাঁরাই কিন্তু সময়ান্তরে আফসোস করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের রাজনীতি আজও ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক স্তর অতিক্রম করিয়া প্রোগ্রাম ভিত্তিক স্তরে পেঁছে নাই। অথচ এঁদেরই একদল আজ ভোটারদেরে পরামর্শ দিতেছেন, নির্বাচনী ওয়াদাকারীদেরে ভোট না দিয়া 'সাধু সচ্চরিত্র' প্রার্থীকে ভোট দিবার জন্য। মনে হয়, এঁরা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার না চাহিয়া 'ভাল মানুষের সরকার' চাহিতেছেন। 'গুড গবর্নমেন্ট' যে 'সেল্ফ গবর্নমেন্ট' নয়, এ কথা যেন তাঁরা ভুলিয়াই গিয়াছেন। তাছাড়া মেনিফেস্টো-হীন 'সাধু-সচ্চরিত্র' লোকেরা নির্বাচিত হইয়া কি করিবেন ? আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের সমাধান সম্বন্ধে পণ্ডিত দের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ থাকিতে পারে। সবগুলি মতভেদই যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যও হইতে পারে। পণ্ডিতেরা সবাই সাধু ও সচ্চরিত্রও হইতে পারেন। এঁদেরে নির্বাচনে ভোট দিতে হইলে ভোটাররা কি উপায়ে এঁদের মধ্যে কাকে বাছাই করিবেন ? সবাই যে সমান সাধু ও সচ্চরিত্র। তারপর নির্বাচিত হইলে এঁরা কিভাবে শাসনতন্ত্র ও আইন রচনা ও মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন ? এঁরা সকলেই সাধু-সত্যবাদী হওয়ার দরুন সবাই যে যাঁর-তাঁর মতে দৃঢ় ও অনড় থাকিবেন। অপরের চাপে বা বুদ্ধিতে অথবা অধিকাংশের ধমকে মত-পরিবর্তন করিতে এই সাধু ব্যক্তিরা কেউ ত রাযী হইবেন না। তাতে গণ-পরিষদ ও পার্লামেন্টে ক্যাওস হইবে না কি ?

এসব কথাই অনাবশ্যক, সুতরাং অবান্তর। এই ধরনের 'ভাল মানুষ' নির্বাচন করিয়া আর যা-ই চলুক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চলিতে পারে না। গণতন্ত্র চালাইতে হইলে পার্টি বাছিয়া ভোট দিতে হইবে। পার্টি বাছাই করিতে মেনি-ফেস্টো বিচার করিতে হইবে। অতীতে কোন পার্টি নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করিয়া থাকিলেও এবারও পার্টি-মেনিফেস্টোর ভিত্তিতেই ভোট দিতে হইবে। 'যে যায় লংকায়, সেই হয় রাবণ', এই অভিজ্ঞতা যদি আমাদের থাকিয়াও থাকে, তবু ব্যক্তির সাধুতার চেয়ে 'মেনিফেস্টোর' গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কারণ নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ হউক আর না হউক, যে পার্টি

নির্বাচনে জয়ী হইল, তার মেনিফেস্টোই গণ-দাবির মর্যাদায় উন্নীত হইল। যতদিন তা পূরণ না হইবে, ততদিনই উহা গণ-দাবির চার্টার হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টো। সেটা আজও পূরণ হয় নাই। নির্বাচন-বিজয়ী মুসলিম লীগ নির্বাচনে জিতিয়া 'লংকায় গিয়া রাবণ' হইয়াছে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের চার্টার-মর্যাদা আজো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ইত্তেফাক, ২২শে নবেম্বর, '৭০

২৬
আগামী নির্বাচন ও মাইনরিটি

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তিনি তাঁর লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে যুক্ত নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে অসংখ্য মোবারকবাদ, তাঁরা নিজেদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা বা আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাবি করেন নাই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও মাইনরিটি সম্প্রদায় তাঁদের বর্তব্য করিয়াছেন। এইবার পার্টি-নেতৃবৃন্দের কর্তব্য করিবার পালা। প্রেসিডেন্ট ও মাইনরিটি সম্প্রদায় যে দূরদর্শিতা দেখাইয়াছেন, নেতাদেরও তাই করিতে হইবে।

মাইনরিটির জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা বা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে না মানে এই নয় যে, আইন পরিষদে মাইনরিটির প্রতিনিধিও থাকিবেন না। তার মানে এও নয় যে, মাইনরিটিরা দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবে না; মাইনরিটি নেতারা সরকারের মন্ত্রী ও আইন পরিষদের মেম্বর হইবেন না। নিশ্চয়ই হইবেন। যুক্ত-নির্বাচন প্রথা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু-প্রতিনিধিরা মেম্বর-মন্ত্রী হইবেন। বাতিল দুইটি শাসনতন্ত্রে ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে শুধু রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বেলা মাইনরিটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। গণতন্ত্রের বিচারে ঐ বিধান অন্যায়, সে তর্ক এখানে তুলিতেছি না। ঐ একটিমাত্র পদ ছাড়া আর সব পার্লামেন্টারি পদই মাইনরিটির সামনে খোলা আছে মায় প্রধানমন্ত্রীত্ব পর্যন্ত, এই বুনিয়াদেই আমার আজকার আলোচনা।

পাকিস্তানের মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের ও তাঁদের পরিচালিত পার্টিসমূহের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দুইটি মত আছে। এক দল পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে, সেকিউলার রাষ্ট্রে ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এঁরা যুক্ত নির্বাচন প্রথার সমর্থক, পৃথক নির্বাচন প্রথার বিরোধী। আরেক দল মুসলিম জাতীয়তাবাদে, ইসলামী রাষ্ট্রে ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এঁরা পৃথক নির্বাচনের সমর্থক, যুক্ত-নির্বাচনের বিরোধী। এমন বিরোধী যে, এঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁরা বলেন, যুক্ত-নির্বাচনে নির্বাচিত কোনও মুসলিম মেম্বর ইসলামী আইন পাসে ভোট দিলে সে আইন জায়েয হইবে না। এঁদের দাবি-মতে পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু হইলে শুধু মাইনরিটির ভোটে ৩১০ জন

মেম্বরের পরিষদে ৬০ জন মাইনরিটি মেম্বর নির্বাচিত হইবেন। দু'পাঁচজন মন্ত্রীও হইবেন। প্রমাণঃ চৌধুরী মোহম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা।

তবু মাইনরিটি নেতারা পৃথক নির্বাচনের ঐ সহজ সুবিধাজনক পথ ছাড়িয়া যুক্ত নির্বাচনের এই কঠিন পথ বাছিয়া লইয়াছেন। কারণ তাঁরা পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের মতই জাতীয়তাবাদেও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মন্ত্রী-মেম্বর হইতে চান শুধু মাইনরিটির প্রতিনিধি হিসাবে নয়, ধর্ম-মত-নির্বিশেষে পাকিস্তানী নেশনের প্রতিনিধি হিসাবে। তাঁরা মন্ত্রী-মেম্বর হইতে চান শুধু মাইনরিটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও গোটা পাকিস্তানী জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য। একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে, একটা রাষ্ট্রীয় জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, একটা স্বাধীন দেশের দেশপ্রেমিক অধিবাসী হিসাবে তাঁরা রাষ্ট্র, জাতি ও দেশের সেবা করিতে চান। পাকিস্তানের সরকার ও মেজরিটির রাষ্ট্র-নেতারা কি মাইনরিটি নেতাদেরে সে সুযোগ, দায়িত্ব ও অধিকার অতীতে দিয়াছেন ও ভবিষ্যতে দিবেন? আসন্ন নির্বাচনের মুখে এই কথাটাই আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আমি পূর্ব বাংলার মাইনরিটির কথাটাই ভাবিতেছি। এদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের কথাটাই আসে সকলের আগে। তাদের কথাটা বলিলেই মোটামুটি সব মাইনরিটির কথাই বলা হইয়া যায়।

পাকিস্তানের বয়স তেইশ বছর। মাঝখানে হক-নেতৃত্বের কৃষক-শ্রমিক পার্টির এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ-শাসনের সংক্ষিপ্ত তিনটি বছর বাদে বাকী বিশটা বছর পাকিস্তানের মাইনরিটি রাষ্ট্রীয় জীবনে মর্যাদা পায় নাই। শুধু মর্যাদা পায় নাই বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না। মর্যাদার বদলে অসম্মান, অধিকারের বদলে উপেক্ষা ও দায়িত্বের বদলে অবহেলাই পাইয়াছে। এই কুড়ি বছরের মুদ্দতের মধ্যেও আইউবী আমলের এগার বছর পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে মাইনরিটি সম্প্রদায় কার্যতঃ মুছিয়া গিয়াছে। কিছুদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একজন বৌদ্ধ মন্ত্রী নেওয়া ছাড়া সারা পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি 'পযিশনে' মাইনরিটির নাম-গন্ধ ছিল না। অথচ মজার কথা এই যে, মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত দু'একজন অসাধু ব্যবসায়ীর সাথে আইউবী আমলের মন্ত্রী-মেম্বরদের গোপন ব্যবসা করিতে বাধে নাই।

বলা যাইতে পারে, এই মুদ্দতে দেশে গণতন্ত্র ছিল না। কাজেই এই সময়কার অবিচারের জন্য রাজনীতিক নেতারা দায়ী নন। মানিলাম। কিন্তু ওটা সরকারী

দলের অবিচারের কথা। বেসরকারী অপযিশন রাজনীতিতে মাইনরিটি নেতাদেরে উপেক্ষা অবহেলা করিবার কি যুক্তি ছিল অথবা আছে? আইউব রেজিমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় এন. ডি. এফ. গড়িয়া। তখন পার্টি রিভাইভ করা হয় নাই। নির্দলীয় নেতাদেরে লইয়াই কমিটি গঠিত হইয়াছিল। মাইনরিটির, বিশেষতঃ হিন্দু রাজনীতিকদের, মধ্যে কত ত্যাগী, নির্যাতিত, উচ্চ-শিক্ষিত জনপ্রিয় দেশসেবক ছিলেন ও আছেন। তাঁদের কেউকে কমিটিতে নেওয়া হয় নাই কেন? ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আইউবের সাথে সম্মুখ-যুদ্ধে যখন সর্বদলীয় 'কপ' গঠিত হইল, তখনও কোনও মাইনরিটি নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেওয়া হইল না কেন? পার্টি-বেসিসে 'কপ' গঠিত হইয়াছিল, এই যুক্তিতে? 'কপের' অংগদলের একাধিক প্রতিষ্ঠান ত ছিল অসাম্প্রদায়িক। তাদের মধ্যে মাইনরিটি-মেম্বরও ত ছিলেন। তবু তাঁদেরে নেওয়া হয় নাই। 'কপ' সম্বন্ধে যে কথা, 'ডাক' সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য। সর্বশেষে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বসিল রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। একদিকে প্রেসিডেন্ট আইউব ও তাঁর রাজনৈতিক অনুসারীরা। অপর দিকে বার কোটি পাকিস্তানীর গণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানী জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। উদ্দেশ্য যেমন মহান, তেমনি বিরাট, তেমনি পবিত্র। সে কনফারেন্সে ভাগ্য নির্ধারিত হইবে ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে গোটা পাকিস্তানী জাতির। নির্মিত হইবে গণতান্ত্রিক পাকিস্তান-সৌধের কাঠাম। অথচ সে কনফারেন্স টেবিলে সোয়া এক কোটি অমুসলমান ও ছয় কোটি নারীর কোনও প্রতিনিধি নাই। নারীর প্রতিনিধিত্বের কথাটা আমার আজকার আলোচ্য নয়। শুধু মাইনরিটির কথাটাই বলিতেছি।

এই গোলটেবিল বৈঠকে কাকে-কাকে দাওয়াত করা হইবে, সে ভার প্রেসিডেন্ট আইউব নিজ হাতে বা তাঁহার সরকারের হাতে রাখেন নাই। সম্পূর্ণ ভার দিয়াছিলেন অপযিশন নেতাদের হাতে। কনফারেন্সের প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইউব নিজে বা তাঁর পক্ষ হইতে অন্য কেহ কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন নাই। গণতন্ত্রী নেতারা যাকে খুশি, যতজন খুশি দাওয়াত করিতে পারেন, সেকথা প্রেসিডেন্ট আইউব প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। তবু এমন গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সে দু' একজন মাইনরিটি নেতাকে দাওয়াত করা হইল না কেন? নেতারা কি ভাবিয়াছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠাম নির্মাণে মাইনরিটির কোন কথা বলার দরকার বা অধিকার নাই? তাঁরা কি মনে করিয়াছিলেন, গোলটেবিলে বসিবার মত যোগ্য লোক মাইনরিটি সম্প্রদায়ে ছিলেন না? দরকার-অধিকারের কথা ন্যায়তঃ ও আইনতঃ কেউ

বলিতে পারেন না। তাই যোগ্যতার কথা বলিবেন? রাউন্ড-টেবিলে সমবেত নেতাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান না দেখাইয়াও বলা চলে, মাইনরিটি সম্প্রদায়ে এমন নেতা আজো আছেন, যাঁরা দক্ষতার সংগে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন। তাঁদের উপস্থিতিতে গোল-টেবিলের মর্যাদা ও সৌষ্ঠব বাড়িত ছাড়া কমিত না।

সকলেই জানেন, গোটা দেশবাসীর পরতে-পরতে 'আমরা'ত্ব ও 'আমাদের'ত্ব-বোধ বিস্তার করাই ঐক্যবদ্ধ সুসংহত শক্তিশালী রাষ্ট্র-জাতি গড়ার একমাত্র পন্থা। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা ভুগিয়া শিখিয়াছি যে, দেশ শাসনে সেন্‌স্‌-অব-পার্টিসিপেশন সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই 'আমরা'ত্ব-বোধের উন্মেষ হয় না। আর বাস্তব ক্ষেত্রে পার্টিসিপেশন না হইলে সেন্‌স্‌-অব-পার্টিসিপেশন আসিবে কোথা হইতে? পূর্ব পাকিস্তানীদের বেলা যেখানে আট-দশ আনা এই শূন্যতা, মাইনরিটির বেলা এই শূন্যতা সেখানে ষোল আনা। এমন শূন্যতায় 'আমরা'ত্ব-বোধ সৃষ্টি হইতে পারে না।

এইখানে আমাদের বাটোয়ারার বড় শরিক ভারতের সাথে অবস্থার তুলনাটা খুবই শিক্ষাপ্রদ। ভারতের মুসলমানদের তুলনায় পাকিস্তানের হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক দাংগাহীন আবহাওয়ায় শান্তিতে বাস করিতেছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগা লাগিয়াই আছে। এই দিক হইতে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব ও প্রশংসার অধিকারী। পাকিস্তানের এই সাম্প্রদায়িক দাংগাহীন শান্তিটাকেই পাকিস্তান সরকার ও রাষ্ট্র-নেতারা মাইনরিটির প্রতি তাঁদের কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেছেন। এটা তাঁদের ভুল। কায়িক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ভারতের মুসলমানরা শারীরিক অনিরাপত্তার মধ্যে রাজনৈতিক অংশীদারত্ব ভোগ করিতেছে। আর পাকিস্তানের হিন্দুরা শারীরিক নিরাপত্তার মধ্যে রাজনৈতিক অংশীদারত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিতেছে।

অতএব এটা শুধু শারীরিক ও বৈষয়িক শান্তির প্রশ্ন নয়। রাজনৈতিক অধিকার ভোগেরও প্রশ্ন এটা। শুধু শান্তিতে বাস করাই যদি হিন্দুদের জীবনের আদর্শ হইত, তবে কেন তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জান-মাল কোরবানি করিয়াছিল? ইংরাজের অধীনে এরা বর্তমানের চেয়ে এবং আমাদের চেয়েও বেশী সুখে-সম্পদে পরম শান্তিতেই জীবন যাপন করিতেছিল। মাতৃভূমির আজাদির জন্য যারা অর্ধ-শতাব্দীকাল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিল, দেশের মুক্তির জন্য যাদের তরুণরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া গেল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তারাই রাজনৈতিক অধিকারহীন কায়িক শান্তিতে

বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, এমন আশা করা সংগত হইবে না ঃ মাইনরিটির মর্যাদা-অধিকারের দিক হইতেও না, পাকিস্তানের সংহতি-নিরাপত্তার দিক হইতেও না।

বরঞ্চ তার বদলে মাইনরিটির মনে সমান নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করিতে হইবে। তাদের অন্তরে সার্বিক সেন্স্-অব-পার্টিসিপেসন জাগাইতে হইবে। তাদের বুদ্ধি-বৃত্তি, জ্ঞান-প্রতিভা ও কর্ম-ক্ষমতা পাকিস্তানের খেদমতে লাগাইতে হইবে। ধর্ম-নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানবাসীকে এক পাকিস্তানী জাতি করিবার কায়েদে-আযমের স্বপ্ন সফল করিতে হইবে।

এই কাজটিই শুধু করিতে হইবে আসন্ন নির্বাচনে। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তানী জাতি গড়ার এটাই হইবে প্রথম পদক্ষেপ। এই নির্বাচনে যাতে যথাসম্ভব সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট-সংখ্যক মাইনরিটি নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হইতে পারেন, মত-নির্বিশেষে সকল পার্টিরই সেদিকে নযর রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, পাকিস্তানের মেজরিটি হিসাবে মাইনরিটির প্রতি মামুলি কর্তব্য ছাড়াও যুক্ত-নির্বাচন-প্রথায় আমাদের উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। আমাদের নিজেদের মর্যাদার উপযোগী এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। যারা অসাম্প্রদায়িক সেকিউলার পার্টি চালান, সে-সব নেতা ত তা করিবেনই। যাঁরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পৃথক-নির্বাচন-প্রথায় বিশ্বাসী, তাঁদেরও এ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, আসন্ন নির্বাচন হইতেই জাতির জীবনে এই সর্বপ্রথম সার্বজনীন ভোটের প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসন শুরু হইবে। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশে আইন-পরিষদে ও মন্ত্রিসভায় ন্যায়-সংগত সংখ্যা ও পরিমাণে মাইনরিটির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিয়া দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মনোরম ইমেজ খাড়া করিতে হইবে।

আসন্ন নির্বাচনে আরেক কারণে সংখ্যায় ও গুণে যথেষ্ট পরিমাণে মাইনরিটির প্রতিনিধির আসিতে হইবে। এ নির্বাচনে শুধু আইন-পরিষদ গঠিত হইবে না, গণ-পরিষদও গঠিত হইবে। তাতে দেশের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। লাহোর প্রস্তাবে, মানে পাকিস্তান প্রস্তাবে, আমরা ওয়াদা করিয়াছি মাইনরিটির ধর্মীয়, কৃষ্টিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বার্থ রক্ষার বাধ্যতামূলক বিধান মাইনরিটির সাথে মন্ত্রণা করিয়াই শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করিব। গণ-পরিষদে যথেষ্ট পরিমাণ মাইনরিটির প্রতিনিধিত্ব ছাড়া এটা হইতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ বিষয়ে আমাদের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁর আইনমন্ত্রী করিয়াছেন একজন মাইনরিটি সম্প্রদায়ের লোককে। শাসন-তন্ত্র রচনার প্রাক্কালে আইন দফ্তরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই হিসাবে

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মাইনরিটির প্রতি পূর্ণ আস্থা দেখাইয়াছেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষিত নীতি অনুসারে অবশ্য তাঁর মন্ত্রীরা কেউই জনগণের প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে পারেন না। কিন্তু তবু এর মধ্যে নেতাদের প্রতি প্রেসিডেন্টের যথেষ্ট স্পষ্ট নির্দেশ নিহিত আছে। নেতাদের এ নযির অনুসরণ করা উচিত।

অতএব, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে সকল পার্টিকেই মাইনরিটির প্রতিনিধিত্বের কথা মনে রাখিতে হইবে। যে-সব সাম্প্রদায়িক পার্টিতে অমুসলমান মেম্বর আছেন, তাঁরা পার্টির মনোনীত প্রার্থী-হিসাবেই মাইনরিটির লোক খাড়া করিবেন। যাঁদের তা নাই, তাঁরাও এমনি ব্যবস্থা করিবেন। পার্টি মেম্বর না হইয়াও যদি কোনও প্রার্থী পার্টি-প্রোগ্রাম ও শৃংখলা মানিয়া চলিতে রাযী হন, তবে স্বতন্ত্র এসোসিয়েট বা সমর্থিত প্রার্থী হিসাবেই তাঁর সাফল্যের সহায়তা করিবেন। আর যাঁরা ইসলামী গণতন্ত্র ও পৃথক নির্বাচনে বিশ্বাসী, তাঁরাও মাইনরিটির ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব ও ইসলামী ইনসাফের খাতিরে দেশ-প্রেমিক, যোগ্য ও সৎ মাইনরিটি প্রার্থীকে সমর্থন দিয়া মাইনরিটির প্রতি তাঁদের সদিচ্ছার নযির স্থাপন করিবেন।

ইত্তেফাক, ৯ই মে, '৭০

২৭

আকাশ মেঘমুক্ত হইল কি ?

আজ পয়লা জানুয়ারি। ১৯৭০ সাল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬০ নম্বর মার্শাল ল' রেগুলেশন জারি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন : আজ হইতে পাকিস্তানীরা নিয়মিত রাজনীতি করিতে পারিবে। যথারীতি রাজনীতি শুরুও হইয়াছে। পল্টনে সভা ডাকার হিড়িক পড়িয়াছে। আশা হয়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আসমান সাফ হইয়াছে। ভালয়-ভালয় দশটা মাস কাটিয়া গেলে ৫ই অক্টোবর গণতন্ত্রের চাঁদ উঠিবে। সত্যই কি আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে ? সত্যই কি নির্ধারিত দিনে চাঁদ উঠিবে ? প্রশ্নটার উত্তর শুধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দিবেন না, রাজনৈতিক নেতারাও দিবেন। দায়িত্ব ও কর্তব্য উভয়ের সমান। মার্শাল ল'র আমলে রাজনীতি করা দূরের কথা, কলেজে রাজনীতি পড়ানই নিষিদ্ধ। যে-দেশের অভিজ্ঞতা বা ধারণা এই, সে-দেশে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে রাজনীতি করিবার অধিকার দিয়াছেন, এটা কম কথা নয়। মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষেরও কম প্রশংসার কথা নয়। সেজন্য সকল দলের নেতারা পঞ্চমুখে প্রেসিডেন্টের তারিফ করিয়াছেন।

সত্য-সত্যই তিনি তারিফের যোগ্য। কারণ, তিনি শুধু রাজনীতির খাতিরেই রাজনীতি করিবার অনুমতি দেন নাই, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি হিসাবেই এ অধিকার দিয়াছেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি দ্রুত ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে আইন পরিষদ গঠনের দিন-তারিখ ঘোষণা করিয়াছেন। আজ হইতে ঠিক দশ মাস পাঁচ দিন পরে পাকিস্তানের তেইশ বছরের জীবনে সর্বপ্রথম এই ধরনের সাধারণ নির্বাচন হইবে। এজন্য শুধু নেতারা খুশি হন নাই, জনগণও উৎফুল্ল হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য দশ মাস পাঁচ দিন কেন নির্ধারণ করিলেন, ভাল বোঝা গেল না। এ বিষয়ে তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, সেটা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। তা'ছাড়া, দশ মাস পাঁচ দিনও যা, দশ মাস দশ দিনও তাই। দশ মাসের ব্যাপারটাই চিন্তার কারণ। কখন কি হয়, বলা যায় না। তার উপর পাকিস্তানীরা বড় মন্দ-কপাল। নির্বাচন করা তাদের বরাতে জোটে না। ভোট

হইতে-হইতে হয় না। হইলেও ভোটের ফল তারা পায় না। এই দুর্ভাগ্য, জনগণ যা গড়ে, নেতারা তা ভাংগেন। নেতারা যেটুকু ভাংগিতে পারেন না, অফিসাররা তা সম্পূর্ণ করেন। সেই যে ১৯৪৭ সালে ভোট দিয়া জনগণ পাকিস্তান কায়েম করিয়াছিল, সেই পাকিস্তান গড়ন বা শাসনের ব্যাপারে জনগণ আর ভোট দিতে পারে নাই। নেতারা নির্বাচন দিলেন না। অফিসাররা ভোটাধিকারই বাতিল করিয়া দিলেন। এইভাবে পাকিস্তানের জনগণ গোয়াল-পোড়া গরু বনিয়াছে। সিন্দুরে তাদের ভয়। তথাপি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণায় তারা আশ্বস্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী শাসকদের ব্যতিক্রমে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, পাকিস্তানীরা গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের যোগ্য।

তবে তিনি দশ মাস পাঁচ দিনই যখন করিলেন, তখন দুই দিন বাড়াইয়া ৫ই অক্টোবরের জায়গায় ৭ই অক্টোবর করিলে আরও ভাল হইত। ঐ তারিখের ঠিক বার বছর আগে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের রাতের অন্ধকারে পাস্তিানবাসীর রাজনৈতিক অধিকার চুরি হইয়াছিল। ডাকাতি হইয়াছিল বলাই ভাল। কাজেই বার বছর পরে ঐ তারিখেই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে ইতিহাসের দিক দিয়া ঘটনাটা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হইত।

দশ মাস লম্বা সময়। পাকিস্তানীদেরও বরাত মন্দ। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও দলীয় নেতৃবৃন্দ উভয়পক্ষকেই খুব হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। এর আগের বারও নির্বাচনের দিন-তারিখ ঠিক হইয়া গিয়াছিল। নির্বাচনের নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছিল। ভোটার-তালিকা ও নির্বাচকমণ্ডলী ঠিক হইয়া গিয়াছিল। ব্যালট-বাক্স তৈয়ার হইয়া গিয়াছিল। নির্বাচনের আর মাত্র ১২০ দিন বাকী। এমন সময়ে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়া গেল। পাঁচ মাসের কম সময়ে যদি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তবে দশ মাসের বেশী সময়ে আরও বেশী পারে। কাজেই সকলকেই সাবধান থাকিতে হইবে। সাবধান থাকিতে হইবে আরও বেশী এই জন্য যে, আমাদের নেতারা গণতন্ত্র দাবি করিবার সময় সকলের আগে যে জিনিসটির কথা ভুলিয়া যান, তা হইল জনগণ। নেতারা বরাবরই তা করিয়া থাকেন। আজও করিয়াছেন। গণতন্ত্রের দরজা উন্মুক্ত করার জন্য আমরা সকলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রশংসার অধিকারী যে জনগণ, ভুলেও আমরা তাদের কথা স্মরণ করিতেছি না। যে আইউবশাহি দৃশ্যতঃ এবং বস্তুতঃ চিরস্থায়ীভাবে আমাদের কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছিল, কায়েমী স্বার্থীরা যে ডিক্টেটরশিপকে দুরপনেয় করিবার সকল ব্যবস্থাই করিয়া ফেলিয়াছিল, একশ্রেণীর ইন্টেলিজেনশিয়া যে ডিক্টেটরের সেফতনামায় নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়া-

ছিলেন, যে অক্টোপাসের সহস্র বাহু আমাদের জাতীয় জীবনের সকল স্তরে ও ক্ষেত্রে বজ্রমুষ্ঠিতে দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল, দশ বছরের সেই ডিক্টেটরশিপকে মাত্র পাঁচ মাসে উৎখাত করিয়াছিল কে? এই জনগণ। গণ-অভ্যুত্থানই সে স্বৈরাচারের অবসান ঘটাইয়াছিল। নেতৃত্বহীন সে গণ-অভ্যুত্থান মনযিলে-মকসুদে পেঁ ীছিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু গণতন্ত্র কায়েমই ছিল সে অভ্যুত্থানের মহান উদ্দেশ্য, সেটা বুঝিতে কারও বাকী থাকে নাই। তাই জেনারেল আইউব সরিয়া পড়িয়াছেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর স্থানে দাঁড়াইয়া জনগণের দাবি মানিয়া লইয়াছেন; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন-তারিখ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং সকল তারিফের অধিকারী জনগণ। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে তাই জনগণের কাজে লাগাইতে হইবে।

গণতন্ত্র যেমন সব জাতির জন্যই মর্যাদাসূচক মার্শাল ল' তেমনি সব জাতির জন্যই অপমানকর। কিন্তু মার্শাল ল' ও ডিক্টেটরশিপ সব দেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। পাকিস্তানের জন্য মার্শাল ল' ও ডিক্টেটরশিপ শুধু অপমানকর নয়, ক্ষতিকরও বটে। পাকিস্তানে মিলিটারি শাসন বা ডিক্টেটরশিপের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মার্শাল ল' প্রবর্তনের সংগে-সংগে অবস্থাগতিকে স্বতঃই পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী একক শাসন কায়েম হইয়া যায়। সৈন্যবাহিনীতে কোনও পদস্থ পূর্ব পাকিস্তানী না থাকায় স্বভাবতঃই এটা ঘটিয়া থাকে। এর কোনও উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশরক্ষা বাহিনীর বর্তমান প্রকৃতির জন্যই এরূপ হইতে বাধ্য। কিন্তু যতই স্বাভাবিক, সংগত এবং অপরিহার্য হউক না কেন, ব্যাপারটা দেখিতেই শুধু দৃষ্টিকটু, উলংগ ও অবাঞ্ছনীয় নয়, জাতীয় ঐক্যবোধের দিক হইতেও সাংঘাতিক রকম ক্ষতিকর। এটা বেশীদিন স্থায়ী হইলে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে নিজ দেশে পরবাসী মনোভাবের উদ্রেক হইতে পারে। পাকিস্তানী জাতীয়তা গঠন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের দুশমনরা এই মনোভাবের অশুভ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্যই পাকিস্তানের মত দ্বিধা-বিভক্ত দেশে পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর মত আঞ্চলিক রূপের সামরিক শাসন যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত। অনিবার্য কারণে তেমন শাসন প্রবর্তিত হইলেও তার মেয়াদ যথাসম্ভব খাট করা অত্যাবশ্যক।

কিন্তু মার্শাল ল' যে-কোনও জাতির জন্য যতই অপমানকর হউক না কেন, আমাদের জন্য মনে হয়, এর দরকার ছিল। অন্ততঃ জেনারেল ইয়াহিয়ার মার্শাল ল' আমাদেরে তাই শিক্ষা দিয়াছে। নেতাদের জন্য যতই লজ্জার ব্যাপার হউক না কেন, তাঁরা যা পারেন নাই, জেনারেল ইয়াহিয়া তা পারিয়াছেন। তাঁকে

প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। এগুলি সমাধানের দায়িত্ব ছিল পলিটিশিয়ানদের। তাঁরা তা পারেন নাই। পারেন নাই বলিলেও যথেষ্ট হইবে না, অনেক নেতাই ওভাবে সমাধানের বিরোধী ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের 'ওয়ান ইউনিট' ও দুই উইং-এর প্রতিনিধিত্বের প্যারিটির কথাই ধরা যাক। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনার আগে একদল পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি না মানা পর্যন্ত শাসনতন্ত্র হইবে না। আইউবশাহির শেষদিন পর্যন্ত একশ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া সাবেক প্রদেশগুলির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কথা কানেই তুলিতেন না। পি. ডি. এম. ইত্যাদি ধরনের নিখিল পাকিস্তানী সর্বদলীয় ঐক্যজোটের আলোচনাকালে সাবেক প্রদেশগুলির পুনরুত্থানের কথা উঠিলে তাঁরা একেবারে জিভে কামড় দিতেন। ওটা যেন পাকিস্তান ধ্বংসের একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব। কিন্তু আজ যখন মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক তুড়িতে ঐ দুইটা ব্যবস্থাই করিয়া ফেলি-লেন, তখন ঐসব নেতার কেউই তার প্রতিবাদ করিলেন না, বরঞ্চ অভিনন্দন জানাইলেন। ভাবখানা এই যে, তাঁরাও যেন এই কাজটাই করিতে চাহিতে-ছিলেন। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এই ব্যবহার-বৈচিত্র্যই আমা-দের জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যা জটিল করিয়াছে, অনেক বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। এই জন্যই মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরা মিটাইতে পারি না। এই কারণেই অনেকে বলিতে সাহস পায়, আমরা গণতন্ত্রের যোগ্য আজও হই নাই।

আরেকটা কথার বিচার করুন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ও শাসকদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই আজ সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানীদের বিশ্বাস করিলেন। যে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ দেশের নয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবে, তাতেই জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের মেজরিটি দিয়া দিয়াছেন। অবস্থা বিবেচনায় এটা কম কথা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তনীদেরে বিশ্বাস করেন নাই। উল্টা এদের দেশানুগত্যেই তারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানীদের মাতৃভাষার দাবি তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যুক্তনির্বাচনের দাবি, চাকরি-বাকরিতে সমান অংশ দাবি ইত্যাদি সব ন্যায্য দাবিকেই তাঁরা শুধু সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা বলিয়াই রেহাই দেন নাই, পাকিস্তানের দুশমনদের উস্কানিতেই আমরা এসব দাবি করিতেছি, তা ও বলিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের মুসলমানিত্বেও তাঁরা কুৎসিত কটাক্ষ করিয়াছেন। এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানীদের মেজরিটি নষ্ট করিয়াও তারা নিশ্চিন্ত হন নাই; পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরে মাইনরিটি করিবারও

চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানীরাই ভোট দিয়া পাকিস্তান বানাইয়াছে। তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন, যাঁরা পাকিস্তান বানাইলেন, তাঁরা পাকিস্তান ভাংগিতে পারেন না। আর যদি পাকিস্তানের মেজরিটি পাকিস্তান ভাংগিয়া দিতেই চায়, তবে কেউ তা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। কাজেই পাকিস্তানকে বাঁচাইতে হইলে পূর্ব পাকিস্তানীদেরে বিশ্বাস করিতেই হইবে। এই সহজ-সরল কথাটা বুঝিয়াছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। এটা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিদর্শন।

কিন্তু সেই কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মতে খুব বড় একটা রিস্ক নিয়াছেন। সেজন্য তাঁদের অনেকেই তাঁকে উদ্দেশ্য করিয়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁরা বলিতেছেন, শাসনতন্ত্র রচনা অনুমোদনের চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁর নিজ হাতে থাকা দরকার। ভোটা-ভুটির বেলা কড়া বিধি-নিষেধ থাকা আবশ্যক। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও যে এমন চিন্তা না করিতেছেন, তা-ও নয়। তিনি কি চিন্তা করিতেছেন, কি-কি বিধি-নিষেধের কথা ভাবিতেছেন, তাঁর প্রতিশ্রুত 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা বলা যায় না। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্র রচনাটা সাধারণ আইন রচনার কাজ নয়। এতে তাঁর পরিকল্পিত বিধি-নিষেধের একটা আন্দায করা যায়। শাসনতন্ত্র রচনা সাধারণ আইন রচনা নয়, এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, শাসনতন্ত্রের মর্যাদার খাতিরেই তার রচয়িতাকে বাইরের বিধি-নিষেধমুক্ত হইতে হইবে। কাজেই লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক রচনার সময় প্রেসিডেন্টকে অন্ততঃ তিনটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। তিনটি বিষয় এই ঃ

(১) তিনি তার ঘোষণায় 'ম্যাক্সিমাম প্রভিনশিয়াল অটনমির' কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সে অটনমির পরিমাণ নির্দেশ করেন নাই। ওটা রাজনৈতিক প্রশ্ন বলিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ কথার তাৎপর্য এই যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যা করিবেন, তাই তিনি মানিয়া লইবেন। কিন্তু প্রশ্নটার এখানেই শেষ নয়। তাঁর মনে রাখিতে হইবে, পূর্ব পাকিস্তানের বিচার গোটা পশ্চিম পাকিস্তান দিয়াই হইতে পারে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি দিয়া হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের 'পাঁচটি প্রদেশের' একটি মাত্র 'প্রদেশ' বিবেচনা করিয়া 'প্রাদেশিক অটনমির' মাত্রা নির্ধারিত হইতে পারিবে না। তিন বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রায় সর্বসম্মত দাবি। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা সাড়ে সাতানব্বই জন ভোটার এই ভার্ডিক্ট দিয়াছেন। অথচ তিন বিষয়ের বাইরের অনেক বিষয়ে যথা—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোস্ট, রেডিও, টেলিফোন, সিন্ধু অববাহিকা, তারবেলা, মংলা,

সুইগ্যাস ইত্যাদির ও কমিউনিকেশন-ইরিগেশনের মত বিষয় বহন করিবার ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের একক কোনও প্রদেশের নাই। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবি-মোতাবেক অটনমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইলে পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের সমান অধিকারের একটি সাব ফেডারেশন হওয়া অত্যাবশ্যক। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক রচনার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে নিশ্চয়ই একথা মনে রাখিতে হইবে।

(২) প্রেসিডেন্ট প্রজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় ডিসিশন-মেকিং-এ পূর্ব পাকিস্তানীরা যথাযোগ্য শরিক হইতে পারে নাই বলিয়াই তাদের অসন্তোষ ন্যায়সংগত। কিন্তু প্রশ্নটা শুধু সরকারী ক্ষমতা বণ্টনে সীমাবদ্ধ নয়। সরকারী খরচেও পূর্ব পাকিস্তানের সমান অংশ থাকিতে হইবে। 'সরকারের ব্যয় জনগণের আয়' পাবলিক ফাইন্যান্সের এই বুনিয়াদী সত্য পূর্ব পাকিস্তানীদের জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার চিন্তা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় রাজধানী, শাসনতন্ত্র, দেশরক্ষা বাহিনী, সুপ্রিম কোর্ট, স্টেটব্যাংকসহ ব্যাংকিং-ইন্শিওরেন্স সংস্থা সবই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। সমস্ত সরকারী ব্যয় কাজেই সেখানেই হয়। দুই অঞ্চলের মধ্যে মবিলিটি-অব-লেবার ও ক্যাপিটাল না থাকায় এই সুবিধা হইতে পূর্ব পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে-সাথে বিদেশী মিশনসমূহও স্বভাবতঃই পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ। ওদের ব্যয় হইতেও পূর্ব পাকীস্তানীরা কোনও সুবিধা পায় না। প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘোষণায় বলিয়াছেন, দুই অঞ্চলের সম্পদ নিজ-নিজ এলাকায় ব্যয় হইবে। তাতে ত সরকারী খরচের এই সমস্যা মিটিবে না।

(৩) শাসনতন্ত্রের মর্যাদার কথা। শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ উন্মেষিত ও বিকশিত হইবে। কাজেই শাসনতন্ত্রের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা চাই। গণপরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া জেনারেল আইউব খুবই খারাপ নযির স্থাপন করিয়াছেন। এর পরে শাসনতন্ত্রের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিতে হইলে তার রচয়িতাকে নির্বাচিত হইলেই চলিবে না, তাকে সার্বভৌমও হইতে হইবে।

এই তিনটি বিষয় ছাড়াও আরেকটি কথা আছে। জাতীয় সংহতির জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা রাজধানীর কথা। পাকিস্তানী জাতীয় সংহতির খাতিরেই আমাদের রাজধানীকে কায়েদে-আযমের করাচীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কায়েদে-আযমের ফাদার-ইমেজ আমাদের নয়া জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ। করাচীতে রাজধানী না থাকিলে কায়েদের ফাদার-ইমেজ থাকে না, এটা বুঝিতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার নাই। কায়েদে-আযম-স্থাপিত

রাজধানী পাকিস্তানের জনগণের দ্বারা বা জনগণের মতানুসারে সরান হয় নাই। সরাইয়াছেন এমন একজন ডিক্টেটর, যাঁর কার্যকলাপ পাকিস্তানের ইতিহাসের একটি কলংকময় অধ্যায়। নয়া রাজধানী এই কলংকের স্মৃতি-স্তম্ভ। এই কলংকের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলা দরকার। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর অবসান ঘটাইয়া কায়েদে-আযমের রাজধানীতে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত এই কলংক ঘুচিবে না। করাচীতে রাজধানী ফিরাইয়া আনার দরকার জাতীয় সংহতির খাতিরেও। পাকিস্তানের রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য সহজলভ্য হওয়া অত্যাবশ্যক। কোস্টাল ট্রাফিক জাতীয়করণ করিয়া সাব-সিডাইযড তৃতীয় ও ডেক শ্রেণীর ভাড়ার ব্যবস্হা করিয়া উভয় পাকিস্তানের জনগণের অবাধ মিলা-মিশার ব্যবস্হা না করা পর্যন্ত জনগণের স্তরে ও মধ্যে জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিবে না। করাচীতেই এটা সম্ভব। 'পিন্ডি-ইসলামাবাদে এটা সম্ভব নয়।

সুতরাং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এবং জন-নেতৃবৃন্দের অনেক করণীয় কাজ বাকী রহিয়াছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট 'লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক' প্রণয়ন করিবেন। কাজেই এই তিনটা মাস প্রেসিডেন্টের জন্য খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। তিনি যদি ঠিকমত 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' রচনা করিতে পারেন, ২৮শে নবেম্বর ও পরবর্তী কয়েকদিনে তিনি যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন, 'লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক'ও যদি সেই গুণের পরিচয় দিতে পারেন তবে পাকিস্তানের সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারিত না হইবার এবং আমাদের একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র না পাইবার কোনও কারণ নাই।

কিন্তু জন-নেতাগণের কর্তব্য আরও বেশী গুরুতর। দায়িত্ব তাঁদের আরও অনেক বড়। সে কর্তব্য শুধু এই তিন মাসের সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। নির্বাচনী প্রচারের সারা মুদ্দত এবং নির্বাচনের পরে চার মাসকালও সেই গুরুদায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সে কর্তব্য পালনে তাঁদের একটি আধুনিক প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের যোগ্য নেতৃত্বের প্রমাণ ও পরীক্ষা দিতে হইবে।

এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ৬০ নং রেগুলেশনে যেসব বিধি-নিষেধ প্রচার করিয়াছেন, তার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। কারণ, তাতে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের বিধান করা হইয়াছে। তাছাড়া উদ্দেশ্য আরোপ করিলে তর্কের দ্বারা ভাল জিনিসকেও খারাপ বলা যায়, খারাপ জিনিসকেও ভাল বলা যায়। সব আইনের ভাল-মন্দই প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। চলুন, আমরা সকলেই আশা করি, বিধানসমূহ অসদুদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা

[illegible] না। অটনমির পরিমাণ নির্দেশিত না হওয়ায় এ সম্পর্কে সব পার্টির সব [illegible] প্রচার করা চলিবে। অন্যায় অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রচার করিলেই, পুঁজিবাদের বিপক্ষে ও সমাজবাদের পক্ষে বলিলেই, 'শ্রেণী বিদ্বেষের' অপরাধ হইবে, এ-কথা কেউ বলিবেন না।

অতএব আমরা যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সদাচারের দ্বারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবেই বুঝিব পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে। যদি তা না পারি, তবে আকাশ মেঘমুক্ত হয় নাই। নূতন করিয়া ঝড় উঠিতে পারে।

ইত্তেফাক, ১লা জানুয়ারি, '৭০

২৮

পূর্বাঞ্চল উন্নয়নে সদিচ্ছার প্রমাণ চাই

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং-কর্তাদের সদিচ্ছার পরিমাপের দুইটি গজকাঠির মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের আলোচনা আগের এক প্রবন্ধে করিয়াছি। অপরটির আলোচনা আজ করা যাক। এটি এক প্ল্যানের শর্টফল পরবর্তী প্ল্যানে ক্যারি-ওভার।

কাজটার আবশ্যকতা বিচার এইভাবে করা যায়। অর্থ-বিজ্ঞানের মতে অভীপ্সিত ভবিষ্যৎ ফললাভের উদ্দেশ্যে বর্তমানের অর্থনীতি পরিচালনার নামই পরিকল্পিত অর্থনীতি। এই পরিকল্পনায় সংকল্পিত কাজের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার, তা সমাধানে আবশ্যক সংগতি ও লভ্য সংগতির দ্বারা তার সাফল্যের সম্ভাবনা, সবই পুংখানুপুংখরূপে বিচার করা হইয়া থাকে। কাজটা বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞেরা করেন বলিয়া সিদ্ধান্তটা যথাসম্ভব নিখুঁত হইয়া থাকে। নিখুঁত করিবার জন্যই প্রয়োজনমত মোটা মাহিয়ানা দিয়া একাজে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। প্ল্যানিংটা গোড়ায় ছিল ব্যক্তিগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ব্যক্তিগত চিন্তা ও দূরদর্শিতার এই পরীক্ষিত পন্থা সরকার বা সরকার-নিয়োজিত কোনও সংস্থা জাতির সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগ করিলে তার নাম হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, ন্যাশনাল ইকনমিক প্ল্যানিং। এটা শুধু অর্থ-বিজ্ঞানের কথা নয়, কাণ্ডজ্ঞানেরও কথা। কারণ এই নীতিটা ব্যক্তির জীবন হইতেই জাতির জীবনে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেজন্য বিজ্ঞানী না হইয়াও আমরা বুঝিতে পারি, প্ল্যান করিয়া কাজ করা মানে যখন-যা-সামনে-পড়ে-আন্দাযী-তাই-করার বিপরীত নীতি। আগে হইতে চিন্তা করিয়া আগের-পরের দরকারের ও সামর্থ্যের বিচারে কাজ করার নামই পরিকল্পনা। একথার সোজা অর্থ এই যে, যে-কাজ করিবার প্ল্যান করি, তার দরকার বুঝিয়াই করি। তার মানে, যে কাজ করার দরকার নাই, তার পরিকল্পনা করি না। যে কাজের সংকল্প করি, একবারে না পারিলে আরেকবার তা সাধনের চেষ্টা করি। এখানে বাল্যশিক্ষার সেই উপদেশমত কাজ করি বা করা উচিত ঃ 'একবারে না পারিলে দেখ শতবার'। কারণ যা দরকার, একবার ব্যর্থ হইলেই তার আবশ্যকতা শেষ হয় না। এক চেষ্টায় ব্যর্থ হইলেই যে কাজের আবশ্যকতা শেষ হইয়া যায়, তেমন কাজকে কেউ পরিকল্পনাভুক্ত করে না।

অতএব, জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মংগলের জন্য যা অত্যাবশ্যক, সে কাজ সম্পাদনের জন্যই পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। এই কারণেই প্ল্যান কার্য-করী করিবার পন্থাও প্ল্যান রচনার অবিচ্ছেদ্য অংগ। প্রয়োগের উপকরণ ও বাস্তবায়নের অব্যর্থ পন্থা নির্দেশ ব্যতীত পরিকল্পনা হয় না। যা হয়, তার নাম পরিকল্পনা নয়, কল্পনামাত্র। আমাদের প্ল্যানাররা সকলেই অর্থ-বিজ্ঞানের বিশারদ। তাঁরা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই শুধু কল্পনার জাল বুনেন নাই। কল্পনার খেয়ালী পোলাও পাকাইবার জন্য অত-অত মোটা মাহিয়ানা দিয়া অর্থ-বিজ্ঞানী নিয়োগের দরকার নাই। কবি-শিল্পীরা অনেক কম খরচে অনেক বেশী সুন্দর কল্পনার ফানুস উড়াইতে পারেন। তার উপর প্রাচীন-পন্থীদের জন্য গাঁজায় অথবা আধুনিকদের জন্য মারিজুয়ানায় কিছু পয়সা খরচ করিলে আমরা দিনে-দুপুরে আলাউদ্দিনের চেরাগ আনিতে অথবা আল্নাসকারের প্রাসাদ বানাইতে পারি। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বেলা পাঁচ-সালা পরিকল্পনাগুলির অবস্থা দেখিলে মনে হয়, আমাদের কেন্দ্রীয় প্ল্যানাররা ওপারে বসিয়া এ-পারের জন্য ঠিক এই কাজটিই করিতেছেন। বাস্তবায়নের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটার-পর-আরেকটা 'পরি'কল্পনা করিয়া চলিয়াছেন।

প্ল্যানিং-এর আরেকটা মৌলিক বিশেষত্ব এই যে, একটা প্ল্যান পরবর্তী প্ল্যানের বুনিয়াদ রচনা বা ইন্ফ্রাস্ট্রাক্চার তৈয়ার করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পাদিত এক প্ল্যান পরবর্তী আরেক প্ল্যানের জন্য উপাদান ও মাল-মসলা উৎপাদন করে। এগুলিকে সাধারণতঃ ব্যাসিক ইন্ডাস্ট্রি বা বুনিয়াদী শিল্প অথবা ভারি শিল্প বলা হইয়া থাকে। এ ধরনের প্রকল্প পরবর্তী বহু প্রকল্পের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে। বড়-বড় যে-সব প্রকল্প এক প্ল্যান-মুদ্দতে অর্থাৎ পাঁচ বছরে শেষ করা সম্ভব নয়, সেগুলিকে বিভিন্ন ধাপে ভাগ করিয়া এক-এক প্ল্যান-মুদ্দতে এক-এক ধাপ সম্পাদন করা হয়। যেমন ধরুন, আমাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পটা। এক প্ল্যান-মুদ্দতে এটা শেষ করা সম্ভব নয়। কোনও কোনও ইঞ্জিনিয়ারের মতে এটা শেষ করিতে চারটি প্ল্যানে বিশ বছর লাগিবে। আর কারও মতে ছয়টি প্ল্যান-মুদ্দতে ত্রিশ বছর লাগিবে।

এ বিষয়ে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি দেখাইতে চাই, প্ল্যানিং-এর মধ্যে একটা কনটিনিউইটি, একটা সিলসিলা, থাকিবেই। জাতির গোটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিকতার দিক হইতে ত বটেই, পৃথক-পৃথক প্রকল্পের ফলের দিক হইতেও এই অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যাইবে। এই জন্যই এক প্ল্যান করিতে গিয়া পরবর্তী প্ল্যানেরও কথা ভাবা হয়। বস্তুতঃ আজকার প্ল্যানে আগা-মীকালের প্ল্যানের চেহারা কল্পনা করা দোষের ত নয়ই, বরঞ্চ দরকার। এই

কারণে আমাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় চতুর্থ ও ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনার চেহারা আন্দায করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল : আমাদের আজকার জাতীয় আয় চতুর্থ পাঁচসালায় দ্বিগুণ ও ষষ্ঠ পাঁচসালায় চারগুণ হইবে। ঠিক এই কারণেই আমাদের বর্তমান প্ল্যানাররাও তৃতীয় পাঁচসালা রচনা করিবার সময় ১৯৬৫ সাল হইতে ১৯৮৫ সালের কুড়ি বছরের পারস্পেকটিভ প্ল্যানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এটা দ্বিতীয় পাঁচসালা রচয়িতার ষষ্ঠ পাঁচসালার স্বপ্নেরই প্রতিবিম্ব। এর একটাও দোষের নয়। দূরে দেখা এবং দূরবর্তী সে লক্ষ্যবস্তু হাসিল করার নামই প্ল্যানিং। প্ল্যান্ড ইকনমির প্রথম প্রবর্তক রুশিয়ার ১৯২৬-২৭ সালে প্রবর্তিত প্রথম পাঁচসালা ছিল আসলে পনর সালের পারস্পেকটিভ প্ল্যানেরই প্রথম পদক্ষেপ। সেটা আদতে শুরু হয় লেনিনের সময়ে ১৯২১ সাল হইতে। এর নামই প্ল্যানিং-এর কন্‌টিনিউটি।

পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় চার-চারটা প্ল্যানেই এই কন্‌টিনিউইটির অভাব। আগেরগুলি বাদ দিয়া হিসাব করিলেও শুধু তৃতীয় প্ল্যানে পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দের দুই-তৃতীয়াংশ খরচ হয় নাই। এই অব্যয়িত টাকার পরিমাণ এগার'শ কোটি টাকা। এই বিপুল টাকা যখন খরচ হয় নাই, তখন ঐ টাকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলিও কাজেই সমাধা হয় নাই। চৌথা প্ল্যানে সেই অব্যয়িত টাকা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি ক্যারি-ওভার করা হয় নাই। এর অর্থ এই যে, প্রথমতঃ, পূর্ব পাকিস্তানের ভাগের ঐ বিপুল পরিমাণ টাকা মারা গেল। দ্বিতীয়তঃ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি পরিত্যক্ত হইল। এই দুইটাই পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য-বিরোধী। বরাদ্দ টাকা খরচ না করিলে এবং সংকল্পিত প্রকল্প সমাধা না করিলে সেটা প্ল্যান্‌ড ইকনমি হইল না। সেক্ষেত্রে আমরা অর্থনীতিকে পরিচালন করিলাম না। অর্থনীতিই আমাদেরে পরিচালন করিল। অথচ আমরা নূতন-নূতন পরিকল্পনা ও অর্থ বরাদ্দ করিয়াই চলিলাম। ব্যাপারটা কি রহস্যজনক মনে হয় না? প্ল্যান করেন কেন্দ্রীয় সরকার, টাকা বরাদ্দ করেন তাঁরাই, টাকা বিতরণ করেন তাঁরাই, সে টাকা খরচ করেনও তাঁরাই। আবার পূর্ব বাংলার ভাগের টাকা খরচ হইল না বলিয়া টাকা ফেরত নেন তাঁরাই। এটাকে কি পূর্ব বাংলার ভাগে টাকা বরাদ্দ করা বলা চলে? বড়জোর এটাকে 'টাকা দেখানো' বলা চলে। যেমন 'বাংগালকে হাইকোর্ট' দেখান হয়। যেয়াফত-টেয়াফতে কোন মেহমানের পাত খালি দেখিলে আমরা বাংগালরা খাদেমদারকে বলি : 'ফলনাকে পোলাও দাও।' উর্দু-ওয়ালারা বলেন : 'ফলানাকো পোলাও দেখাও।' এতে দেওয়াও চলে, শুধু দেখানোও চলে। বুদ্ধিমান ও মনিব-হিতৈষী খাদিমদার হইলে শুধু দেখাইয়াই কাজ সারিবে। উর্দুওয়ালা কেন্দ্রীয়

প্ল্যানারা তেমনি পূর্ব-বাংগালীদেরে টাকা 'দেওয়ার' বদলে টাকা 'দেখাইতেছেন'। 'দেখাইতেছেন' না বলিয়া 'শুনাইতেছেন' বলাই ভাল।

আর ঐ শর্টফলের প্রকল্পগুলির অবস্থা কি হইল ? বাদ দেওয়া হইল ঠিকই। কিন্তু বাদ দেওয়া হইল কেন ? কারণ পাঁচ বছর পরে হয় সেগুলির আর দরকার নাই অথবা দরকার থাকিলেও সেগুলি সম্পাদন করা এখন আর সম্ভব না। এই পাঁচ বছরে জিনিসপত্রের দাম ও বিশেষজ্ঞের বেতন, শ্রমিকের মুজুরি দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পাঁচ-ছয় বছরের আগের ইস্টিমেটে এখন আর কাজ করা যাইবে না। এমন অবস্থায় কাজে একদম হাত না দেওয়াই ভাল। নূতন করিয়া ইস্টিমেট করিতে হইবে। প্রকল্পের সাইয ঠিক রাখিতে হইলে বেশী টাকা বরাদ্দ করিতে হইবে। আর টাকার অংক ঠিক রাখিতে হইলে প্রকল্পের সাইয ছোট করিতে হইবে। অতএব তৃতীয় পরিকল্পনার শর্টফল চতুর্থ পরিকল্পনায় দেওয়া গেল না। ইন্‌শাল্লাহ, আয়েন্দামে দেখা জায়েগা —ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের বেলা এমন অনেক ঘটিয়াছে। বহু অত্যাবশ্যক প্রকল্প এমনি ব্যয়-বৃদ্ধির অজুহাতে বিলম্বিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কয়েকটি আরব্ধ কাজ বন্ধ আছে। আর কয়েকটি আদৌ শুরুই হয় নাই। প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রকল্পগুলির মধ্যে গংগা-কপোতাক্ষ বাঁধ, তিস্তা বাঁধ ও কর্ণফুলী মাল্‌টিপার্পাস স্কীমের নাম করা যাইতে পারে। এগুলি সবই ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের অনুমোদিত স্কীম। কিন্তু প্রয়োগে বিলম্ব হওয়ার দরুন ইতিমধ্যে সম্ভাব্য ব্যয় ইস্টিমেট ছাড়াইয়া গিয়াছে অনেক গুণ। গংগা-কপোতাক্ষ বাঁধের গোড়ার ইস্টিমেট ছিল দুই কোটি। প্রয়োগে বিলম্ব হওয়ায় কাজে হাত দেওয়ার সময় তার ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল এগার কোটি। কাজেই ওটা শেষ করা গেল না। তিস্তা বাঁধের গোড়ার ইস্টিমেট ছিল দশ কোটি। বিলম্বে কাজ শুরু করার সময় দরকার দেখা গেল চল্লিশ কোটির। ফলে ওটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়িয়া থাকিল। কর্ণফুলী মাল্‌টিপার্পাস প্রজেক্টের গোড়ার ইস্টিমেট ছিল এগার কোটি, পরে বাড়াইয়া করা হইল সাড়ে পঁচিশ কোটি। কাজে হাত দিয়া দেখা গেল, দরকার ঊনপঞ্চাশ কোটির। এইভাবে এসব প্রকল্প নয়া ইস্টিমেটের অনিশ্চয়তায় ঝুলিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকল্পের মধ্যে রূপপুর এটমিক প্রকল্প, জামালগঞ্জের কয়লা প্রজেক্ট, চাটগাঁর স্টিলমিল ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ঘোড়াশালের সার কারখানা এবং সর্বোপরি ক্রুগ মিশনের সুপারিশকৃত বন্যা নিয়ন্ত্রণের লম্বা মেয়াদী ও খাটো-মেয়াদী স্কীম, বিশেষতঃ ঐ স্কীমের অংগ হিসাবে ব্রহ্মপুত্র বাঁধ ও যমুনার পুল

ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকল্পের কোনটা অনুমোদিত আর কোনটা অননুমোদিত অবস্থায় পরিকল্পনা রচনা, সংশোধন, পরিবর্তন, কেন্দ্রীয় অনুমোদন, টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার গ্রহণ ও বর্জন বিদেশী বিশেষজ্ঞের পরিদর্শন ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে উঠা-নামা ও অগ্র-পাশ্চাৎ করিতেছে। এদের মধ্যে ক্রুগ-সুপারিশ ও রূপপুরের কথাটাই নযিরস্বরূপ বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক।

১৯৫৭ সালে ক্রুগ মিশন যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পের সুপারিশ করেন, তখন লম্বামেয়াদী প্রকল্পের ইস্টিমেট ছিল কম-বেশী ৪০০ কোটি। আট বছর পরে ১৯৬৫ সালে বলা হইল ঐ প্রকল্প সম্পাদন করিতে লাগিবে মূল ইস্টিমেটের নয় গুণ টাকা। মানে মোট তিন হাজার ছয় শ' কোটি টাকা। কাজেই কি করা যায়? হুকুম হইল, একসংগে অতবড় প্রকল্প সম্পাদন করা যাইবে না। ওটাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিয়া ছোট-ছোট প্রকল্প করা হউক। ছোট-ছোট প্রকল্প জোড়া দিয়া একটা বড় প্রকল্প করা যত সহজ, একটা বড়কে ভাংগিয়া ছোট-ছোট করা তত সহজ নয়। দেশী ইঞ্জিনিয়াররা তা পারিবেন না। বিদেশী বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার আনিতে হইবে। কাজেই বিদেশী সাহায্যের আশা ও ভরসায় রাজসিক বেতনে বিদেশী উপদেষ্টা আনা হইল। তাঁদের 'মূল্যবান' উপদেশের ফলে যে সব টুকরা প্রকল্প রচিত হইল, সেগুলিও করা গেল না বরাদ্দের অভাবে। এক কাজে বরাদ্দ করা টাকা ত আরেক কাজে লাগান যায় না।

রূপপুরের দশাও তাই হইল। প্রকল্প অনুমোদন, টেন্ডার গ্রহণ, জমি দখল, মাটি-কাটার কোদালকাম হইয়া যাওয়ার পরও প্রকল্প শুরু করা হইল না এই যুক্তিতে যে, ওটার উৎপাদন-ক্ষমতা ১৭০০ কিলোওয়াট হইতে বাড়াইয়া ডবল করিয়া ৩৪০০ কিলোওয়াট করা হইবে। বড় করিয়াই যখন করা ঠিক হইল, তখন ছোটটা শুরু করার আর দরকার কি? পরে বড়টাও শুরু করা গেল না। কারণ অত বড় প্রকল্প সম্পাদন করিবার কোনও কন্ট্রাকদার দুনিয়ায় পাওয়া গেল না। ইনশাআল্লাহ, আয়েন্দাতে দেখা যাইবে। এমনি করিয়া দেরিই যখন হইয়া গেল, তখন রূপপুরে নাহক সরকারী অফিস রাখিয়া কর্মচারীদেরে বসাইয়া মাইনা দিয়া সরকারী অর্থের অপব্যয় করা ঠিক হইবে না। অতএব, অফিসটাই উঠাইয়া দেওয়া ভাল এবং কার্যতঃ তাহাই করা হইল।

একদিন দুইদিন নয়, একবছর দুইবছর নয়, দশ-বারটি বছর ধরিয়া এইরূপ প্ল্যানিং-এর তামাশা চলিতেছে। পাকিস্তানী জাতির মেজরিটির ভাগ্য লইয়া কেন্দ্রীয় প্ল্যানাররা এমনি ছিনিমিনি খেলিতেছেন। প্ল্যানের অবস্থা এমন

হইলে অন্য যেকোনও প্ল্যানার লজ্জায় ঘোমটায় মুখ লুকাইতেন। কারণ, যে কোনও নিরপেক্ষ দর্শকের মনে হইবে, পূর্ব পাকিস্তানে কিছু না করিবার জন্যই প্ল্যান করা হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের শুধু রাজনৈতিক নেতারা নন, অর্থ-বিজ্ঞানীরাও বরাবর বলিয়া আসিতেছেন, আঞ্চলিক প্ল্যানিংটা পূর্ব পাকিস্তানী-দের হাতে ছাড়িয়া দিন। নিজেদের প্ল্যানিং পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া অথবা পূর্বাঞ্চলের প্ল্যানিংটা এদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় প্ল্যানাররা পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়নে তাঁদের সদিচ্ছার প্রমাণ দিন।

ইত্তেফাক, ১৬ই জুলাই, '৫০

২৯

শিল্প-বাণিজ্যিক উন্নয়নে পুঁজির ভূমিকা

ঢাকা চেম্বার-অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয় সেদিন এক প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমদানি বাণিজ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং অন্যান্য বিশেষ সুবিধা দাবি করিয়াছেন। কিছুদিন আগে খুলনা চেম্বার এবং তারও আগে চাটগাঁও চেম্বার মোটামুটি একই রকম দাবি করিয়াছেন। এটা পূর্ব পাকিস্তানের সু-প্রাচীন দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ দাবি মানিয়া লন নাই। এ ব্যাপারে বাণিজ্য-দফতর নয়, বরঞ্চ অর্থ-দফতরই বড় বাধা। এই দফতরের প্রধান, কি মন্ত্রী হিসাবে কি সেক্রেটারিরূপে, আজও একদিনের তরেও কোন পূর্ব পাকিস্তানী হইতে পারেন নাই। পশ্চিমা ভাইয়া তিনজন পূর্ব পাকিস্তানীকে প্রধানমন্ত্রিত্ব ও একজনকে গবর্নর-জেনারেলগিরিও দিয়াছেন। কিন্তু অর্থ-দফ-তরের হেঁসেলে একজন পূর্ব পাকিস্তানীকেও ঢুকিতে দেন নাই। এ ব্যাপারে পশ্চিমা ভাইয়া শরৎ বাবুর 'শ্রীকান্তের' টগর বৈষ্টবীর মতই ধর্মনিষ্ঠা দেখাই-য়াছেন। টগর বৈষ্টবী বিশ বছর নন্দ বৈরাগীর ঘর করিয়াছিল বটে, কিন্তু টগর তার বৈরাগীকে কোনও দিন হেঁসেলে ঢুকিতে দেয় নাই। পশ্চিমা ভাইরা তেমনি বাংগালী গবর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর ঘর করিলেও তাঁদেরে অর্থ-দফতরের হেঁসেলে ঢুকিতে দেন নাই। দিলে বাংগালী নেতারা কি করিতেন, তা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নন্দ বৈরাগী টগরের হেঁসেলে ঢুকিবার পারমিশন পাইলেও হয়ত হেঁসেলের পবিত্র মেঝে পায় না মাড়াইয়া বুড়া আংগুলে ভর করিয়াই যাতায়াত করিত। তেমনি কোনো বাংগালী অর্থ-মন্ত্রী হইলেও হয় ত তিনিও নন্দ বৈরাগীর মতই পশ্চিমা শিল্পী-সওদাগরদের ভুক্তিত অধিকারের হেঁসেলের পবিত্রতা বাঁচাইয়া বুড়া আংগুলে ভর করিয়াই চলিতেন। তবু পশ্চিমা ভাইরা টগর বৈষ্টবীর সাবধানতার নীতিই মানিয়া চলিতেছেন। আমরা ধরিয়া নিতেছি, এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানী চেম্বারসমূহের দাবি আজও মনযুর হয় নাই। এই কারণেই হইবেও না অদূর ভবিষ্যতে।

তার হেতু এই যে, এই কারণ ছাড়াও এই অবস্থার অন্য কারণও আছে। পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি গঠিত হয় নাই। পুঁজি গঠিত হয় নাই সঞ্চয়ের অভাবে। সঞ্চয় হয় নাই দারিদ্র্যের দরুন। আমাদের চেম্বারসমূহ উপরোক্ত কথাগুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইয়াছেন বলিয়াই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এসব 'বিশেষ সুবিধা' দাবি করিয়াছেন। 'বিশেষ সুবিধা'টা অনুগ্রহের

দানের ব্যাপার। দাতার দয়ার উপর নির্ভরশীল। যেখানে হক পাওনা লইয়াই কৃপণতা, সেখানে 'বিশেষ সুবিধা'টা আশা করা উচিত না। অথচ পূর্ব বাংলার শিল্প-বাণিজ্যিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকরূপে পুঁজির অভাবের, যে হেতু দেখান হয়, ওটা ভুল। পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থীরা ঐ ভুয়া হেতু দাঁড় করাইয়াছেন নিজেদের মতলবে। পূরবীরা ঐ ভুয়া যুক্তি মানিয়া লইয়া পশ্চিমা ভাইদের পাতা ফাঁদে পা দিয়াছেন। আসলে পূর্ব বাংলায় সঞ্চয়ের অভাব এবং সঞ্চয়ের অভাবহেতু পুঁজির অভাব এবং সেই কারণে পূর্ব বাংলার অনগ্রসরতা, এর একটা কথাও সত্য নয়। খাঁটি সত্য কথা এইঃ এক, পূর্ব বাংলায় সঞ্চয়ের পরিমাণ পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে বেশী। দুই, পূর্ব বাংলার শিল্প-বাণিজ্যিক অনুন্নতির কারণ পুঁজির অভাব নয়।

প্রথমে সঞ্চয়ের কথাটাই ধরা যাউক। পূর্ব বাংলার সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা আট। পশ্চিমাঞ্চলের সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা পাঁচ। এটা শুধু এক পাঁচসালা পরিকল্পনার মুদ্দতের কথা নয়। তিন-তিনটা পাঁচসালা মুদ্দতের অবস্থাই মোটামুটি এই। এটা তাজ্জবের ব্যাপার? যতদিন পূর্ব বাংলার কয়েকজন অর্থ-বিজ্ঞানী চোখে আংগুল দিয়া এটা দেখাইয়া না দিয়াছেন, ততদিন সত্যই এটা তাজ্জবের ব্যাপারই ছিল। পূর্ব বাংলা স্পষ্টতঃ ও দৃশ্যতঃই গরিব অঞ্চল। এমন গরিব অঞ্চলের আবার সঞ্চয় হয় কেমন করিয়া? তাও আবার ধনী অঞ্চল পশ্চিমের চেয়ে বেশী! অর্থ-বিজ্ঞানীরা দেখাইলেন সত্যই তাই। শুধু ধনীরাই সঞ্চয় করে, আর গরিবরা করে না, এটা সত্য নয়। বরঞ্চ দেখা গিয়াছে, ধনীরাই অপব্যয় করিয়া দেউলিয়া হয়। বড়-বড় জমিদাররাই কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে যান। ব্যক্তি-জীবনে যা সত্য, শ্রেণী-সম্প্রদায়ের জীবনেও তাই সত্য। জাতির জীবনেও। তাই গরিব পূর্ব পাকিস্তান যতটা সঞ্চয় করিয়াছে, ধনী পশ্চিম পাকিস্তান ততটা সঞ্চয় করিতে পারে নাই। পারে নাই মানে করে নাই। ব্যক্তি-জীবনে যেমন, সমষ্টি-জীবনেও তেমনি, ধনীর সঞ্চয়ের দরকার নাই। আগামীকালের কথা তাদের ভাবিতে হয় না। অফুরন্ত আয়ের পথ তাদের সুগম ও নিশ্চিত। পক্ষান্তরে গরিব সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয় দুই কারণে। এক, আগামীকালের চিন্তা তাকে করিতে হয়। দুই, তার খরচের পথ সংকীর্ণ। দরকারী খরচের চেয়ে বেদরকারী খরচের রাস্তা অনেক বেশী কুশাদা। ভাতের চেয়ে মদের দাম অনেক বেশী। গরিব পূর্ব বাংলার ভাতই জুটে না, মদ খাইবে কি? পক্ষান্তরে ধনী পশ্চিমাঞ্চলের টাকার অভাব নাই। রাজধানী, বিদেশী মিশন ও ব্যাংকিং-ইনশিওরেন্সাদি সমস্ত প্রতিষ্ঠান পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

তাদের সমস্ত প্রশাসন, খরিদ ও নির্মাণাদি খরচা সেখানেই হইতেছে। বিদেশী খয়রাতী ও কর্যের প্রায় সব টাকাও সেখানেই ব্যয় হইতেছে। পশ্চিমের মালের বাজার পূর্ব বাংলার অর্থ, সম্পদ ও বিদেশী মুদ্রা পশ্চিমেই ব্যয় হইতেছে। এতে কি আভ্যন্তরীণ মুদ্রা, কি বিদেশী মুদ্রা, উভয় দিকেই পশ্চিমাঞ্চলে টাকার ছড়াছড়ি। সম্পদের এমন ছড়াছড়ির মধ্যে সঞ্চয়ের কথা ভাবিতে যায় কোন্ লম্বা আহাম্মক ? আর এদিকে পূর্ব বাংলার অবস্থা কি ? অভাবের সংসার বলিয়াই আগামীকালের চিন্তা তার বেশী। পেট ভরিয়া খাইবার তৌফিক নাই তার। পেট ভরিয়াই যখন খাওয়া হইল না, তখন আধ-পেটই কি, আর সিকি-পেটই কি? এমন সিকি-পেটা যে পূর্ব বাংলা, সে আবার বিদেশী মুদ্রা দিয়া কি করিবে ? পাছায় যার গামছা নাই, তার আবার মাথায় যরির টুপি ! তাই সোহ্‌রাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভা মার্কিন সাহায্যের পাঁচ কোটির মধ্যে চার কোটি টাকা পূর্ব বাংলায় দিতে চাহিলে ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়িয়াছিল। তাই বিদেশী মুদ্রার যরির টুপিটা ধনী পশ্চিমা ভাইয়ের মাথায় দেওয়া সংগতই হইয়াছে। গরিব পূর্ব-পাকিস্তানও যরির টুপির হেফাযতের খরচা হইতে রেহাই পাইয়াছে। তাতেও তার সঞ্চয় কিছু বাড়িয়াছে।

কাজেই বোঝা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের সঞ্চয় বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশী। সঞ্চয় খাটাইলেই হয় পুঁজি। না খাটাইলে হয় 'আইড্‌ল্ মানি. ইন্‌ফ্লেশন। পূর্ব বাংলায় তাই ঘটিয়াছে। তবেই দেখা গেল, সঞ্চয়ের অভাবেই পূর্ব বাংলায় নিয়োগযোগ্য পুঁজি গঠিত হয় নাই এবং সেই কারণেই এ অঞ্চল শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে নাই, এটা উদ্দেশ্যমূলক ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা। আসল সত্য কথা এই যে কর্তাদের ইচ্ছার অভাবেই এটা হয় নাই। জাতির ভাগ্য-বিধাতাদের ইচ্ছা থাকিলে সঞ্চয় ছাড়া পুঁজি হয়, পুঁজি ছাড়াও উন্নয়ন হয়। পশ্চিমাঞ্চল তার প্রমাণ। আর ইচ্ছা না থাকিলে সঞ্চয়ও পুঁজি হয় না, পুঁজি থাকিলেও উন্নয়ন হয় না। পূর্বাঞ্চল তার প্রমাণ। এতে বোঝা গেল, শিল্প-বাণিজ্যিক উন্নয়নে পুঁজির ভূমিকা অতি নগণ্য। এ সত্য আজ অর্থ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত। এই কথাটাই এখানে আলোচনা করিতেছি।

মার্কস-এংগেলস হইতে হ্যারড-ডোমার পর্যন্ত সকল অর্থ-বিজ্ঞানীই উন্নয়নে পুঁজির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বশেষে অধ্যাপক রস্টোভ্ এই গুরুত্বকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিতে হইলে জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা হইতে বাড়াইয়া শতকরা দশ টাকা লগ্নী করিতে হইবে। তা করিলে 'টেক-অফ্' বা পুঁজি উঠানও ত্বরান্বিত হইবে। এই মতবাদই এতদিন সকলের মত বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে অর্থ-বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার মোড় পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়াছে। অধ্যাপক রস্টোভের পুঁজি 'টেক-অফের থিওরির' উপর গবেষণা করিয়া অর্থ-বিজ্ঞানীরা ইদানিং এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, উন্নয়নে পুঁজির ভূমিকা অতি নগণ্য। তাঁদের গবেষণার ফল এই যে, শিল্প-বাণিজ্যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ও উন্নততম দেশের বেলাও লগ্নির পরিমাণ শতকরা দশ টাকার অনেক কম। ইংলন্ডের অর্থ-বিজ্ঞান-গবেষক মিস্ ফিলিস ডীন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গোটা আঠার শতকে (ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লবের যুগ) কোনও দিনই জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ টাকার বেশী শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত হয় নাই। মোট জাতীয় উন্নয়নের যে কথা, শিল্প-বিশেষের বেলাও সেই কথাই সত্য। কোনও শিল্পেই মোট কারবারের শতকরা পাঁচ টাকার বেশী পুঁজি নিয়োজিত হয় নাই। মিস্ ডীন আরও দেখাইয়াছেন যে, আঠার শতকের শেষ দশকে 'টেকঅফ' এত বেশী হইয়াছিল যে, শেষ পর্যন্ত কোনও শিল্প-কারবারেই পুঁজির পরিমাণ শতকরা এক টাকার বেশী ছিল না। জার্মানি-ফ্রান্সেও উন্নয়নের ইতিহাস মোটামুটি অবিকল একই।

ব্যাংকিং-এর গতি-প্রকৃতি হইতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া পড়ে। ব্যাংকের কার্যকলাপ যরিফ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মোট ডিপযিটের শতকরা দশ টাকার বেশী নগদ তহবিলে রাখার দরকার কোনও দিনই হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে-ব্যাংকের ডিপযিট দশ লাখ, তার মাত্র এক লাখ টাকা নগদ ক্যাশে থাকিলেই চলিবে। ওর বেশী টাকা 'ড্র' হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই ঐ ব্যাংক বাকী ন' লাখ টাকাই মুনাফায় লগ্নি করিতে পারে। তা' না করিয়া ডিপযিটররা যে কোনও সময় চাহিতে পারে মনে করিয়া যে-ব্যাংকার সব টাকা হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবেন, তিনি ব্যাংক চালাইতে পারিবেন না। সুতরাং দেখা গেল, শতকরা দশ টাকা হাতে লইয়া যে কোনও শিল্প-বাণিজ্যে হাত দেওয়া চলে। অনেক সময় এই দশ টাকাও আপনার পকেট হইতে দিতে হয় না। আসল পুঁজি আপনার প্রতি অপরের আস্থা, আর সে আস্থার সদ্ব্যবহার করিবার মত আপনার যোগ্যতা। একজন শিল্পপতি ও একজন সওদাগরের নযির লওয়া যাক।

পূর্ব পাকিস্তানের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি যেদিন শিল্পে হাত দেন, সেদিন তাঁর হাতে মোট প্রয়োজনের শতকরা এক টাকা মাত্র ছিল। সে টাকাটাও ছিল এক ব্যাংকের ওডি। এইভাবে ওডি, এলসি, ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সুবিধা পাইয়া যে-কোনও সৎ ও দক্ষ লোক এক পয়সা পকেট হইতে না দিয়াও কোটি-পতি হইতে পারেন। এতে ব্যাংকেরও কোনও রিস্ক নাই। বরঞ্চ লাভ আছে।

তারপর ধরুন সওদাগরি। ধরুন কপর্দকহীন এক লোক শুধু ব্যাংকের দয়ায় ও সরকারী অনুগ্রহে আমদানি লাইসেন্স, ওডি, এলসিতে সাইকেলের ব্যবসা ধরিলেন। এক বছরে লক্ষপতি হইলেন। এখানে ব্যাংকের লগ্নি আরও নিরাপদ। কারণ আমদানী মাল ব্যাংক ছাড়াইবে। ব্যাংকের গুদাম উঠিবে। আমদানীকারক নগদ টাকা দিয়া যত বিক্রি তত সাইকেল ছাড়াইবেন।

দুইটি নযিরেই দেখা গেল, ব্যাংকই সব পুঁজির আধার। ব্যাংকের সহায়তা থাকিলে আপনি সব করিতে পারেন। আপনার নিজের শুধু সততা ও দক্ষতা থাকিলেই হইল।

তারপর শতকরা দশ টাকা হইলেই ব্যাংক চলে, সে কথাও ত বলিলাম। পাঠক, এবার বুঝিলেন পূর্ব বাংলা কেন শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত হয় নাই?

ইত্তেফাক, ৩০শে আগস্ট, '৭০

৩০

আমরা কি বিজ্ঞান-বিমুখ হইয়া পড়িতেছি ?

আমরা পাকিস্তানীরা কি বিজ্ঞান হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছি ? আমাদের জাতীয় অগ্রগতির কৃষ্টিক রূপায়ণের ও আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান কি আমরা অস্বীকার করিতে যাইতেছি ? দুশ্চিন্তার আকারে এই প্রশ্নটা জাগিয়াছে আমার মনে পর-পর সংঘটিত দুইটা সাম্প্রতিক ঘটনায়। এমন ব্যাপার আকস্মিক হইতে পারে না। একটা ঘটিয়াছে পশ্চিমাঞ্চলে, অপরটা ঘটিয়াছে পূর্বাঞ্চলে। তবেই এটা সারা পাকিস্তানের ব্যাপার। সেই কারণেই দুশ্চিন্তার বিষয়।

রাজধানীর দেশ পশ্চিমাঞ্চল। তার কথাটাই আগে কহিয়া লই। গত ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর রাজধানীতে ন্যাশনাল সায়েন্স কাউন্সিলের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন হইয়াছে। এটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ আই. এইচ. উসমানী বৈঠকের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। সারা পাকিস্তানের গৌরব দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রেসিডেন্টের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ আবদুস সালাম ঐ বৈঠকে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। উভয় অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা ঐ সম্মেলনীতে সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত বিজ্ঞানীরা দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যস, খবর ঐ পর্যন্ত ! দুই অঞ্চলের জাতীয় দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় দু' চার লাইনের ঐ খবরটুকু ছাড়া দেশবাসী আর কিছুই জানিতে পারিল না।

তারপর আসুন বাড়ির কাছে পূর্বাঞ্চলে। এখানকার ঘটনাটা ঘটিয়াছে তারও কয়দিন আগে। গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী একটা বিজ্ঞান সম্মিলনী হইয়াছে ঢাকায়। সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন এই সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ভার্সিটির বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা এবং দেশের বিজ্ঞানীরা এই সম্মিলনীতে যোগদান করিবার এবং প্রবন্ধাদি পড়িবার কথা। যতদূর জানা যায়, তা করিয়াছিলেনও। তাছাড়া ডাঃ কুদরতে-খুদা ও ডাঃ কাযী মোতাহার হোসেনের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা প্রধান অতিথি হিসাবে ঐ সম্মিলনীতে ভাষণও দিয়াছিলেন। আশা করা গিয়াছিল, চারদিনব্যাপী ঐ গুরুত্বপূর্ণ সম্মিলনীর ধারাবাহিক কার্যবিবরণী দিনের-পর-দিন আমাদের দৈনিক কাগজসমূহে ছাপা

হইবে। দেশের সরকার, কলেজ-স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ সে-সব পড়িয়া উপকৃত হইবেন। সকলেই যাঁর-তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবেন। কিন্তু হায় খোদা! ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত এতবড় যরুরী একটা সম্মিলনীর রিপোর্ট আমাদের জাতীয় সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় কোনও মর্যাদা ত পাইলই না, খবরটা ছাপাই হইল না।

এই দুইটি ব্যাপারে একই অবস্থা ঘটিল কেমন করিয়া? এটা কি বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের জাতীয় অনীহা ও অবজ্ঞা? না বিরোধিতা? হইতে পারে, সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় প্রচারাদি করেন নাই। তাই সংবাদিকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। উদ্যোক্তারা বিজ্ঞানী সাধক মানুষ। তাই প্রচার-প্রচারণার গুরুত্ব বা কায়দা-কানুন সম্বন্ধে তাঁরা সম্যক সচেতন বা অবহিত না হইতে পারেন। কিন্তু শুধু সেই কারণেই আমাদের সাংবাদিকরা এতবড় ব্যাপারের খবরটা রাখেন না, এটা হইতে পারে না। এও হইতে পারে যে, উদ্যোক্তারা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সাংবাদিকদেরে সম্মিলনীতে দাওয়াত করেন নাই। কিন্তু এটাও সাংবাদিকদেরে তাঁদের কর্তব্যে নিরস্ত করিতে পারে না। সব দেশের সাংবাদিকদের মতই আমাদের সাংবাদিকরাও রিপোর্ট-যোগ্য ঘটনার রিপোর্ট করিতে নিজেদের সম্মান-মর্যাদা ত পরের কথা, শারীরিক নিরাপত্তা ও মানসিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রচারের যোগ্য ঘটনার প্রচার তাঁরা করিবেনই। নিজেদের সাংবাদিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরেই তা করিবেন। ঘটনার কর্তারা না চাহিলেও করিবেন।

এমন কর্তব্যপরায়ণ সাংবাদিকরা যদি ঐ দুইটা ব্যাপার রিপোর্ট না করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তার অন্য কারণ আছে। সে কারণ সংবাদপত্র-পাঠকদের ডিমান্ড। অন্ততঃ তাঁদের ডিমান্ড সম্পর্কে সাংবাদিকদের ধারণা। বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চয়ই সাংবাদিকরা এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। তাই খুব স্বভাবতঃই ডিমান্ড-এন্ড-সাপ্লাইর সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে তাঁরা তাঁদের সাংবাদিক কর্তব্য করিয়াছেন। খরিদ্দারদের ডিমান্ড সাপ্লাই করা ছাড়া বা তার বাইরে বা তার ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের কোনও পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধিতা তাঁদের সাংবাদিক কর্তব্য নয়। এই কারণেই আমাদের রেডিও-টেলিভিশনও ব্যাপারটাকে সমভাবেই উপেক্ষা করিয়াছেন।

এটাই তাঁরা প্রমাণ করিয়াছেন ১৩ই সেপ্টেম্বর। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। ঐদিন রাজধানীতে জাতিসংঘের 'ফাও' সম্মিলনী উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া কারিগরি বিজ্ঞানকে আমাদের কৃষি-উন্নয়নের অপরিহার্য অংগ বলিয়াছেন। এই কথাটাই আমাদের সাংবাদিকরা তাঁদের কাগজের

শীর্ষস্থানে মোটা হরফে ছাপিয়াছেন। কিন্তু এটা কথাটার গুরুত্বের খাতিরে নয়, বক্তার গুরুত্বের খাতিরে। বিজ্ঞানীর মুখের বিজ্ঞানের কথার চেয়ে রাষ্ট্র-নায়কের মুখের সে কথার গুরুত্ব যদি আমাদের সাংবাদিকরা বেশী দিয়া থাকেন, তবে সে দোষ সাংবাদিকদের নয়, পাঠকদের। পাঠকরা যা চাহিবেন, সাংবাদিকরা তাই দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এতে যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও বিজ্ঞানীর চেয়ে রাষ্ট্র-নেতার বেশী মর্যাদা দেওয়া হইয়াই যায়, তবে তার জন্যও দায়ী সাংবাদিকরা নন। দায়ী পাঠকরাই। সাংবাদিকদের বিবেচনায় আমরা পাঠকরা বিজ্ঞানকে ও বিজ্ঞানীদেরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেই না। আমাদের সম্বন্ধে সাংবাদিকদের এই মূল্যায়ন যদি ঠিক হয়, তবে এটাও নিশ্চয়ই ঠিক যে, আমরা জাতি হিসাবেই বিজ্ঞান-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি। আগে বিজ্ঞান-মুখী-ছিলাম, বর্তমানে বিজ্ঞান-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি, এ কথা বলিতেছি না। তেইশ বছরের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞান-চেতন করে নাই, সে কথাই বলিতেছি।

আমাদের দেশে এমনটা হওয়া অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বিজ্ঞান ধর্ম-বিরোধী, এমন ধারণা আমাদের আলেম সম্প্রদায়ের এক বিপুল অংশের মধ্যে এবং তাঁদের প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে আগে হইতেই ছিল। বিজ্ঞান পড়িলে ধর্ম-ইমান দুর্বল হইয়া যায়, এমন ধারণা ত প্রায় সার্বজনীন। ধারণাটা নিতান্ত অমূলকও নয়। তাই শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের বিজ্ঞানোন্নত দেশসমূহেও, একদিকে চার্চ ও রিলিজিওন এবং অপর দিকে সায়েন্স ও ফিলসফির মধ্যে একটা রেষারেষি বরাবরই ছিল। আজও আছে। আছে বলিয়াই বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী-দর্শনী অগণিত সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বই-পুস্তক লিখিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ নাই। বরঞ্চ একটা আরেকটার সম্পূরক। ধর্ম-বিশ্বাসীরা তাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কারণ অনেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-সমর্থক সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ধর্ম-বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপের উপর বিজ্ঞানের বিজয়-পতাকা পৎ-পৎ করিয়া উড়িতেছে।

এই ধর্ম-বিরোধিতার উপর আবার বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মানবতা-বিরোধিতার অভিযোগও আনা হইয়াছে। বিজ্ঞানের শয়তানি ও দজ্জালির নিত্য-নূতন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এইমাত্র সেদিন হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলার পঁচিশা বার্ষিকী দুনিয়ার সর্বত্র প্রতিপালিত হইল। এটম বোমার মত মানবতার মারাত্মক দুশমন যে দুনিয়ায় আর নাই, একথা যেমন বলা হইল, তেমনি স্মরণ করা হইল এটম বোমা বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি। স্বয়ং বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত শিহরিত ও চিন্তিত হইলেন দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া।

কিন্তু বিজ্ঞান সাধনা কেউ ছাড়িয়া দিলেন না। কারণ তাঁরা জানেন, এটা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর দোষ নয়। বিজ্ঞানের শক্তির যাঁরা অপব্যবহার করেন, দোষ তাঁদের। জ্ঞানের অপব্যবহার মানব-চরিত্রের দুর্বলতার দিক। এটা মানব জাতির মতই প্রাচীন। স্মরণাতীতকাল হইতেই মানুষ বিষের ব্যবহার শিখিয়াছে। সেই হইতেই তারা বিষ দিয়া মানুষের জীবন হানিও করিয়াছে, জীবন দানও করিয়াছে। তাই মানুষ একদিকে যেমন বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া এবং তার অপব্যবহার করিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে তারা বিজ্ঞানের অপব্যবহারের প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করিয়াছে বিজ্ঞানের দ্বারাই। মানুষের শারীরিক ও মানসিক, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্যই বিজ্ঞানের দরকার। বিজ্ঞান ও কারিগরি দ্বারা মানুষ কতভাবে উপকৃত হইতেছে, এদের ছাড়া মানুষ এক-দিনও চলিতে পারে না, তার হাজার-হাজার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন নিজের চোখে ও নিজের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে দেখিতেছি। উপকারিতাও দেখিতেছি, অনিষ্টকারিতাও দেখিতেছি।

বিজ্ঞানের এই 'ধর্ম-বিরোধিতা' ও 'মানবতা-বিরোধিতা' সত্ত্বেও মানুষ বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াই চলিয়াছে। দুই কারণে। এক, বিজ্ঞান, মানে জ্ঞান-সাধনা, মানুষের স্বভাব। দুই, জ্ঞান কখনও মানুষের অকল্যাণ করিতে পারে না। প্রথমতঃ জ্ঞানের দরজা বন্ধ করা সম্ভব না। যতদিন অজ্ঞ থাকা যায়, ততদিনই অজ্ঞান থাকা সম্ভব। জ্ঞান একবার লাভ হইয়া গেলে আর অজ্ঞান থাকা যায় না। তখন আর বলা চলে নাঃ 'এইটুকু জ্ঞান লাভ করিব। আর ঐটুকু করিব না। এইখানে আমার জ্ঞানের সীমা-খুঁটি গাড়িলাম।' এটা করা যায় না এইজন্য যে, জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রসারিত করে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে যারা মানুষের অকল্যাণে নিয়োগ করে, তারা অজ্ঞান, মূর্খ। তারা জানে না, বিজ্ঞান মানুষের জন্য, মানুষ বিজ্ঞানের জন্য নয়। অতএব, বিজ্ঞানের আগুন শুধু মানুষের ভাতই রাঁধিবে, তার বাড়ী পোড়াইবে না। এমন বিজ্ঞান মানবতা-বিরোধী হইতে পারে না। এই কারণেই বিজ্ঞান ধর্ম-বিরোধীও হইতে পারে না। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই-এরই লক্ষ্য মানব-কল্যাণ। বিজ্ঞান যেমন মানুষের জন্য, ধর্মও তেমনি মানুষের জন্য। মানুষ ধর্মের জন্য নয়। কাজেই ধর্ম বিজ্ঞানের বিচার করিবে মানুষের কল্যাণের মাপকাঠি দিয়া। বিজ্ঞানও তেমনি ধর্মের বিচার করিবে মানুষের কল্যাণের মাপকাঠি দিয়াই। এইজন্য ধর্ম যেমন খাঁটি বিজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না, বিজ্ঞানও তেমনি খাঁটি ধর্মের বিরোধী হইতে পারে না। ধর্ম যেমন ছদ্ম-বিজ্ঞানীর বিরোধিতা করে মানুষের মংগলের

জন্যই, বিজ্ঞানও তেমনি ছদ্ম-ধার্মিকের বিরোধিতা করে মানুষের মংগলের জন্যই। মানুষের কল্যাণকে যে বিজ্ঞান ভয় পায়, সে বিজ্ঞান বিজ্ঞানই নয়। তেমনি, মানুষের জ্ঞানকে যে ধর্ম ভয় পায়, সে ধর্ম ধর্মই নয়। মানুষের বুনিয়াদী ধর্ম-প্রাণতাই যেমন ধর্মের রক্ষা-কবচ, তেমনি মানুষের জ্ঞানই বিজ্ঞানের রক্ষাকবচ।

অতএব, শুধু ঐ কারণে আমাদের বিজ্ঞান-বিমুখ হওয়া চলিবে না। যদি হই, তবে অনিষ্ট করিব শুধু নিজেদেরই। আমাদের অপেক্ষায় বিজ্ঞান বসিয়া থাকিবে না। দুনিয়া দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান সাধনায় আগাইয়া যাইতেছে, যাইতেই থাকিবে। তার গতি থামিবে না। বিজ্ঞান-বলে আজ মানুষ চাঁদে গিয়াছে। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও যাইবে। শুধু বেড়াইতে যাইবে না, তাদের বাশেন্দাও হইবে মানুষ। একদিন যেমন এশিয়া-ইউরোপের কাছে আমেরিকা অজানা ছিল, তারও আগে যেমন এশিয়া ছিল ইউরোপের কাছে অজানা, আজ তেমনি আল্লার আঠার হাজার আলমের ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ এই পৃথিবীর কাছে ঐ আঠার হাজারের সবগুলিই অজানা। আজ বিজ্ঞান যেমন করিয়া দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরিচয় ও যাতায়াত ঘটাইয়াছে, তেমনি করিয়া আঠার হাজার আলমের মধ্যে জানা-পরিচয় ও যাতায়াতও ঘটাইবে। সেদিন বাসস্থান ও খোরাকের অভাবের ভয়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে না। যুগে-যুগে বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাইয়া লোক-সংখ্যাও কমাইতে হইবে না। বিজ্ঞানের বলে সেদিন আল্লার আঠার হাজার আলমই হইবে আশরাফুল-মখলুকাত আল্লার খলিফা মানুষের উপনিবেশ। ঐ সব উপনিবেশ চাষাবাদ ও শাসন-সংরক্ষণের জন্য মানুষের জন্মের হার আরও বাড়াইতে হইবে। খোরাকির তাদের অভাব হইবে না। সেদিন এটম-শক্তি দিয়া বোমা তৈয়ারের বদলে তার আইসোটোপ দিয়া খাদ্যোৎপাদন বাড়ান হইবে। সাগর মন্থন করিয়া নয়া-নয়া খাদ্য উৎপাদন করা হইবে। সিনথেটিক এমাইনোফোমিড প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট তৈয়ার হইবে। তাতে বর্তমানের শতগুণ মুখে আহার দেওয়া যাইবে। আল্লা যত মুখ দিবেন, তত খোরাক দিবেন, ধর্মের এই বাণী সত্য প্রমাণ করিবে বিজ্ঞান।

গরু-ঘোড়ার গাড়ির জায়গায় আজ মোটর-প্লেনই আসিয়াছে যেমন করিয়া, পালের নৌকা-জাহাজের স্থলে আজ নিউক্লিয়ার জাহাজ আসিয়াছে যে পথে, ঠিক তেমনি করিয়া সেই পথে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে নিরাপদ যাতায়াতের যানবাহন তৈয়ার করিবে বিজ্ঞান। গ্যাস-কয়লার বদলে বিজলি সরবরাহ করিবে এটম-শক্তি। আজকার মত শুধু ইউরেনিয়াম হইতে এটম-শক্তি উৎপাদনের জায়গায় অরিয়াম ও ডিউটরিয়াম হইতেও এটম-শক্তি উৎপাদিত

হইবে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তা অপব্যয়িত হইবে না। সদ্ব্যয়িত হইবে কল্যাণ-সূচক গঠনমূলক কাজে। গ্যাস-বিজলির জোরে আমরা আজ যেমন পর্বত কাটিয়া রাস্তা করিয়াছি, মরুভূমিতে বাগ-বাগিচা-শোভিত আনন্দ-মুখর জন-বহুল নগর রচনা করিয়াছি, এটম-শক্তির জোরে একদিন আমরা তেমনি আঠার হাজার আলমও আবাদ করিব। ডাম-নির্মাণ করিয়া বিজ্ঞান যেমন বড়-বড় নদ-নদীর গতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করিয়াছে মানুষের কল্যাণে, প্রয়োজনমত গ্রহ-উপগ্রহের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং নূতন-নূতন উপগ্রহ নিক্ষেপ করিবে তেমনি মানুষের কল্যাণেই।

আসমান-যমিন ও পর্বত-সমুন্দ্রের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে আল্লার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল। এ সবের অন্তরে ঢুকিয়া আল্লার কুদরতী রহস্য আবিষ্কার করার নির্দেশ আছে আমাদের ধর্মে। এই কাজটিই করিতেছে বিজ্ঞান। এক-দিন বিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়া আমরা মুসলমানরা, আর সব জিনিস ত পরের কথা, নিজেদের টুপি-পায়জামা-জায়নামাযের জন্যও, সে-সব সিলাইর সুই-সূতার জন্যও, চাহিয়া থাকিতাম বিদেশী ও ভিন জাতির দিকে। আজও কি আবার তাই করিব? বিজ্ঞানের আয়োজিত চান-সুরুযের মেলায় সমবেত আশ-রাফুল মখলুকাতের আনন্দ-উৎসবে কি আমরা পাকিস্তানীরা শরিক হইব না?

ইত্তেফাক, ৩০শে সেপ্টেম্বর, '৫০

৩১

পার্লামেণ্টে এক চেম্বার, না দুই চেম্বার ?

জন-সংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে ঃ এক চেম্বার, না দুই চেম্বার ? যদি নেতারা নির্বাচনের আগে প্রশ্নটার মীমাংসা করিতে না পারেন, অথবা যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর প্রতিশ্রুত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে এর মীমাংসা করিয়া না দেন, তবে নির্বাচিত গণ-পরিষদই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন। এতে গণ-পরিষদের দায়িত্ব যেমন বাড়িয়াছে, তার ক্ষমতা ও অধিকারও তেমনি বাড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ নির্বাচিত ও বড় আকারের গণ-পরিষদ দ্বারা দেশের শাসানতন্ত্র রচনার সৌভাগ্য খুব কম জাতিরই হইয়াছে। পাকিস্তানীদের সামনে আজ এই সুযোগ আসিয়াছে। জন্মের তেইশ বছরের মাথায় এই সুযোগ আসায় স্বভাবতঃই অনেক মীমাংসিত ব্যাপারও অমীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। সবগুলির নির্ভুল ও স্থায়ী মীমাংসা করিতে হইবে প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই। এক অথবা দুই চেম্বারের প্রশ্নটাও এমনি একটা প্রশ্ন।

প্রশ্নটা উঠিয়াছে স্বাভাবিকভাবেই। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখনই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে, দুই চেম্বারের পার্লামেন্ট হইতে হইবে। সভ্য জগতের বড়-বড় প্রায় সব দেশেই দুই চেম্বারে পার্লামেন্ট প্রচলিত আছে। ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রে ত আছেই, ইউনিটারি পদ্ধতির রাষ্ট্রেও আছে। তাই অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, পাকিস্তান যখন ফেডারেল রাষ্ট্র, তখন এরও পার্লামেন্ট দুই কক্ষবিশিষ্ট হইতে বাধ্য। এই দিক দিয়া কথাটা দৃশ্যতঃ ন্যায়সংগত। তাই এটা প্রধানতঃ, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কথা হইলেও পূর্ব পাকিস্তানের কোনও কোনও নেতাও এর সমর্থন করিতেছেন। এক চেম্বারের পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে। সেই মেজরিটির জোরে তারা দেশের শাসন-ব্যাপারে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবে, এই ভয় হইতেই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা দুই পরিষদের কথা তুলিয়াছেন, এটা কারো-কারো জন্য সত্য হইলেও সকলের জন্য সত্য নয়। দুনিয়ার সব ফেডারেল রাষ্ট্রেই দুই চেম্বারের পার্লামেন্ট আছে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই তাঁরাও দুই চেম্বারের কথা বলিতেছেন, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। আর যদি এটাও সত্য হয় যে, পশ্চিম

পাকিস্তানী নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের মেজরিটি চেক্ করিবার উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের কথা ভাবিতেছেন, তবু তাঁদেরে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, ফেডারেল রাষ্ট্রে বড় অংগ-রাজ্যের যুলুম হইতে ছোট-অংগ রাজ্যগুলিকে বাঁচাইবার রক্ষা-কবচ হিসাবেই দুই চেম্বারের বিধান করা হইয়াছে।

দুনিয়ার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পার্লামেন্টে একটি উচ্চ-পরিষদ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য দুইটি: এক, গণতন্ত্রের মোটরের ব্রেক, ঘোড়ার লাগাম। দুই, ফেডারেল রাষ্ট্রে ছোট-ছোট অংগ-রাজ্যের রক্ষা-কবচ। পাকিস্তানে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের মেজরিটির মোকাবেলায় পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট-ছোট অংগ রাজ্যগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দুই চেম্বারের কল্পনা করা হইয়াছিল। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার ইতিহাস আলোচনা করিলেই তা বোঝা যাইবে। এ ব্যাপারে লিয়াকত আলী, নাযিমুদ্দিন ও মোহাম্মদ আলী এই তিন প্রধানমন্ত্রী শাসনতন্ত্রের তিনটি মূলনীতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। লিয়াকত আলীর মূলনীতিতে ছিল নিম্নপরিষদে জনসংখ্যার প্রতিনিধি, উচ্চ-পরিষদে পাঁচ প্রদেশের সমান-সমান প্রতিনিধি। নাযিমুদ্দিনের ফরমূলায় ছিল দুই চেম্বারই প্যারিটি-ভিত্তিক। নিম্নপরিষদে দুই উইং-এর দুই শ' করিয়া চার শ' মেম্বর। উচ্চ-পরিষদে ষাটজন করিয়া এক শ' বিশ জন মেম্বর। এই ব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষা-কবচ ডবল করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ আলী ফরমূলায় পার্লামেন্টের মেম্বর-সংখ্যা তিন শ' করা হইয়াছিল। তাঁরা জন-সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন। উচ্চ পরিষদে পাঁচ প্রদেশের প্রত্যেকের দশজন করিয়া পঞ্চাশজন মেম্বর থাকিবেন। এতে দুই পরিষদকে সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। অধিকন্তু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, দুই পরিষদের যুক্ত বৈঠকে পূর্ব বাংলা ও 'পশ্চিম যোন'-এর মধ্যে প্যারিটি হইবে। অনাস্থা প্রস্তাবে ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই অঞ্চলের প্রত্যেকটির অন্ততঃ শতকরা ত্রিশজনের ভোট পাইতে হইবে।

অবশেষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে নয়া গণপরিষদ 'ঘাড়ের পিছন ঘুরাইয়া' প্যারিটি প্রবর্তনের বদলে সোজাসুজি প্যারিটি-ভিত্তিক এক পরিষদ করিলেন। নাযিমুদ্দিনের চার শ'র পার্লামেন্টের স্থলে তিনি তাঁর মিতার তিন শ' মেম্বরের পার্লামেন্ট করিলেন। দশ বছরের জন্য মেয়েদের দশটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করিলেন। তাতেও দুই অঞ্চলের প্যারিটি রাখা হইল।

এই বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নেতারা বরাবরই দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বে সংখ্যা-সাম্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। একটু

সাধাসিধা কথায় বলিলে বলিতে হয়, পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্যকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ভয়ের চোখে দেখিতেন। কাজেই এদের মেজরিটির উপর একটা চেক রাখা দরকার বোধ করিতেন। কিন্তু নাযিমুদ্দিন ফরমুলাতে তার চেয়ে একটু বেশী চেকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ ফরমুলায় নিম্ন পরিষদের দুই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বে সংখ্যা-সাম্যের বিধান থাকা সত্ত্বেও একটা উচ্চ পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং সেটাতেও সংখ্যা-সাম্যের বিধান করা হইয়াছিল। তা হইলে এটা ধরা যায় যে, পূর্ব বাংলার মেজরিটি চেক করা ছাড়াও তাতে আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। দুনিয়ার প্রায় সব বড়-বড় রাষ্ট্রেই দুই চেম্বারের ব্যবস্থা আছে, এ কথা আগেই বলিয়াছি। ফেডারেল রাষ্ট্রসমূহে এটা করা হয় বড় অংগ-রাষ্ট্রের মেজরিটির চাপে ক্ষুদ্র অংগ-রাজ্য বা রাজ্যসমূহের কোনও অনিষ্ট না হয়, সেটা দেখিবার জন্য। আর ইউনিটারি রাষ্ট্রে এটা করা হয় বেপরোয়া আইন প্রণয়নের মুখে একটা লাগাম লাগাইবার জন্য। উপরে তারও উল্লেখ করিয়াছি।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, উচ্চ পরিষদ গণতন্ত্রের মোটরের চাকার ব্রেক, ঘোড়ার লাগাম। এটার দরকার আছে। গণতন্ত্র সাধারণতঃ দ্রুত সংস্কারকামী। কারণ 'স্টেটাস কো', প্রচলিত সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থা, অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের স্বার্থ-বিরোধী। তাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিপ্লবাত্মক আইন করিয়া অতি দ্রুত সংস্কার সাধন করিতে চান। এতে ত্রস্ত-ব্যস্ততার দরুন অনেক সময় ভুল ও অনিষ্টকারী আইন করা হইয়া যায়। উচ্চ-পরিষদ এই বেপরোয়া আইন-কানুন ধীরে-সুস্থে বিচার-বিবেচনা করিয়া ওগুলির ভালমন্দ দেখিতে ও দেখাইতে পারেন। এক কথায়, নিভাজ গণতন্ত্রের দ্রুতগতি একটু মন্থর করিয়া দেওয়াই উচ্চ পরিষদের কাজ। নাযিমুদ্দিন সাহেবের ফরমুলা এই কাজটিও করিতে চাহিয়াছিল। তিনি দুই অঞ্চলের প্যারিটি করিয়া পূর্ব বাংলার মেজরিটি চেক করিয়াছিলেন। এবং উচ্চ পরিষদ দিয়া গোটা পাকিস্তানের গণতন্ত্রের মুখে লাগাম লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এটাও দোষের ছিল না। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ পরিষদ গঠন করার রেওয়াজ সারা দুনিয়াতেই আছে। তবে এটা বোঝা গেল যে, এক নাযিমুদ্দিন ফরমুলা ছাড়া আর কোনও ফরমুলায় দুই অঞ্চলের সংখ্যা-সাম্য ব্যতীত উচ্চ পরিষদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি তাঁরা চাহিতেন, তবে প্রাদেশিক পরিষদেও দুই চেম্বারের ব্যবস্থা করিতেন। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে এবং বন্ধুরাষ্ট্র আমেরিকায় অনেক অংগরাজ্যেই দুই চেম্বারের পরিষদ আছে।

এখন, এই দুই শ্রেণীর উচ্চ পরিষদের মধ্যে প্রথমটিরই আলোচনা করা যাক আগে। বোঝা গেল, অবাধ গণতন্ত্রে পূর্ণ আস্থার অভাবেই গোড়াতে

উচ্চ-পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল। উচ্চ-পরিষদ ছাড়া পার্লামেন্টকে তখন সত্যই ব্রেকহীন মোটর বা লাগামহীন ঘোড়া মনে করা হইত। গণতন্ত্রের বিকাশের প্রাথমিক স্তরে না হয় ধরিয়া লওয়া যাক, এটার দরকার ছিল। নবলব্ধ স্বাধীন ক্ষমতার অতি উৎসাহে ভুল করা অসম্ভব ছিল না। মাথার উপরে উচ্চ-পরিষদের মত একটা প্রবীণ মুরুব্বির না হয় তখন দরকার ছিল। কিন্তু আজও কি দরকার আছে? সব সভ্য দেশেই এর প্রচলন আছে দেখিয়া মনে হইবে, বোধ হয় দরকার আছে। কাজেই ব্যাপারটা একটু তলাইয়া দেখা দরকার।

দুই দিক হইতে এর বিচার করা যাইতে পারে। এক, কিভাবে উচ্চ-পরিষদ গঠিত হইবে? দুই, তার ক্ষমতা কতটুকু থাকিবে? গঠন-পদ্ধতির কথাই আগে ধরা যাউক। এর আকার যে ছোট হইবে, এটা ধরিয়া লওয়া যায়। প্রশ্ন এই, এটা নির্বাচিত হইবে কি না। হইলে প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ হইবে? নির্বাচিত না হইয়া মনোনীতও হইতে পারে। যথা, ইংলন্ডের লর্ড সভা। ওতে নির্বাচন নাই। ওটা বংশানুক্রমিক। রাজা যদি কাউকে লর্ড পদবি দেন, তবে তিনিও লর্ড সভার মেম্বর হইবেন। নির্বাচিত উচ্চ-পরিষদ যদি পরোক্ষ নির্বাচনে হয়, তবে নিম্ন-পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের ভোটে অথবা উভয়ের যুক্ত ভোটে হইতে পারে। যদি প্রত্যক্ষ ভোটে হয়, তবে ভোটারদের ও প্রার্থীদের এলাকা সংকীর্ণ করিয়া তা করা যাইতে পারে। যেমন ধরুন, শুধু আয়করদাতারাই ভোটার হইবেন। আর বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষকরাই প্রার্থী হইতে পারিবেন।

তারপর ধরুন, ক্ষমতার কথা। উচ্চ-পরিষদের ক্ষমতা নিম্ন পরিষদের সমান থাকিতে পারে, কমও থাকিতে পারে। এমন ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে যে, উচ্চ-পরিষদ নিজেরা কোন ট্যাক্স বসাইতে বা আইন করিতে পারিবে না। শুধু নিম্ন-পরিষদের রচিত-আইন বা বসানো-ট্যাক্স ঠেকাইয়া পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্ন-পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

ইংলন্ডের লর্ড-সভার অনুকরণে মনোনীত উচ্চ-পরিষদ আর কোনও দেশে হইবে না, এটা ধরিয়া নিলাম। বাকী থাকিল পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উচ্চ-পরিষদ। যদি আইন পরিষদের মেম্বরদের দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনে উচ্চ-পরিষদ হয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের দলের লোকই নির্বাচিত হইবেন। তাতে উচ্চ-পরিষদ নিম্ন পরিষদের ছায়া হইবে মাত্র। স্পষ্টতঃই এমন উচ্চ-পরিষদের দরকার নাই। আর যদি সংকীর্ণ নির্বাচক মন্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়, তবে সেটা হইবে আমের চেয়ে আটি বড় করা; গোটা

দেশবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজে বাধা দিবার ক্ষমতা দেশের এক অংশের বা এক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়া। ক্ষমতায় যদি তাঁরা নিম্ন-পরিষদের সমান হন, তবে কথায় কথায় ডেড-লক হইবে। দেশের শাসনকার্য সাবলীল গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হইবে না। আবশ্যকতার দিক দিয়াও এমন উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। প্রথমতঃ, একই ব্যক্তি সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বরঞ্চ এক ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ লোক অন্য ব্যাপারে একেবারে উম্মি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ও সহযোগিতা সরকার সব সময়ই নিতে পারেন। তার জন্য বিশেষজ্ঞদের আইন পরিষদের মেম্বর হওয়ার দরকার নাই।

তারপর অর্ডিন্যান্স ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে ত্রস্ত-ব্যস্ততার সাথে আইন পাস করা আজকাল সম্ভব নয়। খোদ আইন পরিষদের ভিতরেই 'জন-মত যাঁচাই'র জন্য 'সার্কুলেশন মোশন' আছে, সিলেক্ট কমিটি আছে। বাইরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ পত্রের আলোচনা-সমালোচনা আছে। সভা-সমিতির বক্তৃতা-মঞ্চ আছে। এ-সব আটঘাট পার হইয়া একটা বিল আইনে পরিণত হইতে এক সেশন পার হইয়া আরেক সেশনে চলিয়া যায়। এতে প্রায়শঃ বছরকাল কাটিয়া যায়। ফলে, ত্রস্ত-ব্যস্ত আইন পাস হওয়ার আশংকা আজকাল একরূপে নাই বলিলেই চলে। এর পরেও যদি কখনোও এমন কোনও আইন হইয়াই যায়, তবে তাতে বাধা দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টে রীটের ব্যবস্থা আছে। ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের আইনটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ব্যাপারে উচ্চ-পরিষদ কাজে লাগে নাই। কিন্তু সুপ্রীম-কোর্ট কাজে লাগিয়াছে। ফলে উচ্চ-পরিষদ অনাবশ্যক প্রমাণিত হইয়াছে।

তারপর থাকিল ফেডারেল রাষ্ট্রে ছোট অংগ-রাজ্যের রক্ষা-কবচের কথা। এখানেও উচ্চ-পরিষদ অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সব গণতান্ত্রিক দেশেই আজ দলীয় রাজনীতি কায়েম হইয়াছে। মেম্বররা দলীয় শৃংখলা মানিয়া চলেন। পার্টিওয়ারি ভোট দেন, প্রদেশওয়ারি ভোট দেন না। পাকিস্তানেও তাই হইতে বাধ্য। এখানেও নিখিল-পাকিস্তান ভিত্তিক অনেক পার্টি আছে। তাদের মেম্বাররাও পার্টি-অনুগত্য অনুসারেই ভোট দিবেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিতে ভোট দিবেন না। কাজেই এখন এক অঞ্চলের মেজরিটির দ্বারা অপর অঞ্চলের উপর যুলুম হওয়ার আশংকা আর নাই এবং তা ঠেকাইবার জন্য উচ্চ পরিষদেরও আবশ্যকতা নাই।

তবু যে দুনিয়ার সব দেশের পার্লামেন্টে উচ্চ-পরিষদ দেখা যায়, সেটাকে ফ্যাশন বা অভ্যাস বলা যাইতে পারে। বিলাতের হাউস-অব-কমন্সকে 'মাদার

অব-পার্লামেন্ট' বলা হয়। গোড়াতে ইংলন্ডের হাউস-অব-লর্ডসের অনুকরণেই বিভিন্ন দেশে উচ্চ-পরিষদের প্রবর্তন হইয়াছিল। সেটাই অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইংলন্ডে কোন লিখিত কনস্টিটিউশন না থাকায় কমন্স সভা আইন করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা দিনের-পর-দিন কাড়িয়া লইতেছে। লিখিত শাসনতন্ত্রের দেশে একাজ সহজ হইবে না। এই সব কারণে পাকিস্তানে উচ্চ পরিষদের দরকার নাই। এর পরেও যদি উচ্চ পরিষদ করা হয়, তবে সেটা হইবে বিনা-কাজে সাদা হাতী পোষা।

ইত্তেফাক, ১২ই ফেব্রুয়ারী, '৭০

৩২

শাসনতান্ত্রিক বিধান বনাম পার্টি-প্রোগ্রাম

শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরা সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পরিষদ পাইতেছি, এটা আমাদের বিশেষ সুবিধা। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিতেই হইবে, এটা আমাদের বিশেষ অসুবিধা। একটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ, অপরটা সে অধিকারের সংকোচন। দুইটাই মার্শাল ল' অথরিটির দান। মার্শাল ল' আসিয়াছে আমাদের মূঢ়তার ফলে। সেই মার্শাল ল' অথরিটি নিজেদের আয়ু না বাড়াইয়া এমন গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরে উদ্যোগী হইয়াছেন, এটা আমাদের জোর বরাত। কাজেই অধিকারের সাথে ঐ অনধিকারটুকু মানিয়া নিতেই হইবে। ওটা গোলাপের সাথে কাঁটা। হাত না ছিঁড়িয়া আমাদিগকে ফুল তুলিতে হইবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিতেই হইবে।

শাসনতান্ত্রিক বাদ-বিতণ্ডায় আমরা জাতীয় জীবনের মূল্যবান তেইশটা বছর অতিবাহিত করিয়াছি। এই তেইশ বছরে দুই-দুইবার মার্শাল ল' হইয়াছে, দুই-দুইটা শাসনতন্ত্র বাতিল হইয়াছে। বুরোক্র্যাটিক বিপ্লবে আরেকটা শাসনতন্ত্র অংকুরে নষ্ট হইয়াছে। যদি এইসব ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা, অপমান ও অনিশ্চয়তা এবং সময়-সময় পশ্চাদ্গামিতা হইতে আমরা কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, যদি এ সবের পরিণামে জাতির অমর্যাদা ও জনগণের সীমাহীন দুর্দশা হইতে আমাদের চোখ ফুটিয়া থাকে, তবে এই তেইশটা বছর একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। এই মুদ্দতে গোটা দেশবাসী না হইলেও দেশের নেতারা তিন-তিনটা শাসনতন্ত্র দেখিয়াছেন। এই অভিজ্ঞতা হইতে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে নেতাদের মোটামুটি একটা ধারণা হইয়া যাওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, সে ধারণা নেতাদের হইয়াছে। এই বিশ্বাস হইতেই আমি আশা করি, এবার সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। এটা আশা করিবার কারণ এই যে, শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদী মূল-নীতি সম্বন্ধে নেতারা একমত হইয়াছেন। এমন যে-কয়টি বিষয়ে সারা দেশে এবং সকল দলের নেতাদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যমত আছে, তা এই ঃ

(১) পাকিস্তান হইবে ফেডারেল রিপাবলিক,

(২) গবর্নমেন্ট হইবে পার্লামেন্টারি কেবিনেট সিস্টেমের,

(৩) পার্লামেন্ট হইবে সার্বভৌম ও সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচিত,

(৪) ফেডারেটিং অংগরাজ্যসমূহ হইবে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসিত।

এই চারটি বিষয় ছাড়া আরও পাঁচটি বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইয়াই গিয়াছিল। তার মধ্যে মাত্র একটির নিষ্পত্তি ঠিক আছে। বাকী সবগুলি আবার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। সে পাঁচটি বিষয় এই : (১) বাংলা-উর্দু রাষ্ট্রভাষা ; (২) প্রতিনিধিত্বে দুই অঞ্চলের প্যারিটি ; (৩) যুক্ত নির্বাচন-প্রথা ; (৪) এক চেম্বারের আইন পরিষদ ; (৫) করাচী ফেডারেল ক্যাপিটাল।

এই পাঁচটি মীমাংসিত ব্যাপারের মধ্যে রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্নটা আজও নিষ্পত্তি করাই আছে। প্যারিটির স্থলে জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জনসংখ্যা-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের বিধান হওয়ায় উচ্চ-পরিষদের কথা উঠিয়াছে। দুই অঞ্চলের মধ্যেকার প্যারিটি উঠিয়া যাওয়ায় 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' নেতারা এখন স্বতন্ত্র বির্বাচন-প্রথা দাবি করিতে পারেন। কায়েদে-আযমের প্রতিষ্ঠিত এবং শুধু সেই কারণে পূর্ব পাকিস্তানীদের দ্বারা গৃহীত করাচী হইতে রাজধানী পিন্ডিতে সরাইয়া আরেকটা মীমাংসিত ব্যাপার আবার উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

এ সবই মীমাংসিত ব্যাপার ছিল। আলোচনার মাধ্যমে আবার সর্বসম্মত মীমাংসায় পৌঁছা যায়। 'সকল ক্ষেত্রে' প্যারিটির শর্তে পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা প্রতিনিধিত্বের প্যারিটিতে রাযী হইয়াছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ওয়াদা খেলাফ করায় পূর্ব পাকিস্তান হইতে জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী উঠিয়াছে। 'সকল ক্ষেত্রের প্যারিটি' অপরপক্ষ হইতে মানিয়া নিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি মানিতে পারে। এই দিক হইতে ব্যাপারটা মিটিয়া গেলে দুই চেম্বার ও পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবিও স্বতঃই পরিত্যক্ত হইবে। অমনি-অমনি ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে।

বাকি থাকিল শুধু রাজধানীর কথা। রাজধানী সরাইবার কাজটা জেনারেল আইউব একা করিয়াছেন। তাঁর ছিল এটা ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির ব্যাপার। এমনি আরেকটা ব্যাপারে তিনি কায়েদে-আযম, সকল দলের রাষ্ট্র-নেতা এবং জনগণের সার্বজনীন অভিমতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন। সেটা পার্লামেন্টারি হইতে প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতিতে পরিবর্তন। এই দুইটা পরিবর্তনই একটি ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার মনুমেন্ট। প্রেসিডেনশিয়াল হইতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা আইউবের কুকীর্তির একটা মনুমেন্ট

ভাংগিয়াছি। রাজধানী করাচীতে সরাইয়া আনিয়া যদি অপর মনুমেন্টটি ভাংগিতে পারি, তা হইলে আমরা রাজধানীর অবস্থান লইয়া অবশ্যম্ভাবী বিতর্কের মীমাংসা করিতে পারিব। পিন্ডি-ইসলামাবাদ রাজধানী রাখিয়া পূর্ব পাকিস্তানবাসী কোনও মতেই আপোস করিতে পারে না। পশ্চিমা ভাইরা পিন্ডির উপর জোর দিলে পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা ঢাকার উপর জোর দিবেন। ঢাকায় পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তরিত কারার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। একথা পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা জানিয়া রাখুন। তাছাড়া অর্থনৈতিক ডিসপ্যারিটি দূর করার পন্হা হিসেবে রাজধানী পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার অবশ্যকতা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমার ব্যক্তিগত মত ও আশা এই যে, শাসনতন্ত্র বিলম্বিত হওয়ার নতুন কোনও কারণ ঘটিতে না দিয়া অর্থনৈতিক ডিসপ্যারিটি দূরীকরণের অন্য ব্যবস্থা করিয়া রাজধানী করাচীতে ফিরাইয়া আনিয়া এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা উচিত। এতে শাসনতন্ত্র রচনা সহজতর ত হইবেই, জনগণের স্তরে জাতীয় সংহতি স্থাপনের কাজও সহজ হইবে।

এইভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলির মীমাংসা হইয়া গেলে শাসনতান্ত্রিক বিধানের তর্কিত বিষয় থাকিবে মাত্র একটি। পার্লামেন্ট ও আইন পরিষদ-সমূহের আকার ও আয়ু বিশেষ কোনও তর্কিত বিষয় নয়। সে কথা একটু পরে বলিতেছি। সবচেয়ে জটিল বলিয়া মনে হইবে যে বিষয়টি, সেটি হইল স্বায়ত্ত-শাসনের পরিমাণ; অন্য কথায়, ফেডারেল বিষয়ের সংখ্যা। এটাও দৃশ্যতঃ যতখানি জটিল মনে হইবে, আসলে তত জটিল নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও ইতিমধ্যে অনেকখানি বাস্তববাদী হইয়াছেন। ফেডারেশনের বিষয় নির্ধারণে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য মূলনীতি, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, লাহোর প্রস্তাব-নির্ধারিত রিজিওন ও তাদের অটনমি ও সভারেনটি, এ সকল ব্যাপারই আমাদের বাস্তব-বুদ্ধি স্ফুরণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ফেডারেল ফাইনান্সসহ তিন-বিষয়ের ফেডারেশন করিতে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য সব নেতা ও পার্টিই রাযী আছেন। পি. ডি. এম. তার প্রমাণ। এর পরে তর্কের বিষয় থাকে আওয়ামী লীগের ট্যাক্সেশনের ধারাটা। বাস্তব বুদ্ধি লইয়া আলোচনায় বসিলে এই তর্কেরও একটা সুষ্ঠু ও সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা হইয়া যাইবে।

এসব প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেলে পার্লামেন্ট ও আইন পরিষদের আকার ও আয়ু অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। পার্লামেন্টের আয়ু চার অথবা পাঁচ বছর করিতে কোনও দলের আপত্তি হইবার কথা নয়। পার্লামেন্টের আয়ু যতদিন হইবে, স্টেট পরিষদের আয়ু ততদিন হইবে, এতেও দ্বিমত হইবার

কারণ নাই। পশ্চিম পাকিস্তান স্টেটের অন্তর্গত প্রাদেশিক পরিষদগুলিও ঐ একই মেয়াদের হইতে পারে। পার্লামেন্ট ও আইন পরিষদেসমূহের আকার লইয়াও কোন ঘোরতর মতভেদ হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, পার্লামেন্টের মেম্বর-সংখ্যা চার শ', দুই রিজিওনের স্টেট পরিষদের প্রত্যেকের তিন শ' এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের আইন পরিষদের মেম্বর-সংখ্যা জনসংখ্যা বুঝিয়া এক শ' হইতে দুই শ' হইতে পারে। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের স্টেট-পরিষদ ফেডারেশনের নীতি অনুসারে প্রদেশসমূহের জনসংখ্যা-নির্বিশেষে সমান সংখ্যক মেম্বরের দ্বারা গঠিত হইবে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের বিধানের বিষয়বস্তুর মধ্যে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি আমাদের দেশের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তা ছাড়া আরেকটি বিষয় আছে, যা সব দেশেই প্রযোজ্য; আমাদের দেশেও থাকিতে হইবে। সেটি হইতেছে, শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগকে শুধু শাসন বিভাগ হইতে আলাদা করিলেই চলিবে না, আদালতের স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারা সুনিশ্চিত করিতে হইবে। '৫৬ সাল ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট সমূহের বিচারপতির সংখ্যা, চাকুরির মেয়াদ, বেতন ইত্যাদি যে সব বিধান করা হইয়াছে, শাসনতন্ত্রে ও সবের দরকার নাই। ঐ সব বিধান করিয়া পার্লামেন্টে আইন রচনা করাই যথেষ্ট। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইলেকশন কমিশন, ট্রাইবিউন্যাল ও অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়াদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাদের সম্বন্ধে অত বিস্তারিত বিধান করিয়া না-হক শাসনতন্ত্রের আকার বড় ও ধারা-সংখ্যা বেশী করা হইয়াছে।

আরেকটি বিষয় শাসনতন্ত্রের বিধানভুক্ত করার ঝোঁক ও প্রথা দেখা যায়। সেটি ফান্ডামেন্টাল রাইট্স। এসব রাইট্স শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি বা দান নয়। এগুলি সাধারণ মানবাধিকার। সভ্য জগতের মানুষ মাত্রেই, সুতরাং আদালত মাত্রেই, এসব জানেন। শাসনতন্ত্রে এ-সবের তালিকা করিয়া শুধু ধারা-সংখ্যা বাড়াইবার কোনও দরকার নাই, বিশেষতঃ এই সব তালিকার সাথে লেখা হয়, 'আইন না করিয়া এসব অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না।' সরকার এক মুহূর্তে অর্ডিন্যান্সরূপী 'আইন' করিতে পারেন। শাসনতন্ত্রে এমন তালিকা থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় 'ফান্ডামেন্টাল রাইট' লংঘন যে বিনা-বিচারে বন্দী করা, তাও অবাধে করা হইতেছে। এ অবস্থায় এই তালিকার কোনও দরকার নাই। বরঞ্চ ফান্ডামেন্টাল রাইট্স ও সরকারের ক্ষমতা নামক একটি আইন করিয়া কোন্ কোন্ কারণে সরকার নাগরিকদের কোন্ কোন্ মৌলিক অধিকার কতখানি ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন, সেটার বিধান করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু

ধরুন, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনা করিবার সময় যদি উল্লিখিত অনাবশ্যক বিষয়গুলিও শাসনতন্ত্রের বিধানভুক্ত করিতে চান এবং তা করিতে গিয়া '৫৬ সালের ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সবগুলি ভাল-ভাল মুখরোচক কথা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাতেও বিশেষ কোন গুরুতর মতভেদ দেখা দিবার এবং সে কারণে শাসনতন্ত্র রচনা বিলম্বিত হইবার আশংকা নাই।

আসল মতভেদ দেখা দিবে বিভিন্ন দল যদি যার-তার পার্টি-প্রোগ্রামকে শাসনতন্ত্রের বিধানভুক্ত করিতে চায়, তবেই। পাকিস্তান নামে-জাতে সম্পূর্ণ নয়া রাষ্ট্র হওয়ায় এর জাতীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপের ফর্মেটিভ স্তর এটা। এই কারণেই বিভিন্ন পার্টির মধ্যে যে একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা যায় সেটা এই যে, সকলেই যার-তার পার্টির মতাদর্শ ও সামাজিক-আর্থিক প্রোগ্রামকে শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চান। নিরংকুশ গণতন্ত্র নিশ্চিত হইলেই জনমত গঠন করিয়া নির্বাচনে জিতিয়া পার্লামেন্টে আইন রচনার মাধ্যমে ও-সব পার্টি প্রোগ্রাম কার্যকরী করা যাইবে। কিন্তু ঐসব দলের নেতাদের অনেকের মধ্যেই গণতন্ত্রের প্রতি তেমন আস্থা নাই। তাঁরা মনে করেন, কোনও মতে শাসনতন্ত্রে ঢুকাইতে পারিলেই তাঁদের পার্টি-প্রোগ্রামের সফলতার চান্স আছে। নইলে নাই।

এই ধরনের মতাদর্শের ও কার্যক্রমের দুইটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক দল চান ইসলামী মূল্যবোধকে আমাদের জাতীয় জীবনে রূপায়িত করিতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ইসলামী শাসনতন্ত্র চান। অপর দল চান মেহনতী জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সমাজবাদী শাসনতন্ত্র চান।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, দুই দলের উদ্দেশ্যই মহৎ। উভয়েই দেশের কল্যাণ চান। উভয়ের মতাদর্শ সারবান। তাদের কার্যক্রমও যরুরী। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে উভয়ের কার্যক্রমের সফল প্রয়োগ আমাদের জীবনে অত্যাবশ্যক।

একদিকে ধরুন, ইসলামী মূল্যবোধের কথা। দেড় শ' বছরের পরাধীনতার ফলে আমরা আমাদের ধর্মীয় তমদ্দুনী মূল্য-বোধ হইতে সত্য-সত্যই বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে সার্বিক হীনমন্যতা ঢুকিয়াছে। আমরা শুধু স্বকীয়তা হারাই নাই, আত্ম-মর্যাদা-বোধও হারাইয়াছি। ভাষা-সাহিত্যে, আর্টে-কালচারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায়, নামে-নিশানে আমরা পরানুকরণে সভ্য ও ভদ্র হইবার চেষ্টা করিতেছি। এই স্বকীয়তা-

বোধহীন গোলামি মনোবৃত্তির দরুনই আমাদের কথা ও কাজে কোনও সংগতি নাই। ফলে আমাদের নেতাদের চিন্তায় যে কন্ট্রাডিকশন আছে, তাও তাঁরা বুঝেন না। বুঝেন না বলিয়াই ওদিকে যাঁরা 'ইসলামী মূল্যবোধের' কথা বলেন, তাঁরাও বিজাতীয় পোশাক পরিয়া হুইস্কির বোতল হাতে লইয়া পবিত্র রমযানের ফযিলত বয়ান করিতে পারেন। আর এদিকে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতেছেন, তাঁরাও পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষাতেই সে স্বাতন্ত্র্যের দাবি করিতে পারিতেছেন।

এ সবই পরাধীনতার সৃষ্ট গোলামি মনোভাব। এই হীনমন্যতার হাত হইতে ভারতের মুসলমানদিগকে রক্ষা করিয়া সার্বিক জাতীয় স্বকীয়তায় তাদেরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই পাকিস্তান হাসিল করা হইয়াছে। কাজেই যারা বলেন, ইসলামী মূল্যবোধে মুসলমানদিগকে পুনরুজ্জীবিত করাই পাকিস্তানের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাঁরা সত্য কথাই বলিতেছেন। মুসলমানিই মুসলমানের স্বকীয়তা। এতে তর্কের স্থান নাই।

অপরদিকে ধরুন, সমাজবাদের কথা। অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ ও অসাম্য দূর করিয়া মেহনতী জনতার ন্যায্য হক আদায় করাও পাকিস্তানের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনতার সে হক না দেওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তেইশ বছরের স্বাধীনতায় আমরা সে দিকে এক পা আগুয়ান হই নাই। বরঞ্চ যুলুম-শোষণ বাড়িয়াছে। কালাবাজার ও মুনাফাখুরি, ঘুষ-রেশওয়াত জনগণের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। শিল্প-বাণিজ্যে পাকিস্তান অনেক উন্নতি করিয়াছে। সরকারী খরচে উন্নয়ন দশক পালিত হইয়াছে। কিন্তু সে উন্নয়নের কানাকড়ির ছোঁয়াচও গণজীবনে লাগে নাই। 'বাইশ পরিবার' গোটা জাতির সম্পদের মালিক হইয়াছে। একদিকে বড় লোকেরা বিলাসিতার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছেন, অপরদিকে বুভুক্ষু জনতা অনাহারে মরিতেছে। একদিকে শাসক ও ধনিকরা হাজার টাকার স্যুট পরিতেছেন, অপরদিকে মেহনতী জনতা কৃষক-শ্রমিক লজ্জা নিবারণের আচ্ছাদনটুকুও পাইতেছে না। এই যুলুম, এমন অবিচার দূর করিবার জন্য যদি সাম্যবাদ প্রবর্তন করিতে হয়, তবে জনগণের রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিশ্চয়ই তা প্রবর্তিত হইবে।

কিন্তু আসল কথা এই যে, এই দুইটার একটাও শাসনতান্ত্রিক বিধানের ব্যাপার নয়, পার্লামেন্টের আইন ও সরকারী কার্যক্রমের ব্যাপার। আগে দেশে নিরংকুশ গণতন্ত্র কায়েম হউক, নির্বাচিত জনগণের সরকারের হাতে শাসন-ক্ষমতা আসুক, দেখিবেন সব হইয়া যাইবে। শতকরা পঁচাশি জন মুসলমানের গণতান্ত্রিক দেশে ইসলামী মূল্যবোধ জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হইবে না,

এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। শতকরা পঁচানব্বইজন কৃষক-শ্রমিকের গণতান্ত্রিক দেশে সমাজবাদী অর্থনীতি কায়েম হইবে না, এ আশংকাও অহেতুক। শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়াই মুসলিম জনতা ভোট দিয়া পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে। শাসনতন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই বাংলার মুসলিম জনতা ভোটের জোরে জমিদারি উচ্ছেদ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে ইসলামী মূল্যবোধ-বিরোধী 'সাহেবিয়ানা' চলিবে না বলিয়াই বুরোক্র্যাসি বার-বার বিপ্লব করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়াছে।

অতএব, নেতাদের খেদমতে আমার আরয, যাঁর-তাঁর পার্টি প্রোগ্রামের জন্য যিদ না করিয়া গণতন্ত্র নিশ্চিত করিয়া একটি শাসনতন্ত্র রচনা করুন।

ইত্তেফাক, ২৮শে মার্চ, '৭০

৩৩

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের শক্তি-উৎস

রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের মতভেদের তীব্রতা দেখিয়া অনেকেই হতাশার সাথে বলা শুরু করিয়াছেন, নির্ধারিত মেয়াদে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হইবে না। তাঁদের এ আশংকা সত্য হইলে বড়ই চিন্তার কথা। নির্ধারিত মেয়াদে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে না পারিলে নব-নির্বাচিত পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে; মার্শাল ল'র হায়াত বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণামত আবার নির্বাচন হইবে। খোদা-না-খাস্তা, সে পরিষদও যদি শাসনতন্ত্র রচনা করিতে না পারে, তবে মার্শাল ল'র আয়ু আরও লম্বা হইবে। জনগণের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তর আরও বিলম্বিত হইবে। তার ফলে ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হইয়া পরিবে। সে অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি জেনারেল আইউবের পন্থায় অথবা নতুন ধরনে দশবছর বা তাঁরও বেশী মুদ্দত দেশ শাসন করেন, তবে তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যাইবে না। বরঞ্চ আমরা যে গণতন্ত্রেব অযোগ্য, জেনারেল আইউবের এই তহমত সত্য প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু আমি অমন নৈরাশ্যবাদী নই। আমি গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমি মনে করি, নির্ধারিত মেয়াদে শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব হইবে। আমাদের রাজনৈতিক দলের ও নেতাদের এই পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শ সত্ত্বেও এটা সম্ভব হইবে। কারণ এইসব তীব্র মতভেদ শাসনতন্ত্রের বেলা দৃশ্যতঃ যতটা, আসলে ততটা নয়।

এটা ঠিক যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক পার্টিসমূহ ও নেতারা বর্তমানে যে ধরনের পরস্পর-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিতেছেন এবং যাঁর-তাঁর মতবাদ দেশবাসীর এবং অপর পক্ষের উপর চাপাইবার চেষ্টা-উদ্যম যে ধরনে দেখাইতেছেন, তাতে সরল-মনা ভাল মানুষের মনে হইতে পারে, শাসনতন্ত্র রচনা বুঝি আর হইল না। মার্শাল ল' বুঝি আর উঠিল না। পাকিস্তানবাসী গণতন্ত্রের মুখ বুঝি আর দেখিতে পারিল না।

একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, নেতাদের ও পার্টিসমূহের যে-সব পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শ শাসনতন্ত্র রচনায় আমাদেরে ঘাবড়াইয়া-দিতেছে, তার অধিকাংশই শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধানের বিষয়বস্তু নয়, সরকার

হিসাবে করণীয় পার্টি প্রোগ্রাম মাত্র। দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু। তবু এই দুই ব্যাপারে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে স্বাভাবিক কারণেই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আগামী নির্বাচনের প্রতিনিধিদের গবর্নমেন্ট গঠনের সম্ভাবনাও আছে। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিলে এই পরিষদই জাতীয় আইন পরিষদ হইবে। কাজেই যে দল বা দলসমষ্টি মেজরিটি হইবেন, তাঁরাই সরকার গঠন করিবেন। সরকার গঠন করিলে কোন্ পার্টি কি কি ভাল কাজ করিবেন, সে সব কথা এখনই বলা দরকার। যে পার্টি যত বেশী ভাল কাজ করিবার ওয়াদা করিবেন, সে পার্টির তত বেশী ভোট পাইবার সম্ভাবনা। এটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রচলিত নিয়মও বটে। আগামী নির্বাচনটা ঘটনাচক্রে হইয়া পড়িয়াছে গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মিশ্রিত নির্বাচন। যাঁরা মেজরিটি হইবেন, তাঁরা শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, সরকার গঠন করিবেন এবং শেষ পর্যন্ত এই মুদ্দতের মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক নির্বাচনও করিবেন। কাজেই মোটামুটি সব পার্টিই শাসনতান্ত্রিক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল বিষয়বস্তুর মিশ্রণে পার্টি-প্রোগ্রাম বানাইয়াছেন। তাতে আসমান-যমিনে যত বিষয়-বস্তু আছে, সবগুলিকে নিজ-নিজ পার্টি-প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যে পার্টি যত বেশী দফা দিতে পারিবে তারই জিতিবার সম্ভাবনা বেশী, এটা মোটামুটি সার্বজনীন ধারণা। এই কারণে দফার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এমন প্রতিযোগিতার ফলে দফা-সংখ্যা এই অল্পদিনেই, মাশাআল্লাহ, পৌণে একশয় উঠিয়াছে। বাকী ছয় মাসে ইনশাআল্লাহ্ শ' পূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়।

এসব দফার একটাও অবান্তর নয়। সেগুলি নির্বাচনী ইশতাহারের শামিল করা অন্যায়ও হয় নাই। কাজেই দফার সংখ্যা দেখিয়া শাসনতন্ত্র রচনার ভবিষ্যৎ লইয়া আমাদের চিন্তিত হইবার এখনও কোনও কারণ ঘটে নাই। সে কারণ ঘটিবে শুধু তখনই, যখন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং তাঁদের নেতারা শাসনতান্ত্রিক বিধানের বিষয় ও পার্লামেন্টারী প্রোগ্রামের বিষয় পৃথক করিতে অসমর্থ হইবেন। এ সামর্থ্যের আসল পরীক্ষা হইবে নির্বাচনের পরে। নির্বাচনের আগে এটাকে অনিচ্ছা বলা যাইতে পারিবে, অসামর্থ্য বলা চলিবে না। কারণ তাঁদের পার্টি প্রোগ্রামের কোন্টা তারা শাসনতন্ত্রের শামিল করিবেন, আর কোন্টা সরকার গঠনের পরে করিবেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে খোলাখুলি তা বলিয়া দিয়া নির্বাচনে জিতিবার চান্স কমাইতে কেউ রাযী হইবেন না। অবশ্য এটাও হইতে পারে যে, অনেক নেতা এই পার্থক্যটা বুঝিতেই পারিতেছেন না। গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের মিশ্রিত নির্বাচনের অবস্থা-গতিকে সেটা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছেন না। সেজন্য কেউ-কেউ যে বলিয়া থাকেন,

গণ-পরিষদের ও পার্লামেন্টের নির্বাচন আলাদা হওয়া উচিত ছিল; আরও কেউ-কেউ যে বলেন, শাসনতন্ত্র রচনার পরে গণপরিষদ ভাংগিয়া দিয়া পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন শাসনতন্ত্র অনুসারেই হওয়া উচিত; তাঁদের এ-সব কথা একেবারে ফেলিয়া দিবার মত নয়। তবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিশ্চয়ই উভয় দিক বিচার-বিবেচনা করিয়াই বর্তমান পন্থা ঘোষণা করিয়াছেন। এটার রদ-বদল এখন সম্ভবও নয়। এত দেরিতে সে চেষ্টা করিলে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্ট বেশী হইতে পারে। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষিত বিধি ব্যবস্থামতই আমাদের কাজ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিয়া, মার্শাল ল'র অবসান ঘটাইয়া, গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করিয়া, জনগণের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাথমিক কাজটা সমাধা করিতে হইবে।

এটা করিতে হইলে শাসনতান্ত্রিক বিধানের ব্যাপারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, বিশেষতঃ উভয় অঞ্চলের, মেজরিটির একমত হইতে হইবে। একথা সত্য যে, শাসনতন্ত্র রচনার স্পেসিফিক ইশুতে নির্বাচন হইতেছে বলিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের পরিষদটি হইবে গণ-পরিষদ। সে কারণে আইনতঃ সিম্পল মেজরিটি ভোটে শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার এই পরিষদের আছে। কিন্তু সুস্পষ্ট কারণে সিম্পল মেজরিটি, বিশেষতঃ আঞ্চলিক মেজরিটি, ভোটে শসনতন্ত্র রচনা করা উচিত নয়।

শাসনতন্ত্র দেশের ব্যাসিক ল'। ব্যাসিক ল' ও অর্ডিনারি ল'র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধারণ আইন মানিতে হয় শরীর দিয়া। আর ব্যাসিক আইন মানিতে হয় অন্তর দিয়া। দেশের শাসনতন্ত্র এমনি ব্যাসিক আইন যে, তাকে শুধু অন্তর দিয়া মানিলেই হয় না, তাকে ভালবাসিতে হয়, তাতে গৌরব বোধ করিতে হয়। দেহ-মন দিয়া তাতে আনুগত্য বোধও প্রকাশ করিতে হয়। সে আনুগত্য-বোধ এমন গভীর ও ব্যাপক হইতে হয় যে, তেমন কাট-খোট্টা সেনানায়কের পক্ষেও সেটা এব্রোগেট করিতে অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। শুধু দেশবাসীর ভয়ে নয়, নিজের বিবেকের, নিজের প্রাণের অন্তর্নিহিত জাতীয় আনুগত্যের ভয়েও। মানুষের তৈয়ারী একটা দলিলের প্রতি দেশ-বাসীর এমন শ্রদ্ধা-ভালবাসা, গর্ব-আনুগত্য একদিনে হয় না, বংশ-পরম্পরায় এটা গড়িয়া উঠে।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতিও পাকিস্তানীদের এমন ভালবাসা ও আনুগত্য থাকিতে হইবে। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন, পাকিস্তানেও তেমনি, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই হইবে নাগরিকতার প্রথম শর্ত। পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রকেও

পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতই ভাসবাসিতে হইবে। সে শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যই হইবে নাগরিকতার পয়লা শর্ত। এমন যে শাসনতন্ত্র, সেটা দলীয় ভোটে বা শুধু মেজরিটি ভোটে রচিত হয় না। পাকিস্তানের বেলা এর উপর একটা অতিরিক্ত শর্ত আছে। এ দেশের শাসনতন্ত্রকে হইতে হইবে উভয় অঞ্চলের সমান ভালবাসা, গৌরব ও আনুগত্যের বস্তু। সেটা এক অঞ্চলের মেজরিটি ভোটে হইতে পারে না। এক অঞ্চল হইতে গবর্নমেন্ট হইতে পারে, এমনকি মার্শাল ল'ও হইতে পারে, কিন্তু শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে না। কারণ, একটাকে শুধু মানিতে হয়, আরেকটাকে ভালবাসিতেও হয়।

এমন যে শাসনতন্ত্র, সেটা হইতে হয় সর্বসম্মত। সেটা হইতে হয় অপরিবর্তনীয়। কোনও আইন পরিষদের বা পার্লামেন্টেরও সে শাসনতন্ত্র রদবদল বা সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে না। দুই বা তৃতীয়াংশ মেম্বর ভোট দিলেও না। এমনকি, গোটা পার্লামেন্টও না। দেশের শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসন কাজ চালাইবার জন্যই পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয় জনগণের দ্বারা। পার্লামেন্ট জনগণের এজেন্ট। এজেন্টনামা সংশোধনের অধিকার শুধু প্রিন্সিপ্যালের। এজেন্টের সে ক্ষমতা নাই। কাজেই শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেন্টকে ভোটারদের পূর্ব-অনুমতি লইতে হইবে। পার্লামেন্টেই শাসনতন্ত্র সংশোধন-পরিবর্তন হইবে বটে, তবে তার দরকার বোধ করিলে পার্লামেন্ট নির্বাচনের স্পেসিফিক ইশু করিয়া জনগণের ম্যাণ্ডেট লইবে। বর্তমানে শাননতন্ত্রে উহা সংশোধনের দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ ভোটের যে সব বিধান থাকে, তা ঠিক নয়। শাসনতন্ত্র সংশোধনের পন্হা একদিকে যেমন অতি কঠিন করা উচিত নয়, অপরদিকে তেমনি অতি সহজ করিয়া সরকারী দলের মর্যির উপর নির্ভরশীল করাও উচিত নয়। এই উভয় বিপদ এড়াইবার নিরাপদ পন্হা বিশেষ নির্বাচনী ইশু বা রেফারেণ্ডাম করিয়া জনমত লওয়া। এ পন্হা নীতি হিসাবেও যেমন, বাস্তব ক্ষেত্রেও তেমনি, গণতান্ত্রিক। অন্যথায় যে-কোনও ভাল মেজরিটির সরকারী দল নিজেদের পছন্দমত শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া ফেলিতে পারে। ফলে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের ফলে সরকার পরিবর্তনের সাথে-সাথে শাসনতন্ত্র রদ-বদলের আশংকা থাকে। এমন হইলে শাসনতন্ত্রের স্যাংটিটি বা পবিত্রতা থাকিবে না। দলমত-নির্বিশেষে গোটা দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আনুগত্যও তার প্রতি থাকিবে না। তেমন পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র ঘেরিয়া জাতীয় ঐক্যের ও কমন নাগরিক চেতনার মত আধ্যাত্মিক একাত্মবোধ দেশবাসীর মধ্যে গড়িয়া উঠিবে না; জনগণ কখনও নেশন হইবে না। শাসনতন্ত্রকে এমন জাতীয় মর্যাদা ও পবিত্রতা দিতে হইলে উহার বিধান হইবে সকল দল, মত ও শ্রেণীর উর্ধ্বে।

এমন শাসনতন্ত্র রচনা করা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি সম্ভব। অত্যাবশ্যক এই জন্য যে, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রে বহু মতের এমন-কি পরস্পর বিরোধী মতের, লোক ও পার্টি থাকিবেই। শাসনতন্ত্র এদের সকলের গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে। সম্ভব এইজন্য যে. মূল শাসনতান্ত্রিক বিধান সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেই একমত। যে-সব ব্যাপারে মতভেদ আছে, আলোচনায় দেখা যাইবে, তার অধিকাংশই শাসনতান্ত্রিক বিধানের বাইরের বস্তু। সেগুলি পার্টিপ্রোগ্রাম। সুতরাং পার্লামেন্টও আইন পরিষদের এলাকা-ভুক্ত। শাসনতান্ত্রিক বিধান হওয়ার উপযুক্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে মত-বিরোধ আছে, দেশপ্রেম ও বাস্তববুদ্ধি লইয়া আলোচনা করিলে সেগুলি আপোসেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। এটা করিতে পারিলেই সবদলগ্রাহ্য একটি শাসনতন্ত্র নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই রচিত হইয়া যাইবে। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বদলগ্রাহ্যতা মানে সকল পার্টির দাবি শাসনতন্ত্রের বিধানভুক্ত করা নয়। স্পষ্টতঃই এটা সম্ভব নয়। শাসনতন্ত্রের সর্বদলগ্রাহ্যতা মানে শাসনতন্ত্রে কোন পার্টির মতাদর্শ ও প্রোগ্রামের বিরোধী কোনও বিধান থাকিবে না। এ কথার তাৎপর্য এই যে, প্রচারের দ্বারা জনমত গঠন করিয়া নির্বাচনে জয়ী হইয়া নিজ-নিজ মতাদর্শ ও পার্টি-প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করিবার অধিকার ও সুযোগ সকল পার্টির ও ব্যক্তির থাকিতে হইবে। এক নির্বাচনে না পারুক দশ নির্বা-চনে যার-তার মতাদর্শ ও কর্মসূচী ইশু করিয়া নির্বাচন লড়িবার অধিকার ও সুযোগ সকল দলের থাকিবে। শাসনতন্ত্রে তাতে কোনও বিধিনিষেধ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবেও থাকিতে পারিবে না। এমন শাসনতন্ত্র হইলেই সেটা সক-লের গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। সকলের গ্রহণ করাও কর্তব্য। তা না করিয়া আমি যদি যিদ করি যে, শাসনতন্ত্রে আমার পার্টির মতাদর্শ বিধিবদ্ধ করিতে হইবে, তবে আপনিও বলিতে পারেন, আপনারটা করিতে হইবে। অথচ দুইটাই করা যায় না। কারণ, দুই মতাদর্শ পরস্পর-বিরোধী। মনে রাখিতে হইবে, আমার মতাদর্শ ও প্রোগ্রাম যেমন আমার প্রাণের প্রিয়বস্তু, আপনারটাও আপনার প্রাণের প্রিয়বস্তু। কেউ কারোটা ছাড়িতে পারিনা। এ অবস্থায় এক-মাত্র আপোস ফর্মুলা হইল উভয়ের স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া। তার অর্থ শাসন-তন্ত্রে কারোটার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও বিধান না করা। এমন আপোস এই জন্য করিতে হইবে যে, আমার বা আপনার মতাদর্শ ও প্রোগ্রাম যতই উচ্চাংগের হউক না কেন, তা প্রয়োগ করিতে হইবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের বা আইন পরিষদের মাধ্যমে। তার অর্থ এই যে যতদিন তা না হইতেছে ততদিন আমার আপনার, উভয়টাই যাঁর-তাঁর ব্যক্তিগত বা পার্টিগত মত মাত্র। তথাপি এই ব্যক্তিগত বা

পার্টিগত মত মাত্র। তথাপি এই ব্যক্তিগত বা পার্টিগত মতাদর্শের গণতান্ত্রিক মূল্য ও অধিকার এই যে, ঐ মতাদর্শ ও কর্মসূচীকে ইলেকশন ইশু করিয়া নির্বাচনে জিতিয়া শাসনতন্ত্র সংশোধন না করিয়াই সেগুলি কার্যকরী করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকিতে হইবে।

সকল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক পার্টি-প্রোগ্রামে এই পযিটিভ নিউট্রালিটিই শাসনতন্ত্রের ম্যাজেস্টি। এটাই তার শক্তির উৎস। শাসনতন্ত্র গোটা দেশবাসীর, কোনও দলের নয়। দেশের জনগণের সকলের এবং প্রত্যেকের। এক আইউবী শাসনতন্ত্র ছাড়া দুনিয়ার আর সব শাসনতন্ত্রের প্রিয়েম্বলেই লেখা আছে: 'আমরা অমুক দেশবাসী এতদ্বারা নিজেদেরে এই শাসনতন্ত্র দিতেছি।' যে শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রকে যত অবাধ ও নিরংকুশ রাখিবে, সে তত অমর হইবে।

অতএব আগামী নির্বাচনের আগে না হইলেও অব্যবহিত পরেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতান্ত্রিক বিধানের বিষয়বস্তু ও সাধারণ আইনের বিষয়-বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করিবেন। তারপর লঘিষ্ঠ-সাধারণ শাসনতান্ত্রিক বিধানের বিষয়-বস্তুগুলির উপর সর্বদলীয় গরিষ্ঠ-সাধারণ ঐক্য হাসিল করিবার জন্য সকল-দলীয় নেতার মাথা একত্রিত করিবেন। দেখিবেন, ইনশাআল্লাহ, নির্ধারিত মেয়াদের বেশ কিছুদিন আগেই সর্বজনগ্রাহ্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া যাইবে। পাকিস্তান আরেকটা দীর্ঘস্থায়ী 'বিপ্লবের' হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

ইত্তেফাক, ১৭ই মার্চ, '৭০

৩৪

আসলে মতভেদ কোথায় ?

উত্তরে যদি বলি ঃ মতভেদ কোথাও নাই, তবে অনেকেই তাজ্জব হইবেন। পার্টিতে-পার্টিতে এত বিরোধ, দলে-দলে এত সংঘর্ষ, তবু বলেন, মতভেদ নাই ? জি-হাঁ, তবু বলি, মতভেদ নাই। যা আছে, সেটা মতভেদ নয় মতবিভিন্নতা। গণতন্ত্রে মত-বিভিন্নতা থাকিবেই। মত-বিভিন্নতা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। দেশ-বাসির মধ্যে অতএব পার্টিসমূহের মধ্যে মত-বিভিন্নতাই গণতন্ত্রের প্রাণ। আমরা গণতন্ত্রী বলিয়াই আমাদের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন মত আছে। ভিন্ন-ভিন্ন মত আছে বলিয়াই আমরা গণতন্ত্রী। অতএব আমাদের পার্টিসমূহের মধ্যে মত-বিভিন্নতা আছে, মতভেদ নাই। তবে যে পার্টিতে-পার্টিতে নেতায়-নেতায় এত বিভেদ দেখিতেছি, যে ভেদাভেদ অনেককেই নিরাশ করিয়া তুলিতেছে, এটা কি বিভেদ নয় ? জি হাঁ, এটা নিশ্চয়ই বিভেদ। কিন্তু এ বিভেদ মতে নয়, মনে। এই মনই হইয়াছে আমাদের কাল। কালা মন লইয়া বিচার করিতেছি বলিয়াই মত-বিভিন্নতাই আমাদের চোখে মত-ভেদ বলিয়া ঠেকিতেছে। এটা চোখের ধান্ধা। মনের কালিমা।

আশার কথা, মনের এই কালিমা ও চোখের এমন ধান্ধার জন্য আমাদের নেতারা বা তাঁদের পার্টিসমূহে দায়ী নন, জনগণ ত নয়ই। দায়ী আমাদের পরি-বেশ। আমাদের রাজনৈতিক পটভূমিই এই পরিবেশের স্রষ্টা। যে কারণে তেইশ বছরেও আমরা একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিলাম না, এই পরিবেশের হেতুও তাই। এই হেতুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের মনের কালিমা এবং চোখের ধান্ধা কাটিয়া যাইবে। সুখের কথা, আস্তে আস্তে তা হইতেছেও।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটিয়াছে। আমাদের আযাদির গোড়ার সাত বছর আমাদের নেতারা শাসক হিসেবে অনেক প্রশংসনীয় কাজ করিয়াও জাতি-নির্মাতা হিসাবে লজ্জাকর অদূরদর্শিতা ও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। জাতির পিতার অকাল-মৃত্যুর সুযোগে তাঁর সুস্পষ্ট নীতিনির্ধারক ওসিয়ত অমান্য করিয়াছেন। পার্লামেন্টারী শাসনবিরোধী একদলীয় শাসন চালাইয়াছেন। নিজের পার্টি ছাড়া আর সবাইকে পাকিস্তানের দুশমন বলিয়াছেন। বিধাতার

বিধান ও ভাগ্যের পরিহাস এই যে, যে-নেতা নিজের দলছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করেন না, তিনি অতিশীঘ্রই নিজেকে ছাড়া পার্টির লোককেও বিশ্বাস করেন না। তাই এই মুদ্দতের মুসলিম লীগ নেতারা অপযিশন-নেতাদেরে ত অবিশ্বাস করিলেনই, নিজেদের পার্টির লোককেও দুশমন মনে করিতে লাগিলেন। এই মনোবিকারের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে তাঁরা গোটা দেশবাসিকেই অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মুসলিম লীগের সম্প্রসারণ বন্ধ করিলেন। সব নির্বাচন স্থগিত রাখিলেন। এই অবিশ্বাস এমন স্তরে নামিয়া পড়িল যে, শাসকরা মনে করিতে লাগিলেন, শাসনতন্ত্রের ইস্পাতের শিকলে বাঁধিয়া না রাখিলে পাকিস্তানের মুসলমানেরা ইসলাম ত্যাগ করিবে। এর ফলে তাঁরা শাসনতন্ত্রই রচনা করিতে পারিলেন না। কেমনে পারিবেন? কাকে ভোটাধিকার দিবেন? দেশের সব মুসলমানই যে ইসলামের ও সব পাকিস্তানীই যে পাকিস্তানের দুশমন! নেতাদের এ মনোভাব গজাইল প্রকৃতির বিধান অনুসারেই। ধর্মের ব্যাপারে এটা চরম সত্য যে, যারা পরের ঈমানে সন্দেহ করে, তাদের নিজেদের ঈমানেই খলল আছে। রাজনীতিতেও এটা এমনি চরম সত্য যে, যারা পরের দেশ-প্রেমে সন্দেহ করে, তাদের নিজেদের দেশপ্রেমই সন্দেহের বস্তু। গোড়ার সাত বছরের মুসলিম লীগ-নেতারা এই দুইটা দুর্বলতাই দেখাইয়াছেন। অথচ এটা হওয়া উচিত ছিল না। কারণ ধার্মিক মাত্রেই পরের ধর্ম-বিশ্বাসে আস্থা রাখেন। দেশ-প্রেমিক মাত্রেই পরের দেশ-প্রেমে আস্থা রাখেন। আমাদের শাসকরা এই সত্যের খেলাফে কাজ করিয়াছেন বলিয়াই সারা দেশটা ডুবিয়া গেল সন্দেহ-অবিশ্বাসের কুজ্ঝটিকায়।

আজ সে কুয়াশা কাটিয়া যাইতেছে। কারণ নেতারা যাই হউন, পাকিস্তানের জনগণ সুস্থ। সুস্থ বলিয়াই অত-অত ঝড়-ঝাপটা ও কুজ্ঝটিকার মধ্যে ঠিক-মত দিকনির্ণয় করিয়া ঠিক বাক্সে ভোট দিয়া পাকিস্তান বানাইয়াছে। জনগণের এই চিন্তার সুস্থতা আকস্মিক ব্যাপার নয়। তারা একটা প্রাচীন সভ্যজাতি। দেড় শ' বছরের রাষ্ট্রিক ও কৃষ্টিক গোলামিতে তাদের দেহমনের সোনা ছাই-চাপা পড়িয়াছিল মাত্র; খাঁটি সোনা বলিয়াই তাতে মরিচা ধরে নাই।

সে সোনা মুসলিম জনতার ঈমান। সেই সবল ঈমান হইতে সঞ্জাত আত্ম-বিশ্বাস। এই ঈমানের জোরে ও আত্ম-বিশ্বাসের বলেই মুসলিম-জনতা পয়গাম্বর সাহেবের সেই অমর-শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাস করেঃ 'মানুষের মধ্যে মত-বিভিন্নতা তাদের প্রতি আল্লার রহমত।" এ বাণী অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর তাৎপর্য অপরিসীম। মানব-সভ্যতার গোড়ার কথা এটা। সেজন্য কথাটা আধ্যাত্মিক। এই মহাসত্যের উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। কাজেই গণতন্ত্রও আধ্যাত্মিক।

মত থাকিলেই মত-বিভিন্নতা। যেখানে মত নাই, সেখানে মত-বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ মত-বিভিন্নতাই মতের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। এই মত-বিভিন্নতাই মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে পৃথক করিয়াছে।

প্রকৃতি বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। কিন্তু মানুষের মত-বিভিন্নতা শুধু বৈচিত্র্য নয়। প্রকৃতির বৈচিত্র্য স্থবির, মানুষের মত-বিভিন্নতা ডাইনামিক, চলমান। সে ডাইনামিযম ক্রিয়েটিভ, সৃজনশীল। স্বভাবতঃই এর বিপরীত ধর্মও আছে তার সে ডাইনামিযমে। সে বিপরীত গুণটা ডেস্ট্রাক্টিভ; ধবংসাত্মকও বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, শিল্প-সাহিত্যের, এক কথায়, গোটা সভ্যতার, জন্ম ও বিকাশ এই মত-বিভিন্নতা হইতেই। মত-বিভিন্নতার এই আধ্যাত্মিক রূপেই প্রসারিত হইয়াছে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে। জ্ঞান-সাধনায় মত-বিভিন্নতা হুজরা, তপোবন বা ল্যাবরেটরিতে সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই ওটা ব্যক্তিগত। সাধনার ফলটা নিশ্চয়ই সামাজিক, কিন্তু সাধনাটা ব্যক্তিগত। সামাজিক জীবনে ও রাজনীতিতে ব্যক্তিগত সাধনার স্থান নাই। কাজেই এখানে মত-বিভিন্নতাকে হইতে হয় সহনশীল, একমোডেটিং।

পাঠকের মনে হইবে, আমি রাজনীতির কথা বলিতে গিয়া আধ্যাত্মিকতার আমদানি করিতেছি। কিন্তু এটা আবশ্যক এই জন্য যে, গণতন্ত্র সত্যই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও পরিণাম উভয়টাতেই এই আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্ট। জনগণের ভাল করা সওয়াবের কাজ। সবাই ওটা করিতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্র চায় জনগণের হাত দিয়াই জনগণের ভাল করিতে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাদের ভাল করিবার অধিকার কারো নাই। রোগীকে জোর করিয়া অষুধ খাওয়াইয়া তার রোগ সারিবার নীতি গণতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। ব্যক্তি যত বড় মনীষী, যত বড় জ্ঞানী ও দূরদর্শী-বহুদর্শী হউন না কেন জন-মতের উপরে তাঁর মত প্রাধান্য পাইবে না। জন-মতই ব্যক্তি-মতের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। ব্যক্তির মতের চেয়ে জন-মত সব সময়ে নির্ভুল। এই দুইটি গণতন্ত্রের মূলসূত্র। এর একটাও অমান্য করা চলিবে না। করিলে সেটা হইবে ডিক্টেটরশিপ। পাকিস্তানে জেনারেল আইউব, জার্মানিতে হিটলার ও ইটালিতে মুসোলিনী যাঁর-তাঁর দেশের জনগণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হইতে চাহিয়াছিলেন জনগণকে রোগী ও মূঢ় মনে করিয়া যাঁর-তাঁর ব্যবস্থামত অষুধ জোর করিয়া খাওয়াইয়া দেশবাসীর ভাল করিতে চাহিয়াছিলেন। তার পরিণাম দেশের জন্য এবং তাঁদের নিজেদের জন্যও, কিরূপ সাংঘাতিক হইয়াছে, তা সকলেই দেখিয়াছেন।

রাজনীতিতে এই যে একের চেয়ে বহুর বুদ্ধির নির্ভুলতা, এই যে জনগণের কল্যাণ জনগণের নিজের হাতে করার অধিকারের স্বীকৃতি, এই দুইটা কথাই

অধ্যাত্মিক। সেইজন্য গণতন্ত্র আধ্যাত্মিক। দুইদিক হইতে কথাটার বিচার করা যায়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দেশকে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় জনগণকে উন্নত করিতে হইলে ডিক্টেটরশিপের দরকার আছে, এই মতবাদের অবসান আজও হয় নাই। কারণ জনকল্যাণে গণতন্ত্র মন্হরগতি, আর ডিক্টেটরশিপ দ্রুতগামী। এটা একরূপে স্বীকৃত সত্য। তবু গণতন্ত্রের পরিণাম জয় এই জন্য যে, গণতন্ত্রে জনগণের কল্যাণ জনগণ নিজে হাতে করে, ডিক্টেটরশিপে হয় সেটা পরের হাত দিয়া। এই কারণে সেখানে যে পরিমাণে বৈষয়িক উন্নতি হয়, আত্মিক উন্নতি সেই অনুপাতে হয় না।

এইখানেই একটা নিতান্ত অবান্তর কথা 'অন্তর' হইয়া পড়ে। বলা হয়, মানব-জীবন শুধু পেট ভরিয়া খাইবার জন্য নয়। 'ম্যান ডায নট লিভ অন ব্রেড অন্‌লি।' ধনিক-বণিকরা নিজেদের অবাধ শোষণ বজায় রাখিবার অসদুদ্দেশ্যে কথাটার ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া এই মূল্যবান কথাটাই একটা বীভৎস রূপ ধারণ করিয়াছে। এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিধ্বনিরূপে মযলুমদের তরফ হইতে বলা হয় ঃ 'আগে খাইয়া বাঁচি ত, পরে দেখা যাইবে, ওটা হালাল কি হারাম।' ক্ষুধার্ত মানুষ আগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে চাহিবে, এটা স্বাভাবিক। অসহ্য ক্ষুধা মিটাইবার জন্য পুরুষ যেমন সততা ও নারী যেমন সতীত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, জনগণও সেই কারণেই গণতান্ত্রিক অধিকার বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ সবই সাময়িক আচরণ মাত্র, মানুষের সুস্হ মনের কাজ নয়।

গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিকতার অপর দিক এই যে, ওতে জনগণের অর্থাৎ ভোটার-দের সকলের এবং প্রত্যেকের জন্য বেশ খানিকটা আত্মিক উন্নতির দরকার হয়। এতটা দরকার হয় যে, ওটা ছাড়া গণতন্ত্র চলিতেই পারে না। এজন্য অনেকে বলিয়া থাকেন, গণতন্ত্র সফল হইতে হইলে জনগণকে শিক্ষিত হইতে হইবে। শিক্ষা মানে এখানে এডুকেশন, লিটারেসি নয়। এডুকেশনও এখানে পলিটি-ক্যাল এডুকেশন, একাডেমিক এডুকেশন নয়। আমাদের দেশের শতকরা আশি-জনের বেশী লোক নিরক্ষর। এই যুক্তিতে এদেশে গণতন্ত্র চলিবে না, একথা কেউ-কেউ বলিয়াও ফেলিয়াছেন। সেই জন্যই 'শিক্ষার' ঐ ব্যাখ্যা দরকার হইতেছে। এ ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, গণতন্ত্রের স্পিরিট বুঝিয়া মত মানসিক উন্নতির স্তরে উঠিলেই জনগণ গণতন্ত্রের যোগ্য বিবেচিত হইবে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মুসলিম বাংলার এবং বর্তমানের পূর্ব বাংলার মুসলিম ভোটাররা ১৯৩৭, ১৯৪৬, ১৯৫৪ সালে, এমনকি আইউবী স্বৈরাচারী আম-লের ১৯৬৫ সালেও, এই যোগ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। অনুমান করুন,

১৬—

এই প্রমাণ দিতে জনগণকে আধ্যাত্মিকতার কোন্ স্তরে পেঁছাইতে হইয়াছে। উল্লিখিত নির্বাচনসমূহের যে-কোনটার কথা মনে করুন। হরেক দলের নেতারা হরেক জায়গায় জন-সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। সব জন-সভায় দর্শক-শ্রোতার ভিড়। বক্তারা এঁ-ওঁর সমালোচনা, এমনকি নিন্দা করিতেছেন। শ্রোতারা শুনিতেছেন; কখন-কখনও মারহাবা-করতালিও দিতেছেন। শ্রোতার এত ভিড় দেখিয়াও বুঝিবার উপায় নাই, এঁরা ভোট কাকে দিবেন। অথচ এঁদের অধিকাংশেই জানেন, ভোট কোথায় দিতে হইবে। তার পরেও দুই বন্ধু বা পড়শী একই পথে হাঁটিয়া একই রিকশা বা বাসে চড়িয়া একই নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়া দুই বিপরীত দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়া একই-ভাবে বাড়ী ফিরিয়াছেন। কিন্তু এসব করিয়াছেন হাসি-মুখেই; মন-কষাকষি বা ঝগড়া-বিবাদ হয় নাই। যদি কখনও কোথাও হইয়া থাকে, তবে সেটা হইয়াছে আরও ঘন-ঘন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অভাবে। যতই নির্বাচন হইবে, ততই ভোটাররা বুঝিবেন ভোট যে বাক্সেই দেউন, ভোট দিয়া সকলেই সমান-ভাবে দেশের সেবা করিতেছেন। আপনার ভোট আমার দলের বিরুদ্ধে দিয়াছেন কাজেই আমার দল গতিচ্যুত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার দুশমন; এই মনোভাব গণতন্ত্রে সাজে না। নির্বাচনে একদল হারিবেই, একদল জিতিবেই। দুইদল এক সংগে জিতিতে পারে না। যে দল জিতে, তারা সরকার গঠন করে। এরা সরকারী দল। যারা হারে, তারা হয় অপযিশন দল। অপযিশনই হোক, আর 'পযিশনই' হোক, উভয়েই পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ। একটি ছাড়া আরেকটি চলে না। এটা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানেরও কথা।

অতএব রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কেতাবেও লেখা আছে, আমাদের ভোটাররাও জানেন, গণতন্ত্র চালাইতে একাধিক পার্টি লাগে। আমাদের দেশেও লাগিবে। আমাদের দেশে তা আছেও। না হয়, একটু বেশী সংখ্যায়ই আছে। তাতে আমরা নিরাশ হই কেন? মতভেদের দরুন বিপদের আশংকা করি কেন? দৃশ্যতঃ আমাদের মতভেদ প্রচুর, সাংঘাতিক এবং দুরতিক্রম্য সত্য, কিন্তু সেই ভিন্ন-ভিন্ন মতাদর্শ সবই দেশের মংগলের জন্যই ত। পার্টিসমূহ বা তাদের নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ত নয়। তাছাড়া সে-সব মতাদর্শ কাজে প্রয়োগ করিতে হইবে ত জনগণের অনুমতি লইয়াই তার মানে নির্বাচনে জিতিয়া। এই জ্ঞান, চৈতন্য ও অনুভূতি যে-দেশের জনগণের মধ্যে যত বেশী বিকাশ লাভ করিয়াছে, সে-দেশ গণতন্ত্রের তত যোগ্য হইয়াছে। আমাদের জনগণ বহু পরীক্ষায় পাস করিয়াই এই যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। অসম্পূর্ণ রাজ-নৈতিক চেতনার দরুন রাজনৈতিক মত-পার্থক্য বিরোধ-সংঘাতের আকারে

দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল কতিপয় নেতার মধ্যে। তাঁদের কার্যকলাপেই রাজনৈতিক মত-ভিন্নতা জনগণের মতভেদ ও বিরোধের আকারে দেখা দিতেছিল। কিন্তু যেদিন নেতারা তাঁদের সকল মত ভেদের বিচার ভার ভোটারদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেইদিনই তাঁদের মত ভেদের অবসান ঘটিয়াছে। গণতন্ত্রে সকল রাজনৈতিক বিতর্কের বিচার হয় জন-মতের সর্বোচ্চ সুপ্রীম কোর্টে। এই সুপ্রীম কোর্টে বিচার দেওয়ার অর্থ এই যে, আমার মতের বিরুদ্ধে রায় হইলেও আমি তা মানিয়া লইব। এইখানেই গণ-তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব। অন্যরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যেখানে ক্ষমতা দখল লইয়া খুন-খমের বিপ্লব হইত, এক নেতা আরেক নেতার ফাঁসি দিতেন, গণতন্ত্রে সেই বিতর্কেরই মীমাংসা হইয়া গেল ব্যালট-বাক্সের মাধ্যমে। জনমতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারের আরও বিশেষত্ব এই যে, এই আদালতে একবার হারিয়া গেলেও আপনার মামলা চিরতরে শেষ হইল না। প্রতিবার নির্বাচনে আপনার মত জন-মতের সামনে পেশ করিতে পারিবেন। জনমত একবার আপনার বিরুদ্ধে রায় দিয়াছে, অতএব আপনি আর সে ইশু তুলিতে পারিবেন না, একথা রাজনীতিতে কেউ বলিতে পারিবে না। জনমতের আদালতের আইনে, 'রেস্-জুডিকেটা' বলিয়া কোনও কথা নাই। একবারের হার এখানে চূড়ান্ত হার নয়। আপনি যতবার জিতিবেন, ততবারই ততদিনই আপনি রাষ্ট্র চালাইবেন আপনার প্রোগ্রাম-মত। এই প্রোগ্রামটি আমার প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ বিপরীত, তবুও আমি আপনার গবর্ন-মেণ্ট মানিয়া চলিব। কারণ আপনি জনমতের রায় পাইয়াছেন। মালিকের মতা-মতেই আপনি সম্পত্তি পরিচালনা করিতেছেন। রাষ্ট্র নামক সম্পত্তিটার মালিক জনগণ। এই গণ-আদালতে প্রতি নির্বাচনে আপীল দায়ের করিতে-করিতে আমি যেদিন জিতিব, সেদিন আপনিও আমার আজকার মতই আমাকে মানিয়া চলিবেন ; যদিও আমার প্রোগ্রামের আপনি ঘোর বিরোধী।

এমনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরাই গণতন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে হাজার কঠোর দুরতিক্রম্য মত-পার্থক্য থাকিলেও সেগুলি আসলে মত-বিভিন্নতা মাত্র। মতভেদ নয়। সে মত-বিভিন্নতা সত্ত্বেও এঁরা উভয়েই কার্যতঃ এক পরিবারের, একদলের লোক। কারণ এঁরা সকলেই সে মতভেদের বিচার-ভার দিয়াছেন একই আদালতে। সে আদালত যুদ্ধক্ষেত্র বা সমরাস্ত্র নয়, নির্বাচন কেন্দ্র ও ভোটের বাক্স। এই নির্বাচন ও বাক্সের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রাম করিব, করিয়াছিও সেদিন। আমাদের দেশের ইডিওলজিস্ট-সেকিউলারিস্ট-ক্যাপিটালিস্ট-সোশিয়ালিস্ট-নির্বিশেষে সকল দলের নেতা-ছাত্র-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আইউবশাহির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছেন, সেটা এই সুপ্রীম কোর্টের আধিপত্য ও ব্যালট-বাক্সের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই।

অতএব দেখা গেল, এঁদের মধ্যে যতই মত-বিভিন্নতা ও পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শ থাকুক, সেটা আসলে মতভেদ নয়। বাহ্য বিরোধ সত্ত্বেও তাঁরা সকলে একদলের। সে দল গণতন্ত্রী দল।

অবশ্য যাঁরা গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কথা আলাদা। যাঁরা জন-মতে বিশ্বাস করেন না, জনসাধারণকে যাঁরা মূঢ় মনে করেন, জনগণের মূঢ়তার দরুন তাদের উপর জোর করিয়াই তাদের উপকার করিতে হইবে, এই যাঁদের মত, তাঁরাই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। সার্বজনীন ভোটের নির্বাচনও চান না এঁরাই। আসলে মতভেদ সেইখানে, তাঁদের সাথে।

ইত্তেফাক, ৫ই এপ্রিল, '৭০

৩৫

আসন্ন গণ-পরিষদের গুরু দায়িত্ব

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্কের যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, একটা গুণ তার স্বীকার করিতেই হইবে। এই ঘোষণায় গণ-পরিষদের কাজ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। এতে পরিষদের কর্তব্য ও এলাকা যেমন ছোট করা হইয়াছে, দায়িত্বও তেমনি সহজ করা হইয়াছে। একদিকে যা অবশ্যকরণীয় ছিল, তা করিয়া রাখা হইয়াছে। অপরদিকে তর্কিত বিষয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমে ধরুন পরিষদের রুলস-অব-প্রসিডিওরের কথা। এটা আগাম রচনা করিয়া রাখিয়া প্রেসিডেন্ট পরিষদের এলাকায় হাত দিয়াছেন। এটা নিতান্তই টেকনিক্যাল কথা। এতে প্রেসিডেন্ট পরিষদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরিষদের করণীয় কাজটি পরিষদের পক্ষ হইতে আগেই করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের দেশে আইন-পরিষদ চালু থাকার সময় তাঁদের যে-সব রুলস-অব-প্রসিডিওর ছিল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের পার্লামেন্টে যে-সব রুলস প্রচলিত আছে, মোটামুটি সেগুলিকেই আমাদের আসন্ন পরিষদের রুলস করা হইয়াছে। নির্বাচনের পরে পরিষদের মেম্বররা রুলস করিলে মোটামুটি এই-সব রুলসই করিতেন। প্রেসিডেন্ট এগুলি করিয়া রাখিয়া পরিষদের সময় বাঁচাইয়াছেন মাত্র। চার মাসের মেয়াদের কথা স্মরণ রাখিয়াই প্রেসিডেন্ট মেম্বরদের এই কর্তব্যটি করিয়া রাখিয়া তাঁদের মূল্যবান সময় বাঁচাইয়াছেন। তবু যদি এইসব রুলসে কোনও ত্রুটি থাকিয়াও থাকে, তথাপি সে ত্রুটির দরুন শাসনতন্ত্র রচনায় কোনও বিঘ্ন হইবে না। শাসনতন্ত্র রচনা ও অনুমোদন হইয়া যাওয়ার পরই এই পরিষদ দেশের সার্বভৌম পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হইবে। তখন সেই সার্বভৌম পার্লামেন্টের পক্ষে রুলস-অব-প্রসিডিওরের যে-কোনও ত্রুটি দূর করার, এমনকি সম্পূর্ণ নয়া রুলস প্রণয়ন করার পথে কোনও বাধা থাকিবে না। মার্শাল ল' বা তার প্রেসিডেন্ট কেউই সে পার্লমেন্টের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিবার থাকিবেন না। কাজেই লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের এই অংশের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি চলিতে পারে না।

তারপর শাসনতন্ত্রের আদর্শগত রূপরেখার কথা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম, প্রিয়েম্বল, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালের ব্যাপারে

কতিপয় মূলনীতি ফ্রেম-ওয়ার্কের ২০, ২১ ও ২২ ধারায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পার্ট এক, পার্ট দুই ও পার্ট তিন (৬২ সালের সংশোধিত শাসনতন্ত্রের পার্ট এক ও দুই) মোটামুটি আগামী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই কারণেই '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পার্ট বার ('৬২ সালের শাসনতন্ত্রের পার্ট দশ) মোটামুটি ঐ ভাষাতেই আগামী শাসনতন্ত্রের বিধানভুক্ত করিতে হইবে। মোটামুটি বলিলাম এই জন্য যে, অন্ততঃ ফান্ডামেন্টাল রাইটসের বেলা পরিষদের মেম্বররা নিশ্চয়ই পুরাপুরি গণতান্ত্রিক হইবেন। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের ফ্রেম-ওয়ার্কে কোনও সীমা-সরহদ্দও ঠিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। ফান্ডামেন্টাল রাইটস অধ্যায়ে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ৭ ধারা ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের 'রাইটস' হেডিং-এর ২ ধারামতে বিনা-বিচারে বন্দী করার যে বিধান আছে, সেগুলি বাতিল ও রদবদল করিবার পূর্ণ ও নিরংকুশ ক্ষমতা পরিষদের রহিয়াছে। ঠিক তেমনি, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ১৫ ধারা ও '৬২ সালের ১০ ধারায় ফান্ডামেন্টাল রাইটসের নামে বিনা-ক্ষতিপূরণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইবে না বলিয়া যে বিধান আছে, ইহা স্পষ্টতঃই ধনিক ও সামন্তরাজদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই করা হইয়াছে। এগুলির বাতিল ও রদবদলে প্রেসিডেন্টের ফ্রেম-ওয়ার্কে কোনও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নাই।

এই কয়টি বিধান ছাড়া আগামী শাসনতন্ত্রের প্যাটার্ন ও প্রকৃতি, বিধান ও আকৃতি এবং ভাষা ও রূপ ঠিক করার অবাধ নিরংকুশ স্বাধীনতা গণ-পরিষদের রহিয়াছে। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ও তাঁদের নেতাদের এখন ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, এইটুকু স্বাধীনতার এলাকায় বিচরণ করিয়া যে শাসনতন্ত্র তাঁরা রচনা করিবেন, সেটাকে গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাসিক ল' বলা যাইবে কি না। অন্য কথায়, লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্ক আরোপিত বিধি-নিষেধগুলি কি এতই ঘোরতর যে, তাতে এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা সত্যই অসম্ভব ?

প্রশ্নটার বিচার দুই দিক হইতে করা যায়ঃ এক, লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্ক যদি ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে, তবে এখন তার প্রতিকার করা যায় কি না। দুই, লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্ক গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতির কতখানি ক্ষতিকর হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দিয়াই দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, তাঁর ঘোষিত নীতিমাফিক শাসনতন্ত্র রচিত না হইলে তিনি তা অনুমোদন করিবেন না। এই জন্যই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবের প্রয়োজন হইয়াছে। যদি নেতারা ধীরভাবে বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ত্রুটিগুলি

প্রতিবাদযোগ্য হইলেও সাংঘাতিক নয়, তবে পরিবেশের সাথে আপোস করিয়া 'মন্দের ভাল' পথ বাছিয়া নেওয়াই সকলের উচিত হইবে। তা না করিয়া যাঁরা ভিন্ন পথ ধরিবেন, বিধি-নিষেধের গুরুত্ব-নির্বিশেষে টেক-নিক্যাল সার্বভৌমত্ব ও আদর্শ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া আন্দোলনের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া নির্বাচন বয়কট বা ভন্ডুল করিবেন, তাঁরা পরিণামে দেশের অনিষ্টই করিবেন। প্রেসিডেন্টের লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্ক যদি অগণ-তান্ত্রিক ও জাতীয় সংহতি-বিরোধী হইয়া থাকে, তবে এই ধরনের বিক্ষোভ হইবে আরও বেশী অগণতান্ত্রিক ও জাতীয় সংহতি-বিরোধী। সার্বজনীন ভোটের প্রত্যক্ষ দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন বয়কট বা ভন্ডুল করিয়া গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহিতর কোনও উপকার করা যাইবে না, অবাধ নিরংকুশ গণতন্ত্রের নামে করিলেও না।

যাঁরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধান দাবি করি-তেছেন, তাঁরা ভুলিয়া যাইতেছেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁদের দাবি-মোতাবেক চলিতে নীতিতঃ, বস্তুতঃ ও রাজনীতিতঃ বাধ্য নন। কারণ সাতটি। এক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নন। দুই, তিনি চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর। তিন, যতদিন মার্শাল ল' আছে, ততদিন দেশের ভাল-মন্দের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একা দায়ী। চার, ঐ কারণেই কিভাবে কখন মার্শাল ল' উঠাইবেন, তা ঠিক করিবার অধিকার একমাত্র তাঁরই। পাঁচ, যতদিন মার্শাল ল' বলবৎ আছে, ততদিন দেশবাসীর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ফান্ডামেন্টাল রাইটস স্থগিত আছে। ছয়, মার্শাল ল' অথরিটির কাছে আমরা গণতন্ত্র দাবি করিতে পারি না। মার্শাল ল'ও থাকিবে, গণতন্ত্রও চলিবে, এমন হইতে পারে না। সাত, মার্শাল ল' অথরিটির কাছে ন্যায়তঃ আমরা একটিমাত্র দাবি করিতে পারিঃ 'তোমরা সরিয়া যাও।' জাবাবে মার্শাল ল' অথরিটি ন্যায়তঃ বলিতে পারেনঃ 'তোমরা এই কর, আমরা সরিয়া যাই।' লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্ক মার্শাল ল' অথরিটির এই শর্ত। আমরা যদি মার্শাল ল'র প্রত্যাহার চাই, তবে এ শর্ত আমাদের মানিতেই হইবে। তা না করিয়া যাঁরা অন্যরূপ করিবেন, তাঁরা মার্শাল ল'র হায়াতই বাড়াইবেন। গণতন্ত্রের, সুতরাং জনগণের, কোনও উপকার করিবেন না।

কথাটা নির্বাচন-বিরোধীদের জন্য যেমন সত্য, নির্বাচন সমর্থকদের জন্যও তেমনি সত্য। নির্বাচিত হইবার পরে তাঁরা যদি একটি বাস্তবানুগ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যর্থ হন, তবে জাতির ভাগ্যে ঐ একই দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিবে।

এখন বিচার করা যাক, প্রেসিডেন্টের লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্কের কথিত বিধানগুলি অগণতান্ত্রিক ও জাতীয় সংহিত-বিরোধী ধরিয়া নিলেও তারা কি এতই অগ্রহণযোগ্য ও সাংঘাতিক যে, ও-সবের প্রতিবাদে বিক্ষোভাদি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা নির্বাচন ভণ্ডুল করিয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত বা বিলম্বিত করা উচিত ? এইসব বিধানের মধ্যে 'পাকিস্তানের মুসলমানদিগকে কোরআন ও সুন্না মোতাবেক জীবন যাপন করিতে দেওয়া'-গোছের-বিধানে কারো কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না,—একমাত্র 'হাস্যকররূপে অনাবশ্যক' এই যুক্তি ছাড়া। সিরিয়াস আপত্তি উঠিতে পারে 'ইসলামী রিপাবলিক' নামে এবং 'মুসলমান ছাড়া কেউ প্রেসিডেন্ট হইতে পারিবেন না', এই বিধানে। এই ধরনের বিধান শুধু অনাবশ্যক ও জাতীয় মর্যাদা হানিকর নয়, পাকিস্তানী জাতীয়তা উন্মেষেরও পরিপন্থী। এ সম্পর্কে আমরা বহু কথা বলিয়াছি। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গণ-পরিষদে আলোচনার সময় আমাদের নেতা শহীদ সাহেবের মত হাড়ে-মজ্জায়-মুসলমানও এই দুই বিধানের প্রতিবাদে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তা সত্ত্বেও মেজরিটি ভোটে ঐসব বিধান পাশ হইয়াছিল। মেজরিটির মত মানিয়া লওয়াই গণতান্ত্রিক নীতি। সোহ্‌রাওয়ার্দী নেতৃত্বে আমরা আওয়ামী লীগাররা তা মানিয়া লইয়াছিলাম।

এ প্রসংগে পাঠকদের মনে পড়িবে যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী-নেতৃত্বে আমরা আও-য়ামী লীগাররা '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করিয়াছিলাম এবং রেফারেন্ডামে পূর্ব বাংলার জন-মত যাঁচাইর জন্য সরকার পক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলাম। সরকার পক্ষ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করায় আমরা সে শাসনতন্ত্রের রচয়িতা হিসাবে দস্তখত দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমাদের সে প্রতিবাদের সুনির্দিষ্ট ইশু ছিল। ১৯৫৪ সালের সাধা-রণ নির্বাচনে-দেওয়া ম্যানডেট যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা মতে লাহোর প্রস্তাব-ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক শাসনই ছিল সেই ইশু। পূর্ব বাংলার জনগণের-দেওয়া সেই ম্যানডেট-মোতাবেগ শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই বলিয়াই আমরা সে শাসনতন্ত্রে দস্তখত দিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু উহা মেজরিটির ভোটে রচিত হই-য়াছে, এই রাজনৈতিক সত্য মানিয়া লইয়াছিলাম। আমরা বিশ্বাস করিতাম এবং আজও করি যে, সার্বজনীন ভোটের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পার্লামেন্ট আজ হোক কাল হোক লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একদিন মানিয়া লই-বেই। কারণ পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের উহাই একমাত্র পন্থা। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, ঐভাবে গণতন্ত্র নিশ্চিত ভাবে কায়েম হইবার সাথে-সাথেই

গণতান্ত্রিক চেতনা ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধিবে। তা হইলে পর কথায়-কথায় ধর্মের দোহাই দিয়া নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার প্রবণতা নেতাদের মধ্যে আর থাকিবে না। আমরা বিশ্বাস করি, আজ যাঁরা শাসনতন্ত্রে ইসলামী বিধান করিবার জন্য যিদ করেন, তাঁরা লোক দেখাইবার জন্যই করেন, সিরিয়াসলি করেন না। শহীদ সাহেবের ভাষায় ওগুলি 'লেবেল' ও 'সাইনবোর্ডের' ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার নয়। এটা জানিতেন বলিয়াই চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর দলের হিন্দু মন্ত্রী-মেম্বররাও ইসলামিক রিপাবলিক ও মুসলিম-প্রেসিডেন্টের বিধান সমর্থন করিয়াছিলেন।

'৫৬ সালে যেমন ছিল, আজও তেমনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে প্রভাবশালী উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ধনিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় আজও সমাজে নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁরা সকলেই এই ধর্মীয় লেবেল ও সাইনবোর্ডের পক্ষপাতী। এটাই বর্তমানে পাকিস্তানের মুসলিম জন-মত এ জন-মত এতই প্রভাবশালী যে ডিক্টেটর আইউবও তাঁর '৬২ সালের 'রিপাবলিক অব পাকিস্তানকে' '৬৩ সালেই 'ইসলামিক' করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি আজকাল গণতন্ত্রীদিগকে শহীদ সাহেবের প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। জানি, আজকার 'ইসলামপন্থী' রাজনীতিক নেতারা পাকিস্তান জাতীয়তার এবং ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষতি করিতেছেন। তথাপি তাঁদের মতই আপাততঃ জন-মত। গণতন্ত্রীদের এটা মানিতে হইবে। ভুল করিয়া ভুলের শাস্তি পাইয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ এঁদের দিতে হইবে। এটাই গণতান্ত্রিক পন্থা। জোর করিয়া কারও ভুল ভাংগা গণতান্ত্রিক পন্থা নয়।

অতএব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্ধারিত চতুঃসীমার মধ্যে বিচরণ করিয়া আমরা কত বেশী গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারি, সে কথাই আজ বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বদিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে 'ইসলামিক' নাম ও 'মুসলিম প্রেসিডেন্টের' বিধানটা বড় সমস্যা নয়, সবচেয়ে যরূরী কঠিন ও অপরিহার্য সমস্যা ফেডারেশন ও অংগ-রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্নটি। আমাদের জন্য এই প্রশ্ন সাধারণ ফেডারেশন ও অংগরাজ্যের মধ্যে বিষয় বন্টনের মামুলি প্রশ্ন নয়, ভৌগোলিক ব্যবধানের দুই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা, তার উপর রাষ্ট্রের সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা এক অঞ্চলে অবস্থিতি, ব্যাপারটাকে একদিকে জটিল, অপরদিকে আশু প্রতিকার্য করিয়া তুলিয়াছে। শাসনতন্ত্রেই এর প্রতিকারের অব্যর্থ ফলপ্রদ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে খুব বড় একটা

সত্য কথা বলিয়াছেন। আমাদের শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের সে কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন ঃ 'আমাদের শাসনতন্ত্র আসলে দুই অঞ্চলের একত্রে বাস করিবার একটি চুক্তিনামা মাত্র।' পাকিস্তান একটিই। কিন্তু তার পাকস্থলী দুইটি ; দুই অঞ্চলের দুই পেট। দুই পেটেই খাদ্য দিতে হইবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, পাকিস্তানের নিরাপত্তা, শক্তিশালী কেন্দ্র ঃ কোনও যুক্তিতেই এক পেট খালি রাখা চলিবে না। এই সমস্যার সমাধানের উপর এবারকার গণ-পরিষদের সাফল্য এবং রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে।

ইত্তেফাক, ২৪শে মে, '৭০

৩৬

স্ট্রং সেণ্টার বনাম রাজধানী

প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া একটিমাত্র বাক্যে পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাস লিখিয়া ফেলিয়াছেন। বাক্যটি তিনি এই উপলক্ষে বলিয়াছেনঃ এক সাংবাদিক প্রেসিডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোনও-কোনও পূর্ব পাকিস্তানী নেতা যে নয়া গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তানে হওয়ার দাবি করিতেছেন, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্টের মত কি? জবাবে প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেনঃ 'আমি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত আনাচ-কানাচ চিনি। সারা পূর্ব পাকিস্তানে এমন একটি হলও নাই, যেখানে তিন শ' মেম্বরের একটি পরিষদের বৈঠক বসিতে পারে।'

প্রেসিডেণ্টের কথাটি সত্য। সত্য বলিয়াই মর্মান্তিক। সত্যই পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন স্হান নাই। থাকিলে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া নিশ্চয়ই নয়া গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তানেই করিতেন। প্রেসিডেণ্ট নিজের ক্ষমতা খাটাইয়া যেখানে পনর বছরের প্রচলিত প্যারিটি ভাংগিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অপহৃত জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিয়াছেন, সেখানে সম্ভব হইলে পূর্ব পাকিস্তানের মেজরিটিযুক্ত নয়া গণ-পরিষদের প্রথম বৈঠকটিও পূর্ব পাকিস্তানে বসাইয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিতেন এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্জন করিতেন।

তিনি তা করিতে পারেন নাই। তার বদলে যে উলংগ সত্য কথাটি বলিয়াছেন, তাতেও তিনি ইতিহাসই সৃষ্টি করিয়াছে। তেইশ বছর বয়সের পাকিস্তানের মেজরিটি অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের 'স্ট্রং সেন্টার' কতটা উপেক্ষা-অবহেলা করিয়াছে, একটিমাত্র বাক্যে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া তার সঠিক চিত্র আঁকিয়াছেন। যে মুসলিম-বাংলার ভোটে পাকিস্তান হইল, যে মুসলিম-বাংলা কলিকাতার দামে পাকিস্তানকে লাহোর-করাচী-পেশোয়ার কিনিয়া দিল, সেই মুসলিম-বাংলা পূর্ব 'পাকিস্তান' হইয়া সর্বত্যাগী রাজা হরিশ্চন্দ্রের গৌরব ও সান্তনা অর্জন করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার এই বাক্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, এতে পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্হা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই কথাটিতে পাকিস্তানের অতীত ও বর্তমানের সত্য ইতিহাস ত

আছেই, ভবিষ্যতেরও সুস্পষ্ট ইংগিত ও নির্দেশও এতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই বাক্যের মর্মার্থ যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এবং যথাসময়ে এর অন্তর্নিহিত হুঁশিয়ারি মাফিক কাজ করিতে পারি, তবে পাকিস্তানের বিপদ কাটিয়া যাইবে। আর যদি তা না করি, তবে সত্যই চিন্তার কথা।

কিন্তু আমাদের নেতাদের সকলে না হউক, অন্ততঃ অধিকাংশে তা বুঝিয়াছেন কি? সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কাল বলিয়া এই সময় সব দলের নেতাদের এবং ঐ সংগে দলহীন অনেক নেতারাও চিন্তাধারা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সহিত জনগণ পরিচিত হইবার সুযোগ পাইতেছে। তাঁরা পাকিস্তানের আদর্শ, ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন এবং প্রতিদিনই বলিতেছেন। নির্বাচনে জিতিলে কে কি করিবেন, তাও বলিতেছেন। ঐসব কথা যদি তাঁদের অন্তরের কথা ও সবকথা হইয়া থাকে, তবে দুঃখের সাথে বলিতেই হয় যে, অতি অল্প দুই-একজন নেতা বা পার্টি ছাড়া অধিকাংশেই আমাদের আসল সমস্যাটাই বুঝেন নাই। বুঝেন নাই বলিলে নেতাদের বুদ্ধিহীনতার ইংগিত করিয়া বেআদবি করিতে হয়। কিন্তু বুঝিয়াও আসল সমস্যা এড়াইয়া যাইতেছেন বলিলে নেতাদের সততায় সন্দেহ করা হয়। এ অবস্থায় নেতারাই ঠিক করুন, তাঁরা দেশের আসল সমস্যাটা বুঝিয়াছেন, কি বুঝেন নাই। যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে আজ সরলভাবে স্বীকার করুন, তাঁরা পাকিস্তানের নিরাপত্তার শত্রু যেখানে তালাশ করিতেছেন, সেখানে পাকিস্তানের কোনও দুশমন বাস করে না। আসলে পাকিস্তানের প্রকৃত দুশমন বাস করে নেতাদের মনে ও মস্তিষ্কে। কোনও 'বিদেশী ভাবধারা' পাকিস্তানের সংহতি-নিরাপত্তার শত্রু নয়। পাকিস্তানের সংহতি-নিরাপত্তার শক্তিশালী শত্রু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী স্বার্থপরতা। খোদা-না-খাস্তা, পাকিস্তানের যদি কোনও অনিষ্ট হয়, তবে পশ্চিমা নেতাদের এই স্বার্থান্ধতাই তা ঘটাইবে। কল্পিত বা পরিকল্পিত 'বিদেশী ভাবধারা' ও সে ভাবের দেশী কয়েকজন সমর্থক পাকিস্তান ধ্বংস করিতে পারিবে না। জন-মতই পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জন-মতই শুধু পাকিস্তান ভাংগিতে পারে, আর কেউ পারে না। হাজার মাইলের ব্যবধানের বিচ্ছিন্ন দুইটি ভূখণ্ডের লোকেরা নিজেদের কল্যাণের আশাতেই একত্রিত হইয়া পাকিস্তান গড়িয়াছে। বাহিরের কোন শক্তি পাকিস্তান গড়িয়া দেয় নাই। এক ভূখণ্ডের নেতারা স্বার্থান্ধ হইয়া যদি শুধু 'নিজেদের কোলেই ঝোল টানেন' অপর খণ্ডের মরা-বাঁচার তোয়াক্কা না করেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষায় যদি 'উভয়ে একত্রে বাস করার চুক্তি' না করেন, তবে প্রকৃতিই তার আপন পথ বাছিয়া লইবে। বাইরের কোনও দুশমনের হস্তক্ষেপের দরকার হইবে না।

পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় দুশমন দুই অঞ্চলের ডিস্‌প্যারিটি। এই ডিস্‌প্যারিটির জন্য দায়ী ভূগোল। আমাদের অপরাধ এই যে, রাষ্ট্রের রাজধানীসহ সবগুলি শক্তি-সংস্থা ও অর্থ-কোষ একটিমাত্র অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করিয়াছি। গোড়াতে এমন না করিয়া হয়ত উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ডিস্‌প্যারিটি যে অবশ্যম্ভাবী, এটা সকলেরই জানা থাকিবার কথা। কিন্তু সে কথা বলিবার দায়িত্বটা ছিল শুধু পূর্বাঞ্চলের। পূর্বাঞ্চলের নেতারা আগাগোড়া নিজেদের কর্তব্য করিয়াছেন। গোড়াতে তাঁরা সম্ভাব্য ডিস্‌প্যারিটির আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। মাঝখানে ডিস্‌প্যারিটির দ্রুত বৃদ্ধির দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়াছেন। অবশেষে ডিস্‌প্যারিটি বিপদজনক আকার ধারণ করিলে আর্তনাদ করিয়া শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। পাকিস্তানের কল্যাণের জন্যই এটা দেখা ও বলা পশ্চিমা নেতাদেরও কর্তব্য ছিল। তাঁরা তা ত করেন নাই-ই, বরঞ্চ পূরবীদের এসব কথাকে তাঁরা আঞ্চলিক সংকীর্ণতা বলিয়া গাল দিয়াছেন। অবশেষে যখন উটের পিঠ ভাংগিয়া যাওয়ার দশা হইল, তখন স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। তার বদলে ভাঁওতা দিতে লাগিলেন। ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী করার কথা, উন্নয়ন খাতে পূর্ব বাংলার জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করা ইত্যাদি এই শ্রেণীর ভাঁওতা। বলা হইল, দশ বছরের মধ্যে ডিস্‌-প্যারিটি দূর করা হইবে। দশ বছরের ডিস্‌প্যারিটি কমিল না, আরও বাড়িল। বাড়িবেই ত। 'স্বাধীন অর্থনীতি' আপন নিয়মে চলে। গোড়ায় হাত না দিয়া, ডিস্‌প্যারিটির কারণ দূর না করিয়া উপরে প্রলেপ দিয়া প্রতিকার হয় না। পশ্চিমা নেতারা এটা বুঝেন। তবু গোড়ায় হাত না দিয়া নির্দিষ্ট মেয়াদে ডিস্‌প্যারিটি দূর করার কথার পুনরাবৃত্তি করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ফ্রেম-ওয়ার্কেও এই ধরনের কথা বলা হইয়াছে। প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপ-দেষ্টারা কি সত্যই বিশ্বাস করেন, মৌলিক চিকিৎসা না করিয়া এ রোগ সারিতে পারে? সে বিশ্বাসের প্রমাণ তাঁরা আজো দেন নাই।

পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলের নেতারা শুধু ডিস্‌প্যারিটিই দেখান নাই, তার প্রতিকারের উপায়ও তাঁরা দেখাইয়া আসিতেছেন। সে প্রতিকার লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও তিন বিষয়ের ফেডারেশন। কিন্তু পশ্চিমা নেতারা এটা মানেন না। গোড়ায় ডিস্‌প্যারিটির কথা বলা ও বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে যেমন পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলিতেন, এখনও লাহোর প্রস্তাব মানে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবিকে তেমনি পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়া চলিয়াছেন। পশ্চিম

পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব নেতাই পাকিস্তানের সংহিত ও নিরাপত্তার জন্য প্রাণত্যাগের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করিতেছেন। খুবই আশার কথা। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রাণত্যাগের কোনও প্রয়োজন হইবে না। শুধু স্বার্থত্যাগ করিলেই চলিবে। প্রাণের বদলে একটু স্বার্থত্যাগ করুন, দেখিবেন, পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা দৃঢ় হইয়াছে। তবে তাঁদের প্রাণের চেয়ে স্বার্থটাই যদি বেশী মূল্যবান হয়, তবে অবশ্য আলাদা কথা। ফারসীতে একটা কথা আছে ঃ 'আগার জান মিখাহি জান মি দেহাম, আগার যর মিখাহি সির খারাশ কুনাম।' মানে, 'যদি জান চাও এখনি জান দিয়া দিব, কিন্তু যদি টাকা চাও, তবে মাথা চুলকাইব।' পশ্চিমা ভাইদের জান কোরবানির সংকল্প যদি অমন না হয়, তবে পাকিস্তানীদের মেজরিটির উপর ইনসাফ করিবার মত স্বার্থত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তার প্রতি আগ্রহের প্রমাণ দিন।

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রমাণ বৈষম্য-অসাম্য বিদ্যমান, এটা তাঁরা চোখেই দেখিতেছেন, স্বীকারও করিতেছেন। সে অসাম্য-বৈষম্য দূর করিবার আশ্বাসও দিতেছেন। কিন্তু কি প্রকারে সে অসাম্য-বৈষম্য দূর করিবেন, তা বলিতেছেন না কেন? পূর্ব পাকিস্তানীদের ছয়দফা, সাতদফা, এগারদফা, চৌদ্দদফা ইত্যাদি সবগুলিকে বিচ্ছিন্নতার দাবি বলিতেছেন। কিন্তু ঐসব দফা ছাড়া আর কি উপায়ে ক্ষমতা ও অর্থ বণ্টনে এই বৈষম্য দূর করা যায়, তার একটা অলটারনেটিভ পন্হাও কি কেউ দেখাইয়াছে? পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশের মেজরিটি হইয়াও দুই অঞ্চলের মধ্যে সমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের এবং তিন বিষয়ের ফেডারেশনের কথা বলিতেছে আর দেশের মাইনরিটি হইয়াও পশ্চিমা ভাইয়েরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা 'ও স্ট্রং সেন্টার' দাবি করিতেছে, এটা কি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়? মেজরিটি স্ট্রং সেন্টার দাবি করিবে আর মাইনরিটি স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। পাকিস্তানে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ও বিপরীত ঘটিতেছে কেন? এটা কি দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক ধারণা ও চরিত্রের পার্থক্য? পূর্ব পাকিস্তানীরা চরিত্রগতভাবেই কি রাষ্ট্র ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী? আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা কি সেইরূপ চরিত্রগতভাবেই রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের সমর্থক?

আসল কথা তা নয়। স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রক্ষমতার বণ্টনও প্রয়োগ সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষের মতই দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের ধারণাও একই। পার্থক্য শুধু এই যে, রাষ্ট্রের রাজধানী ও সাকুল্য কেন্দ্রীয় সংস্হা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্হিত। ঘরের দুয়ারে রাজধানী বলিয়াই পশ্চিম

পাকিস্তানীরা 'স্ট্রং সেন্টারের' এত মুখর ও গলাবায সমর্থক। রাজধানী যদি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত হইত, তবে 'স্ট্রং সেন্টারের' কথা তাঁরা মুখেও আনিতেন না। কাজেই পশ্চিমা নেতাদের স্ট্রং সেন্টার-প্রীতি আসলে আত্ম-স্বার্থ-প্রীতি। পাকিস্তানের নিরাপত্তা অর্থে তাঁরা বুঝেন নিজেদের ভুক্তিত অধিকারের নিরাপত্তা।

কথাটার সত্যতা এক মুহূর্তে প্রমাণিত হইতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা যদি আজ বলেন, 'ব্যস, আমরা আমাদের সব দফা-টফা ছাড়িয়া দিলাম, আমরা শুধু স্ট্রং নয়, স্ট্রংগেস্ট সেন্টারের রাযী হইলাম। আমাদের দাবি মাত্র একদফাঃ রাজধানীটা ঢাকায় আসুক। পশ্চিমা নেতারা অবশ্য এতেও রাযী হইবেন না। তাঁরা 'ডুঢ ও খাইবেন, টামাক ও খাইবেন।' রাজধানীও রাখিবেন, স্ট্রং সেন্টারও রাখিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজধানী যদি ছাড়িতেই হয় তবে স্ট্রং সেন্টারের ভূতও তাঁদেরে এক মুহূর্তে ছাড়িয়া যাইবে। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন। অতএব গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার এই শুভ-মুহূর্তে আমি সারা অন্তর দিয়া পশ্চিমা ভাইদের খেদমতে এই আরয করিতেছি যে, পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তার খাতিরে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের রাষ্ট্রের সমান অংশীদার করুন। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও রাজধানী দুইটার একটা পূর্ব পাকিস্তানকে দিয়া দিন।

ইত্তেফাক, ১৬ই মে, '৫০

৩৭

জাতীয় সম্পদ ও সাগর-বিজ্ঞান

জাতিসংঘ কর্তৃক আহূত ওশানোলজিক্যাল কনফারেন্স সফল হয় নাই। একমাস ধরিয়া জেনেভায় এই সম্মিলনীর বৈঠক চলিবার পর গত ২৮শে আগস্ট ইহার সমাপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, প্রধান-প্রধান বিষয়ে একমত হইতে না পারায় বিয়াল্লিশ জাতির এই বৈঠক আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। এখন সম্মিলনীর উদ্যোগ কমিটি জাতিসংঘের নিকট একটি গুরুত্ব-পূর্ণ রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

অনেকেই হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন, ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এই সম্মিলনী আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিন বছর আলাপ আলোচনার পর আয়োজিত এই সম্মিলনী ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্ববাসী নিশ্চয়ই নিরাশ হইবে। সত্য বটে জনসাধারণের স্তরে এই সম্মিলনীর গুরুত্ব আজো তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কিন্তু সব রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণই আজ ওশানোলজি (সাগর-বিজ্ঞান) ও ওশানোগ্রাফির (সাগর-চিত্র) গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াছেন। মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞগণ কোয়েটা বৈঠকে এ বিষয়ের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ন্যাশনাল কমিটি-অব-ওশানোগ্রাফিক্যাল রিসার্চ তিনদিন ব্যাপী আলোচনার পর অবিলম্বে একটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট-অব-ওশানোগ্রাফিক্যাল রিসার্চ স্থাপনের জন্য সরকারকে তাগিদ দিয়াছেন। কোয়েটার এই বৈঠকে কোনও পূর্ব পাকিস্তানী বিজ্ঞানী শামিল ছিলেন কি না রিপোর্টে তার উল্লেখ নাই। না থাকিলেও এই প্রস্তাবের গুরুত্ব কমে নাই। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের দিক হইতেই প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। বরঞ্চ একথা খুব জোরের সাথেই বলা যায় যে, শুধু ওশানোগ্রাফি নয়, ওশানোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে। বস্তুতঃ পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয়ে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মুদ্দত হইতেই জোর দাবি করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য সেদিনকার দাবি ছিল প্রধানতঃ আমাদের ফিশারি বিভাগেরই দাবি। ম্যারিন ফিশারি মানে সাগরে মাছ ধরার ব্যাপারটা গোড়া হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত থাকার দরুন প্রাদেশিক ফিশারি

বিভাগের এ বিষয়ে কিছু করিবার বা বলিবার ছিল না। তাছাড়া স্বাধীনতা লাভের দিনে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া আর কোনও প্রাদেশিক সরকারের ফিশারি বিভাগ ছিল না। ১৯৫০ সালে সিন্ধুর ফিশারি বিভাগটি তুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর সারা পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব সরকারের দুইটি ফিশারি বিভাগ থাকে। পাঞ্জাব স্বভাবতঃই ম্যারিন ফিশারিতে ইন্টারেস্টেড না থাকায় এ দায়িত্ব বর্তে শুধু পূর্ব বাংলা সরকারের ঘাড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার ম্যারিন ফিশারি নিজ হাতে নেওয়ায় পূব বাংলা সরকার ও-বিষয়ে আর মাথা ঘামান নাই। পক্ষান্তরে ম্যারিন ফিশারি বিভাগ কেন্দ্রীয় কৃষি দফতরের একটি উপশাখা হইয়া থাকায় উহার কার্যকলাপও স্বভাবতঃই সংকীর্ণ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় ম্যারিন ফিশারি বিভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের মাকরান উপকূলে এবং একদল জাপানী ট্রলার পূর্ব পাকিস্তানে বংগ-সাগরে সামুদ্রিক মাছের একটি যরিফ করে মাত্র। প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রয়াস নিতান্তই নগণ্য। ফলে প্ল্যান-পূর্ব মুদ্দতে আমরা যেখানে দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টন মাছ ধরিয়াছিলাম, প্রথম প্ল্যান শেষে সে পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র দুই লাখ নব্বই হাজার টন। পূর্ব পাকিস্তানের বেলা এর প্রায় সবটুকুই ধরা হইয়াছিল আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে, বড় জোর 'ইনশোর' এলাকায়। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে মাকরান উপকূলের ত্রিশ মাইলের মধ্যে এক লাখ বত্রিশ হাজার টন সামুদ্রিক মাছ ধরা হইয়াছিল।

এ অবস্থা আর চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। স্বাভাবিক কারণে এবং ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তাকিদেই মানুষ উপরে আসমানে ও সামনে সমুদ্রে নযর দিতেছে। সমুদ্রে যাইতেছে মানুষ আর শুধু মাছের তালাশে নয়, হরেক রকমের খাদ্যের তালাশে। বহু মূল্যবান সম্পদের তালাশে। অবস্থাগতিকে আমাদের মত গরীব দেশের জন্য ত বটেই, অনেক বেশী উন্নত ও সম্পদশালী দেশের জন্যও।

এইখানেই ওশানোগ্রাফি ও ওশানোলজির ভূমিকার গুরুত্ব। পাঠক ভয় পাইবেন না। আমি কোনও দুর্বোধ্য বিজ্ঞানের আলোচনার অবতারণা করিতেছি না। অধিকাংশ পাঠকের মতই আমিও এ-ব্যাপারে একজন উম্মি মানুষ। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার ও যোগ্যতা আমার নাই। তবে সব ব্যাপারের মতই বিজ্ঞানেরও একটা সাধারণ বিষয়-জ্ঞানের দিক আছে। আলোচ্য বিষয়েও আছে। জাতীয় জীবনের দিক হইতে তার গুরুত্ব আছে। সে কথাটাই উম্মি লোকের ভাষায় বলিতেছি।

আমরা পাঠশালাতেই পড়িয়াছি, পৃথিবীর একচৌথ মাটি, আর তিন-চৌথ পানি। বিজ্ঞানীরা আরও নিখুঁত হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন শতকরা একাত্তর ভাগ পানি; আর ঊনত্রিশ ভাগ মাটি। এযাবৎ মানুষ তার সব খাবার আহরণ করিয়াছে মাটি হইতে। পানি হইতে আহরণ করিয়াছে শুধু মাছ। মাছও আহরণ করিয়াছে আভ্যন্তরীণ জলাশয় হইতেই। মাছের তালাশে সাগরে গিয়াছে অনেক পরে। মাছ ও মাছ জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ ছাড়া মানুষ অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রীও আহরণ করিয়াছে সাগর হইতে। দুনিয়ার লোক সংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে তাতে শুধু মাটি আর তাদের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, আর ত্রিশ বছরে খৃষ্টীয় দুই হাজার সালে দুনিয়ার লোক-সংখ্যা দাঁড়াইবে পাঁচ শ' কোটিতে। এই পাঁচ শ' কোটি হাজার কোটি হইতে আর লাগিবে মাত্র পঞ্চাশ বছর। ঘরে ফিরিয়া পাকিস্তানের হিসাবটাই করুন। স্বাধীনতার দিন আমরা ছিলাম সাত কোটি ত্রিশ লাখ। আজ হইয়াছি বার কোটি সত্তর লাখ। পূর্ব বাংলায় সেদিন ছিলাম চার কোটি বিশ লাখ, আজ হইয়াছি সাত কোটি।

সহজে বুঝিবার জন্য পূর্ব বাংলার হিসাবটাই করা যাউক। আমাদের বর্তমান খোরাকির প্রয়োজন এক কোটি আঠারো লাখ টন। উৎপাদন মাত্র এক কোটি টন। ধরিয়া লওয়া যাক, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হইয়া গেল। জলাশয়সহ সমস্ত অনাবাদী জমি আবাদও হইয়া গেল। এক ফসলের জায়গায় দুই ফসল করিয়া উৎপাদনের হাড় বাড়াইয়া খাদ্যোৎপাদন ডবল করা হইল। ধরুন, দুই শ' কোটি টন। কিন্তু সেই সংগে হিসাব করিতে হইবে দুই হাজার সালের মাথায় আমাদের লোক-সংখ্যা হইবে দশ কোটি। বিশ শ' পঞ্চাশ সালে হইবে বিশ কোটি। হাজার জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিয়াও আমরা আঠার কোটির নিচে আসিতে পারিব না। এই আঠার কোটির খোরাকি লাগিবে সাড়ে চার কোটি টন। এই আড়াই কোটি টন ঘাটিতি খোরাকি আমরা পাইব কোথায় ? তাছাড়া আমরা চাউল, গম, শাক-সব্জি ও ফল-মূলের উৎপাদন বাড়াইবার সংগে সংগে মাছের উৎপাদন মারাত্মকরূপে কমাইয়া ফেলিব। শস্যের উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া আমরা বন-জংগল সাফ করিতেছি। বন-জংগল ও গাছ-পালার অভাবে নদী-নালা ভরাট হইয়া যাইতেছে। গভীর পানির যেসব নদী-নালা তখনও থাকিবে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে নৌকা-জাহাজ চলাচলের ফলে ও আবর্জনার দরুন সেসব নদীর পানিও মাছ জন্মের ও পালনের অনুপযোগী হইয়া যাইবে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আমরা যেসব রাসায়নিক সার ও শস্য রক্ষার জন্য যেসব

পোকা-ধ্বংসী অষুধ ব্যবহার করিতেছি, তার বিষ-ক্রিয়ায় জলা-বিলে ও নদী-নালায় মাছ জন্মিবে না, বাঁচিবেও না। আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের দুর্ভিক্ষ হইবে। প্রোটিন, ফসফরাস ও চর্বিযুক্ত এই উপাদেয় মূল্যবান খাদ্য ছাড়া আমরা বাঁচিব না। অতএব মাছের তালাশে আমাদিগকে শুধু সাগরের উপকূলে নয়, গভীর পানিতেও যাইতে হইবে। শুধু মাছ ধরিলেই চলিবে না, মাছ পালিতেও হইবে। এটা বেশি দিন পরের কথা নয়, মাত্র পঞ্চাশ বছর পরের কথা।

ইহা শুধু আমাদের সমস্যা নয়, তামাম দুনিয়ার সমস্যা। তাই আজ বিজ্ঞানোন্নত দেশসমূহে ওশানোগ্রাফি ওশানোলজির সাধনা চলিয়াছে। বিজ্ঞানে আমাদের দেশ অনগ্রসর বলিয়া ওশানোগ্রাফি ও ওশানোলজি দুইটা শব্দই আমাদের কাছে নতুন। ওশানোলজিটা আরও বেশী নতুন। তাই আমাদের বিজ্ঞানীরা তাঁদের সাম্প্রতিক কোয়েটা বৈঠকে শুধু ওশানোগ্রাফির কথা বলিয়াছেন, ওশানোলজির কথা বলেন নাই। কিন্তু দুইটাই আমাদের জন্য সমভাবে দরকারী। জিওগ্রাফি (ভূগোলশাস্ত্র) ও জিওলজির (ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান) মধ্যে যা পার্থক্য, ওশানোগ্রাফি ও ওশানোলজির মধ্যেকার পার্থক্যও মোটামুটি তাই। জিওগ্রাফিতে পাই আমরা মাটির পিঠের বিবরণ। আর জিওলজিতে মাটির ভিতরের উপাদানের বিবরণ। ঠিক তেমনি ওশানোগ্রাফিতে পাই আমরা সাগরের মানচিত্র। শুধু সাগরের পানির নয়, সাগরের তলায় যে মাটি আছে তারও চিত্র। কিন্তু ওশানোলজি আরও গভীর, আরও ব্যাপক। এই ওশানোলজিই আজ মানুষকে জানাইয়াছে যে, মাটির উপরের মতই সমুদ্রতলেও প্রচুর কয়লা, গ্যাস, তেল সোনা, রূপা ও অন্যান্য বহু মূল্যবান পাথর ও মিনারেল রহিয়াছে। মার্কিন সরকারের ওশানোলজিক্যাল বিভাগ মেক্সিকো উপসাগরে সন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, ওখানকার সাগর-তলায় অফুরন্ত লোহা, তামা, নিকেল, এলুমিনিয়াম ও দস্তার খনি আছে। তাছাড়া সেখানে এমন সব মূল্যবান ধাতুদ্রব্য আছে, যা মাটির উপরে দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মেক্সিকো উপসাগরের ঐটুকু তলাতেই আড়াই ট্রিলিয়ন (আড়াই হাজার কোটি) ব্যারেল তেল, প্রায় চার কোটি টন রূপা ও বিশ লক্ষ টন সোনা পাওয়া যাইবে।

এই ওশানোলজির সাহায্যে ম্যারিন ফিশারিও আজ অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছে। সমুদ্রের মাছের পরিমাণ হিসাব করিবার নয়া নির্ভুল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আগে শুধু প্রকৃতির সৃষ্ট মাছ ধরা হইত, এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ পালনের এবং রাখালিরও (শেফার্ডিং) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঠিকমত রাখালি করিতে না পারিলে সাগরে মাছ পালন অরণ্যে মেষ পালনের

মতই পণ্ডশ্রম হইবে। আমরা মাটিতে কৃষি করিয়া যেমন ইচ্ছামত ফসল উৎপাদন ও গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করিতে পারি, বনের ফলমূল ও হাঁস-মুরগির দিকে চাহিয়া থাকি না, বিজ্ঞানের বলে আমরা সাগরেও তাই করিতে পারিব। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন, সমুদ্দুরের যে প্রাইমারি উৎপাদন হইতে মাছের জন্ম হয়, উৎপন্ন মাছের তুলনায় সেই প্রাইমারি প্রাণীর পরিমাণ দশ হাজার গুণ। উৎপাদনের হার বাড়াইয়া আমরা কি পরিমাণ মাছ পয়দা করিতে পারি, তার প্রমাণ দিয়াছে জাপান। জাপানের মৎস্য বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন, তাঁদের বর্তমান এলাকাতেই অদূর ভবিষ্যতে বর্তমানের চেয়ে ষাট লাখ টন বেশী মাছ উৎপাদন করিতে পারিবেন।

সমুদ্র-তলের মাটিতে প্রচুর খাদ্য-দ্রব্যও পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্র-তলে এমন সব রাসায়নিক ও জৈবিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, যার খাদ্য মূল্য অসাধারণ। এসবে বহুল পরিমাণে প্রোটিন ও ভিটামিন রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে এগুলির আবাদও বাড়ান যাইবে।

পাকিস্তানের জন্য, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য, এটা নিশ্চিতরূপে সুখবর। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দুই অঞ্চলই সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলের বিস্তৃতি তার আয়তনের তুলনায় অনেক প্রশস্ত। সে হিসাবে সামুদ্রিক সম্পদে আমাদের অধিকারও বেশী। এপ্রোচও তেমনি সহজ। আজ হইতে পঞ্চাশ-একশ বছর পরে ভাত-মাছের জন্য ত বটেই, বহু জাতীয় সম্পদের জন্যও আমাদিগকে সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

সেজন্য এখন হইতেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু করিতে হইবে। সাগর-বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্হাপন করিতে হইবে। ম্যারিন ফিশারিকে আরও উন্নত করিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তান-উপকূলে পি. এন. এস. 'যুলফিকারে' বর্তমানে এ বিষয়ে যে ল্যাবরেটরি কাজ করিতেছে, ওটার এলাকা বাড়াইতে হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তান-উপকূলে অমনি একটি ল্যাবেরেটরি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এসব পরিচালনার জন্য ওশানোগ্রাফি ও ওশানোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্হাপন পাকিস্তান সরকারের একটি আশু কর্তব্য।

ইত্তেফাক, ৫ই সেপ্টেম্বর, '৭০

৩৮

ওয়ান ইউনিট ভাংগার পর

পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়াছে। 'পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে'র অবসান ঘটিয়াছে। তার স্থলে পূর্ববর্তী চারটি প্রদেশ পুনর্বহাল হইয়াছে। 'পশ্চিম পাকিস্তান' এই রাষ্ট্রীয় নামের অবসান ঘটায় এবং সেস্থলে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এই চারটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বহাল হওয়ায় পূর্বাঞ্চলের 'প্রদেশ'টির নামকরণ লইয়া সরকার স্পষ্টতঃই অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। আইন ও ন্যায়শাস্ত্রানুসারে 'পশ্চিম পাকিস্তানে'র অবসানের সংগে-সংগেই 'পূর্ব পাকিস্তানের'ও অবসান ঘটার কথা। তাতে পূর্বাঞ্চলের পূর্বনাম 'পূর্ব বাংলা' পুনর্বহাল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকার এখনও তেমন কোনও ঘোষণা করেন নাই। এদিকে আবার পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্র-নেতাদের এবং সংবাদপত্রসমূহের অধিকাংশেই পূর্ব পাকিস্তানের নাম পূর্ব বাংলা না বলিয়া 'বাংলা' রাখিবার দাবি করিতেছেন। পশ্চিমাঞ্চলের বিভক্ত পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশের নাম 'পশ্চিম পাঞ্জাব' না রাখিয়া 'পাঞ্জাব' রাখা হইয়াছে। অতএব ঐ যুক্তিতেই পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব বাংলা না হইয়া সোজাসুজি "বাংলা" হওয়ার যুক্তি অপ্রতিরোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমাঞ্চলের কোনও-কোনও নেতা, বিশেষতঃ পাঞ্জাবের নেতাদের অনেকেই পূর্বাঞ্চলের নাম বাংলা রাখার বিরুদ্ধতা করিতেছেন। নিজেরা নিজেদের প্রদেশকে পশ্চিম পাঞ্জাব না বলিয়া 'পাঞ্জাব' বলিবার পরেও তাঁরা পূর্ব বাংলাকে 'বাংলা' বলিতে আপত্তি করিতেছেন। এই আপত্তির মধ্যে যে সুস্পষ্ট অসংগতি আছে, তা তাঁদের নযরে পড়িতেছে না। এমন অবস্থায়, এসব ব্যাপারে, পড়েও না। স্বার্থপরেরা নিজের স্বার্থ ও পরের স্বার্থ এক গজকাঠি দিয়া মাপে না কোনও দিনই; রাজনীতিতে ত নয়ই, ধর্মের ব্যাপারেও না। মাকড় মারিলে এক জনের বেলায় নরকবাস আরেক জনের বেলা ধোকড় হওয়ার কথা সকলেরই জানা আছে। এই কারণেই যে কেন্দ্রীয় সরকার একই অর্ডিন্যান্সবলে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমাঞ্চলের নাম পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখিয়াছিলেন, সেই কেন্দ্রীয় সরকারই আরেক অর্ডিন্যান্স বলে পশ্চিমাঞ্চলের নাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটাইয়াছেন। অথচ পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তান

বহাল রাখিয়াছেন। সেই মাকড়-ধোকড়ের ব্যাপার। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, এর মীমাংসা করিতেই হইবে। কারণ এটা একটা সমস্যা। 'পশ্চিম পাকিস্তান'-ভাংগার এটা পরিণাম। এটা শুধু পূর্ব-পশ্চিম আঞ্চলিক সমস্যা নয়, এটা গোটা পাকিস্তানের সমস্যা।

পাকিস্তানের মত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার রাষ্ট্রে আন্তঃ-আঞ্চলিক সমস্যাও আসলে গোটা রাষ্ট্র ও জাতিরই সমস্যা। এমনি ধরনের সকল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান হিসাবেই পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ান ইউনিট গঠন করিয়া পাকিস্তানকে সমান দুই প্রদেশের রাষ্ট্র করা হইয়াছিল। এখন পশ্চিমাঞ্চলের ইউনিট ভাংগিয়া তাকে চার প্রদেশে ভাগ করায় মেজরিটি পাকিস্তানীর দেশ পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানের পাঁচ প্রদেশের এক প্রদেশ বনিয়া গিয়াছে। এতে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কি কি জটিলতা দেখা দিতে পারে, তা ক্রমে দিনের-পর-দিন একটার-পর-একটা মাথা-চাড়া দিয়া উঠিবে। যখন যেটা উঠিবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও পাকিস্তানী জাতির সংহতির খাতিরে দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রীয় দূরদর্শিতার দ্বারা তার সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে হইবে। কোনও মতেই ধামা-চাপা দেওয়া চলিবে না।

এমনি ধরনের আরেকটি সমস্যা ইতিমধ্যে উঠিয়া পড়িয়াছে। এটি কেন্দ্রীয় সাহায্য বণ্টনের প্রশ্ন। সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় সাহায্য তহবিলের শতকরা ৫৪ ভাগ পূর্বাঞ্চলে ও ৪৬ ভাগ পশ্চিমাঞ্চলে বিতরণ করিবেন। কথাটা শুনিতে ভাল। কিন্তু এর মধ্যেও সেই সনাতন শুভংকরের ফাঁকি রহিয়াছে। 'বণ্টনযোগ্য তহবিল' কথাটার মধ্যে এই ফাঁকি নিহিত। ফাঁকি আছে বলিয়াই কথাটা ঘোষণার নিচের দিকে বলা হইয়াছে। তাতে জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য তহবিলের শতকরা ৩৫ ভাগ রাখিয়া বাকী ৬৫ ভাগ প্রদেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক ৫৪ ঃ ৪৬ রেশিওতে বিতরণ করা হইবে। অবস্থাগতিকে কেন্দ্রীয় অর্থ পশ্চিমাঞ্চলেই খরচ হইবে। ফলে 'বণ্টনযোগ্য' তহবিলের ৫৪ ভাগ পূর্বাঞ্চল পাইলেও মোট তহবিলের ৩৪.১ ভাগ পাইবে পূর্বাঞ্চল এবং ৬৫.৯ ভাগ পাইবে পশ্চিমাঞ্চল। আমি আগের এক প্রবন্ধে অধ্যাপক ডাঃ কলিন ক্লার্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানীদের অভিমত দিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে, শাসন-ব্যয়ও দেশের উন্নয়ন বিনিয়োগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই হিসাবে পাকিস্তানের অধিকাংশ শাসন-ব্যয় আসলে পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে নিয়োজিত হইতেছে। এই অবস্থায় লোকদেখানোভাবে 'বণ্টনযোগ্য' তহবিলের শতকরা ৫৪ অংশ পূর্বাঞ্চলকে দিলেও আসলে পূর্বাঞ্চলের প্রাপ্তি মোট তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ

এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রাপ্তি দুই-তৃতীয়াংশ ঘটিতেই থাকিবে। এতে পূর্ব-পশ্চিমের ডিস্প্যারিটি দূর হওয়া ত পরের কথা, সে ডিস্প্যারিটি দ্রুতগতিতে বাড়িতেই থাকিবে। মনে রাখিতে হইবে, সমস্যাটা বুনিয়াদী। কারণ, এটা শুধু সাহায্য তহবিলেই সীমাবদ্ধ নয়, গোটা শাসন-ব্যয় ও দেশরক্ষা ব্যয়েও এই বৈষম্য প্রসারিত। এসবের অবসান ঘটাইয়া পূর্বাঞ্চলের ন্যায্য হক আদায় করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করিতে হইলে অসাধারণ রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞা দেখাইতে হইবে।

এসব ত গেল গোটা জাতীয় ও আন্তঃআঞ্চলিক জটিল সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা ছাড়াও ওয়ান ইউনিট ভাংগার ফলে পশ্চিমাঞ্চলে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ জটিলতা দেখা দিতে পারে। কয়েকটি ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। বাকীগুলিও ক্রমে দিন-দিন দেখা দিবে। পনর-বছর-স্থায়ী ওয়ান-ইউনিটের শাসনযান্ত্রিক কাঠামো আজিও পুরাপুরি বিভক্ত হইয়া সারে নাই। এরই মধ্যে অভিযোগ উঠিয়াছে, পাঞ্জাবী অফিসারদেরে অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার জায়গা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। সিন্ধু নদীর পানি ও মংলা-তারবেলার পানি-বিজলির শরিকানার অংশ লইয়া এমনি কথা উঠিয়াছে। পি. আই. ডি. সি. ও ওয়াপদা আজিও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনেই আছে। সেগুলি ভাগ-বণ্টনের সময়ে নানা জটিলতা দেখা দিতে বাধ্য। চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটিই যার-তার জাতিনাম পাইতেছে। শুধু পাঠানদের বাসভূমিটাই পরাধীন আমলের 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের' গোলামি-তকমা বহন করিতেছে। পাঠানরা কিছুতেই গোলামি-যুগের এই জাত-গোত্রহীন নাম বহন করিবে না।

সবচেয়ে তীব্র বিক্ষোভের মনোভাব দেখা দিয়াছে পাঞ্জাব প্রদেশে। অনেকটা সংগত কারণেই পাঞ্জাবীদের অনেকের ধারণা এবং সে ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীনও নয় যে, গোটা পশ্চিমাঞ্চলকে একত্রীভূত করিয়া ইউনিট গঠনে পাঞ্জাবীরা অনেকখানি স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা যাট হইয়াও তারা পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদে নিজেরা মাত্র শতকরা চল্লিশ ভাগ নিয়া মাইনরিটি প্রদেশগুলিকে শতকরা ষাট ভাগ আসন দিয়াছিল। পাঞ্জাবীরা এই ত্যাগের প্রতি এতটা অনুগত ছিল যে, জেনারেল আইয়ুব '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া ১৯৬২ সালে নিজস্ব যে শাসনতন্ত্র দিয়াছিলেন, তাতেও এই হার বজায় রাখা হইয়াছিল। আইউবী শাসনতন্ত্রের ২৩৯ ধারায় বিধান করা হইয়াছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ১৫০ জন মেম্বরের মধ্যে পাঞ্জাবীরা ৬০টির বেশী আসন পাইবে না। এটা শতকরা ৪০-এর হার। পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের পার্লামেন্টারী

জীবনের চার বছর মুদ্দতের মধ্যে তিন বছরেই সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধি দুই-দুইজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পাঞ্জাবের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাত্র এক বছর। এটাও পাঞ্জাবীদের স্বার্থত্যাগেরই নিদর্শন বলিয়া তাঁরা মনে করেন।

পাঞ্জাবীদের এত 'ত্যাগ' সত্ত্বেও মাইনরিটি প্রদেশগুলি তাদের ভুল বুঝিল। ওয়ান ইউনিট-বিরোধী আন্দোলনটা শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবী-বিরোধী আন্দোলনের রূপ পাইল। প্রধানতঃ উত্যক্ত হইয়াই পাঞ্জাবীরাও ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। বস্তুতঃ ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তান আইন-পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমেই ইউনিট ভাংগার প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রুখিয়া না দাঁড়াইলে ঐ সময়েই ইউনিট ভাংগিয়া যাইত। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের ঐ বিরুদ্ধতার মধ্যে কোনও দূরদর্শিতা ও দেশাত্ববোধ ছিল কিনা, থাকিয়া থাকিলে সেটা কি ছিল, সে-সব কথা আরেক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সে বিরুদ্ধতায় পাঞ্জাবীদের কোনও অবদান ছিল না। বরঞ্চ প্রধানমন্ত্রীর সে বিরুদ্ধতায় পাঞ্জাবী নেতারাই তাঁর উপর চটিয়াছিলেন বেশী। তবু মাইনরিটি প্রদেশ-গুলিতে পাঞ্জাবী বিদ্বেষ কমে নাই। 'ওয়ান-ইউনিট'কে তখনও মাইনরিটি প্রদেশের লোকেরা 'গ্রেটার পাঞ্জাব' বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। তাই আজ ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া বিভিন্ন প্রদেশ পুনর্বহাল হওয়াকে তাঁরা তাঁদের জয় মনে করি-তেছেন। মাইনরিটি প্রদেশসমূহে বিজয়োৎসব প্রতিপালিত হইতেছে। এ উল্লাস তাদের প্রাণের স্বতঃউৎসারিত আনন্দ। তারা যার-তার স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ফিরাইয়া পাইয়াছে। আনন্দ করিবার অধিকার তাঁদের নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু এই উল্লাসে তাঁরা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজের মার্শাল ল'র ক্ষমতায় পনর-বছর-স্থায়ী এই শাসনতান্ত্রিক সংস্থা ভাংগিয়া দিয়া-ছেন বটে, কিন্তু রেল, পি. আই. ডি. সি. ওয়াপডা, ওয়েপসিক, বিজলি, গ্যাস, ইত্যাদি ওয়ান ইউনিটের এলাকাভুক্ত বিষয়গুলি প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করেন নাই। ফলে এতদিনের এই সব প্রাদেশিক বিষয় আজ কেন্দ্রীয় বিষয় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানীরা এ সবকে কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে দিবে না। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানেও এগুলি কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে পারিবে না। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও প্রদেশের পক্ষেই ঐ সব বিষয়ে একক স্বত্বাধিকার নাই। অতএব পরিচালন-ক্ষমতাও নাই। এ অবস্থায় সাব-ফেডারেশনেই ছিল একমাত্র বিকল্প পন্থা। কিন্তু মাইনরিটি প্রদেশসমূহ সাব-ফেডারেশনে রাযী নাই। অবস্থাধীনে এ সব বিষয় প্রতিযোগিতা শুরু হইবে। সব প্রদেশের

নেতারাই যাঁর যাঁর প্রাদেশিক অধিকার দাবী করিবেন। ঐসব প্রতিষ্ঠানের কার্যরত কর্মচারীদেরে প্রাদেশিক ভিত্তিতে রদ-বদলের দিকে মনোনিবেশ করিবেন। এই প্রসংগে একথাও উঠিয়াছে যে, নন্-পাঞ্জাবীদেরে পাঞ্জাবের সরকারী চাকরিতে নেওয়া হইবে না। রাজনীতিক্ষেত্রে কথা উঠিয়াছে নন্-পাঞ্জাবীদের পাঞ্জাবের রাজনীতিক নেতৃত্ব দেওয়া হইবে না। জনৈক খ্যাতনামা প্রভাবশালী পাঞ্জাবী নেতা এমনও বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবী ও বাংগালীরা একজোট হইলে শাসনতন্ত্র রচনায় ও দেশ শাসনের ব্যাপারে নিরংকুশ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন।

বস্তুতঃ এমন সম্ভাবনা ও আশংকা যে একেবারে নাই, তা বলা যায় না। বরঞ্চ জাত, ভাষা, কৃষ্টি, খোরাক-পোশাক ও মাটি-আবহাওয়ার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তান এতই শতরংগা যে, তাদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও স্বার্থ-সংঘর্ষ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই বিরোধের মধ্যে একতা, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, আনাই ছিল ওয়ান ইউনিট কায়েমের মহৎ উদ্দেশ্য। ওয়ান ইউনিট প্রতিষ্ঠার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৪ সালের ২২শে নবেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাতে ইতিহাস, ভূগোল ও জাতীয় সংহতির দিক দিয়া ওয়ান ইউনিটকে অপরিহার্য একমাত্র পন্থা ত বলা হইয়াছিলই, তার উপর ইস্‌লামেরও নির্দেশ যে এক ইউনিট, তাও বলা হইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ থাকা সুস্পষ্টরূপে ইসলাম-বিরোধী, তাও খুব জোরের সাথেই বলা হইয়াছিল। তারপর ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে গণ-পরিষদের বিতর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ইউনিটের সমর্থনে যে সব হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, দীর্ঘ পনর বছর পরেও সে-সব আমার কানে ঝংকৃত হইতেছে। সে সব বক্তৃতায়ও 'কোরআন ও সুন্নারও' দোহাই দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্র-নেতাদের অনেকেই 'কোরআন ও সুন্না' ছাড়া কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতে পারেন না। কাজেই আজ ওয়ান ইউনিট ভাংগায় সমর্থনেও কোরআন ও সুন্নার কথা বলিবেন, তাতে আমরা আশ্চর্য হই না।

অতএব 'কোরআন-সুন্নার সুস্পষ্ট নির্দেশ' অনুসারেই তখন ওয়ান ইউনিট হইয়াছিল, 'কোরআন সুন্না মোতাবেকই' আজ তার অবসান হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে ঃ তারপর কি ?

ইত্তেফাক, ২৫শে জুলাই, '৭০

৩৭

ওয়ান ইউনিট ব্যর্থ হইল কেন ?

আগের প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম, পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ান ইউনিট ভাংগার পরে কি হইবে? পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রশ্নটা খুব জোরের সাথেই উঠিয়াছে। কাজেও উঠিয়াছে, চিন্তায়ও উঠিয়াছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই উঠিয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী জোরে-সোরে উঠিয়াছে। এটাও ঘটিয়াছে স্বভাবতঃই। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির মধ্যে পাঞ্জাব শুধু আকারে ও লোক-সংখ্যায়ই সকলের বড় নয়, শিক্ষা-দীক্ষায় ও মননশীলতায়ও সকলের চেয়ে অগ্রসর। এই হিসাবে এ বিষয়ে দায়িত্বও তাদেরই সবচেয়ে বেশী। কাজেই প্রশ্নটাও যেমন উঠিয়াছে আগে তাদের মধ্যেই, উত্তরটাও দিতে হইবে প্রধানতঃ তাদেরই।

কিন্তু এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ও পাইতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে, ওয়ান ইউনিট ব্যর্থ হইল কেন? ঘোষিত উদ্দেশ্যটা ছিল অতীব মহান। গোটা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো দৃঢ়-ভিত্তিক করিবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই সারা পশ্চিমাঞ্চলকে শাসনতান্ত্রিক ও শাসনযান্ত্রিক ঐক্যে সংঘবদ্ধ করাই ছিল ইউনিট গঠনের উদ্দেশ্যে। যে মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এমন উচ্চ, সম্ভাবনা ছিল যার বিপুল, সাফল্য ছিল তার অবধারিত। সেটা তবে ব্যর্থ হইল কেন? নিশ্চয়ই এর গুরুতর কারণ আছে। এক কারণ এই হইতে পারে যে, উদ্দেশ্য মহান হইলেও প্ল্যানটা ভাল ছিল না। আর এক কারণ এই হইতে পারে যে, প্ল্যানটা নিখুঁত হইলেও উদ্দেশ্যটা সাধু ছিল না। ওয়ান ইউনিট ভাংগার পরে কথা উঠিয়াছে, এর প্ল্যানও ছিল খারাপ, উদ্দেশ্যও ছিল অসাধু। ব্যর্থ যখন হইয়াছে, তখন সবাই ওটাকে গাল দিতে পারে। ব্যর্থতাই উহার মন্দত্বের প্রমাণ। দুনিয়ার ধারাই এই যে, যতদিন কোন কাজ মহৎ বলিয়া গণ্য থাকে, ততদিন অনেকেই সে কাজের পিতৃত্ব দাবি করে। যখন কাজটা অসাধু বলিয়া ধরা পড়ে, তখন আর কেউ তার পিতৃত্ব স্বীকার করে না; এ ও-কে দেখাইয়া দেয়।

হতভাগা ওয়ান ইউনিটের হইয়াছে আজ সেই অবস্থা। ১৯৫৫ সালে অনেক মনীষীই উহার জনকত্ব দাবি করিতেছিলেন। ১৯৭০ সালে যখন উহা সকলের গালমন্দ মাথায় লইয়া কবরস্থ হইল, তখন নেতাদের কেউ-কেউ ওর

পিতৃত্ব 'যাঁর-তাঁর' রাজনৈতিক দুশমনদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন অনেক নেতার দুশমন ছিলেন মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। জনগণের ও গণতন্ত্রের দুশমনদের তিনি সত্য-সত্যই ছিলেন দুশমন। সেজন্য পশ্চিমাঞ্চলের ত বটেই, পূর্বাঞ্চলেরও কোন-কোনও নেতা এই ব্যর্থ ওয়ান ইউনিটের পিতৃত্ব শহীদ সাহেবের ঘাড়ে চাপাইবার কোনও সুযোগই ছাড়িতেছেন না। সুযোগের অভাবও হয় না। প্রথমতঃ, এই ওয়ান ইউনিটের জন্য তিনি ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রিত্ব স্যাক্রিফাইস করিয়াছিলন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব বাংলাকে প্যারিটি গ্রহণ করাইয়াছিলেন শহীদ সাহেবই। এই প্যারিটির সাথে ওয়ান ইউনিট ছিল অংগাংগিভাবে জড়িত। ইউনিটের সাথে প্যারিটিও সমাধিস্থ হইয়াছে। কিন্তু প্যারিটি ব্যর্থ হইয়াছে বলা হয় নাই। উচ্চ পরিষদের বাঁকা পথে প্যারিটি আসিবে না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাজেই ইউনিটের ব্যর্থতাই আজ বিচার্য। তাই দেখা দরকার, ওটার দায়িত্ব কার। ব্যর্থ ওয়ান ইউনিটের পিতা তবে কে ?

জেনারেল আইউব তাঁর রাজনৈতিক আত্মজীবনী 'ফ্রেণ্ডস্ নট মাস্টার্স'-এ দাবি করিয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ান ইউনিট ও উভয় অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্বের স্কিম তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ১৯৫৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর লণ্ডনের এক হোটেলে বসিয়া তিনি এই পরিকল্পনা কাগজে-কলমে রচনা করেন। এই পরিকল্পনার পক্ষে জোরদার যুক্তিও তিনি স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন দেখা যায়। তারপর তিনি ২৪শে অক্টোবর যখন 'বড়লাট গোলাম মোহাম্মদের পীড়াপীড়িতে' মোহাম্মদ আলীর 'ক্যাবিনেট-অব-ট্যালেন্টস'-এ যোগ দেন, তখন তিনি একটিমাত্র শর্তে মন্ত্রী হইতে রাজী হইয়াছিলেন। সে শর্ত ছিল, তাঁর পরিকল্পিত ওয়ান ইউনিট স্কিম গ্রহণ করিতে হইবে। গবর্নর-জেনারেল ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যে তাঁর এই শর্ত মানিয়া লইয়াছিলেন, পরবর্তী ঘটনাসমূহে তা প্রমাণিত হয়। এক মাস মধ্যে ২২শে নবেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বেতার ভাষণে পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ান ইউনিট গঠনে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সে ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী যে সব যুক্তি দেন, তার সাথে জেনারেল আইউবের যুক্তিসমূহের ভাষায় ও মর্মে অনেক মিল আছে। প্রধানমন্ত্রী বেতার ভাষণ দিয়াছিলেন ১৯৫৪ সালে। জেনারেল আইউবের আত্মজীবনী বাহির হইয়াছে ১৯৬৭ সালে। তথাপি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী জেনারেল আইউবের ভাষা ও যুক্তি নিয়াছেন, না জেনারেল আইউবই প্রধানমন্ত্রীরটা গ্রহণ করিয়াছেন, এবিষয়ে সন্দেহ থাকার কোন কারণ নাই। কারণ আইউব তাঁর বই-এ বলিয়াছেন, লণ্ডন হোটেলের রচিত তাঁর সেই দলিল

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময়েই তিনি বড়লাটের হাতে দিয়াছিলেন। তা হইলে সে দলিল আজও বড়লাট-দফতরে মানে প্রেসিডেন্ট-দফতরে রহিয়াছে।

যাহোক, পাকিস্তান সরকার ২২শে নবেম্বর ১৯৫৪ সালেই জেনারেল আইউবের ইউনিট-স্কিম মানিয়া লইয়াছিলেন। তারপর ২৪শে ও ৩০শে নবেম্বর যথাক্রমে সীমান্ত প্রদেশের ও সিন্ধু প্রদেশের আইন পরিষদ ও ১১ই ডিসেম্বর পাঞ্জাব আইন পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার-রচিত ওয়ান ইউনিট স্কিম অনুমোদন করে। ১৪ই ডিসেম্বর বাহওয়ালপুর, খয়েরপুর ও বেলুচিস্তানের শাসকবর্গ পাকিস্তান সরকারের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া ওয়ান ইউনিটের শামিল হন। ১৭ই ডিসেম্বর গবর্নর-জেনারেল এক অর্ডিন্যান্স বলে পশ্চিম পাকিস্তান এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠন করেন। ২০শে ডিসেম্বর শহীদ সাহেব মোহাম্মদ আলী ক্যাবিনেটে যোগ দেন। অতএব দেখা গেল, ওয়ান ইউনিট হইয়া যাইবার পর শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রমাণিত হইল, শহীদ সাহেব ওয়ান ইউনিটের জনক নন।

বলা যাইতে পারে, শহীদ সাহেব ইউনিটের জনক না হইলেও ধাত্রী ছিলেন। তিনি বিলটির মুসাবিদা রচনা করিয়াছিলেন। পরিষদে বিলটির আলোচনাকালে এ কথা কেউ-কেউ বলিয়াছিলেন। শহীদ সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেনঃ 'এ বিল আমার রচিত নয়। আমার রচিত বিলটি পরিষদের সামনে পেশ করিবার জন্য সরকারী দলকে আমি চ্যালেঞ্জ দিতেছি।' প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী অথবা সরকারপক্ষে আর কেউ শহীদ সাহেবের এই অস্বীকৃতির প্রতিবাদও করেন নাই, চ্যালেঞ্জের জবাবে শহীদ সাহেবের রচিত বিল পরিষদে হাযিরও করেন নাই। এইখানেই কথাটা শেষ হওয়া উচিত ছিল। শহীদ সাহেবের নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নাই। না হইয়া ভালই হইয়াছে। এ বিষয়ে সত্য প্রকাশের সুযোগ মিলিয়াছে।

শহীদ সাহেব নিজে ওয়ান ইউনিট গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আওয়ামী লীগকে দিয়া তা গ্রহণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বিনাশর্তে তা করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তানের তথা গোটা পাকিস্তানের স্বার্থে দেশের শাসনতন্ত্রের পাঁচটি মূল-নীতির অন্যতম নীতি হিসাবে 'প্যাকেজ ডিল্' বা মোক্তা চুক্তিরূপে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মারিচুক্তির পাঁচটি দফাই এই প্যাকেজ ডিল্। ওয়ান ইউনিট ব্যাপারেও তিনি পশ্চিমাঞ্চলের চলিত স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলি বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। বিলের আলোচনাকালে তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেনঃ 'পশ্চিমাঞ্চলের সংহতি সাধনের জন্য ওয়ান ইউনিট করিতে

হইবে, এটা আমি মানি। কিন্তু প্রদেশগুলির বিলোপ সাধনই ওয়ান ইউনিট গঠনের একমাত্র উপায়, এটা আমি স্বীকার করি না।'

'ওয়ান ইউনিটের' রূপ-রেখা সম্পর্কে শহীদ সাহেব ও আওয়ামী লীগের ধারণা আরেকটি ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে। আওয়ামী লীগ পার্টির পক্ষে এবং শহীদ সাহেবের সম্মতিক্রমে আমি নিজে ওয়ান ইউনিট বিলে একটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়াছিলাম। এই সংশোধনীতে আমি সুপারিশ করিয়াছিলাম যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের-দেওয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়া পশ্চিমাঞ্চলে 'পশ্চিম পাকিস্তান' নামে একটি সাব-ফেডারেশন গঠন করা হোক। আর সব কথা বাদ দিলেও এই দুইটি ব্যাপার হইতেই বুঝা যাইবে, শহীদ সাহেব ও আওয়ামী লীগ কি আকৃতি-প্রকৃতির 'ওয়ান ইউনিট' চাহিয়াছিলেন। আরও বোঝা যাইবে, কেন শহীদ সাহেব ও আওয়ামী লীগ একবার ওয়ান ইউনিট মানিয়া মারিচুক্তি করিয়া পরে পরিষদ কক্ষে ইউনিটের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন? এতে দেখা যাইবে যে, শহীদ সাহেব ও আওয়ামী লীগ মত বদলান নাই। মত বদলাইয়াছিলেন অপর পক্ষ। শুধু মত বদলাইয়াছিলেন বলিলে কাজটার আসল রূপ দেখান হয় না। বিশ্বাস-ভংগ ও লিখিত ওয়াদা খেলাফ করিয়াছিলেন বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। বিশ্বাস-ভংগ ও চুক্তি-খেলাফ দুই-ভাবে করা হইয়াছিল। পাঁচ-দফা মারিচুক্তি একটা 'প্যাকেজ ডিল' হওয়া সত্ত্বেও ঐ চুক্তির একটি মাত্র দফা—ইউনিট গঠনের জন্য স্বতন্ত্র বিল আনা হইয়াছিল। সেটা আনা হইয়াছিল শাসনতন্ত্র বিলের আগে। ওয়ান ইউনিট পাস করাইবার পরে চুক্তিবিরোধী শাসনতন্ত্র-বিল আনা হইয়াছিল। শাসনতন্ত্র-বিলে চুক্তির বাকি চারটি দফার মধ্যে শুধু রাষ্ট্র-ভাষার চুক্তিটি রক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তনির্বাচন প্রথার চুক্তি দুইটি রক্ষিত হয় নাই। অধিকন্তু সর্বাত্মক প্যারিটির স্থলে শধু প্রতিনিধিত্বের প্যারিটি করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্রে এইভাবে চুক্তি ভংগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই গোটা শাসনতন্ত্র বিলে ওয়ান ইউনিটের বিধান না করিয়া তার জন্য স্বতন্ত্র বিল আনা হইয়াছিল। অথচ কথা ছিল ইউনিটসহ পাঁচটি দফাই শাসনতান্ত্রিক বিলের বিধান হিসাবে একসংগে গণপরিষদে পেশ করা হইবে। সে বিশ্বাস ভংগ করিয়া শুধু ইউনিটের জন্য স্বতন্ত্র বিলই পেশ করিলেন না; শহীদ সাহেবের রচিত বিলটি একদম গায়েব করিয়া সম্পূর্ণ নতুন বিল পেশ করিলেন। পরিষদের ১৯৫৫ সালে ৮ই আগস্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুদ্দতের প্রসিডিং পড়িলেই পাঠক-গণ দেখিতে পাইবেন, শহীদ সাহেবসহ আমরা আওয়ামী মেম্বাররা স্বতন্ত্র ইউ-নিট বিলের প্রতিবাদ করিয়া এবং শহীদ সাহেব-রচিত সম্পূর্ণ বিল পরিষদে

হাযির করিবার চ্যালেঞ্জ দিয়া কত গলা ফাটাইয়াছি। সরকার পক্ষ আমাদের চিৎকারে কান দেন নাই। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের অধিকাংশের সমর্থনে শাসকগোষ্ঠী স্টীম রোলার চালাইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের মাইনরিটি প্রদেশের জনগণের উপর এই অগণতান্ত্রিক পাষাণ চাপাইয়া দেন। এই অশুভ সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁরা সারা পাকিস্তানের জন্য শহীদ সাহেব-রচিত ফেডারেল শাসন তন্ত্রের মুসাবিদাটার বদলে সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের ইউনিটরি-ফেডারেল শাসনতন্ত্রের বিল পেশ করেন। তাতে মারিচুক্তি পদদলিত হয়। শাসকগোষ্ঠী শহীদ সাহেব-রচিত ওয়ান ইউনিট বিল গায়েব করিয়াছিলেন ওতে স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশগুলির বিলোপ সাধন করা হয় নাই বলিয়া। আর শহীদ সাহেব রচিত শাসনতন্ত্রের মুসাবিদা গায়েব করা হইয়াছিল ওতে মাত্র তিন-চার সাব-জেক্টের কেন্দ্রের যুক্ত নির্বাচনের ফেডারেল শাসনতন্ত্র ছিল বলিয়া। বস্তুতঃ, শহীদ সাহেব রচিত সে শাসনতন্ত্র 'নট ফর সার্কুলেশন' নোটসহ পুস্তকাকারে ছাপাও হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে ঐ মুসাবিদায় একুশ দফা দাবিমত দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ের উপর ইন্টার-উইং কমিউনিকেশনও ফেডারেল সরকারকে দেওয়া হইয়াছিল। শহীদ সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ তিন-চার সাবজেক্টের কেন্দ্রের বিধানে তিনি ডঃ খান সাহেব, ইস্কান্দার মির্যা ও জেনারেল আইউবের মূল্যবান সমর্থন পাইয়াছিলেন। এটা সম্ভব। কারণ জেনারেল আইউব তাঁর আত্মজীবনিতে যে লন্ডন হোটেলের দলিলের' কথা বলিয়াছেন, তাতে তিনি ঐ চার বিষয়ের কেন্দ্রের দাবিই করিয়াছিলেন। জেনারেল আইউব অবশ্য পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে ঊনপঞ্চাশ বিষয়ের কেন্দ্রের শাসন-তন্ত্র রচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি মত বদলাইয়া ফেডারেলিস্ট হইতে ইউনিটারিস্টে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। এটা অস্বাভাবিক নয়। ক্ষমতায় একবার বসিতে পারিলে সব ফেডারেলিস্টই ইউনিটারিস্ট হইয়া যান। কারণ 'পাওয়ার করাপ্টস।' ১৯৫৫-৫৬ সালের শাসকগোষ্ঠীকেও সেই 'পাওয়ার'ই 'করাপ্ট' করিয়াছিল।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, কেন 'ওয়ান ইউনিট' ব্যর্থ হইয়াছে। সেই সাথে এও নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, যে কারণে ওয়ান ইউনিট ব্যর্থ হইয়াছে, সেই কারণেই '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রও বাতিল হইয়াছে। 'ওয়ান ইউনিট সৃষ্টির মধ্যে তার ধ্বংসের বীজ, তার গড়নের মধ্যে পচনের কারণ নিহিত ছিল। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মধ্যেও ঠিক তাই ছিল। বিশ বছরের ভুক্তিত স্বায়ত্তশাসন হইতে প্রদেশগুলিকে বঞ্চিত করিয়া 'স্টং ইউনিট' করিতে চাওয়া হইয়াছিল এবং সে উদ্দেশ্যে চালাকি, চতুরতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা ও যুলুম-খুরোইযমের আশ্রয়

লওয়া লইয়াছিল। তাই ওয়ান ইউনিট ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক তেমনি, লাহোর প্রস্তাবের মত জাতীয় ওয়াদা, মারি-চুক্তির মত পবিত্র অংগীকার ও একুশ দফার মত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া পূর্বাঞ্চলের জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 'স্ট্রং সেন্টার' করিতে চাওয়া হইয়াছিল এবং তা করিতে গিয়া শঠতা-প্রবঞ্চনা ও বেঈমানি-বেওফাইর আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল। তাই '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হইয়াছে।

তবে এমন ইউনিট ভাংগার বিরোধিতায় শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রিত্ব খোওয়াইলেন কেন ? উত্তর সোজা। জনমত উপেক্ষায় যে হাতুড়ি দিয়া ইউনিট গড়া হইয়াছিল, সেই হাতুড়ি দিয়াই উহা ভাংগিতে চাওয়া হইয়াছিল। স্বায়ত্তশাসনহীন আঞ্চলিক ঐক্যসাধনে যে ভুল করা হইয়াছিল, ঐক্যহীন স্বায়ত্তশাসনের পুনপ্রবর্তনে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিতে চাওয়া হইয়াছিল। এটা করিতে চাওয়া হইয়াছিল সাধারণ নির্বাচনের মাত্র ছয়মাস আগে। স্মরণীয় যে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন দিতেছিলেন। যে কারণে সাধারণ নির্বাচনের মুখে সর্বজন-নিন্দিত '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিলের 'আইউবী বিপ্লবে'র আমরা বিরোধিতা করিয়াছি এবং রাষ্ট্রের বৈধতা ও সিল সিলার খাতিরে উহার পুনর্বহাল চাহিয়াছি, ঠিক সেই কারণেই শহীদ সাহেব সর্বজন-নিন্দিত ইউনিট ভাংগার বিরোধিতা করিয়াছেন। অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ে হয় না। অদূরদর্শিতার কুফল অদূরদর্শিতায় সংশোধন করা যায় না।

ইত্তেফাক, ৮ই আগস্ট, '৭০

৪০

আঞ্চলিক সমতা মানে ইউনিফর্মিটি নয়

শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনা পিছাইয়া দেওয়া হইল না। নির্ধারিত তারিখেই তা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়া গেল। তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্ব-পাকিস্তানী বিপুল শর্টফলের কি হইল, ইকনমিক প্যানেলের সুপারিশের কতটুকু গৃহীত হইল, তা বুঝা গেল না। ডেপুটি চেয়ারম্যানের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, ইকনমি প্যানেলের সুপারিশে তিনি 'উপকৃত' হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান যে 'উপকৃত' হয় নাই, এটা সুস্পষ্ট।

চতুর্থ পরিকল্পনার কথা আমি পরে আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, পরিকল্পনার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বুনিয়াদী পরিবর্তন সাধিত না হইলে চতুর্থ পরিকল্পনাও তৃতীয়ের পথেই যাইবে। আঞ্চলিক ডিস্প্যারিটি বাড়িবে বই কমিবে না, এটাও একরূপ অবধারিত।

আঞ্চলিক ডিস্প্যারিটির অবসান মানে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রেণী, সংখ্যা ও পরিমাণের প্যারিটি স্থাপন নয়। সুস্পষ্ট কারণেই এসব ব্যাপারে এক অঞ্চল অপর অঞ্চলের রিপ্লিকা বা প্রতিকৃতি হইবে না। দুই অঞ্চলের নিজ-নিজ সুবিধা প্রয়োজন ও কাঁচামালের লভ্যতার বিচারে তাদের উন্নয়ন ও শিল্পায়ন দুই রকমের হইবে। পৃথক-পৃথক-ভাবে উভয় অঞ্চলের এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই এটা অত্যাবশ্যক। সেজন্য প্ল্যানিং প্রয়োগ, দফাওয়ারি বরাদ্দ ও বরাদ্দ টাকা বণ্টন প্ল্যানিং কমিশন, পিকিক ও আই. ডি. বি-র মত কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে থাকিলে চলিবে না তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্ব পাকিস্তানী শর্টফলের প্রধান কারণ পিকিক ও আই. ডি. বি-র' বরাদ্দ টাকা বণ্টনে ব্যর্থতা। পূর্বাঞ্চলের ভাগে কিছু বেশী টাকা বরাদ্দ করিলেই দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য তাতে দূর হইবে না। সুস্পষ্ট কারণেই তা হইবে না। কতকগুলি সরকারী খরচা, বিশেষতঃ রাজস্ব-ব্যয়, প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তানেই বরাবরই হইতে থাকিবে। যতদিন দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকিবে, ততদিনই এই সরকারী খরচার একক সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তান পাইবে। আগের এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সরকারী খরচাকেও আজকাল উন্নয়ন-লগ্নির অবিচ্ছেদ্য অংশ ধরা হয়। অন্য সব ব্যাপারে যতই প্যারিটি করুন, নয়া শাসনতান্ত্রিক বিধানে অবস্থার পরিবর্তন না হইলে বরারর এই ডিস্প্যারিটিটা চলিতেই থাকিবে।

এটাই শাসন-ব্যয় ও প্রতিরক্ষা-খরচা। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬২ টাকা দেশরক্ষা খাতে এবং শতকরা ২০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনে ব্যয় হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের জংগী খরচা দেওয়ানী খরচার তিনগুণ। জংগী-বিভাগে পূর্ব-পাকিস্তানীর সংখ্যা নগণ্য। তাই এখানে চাকুরির প্যারিটি আনিতে বহু যুগ লাগিবে। এ অবস্থায় জংগী খরচ আঞ্চলিক সমতা আনিতে হইলে খরচার অর্ধেক টাকা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করিতে হইবে। দেশরক্ষা বাহিনীর অবস্থান দুই অঞ্চলে সমান ভাগ করা যায় কি-না, সেটা সমরবিশেষজ্ঞের বিচার্য বিষয়।

কাজেই থাকিল শুধু দেওয়ানী খরচার সমতা। রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে আনিলে সরকারী খরচার বেনিফিট পূর্ব-পাকিস্তানীরা পাইবে, এটা সুস্পষ্ট। কিন্তু রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে রাখিয়াও এই ডিসপ্যারিটির আংশিক প্রতিকার করা যায় কেন্দ্রীয় সকল সরকারী, আধা-সরকারী চাকুরিতে পূর্ব-পশ্চিমের প্যারিটি প্রবর্তন করিয়া। এটা রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও ন্যায়-নৈতিক সকল দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ব্যবহারিক বাস্তবতার দিক হইতে এটাও সহজসাধ্য নয়। এই প্রসংগে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। বহুবার বহুস্থানে কথাটা বলিয়াছি। লিখিয়াছিও। তবু এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

তৎকালে কেন্দ্রীয় চাকুরিতে পূর্ব-পশ্চিমের প্যারিটির আমি খুব জোর সমর্থক ছিলাম। একদিন আইন-পরিষদে চাকুরির প্যারিটির পক্ষে বিলাতী নযিরাদিসহ ঝাড়া আড়াই ঘণ্টাকাল খুব জোর বক্তৃতা করিয়া গলা ফাটাইলাম: বক্তৃতার পরে পশ্চিম পাকিস্তানী একজন উচ্চস্তরের নেতা লবিতে আমাকে চা খাওয়াইতে-খাওয়াইতে বলিলেন: 'তোমার মত একটা বুদ্ধিমান লোককে কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তৃতা করিতে দেখিয়া আমি তাজ্জব হইয়াছি। তুমি কেমন করিয়া আশা করিলে যে, তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীরা চাকুরিয়ার অর্ধাংশ তোমাদেরে ছাড়িয়া দিব?' তৎকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে চাকুরির সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। এই দেড় লক্ষের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানী ছিলেন চৌদ্দ হাজার। তার মানে পশ্চিম পাকিস্তানী (অবশ্য মোহাজেরসহ) ছিলেন এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার। উক্ত নেতা অতি সহজেই আমার চোখে আংগুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, মাত্র দুইটি উপায়ে কেন্দ্রীয় চাকুরিতে পূর্ব-পশ্চিমে প্যারিটি হইতে পারে। এক, ৬৮ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানীকে ডিসমিস করিয়া সেই খালি পদগুলি পূর্ব-পাকিস্তানী

দিয়া পূরণ করিতে হইবে। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানী জনমতের সম্ভাব্য বিক্ষোভের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ 'এতে কেউ রাযী হইতে পারে না। ন্যায়নীতি ও মানবতার খাতিরে তোমরাও পার না।' দুই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি-সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া এটা করা যায়। কিন্তু তাতে শাসন-ব্যয়ও দ্বিগুণ হইবে। এতে কেউ রাযী হইবেন? দেশবাসীই কি মাথাভারি শাসনযন্ত্রের মাথা আরও মোটা করিতে সম্মত হইবে? এই সব কথার পর ভদ্রলোক এই বলিয়া উপসংহার করিলেন ঃ 'মনে রাখিও, ভারতের মুসলমানরা সরকারী চাকুরিতে অংশ দাবি করায় হিন্দুরা ভারত-মাতাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে রাযী হইয়াছে। তবু চাকুরিতে অংশ দেয় নাই।'

কথাটার তাৎপর্য খুবই সাংঘাতিক কাজেই কথাটাও তিক্ত। কিন্তু তিক্ত হইলেও বাস্তব সত্য। যিনি কথাটা বলিয়াছেন, তিনিও অভিজ্ঞ, স্পষ্টভাষী, বহুদর্শী ও সত্যবাদী। কাজেই অমন সোজাসুজি এ অবস্থার প্রতিকার করা যাইবে না। উক্ত বহুদর্শী নেতার তাৎপর্যপূর্ণ কথাটার মধ্যে যে অশুভ ইংগিত আছে সেটাকে আমাদের পরিণাম বলিয়া মানিয়া নিতে আমরা পারি না। আঞ্চলিক অবিচার দূর করিবার জন্য আমরা পাকিস্তানকে দুই টুকরা করিতে পারি না। মাথার বিষ দূর করার জন্য আমার মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারি না। পূর্ব বাংলায় প্রতি অবিচার দূর করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকেও বাঁচাইতে হইবে, পাকিস্তানকেও বাঁচাইতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচার-অত্যাচারের অবসান করিতে গিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি অবিচার-অত্যাচার করিতে পারিব না। পশ্চিমা ভাইরা তেইশ বছর আমাদের শোষণ করিয়াছেন বলিয়া আগামী তেইশ বছর আমরা তাঁদেরে শোষণ করিতে পারিব না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের পিছনে ফেলিয় আগাইয়া গিয়াছেন বলিয়া তাদেরে আমরা টানিয়া পিছনে আনিতে পারি না। তাঁরা শিল্প-কারখানা সব পশ্চিম পাকিস্তানে করিয়াছেন বলিয়া সেগুলি উখড়াইয়া পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারি না। তিন শ' মেম্বর বসিবার মত আইন পরিষদের হল পূর্ব পাকিস্তানে একটিও নাই, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে দুই ডজন আছে বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের হলগুলি আলাউদ্দিনের চেরাগের জোরে পূর্ব পাকিস্তানে উঠাইয়া আনিতে পারি না।

তবে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচাইব কিরূপে? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁটি কথাটাই বলিয়াছেন ঃ 'দুই অঞ্চলকে একত্রে বাস করিবার চুক্তি করিতে হইবে। এই চুক্তিনামাই হইবে আমাদের শাসনতন্ত্র। শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারাই দুই অঞ্চলকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমান ক্ষমতাবান, সমান অধিকারভোগী, সমান

ফলভোগী শরিক করিতে হইবে। এমনি করিয়াই দুই অঞ্চল শক্তিশালী হইবে। শক্তিশালী দুই অঞ্চলের সমবেত শক্তিই হইবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শক্তি, যেমন করিয়া মানুষের দুই হাত-পা, দুই চোখ-কান হয় তার দেহের শক্তি। এ শক্তির বিচারে, এমন অধিকার বণ্টনের বেলা, কে সংখ্যায় বেশী, কার বাড়ির আংগিনায় রাজধানী, কোন্ হাতে তলওয়ার আর কোন্ হাতে ঢাল, তার বিচার করা চলিবে না। পাকিস্তান রাষ্ট্র একটাই। তার প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট থাকিবেন একজন করিয়াই। রাজধানীও কাজেই থাকিবে একটাই। তাই বলিয়া সে কারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টনে, তার অর্থ-সম্পদ বিতরণে, স্বত্ব-অধিকার, সুবিধা-বেনিফিট বিস্তারে অঞ্চলে-অঞ্চলে কোনও কম-বেশ হইতে দেওয়া চলিবে না।

এটা করা যায় কেমন করিয়া ? দুইটা মৌলিক কথার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া। কথা দুইটা এইঃ এক, দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করা মানে তাদের মধ্যে ইউনিফর্মিটি আনা নয়। দুই, দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব এক নয়। খুব সহজ ঘরের কাছের একটা দৃষ্টান্ত লউন। দুই সহোদর ভাই-এর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব এক নয়। তাদের চেহারায় এত পার্থক্য যে, দুইজনকে পৃথক করিয়া চেনা যায়। দুইজনের চরিত্র ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে, এক কথায়, তাদের ব্যক্তিত্বে, এত পার্থক্য যে, তাতেও তাদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্বে যেমন, স্বার্থেও তেমনি। দুই ভাই-এর দুই পেট। দুই জনকেই খাওয়া-পরা করিতে হয়। একজন খাইলে-পরিলে অপরের খাওয়া-পরা হয় না। কাজেই খাওয়া-পরা ও ধন-সম্পদের বেলা দুই ভাই-এর স্বার্থ পৃথক ও স্বতন্ত্র। দুই ভাই-এর একজন বা উভয়ে যদি স্বার্থপর হয়, তবে তাদের স্বার্থও হয় পরস্পর-বিরোধী। শত্রুতার হেতু এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য কিন্তু তাদের নিজেদের বেলাতেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় পক্ষ অপরের মোকাবিলা কিন্তু দুই ভাই-এর স্বার্থই এক। সে স্বার্থে অপর কেউ আঘাত করিলে দুই ভাই কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দুশমনের হামলা প্রতিরোধ করিবে। আবার পরমুহূর্তেই যার-তার স্বার্থ সামলাইতে দুই ভাই-এ ঝগড়া করিবে। দুই ভাই-এর ব্যক্তিত্ব ও স্বার্থ এমন পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তারা আদর্শ সুখী পরিবার হিসাবে একত্রে বাস করিতে পারে। শুধু তারা পরস্পরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবে না। পরিবারের সম্মান-মর্যাদা রক্ষার বেলা দুই ভাই সমবেতভাবে কাজ করিবে।

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অবস্থা ও সম্পর্ক অবিকল তাই। দুই অঞ্চলের ভূগোল, আবহাওয়া, খোরাক, পোশাক, ভাষা-কৃষ্টি, শিল্প-সাহিত্য, আচার-আচরণ, এক কথায়, তাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব পৃথক ও স্বতন্ত্র। ভৌগোলিক ব্যবধানহেতু দুই অঞ্চলের ফ্রন্টিয়ারও এক নয়। ইন্টিরিয়ারও এক নয়।

কাজেই দুই অঞ্চলের আর্থিক স্বার্থও এক নয়। এরই নাম দুই অঞ্চলের দুই অর্থনীতি। এটাই বাধ্যতামূলক করিয়াছে দুই অঞ্চলের দুই প্ল্যানিং। ব্যক্তিত্বে ও স্বার্থে এমন পৃথক হইয়াও দুই অঞ্চল দুই সহোদরের মত এক পাকিস্তান-পরিবারের দুই শরিক। পারিবারিক সম্পত্তিতে যেমন দুই ভাই-এর সমান স্বত্বাধিকার, পরিবারের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায়ও উভয় ভ্রাতার তেমনি সমান দায়িত্ব।

পাকিস্তানের, বিশেষতঃ পশ্চিম অঞ্চলের, নেতারা ধর্মাদর্শের বড় বড় কথা না বলিয়া শরিকের হক পাওনা পকেটের কড়ি ও পেটের ভাতের এই ছোট কথা দুইটি যেদিন বুঝিবেন, সেইদিনই পাকিস্তানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হইয়া যাইবে। তার আগে নয়।

ইত্তেফাক, ৭ই জুন, '৭০

৪১

আঞ্চলিক দেনা-পাওনার খতিয়ান

চতুর্থ পরিকল্পনা বিচারের আগে তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পরিমাপ হওয়া দরকার। প্ল্যানকর্তারা নিশ্চয়ই এটা করিয়াছেন। প্ল্যানিং-এর এটা পয়লা শর্ত। চতুর্থ পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনার বিচার শুধুমাত্র তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পটভূমিতেই হইতে পারে।

সরকার ও প্ল্যানাররা সরলভাবেই স্বীকার করিতেছেন, উন্নয়নের আঞ্চলিকতাই আমাদের জাতীয় জীবনের জটিলতম সমস্যা। প্রধানতঃ আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্যই প্ল্যানিং আবশ্যক হইয়াছে। বৈষম্য বাড়াইবার জন্য অবাধ অর্থনীতিই যথেষ্ট ছিল। পরিকল্পনা করিয়া আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়াইবার দরকার ছিল না। তাই সরকার ও প্ল্যানাররা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন যে, এই বৈষম্য দুই অঞ্চলের মধ্যে শুধু আর্থিক দূরত্বই আনিতেছে না, রাজনৈতিক দূরত্বও আনিতেছে, ঐ সংগে আত্মিক দূরত্বও।

কিন্তু বাস্তব সত্য কথা এই যে,অবাধ অর্থনীতির যুগে যে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছিল, পরিকল্পনা-মুদ্দতে তা কমে নাই, বাড়িয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এটা চরমে উঠিয়াছে। কারণ, বরাবরের মতই পূর্ব পাকিস্তানের বরাদ্দ-টাকা খরচ হয় নাই। যুক্তি, পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি গঠন হয় নাই। স্থানীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের নাই বলিয়া তার অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হয়। এটা বরাবর হইয়া আসিতেছে। পাকিস্তানের সৃষ্টি অবধি পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে। হইবেই ত। পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হয় নাই বলিয়া তা পশ্চিম পাকিস্তানে হইয়াছে। এক সহোদরের উদ্বৃত্ত টাকা আরেক সহোদর খরচ করিয়াছে। ভালর জন্যই খরচ হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এক পরিবারের ভাই-এর উদ্বৃত্ত টাকা অপর ভাই যে খরচ করিল, তার দামটাও কি দিতে হইবে না? পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তান শিল্পায়িত হইবে, অথচ পূর্ব পাকিস্তান তার কোনও ফল, কোনও উপকার, কোনও বেনিফিট পাইবে না। এটা অবশ্য ঠিক যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত দ্রব্য পাকিস্তানেরই সম্পদ। পূর্ব পাকিস্তানীরাও সে শিল্পজাত দ্রব্য

ব্যবহার করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীরা দাম দিয়াই সে-সব শিল্পজাত দ্রব্য কিনিয়া থাকে এবং খুব বেশী দাম দিয়াই কিনিয়া থাকে।

কাজেই যে বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানীরা এই শিল্প স্থাপন করিয়াছেন, তারও একটা মূল্য দেওয়া পশ্চিম পাকিস্তানীদের উচিত। উচিতটা এইজন্য আরও বেশী যে, যে পূর্ব পাকিস্তানীর বিদেশী মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা শিল্প স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশী মুদ্রার অভাবে নিজেরা শিল্প স্থাপন করিতে পারিতেছে না। সোজা কথায়, পশ্চিম পাকিস্তানীদের দেশী মুদ্রা আছে প্রচুর, কিন্তু সেই পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা তাদের নাই। তাই তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানীদের বিদেশী মুদ্রা আছে প্রচুর। কিন্তু দেশী মুদ্রার অভাবে তারা সে বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারিতেছে না।

এ অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের কর্তব্য কি? এক কথায় প্রশ্নটা এই : 'পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রা আছে, দেশী মুদ্রা নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের দেশী মুদ্রা আছে, বিদেশী মুদ্রা নাই। এর সুষ্ঠু উত্তরের উপরই দুই অঞ্চলের ভ্রাতৃত্ব নির্ভর করিতেছে। এইখানে আমাদের ঘরের উপমা দুই সহোদরের সম্পর্কটা আবার তোলা যাক। ধরা যাক, এক ভাই-এর ক্ষেতে শুধু পাট বা নগদা ফসল হয়। অপর ভাই-এর ক্ষেতে শুধু ধান বা খাদ্যশস্য হয়। বিদেশী মুদ্রা বিদেশে বিক্রি করা চলে। সুতরাং ধরা যাক, শুধু পাটেরই বাজার মূল্য আছে। দেশী মুদ্রা বিদেশে বিক্রি করা চলে না। সুতরাং ধরা যাক, ধানের বাজার দাম নাই। শুধু খাওয়া চলে। এ অবস্থায় পাটওয়ালা ভাই-এর কর্তব্য ধানওয়ালা ভাই-এর কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনিবার জন্য পাট, মানে টাকা দিয়া ঐ ভাইকে সাহায্য করা। পাটওয়ালা-ভাই পূর্ব-পাকিস্তান ধানওয়ালা-ভাই পশ্চিম পাকিস্তানকে বরাবর সে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু ধানওয়ালা-ভাই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে ধান দিয়া সাহায্য করিতেছে না। ফলে, পূর্ব পাকিস্তান অনাহারে থাকিতেছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থাটা অবিকল এইরূপ। তেইশ-তেইশটা বছর ধরিয়া এই অবিচার চলিতেছে। পাকিস্তান পুঁজিবাদী দেশ। দেশী মুদ্রা এখানে প্রাইভেট প্রপার্টি, কিন্তু বিদেশী মুদ্রা এখানে সরকারী ধন। এটা খরচ করিবার বা খরচের অনুমতি দেওয়ার মালিক সরকার। বিদেশী মুদ্রা খরচের অনুমতি-পত্রের নামই লাইসেন্স। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী

মুদ্রা যে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে, সে বিতরণ ও লাইসেন্স দানটাও পাকিস্তান সরকারই করিতেছেন। পাকিস্তানের দুই অঞ্চল যদি দুই সহোদর হয়, তবে পাকিস্তান সরকারই উভয়ের বাবা। এই বাবাই তেইশ বছর ধরিয়া এক পুত্রের টাকা অপর পুত্রের জন্য খরচ করিয়া আসিতেছেন। অথচ টাকা-ওয়ালা পুত্র খাদ্যাভাবে অনাহারে থাকিতেছে। বাবা ধানওয়ালা পুত্রের নিকট হইতে টাকার বদলা ধান আদায় করিয়া অনাহারী পুত্রকে খাওয়াইতেছেন না। নিতান্ত সততার সংগেই সৎবাপের মত ব্যবহার করিতেছেন। এমন না করিয়া যদি পাকিস্তান সরকার অন্যরূপ করিতেন, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইত, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ১৮ বছরের সরকারী হিসাবটাই আমাদের সামনে আছে। কাজেই এই মুদ্দতের কথাটাই আলোচনা করা যাউক। এই আঠার বছরে পূর্ব পাকিস্তান বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়াছে ১৮৩৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এই আয় হইতে সরকারী খাতে পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হইয়াছে ৪৩৬ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। আর বেসরকারী খাতে খরচ হইয়াছে ৮৭৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। মোট খরচ ১৩৪৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তান অর্জন করিয়াছে ১৪৩৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এই আয় হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইয়াছে সরকারী খাতে ৮৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ, আর বেসরকারী খাতে খরচ হইয়াছে ২৩৮৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। মোট খরচা ৩২৬৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। অতএব, পশ্চিম পাকিস্তান খরচ করিয়াছে তার আয়ের চেয়ে ১৮২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী। আর পূর্ব পাকিস্তান খরচ করিয়াছে তার আয়ের চেয়ে ৪০০ কোটি টাকা কম। আঞ্চলিক রেশিও হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান খরচ করিয়াছে শতকরা ২৯ টাকা; আর পশ্চিম পাকিস্তান করিয়াছে শতকরা ৭১ টাকা। এটাও প্রকৃত হিসাব নয়। এতেও শুভংকরের ফাঁকি আছে। পূর্ব পাকিস্তানের বেলা সরকারী আমদানি খরচাটাই আসলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হইয়াছে। এই খরচার পরিমাণ মাত্র ৪৩৬ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। বেসরকারী খাতে যে আমদানি খরচা হইয়াছে, তার অধিকাংশই করিয়াছে পূর্ব পাকিস্তানে বসিয়া পূর্ব পাকিস্তানের খাতে পশ্চিমা শিল্পী-সওদাগররাই। পূর্ব পাকিস্তানের খাতে আমদানি করা মাল কতবার করাচী বন্দরে চলিয়া গিয়াছে, তার অনেক খবর খবরের কাগজের পাঠকরা রাখেন। আর ওটা ত সমুদ্দুরের জিনিস। থাকিতও পশ্চিমা জাহাজ মালিকদের জাহাজেই। পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে স্থাপিত বা পড়িয়া-থাকা কত মাল-সরঞ্জাম সরকারের বিনা-অনুমতিতে ও অজ্ঞাতসারে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে: এ ধরনের খবরের

সংখ্যাও কম নয়। অতএব ধরিয়া লওয়া যায়, এই মুদ্দতে পূর্ব পাকিস্তানের নামে বেসরকারী খাতে যে ৮৭৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে, তারও সিংহের ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানই পাইয়াছে। সে হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে মোট খরচা ৯০০ কোটি টাকার বেশী হয় নাই। তার মানে এই যে, এই আঠার বছরে পূর্ব পাকিস্তান পাইয়াছে বছরে ৫০ কোটি। আর পশ্চিম পাকিস্তান পাইয়াছে বছরে ২০০ কোটি। ডিস্‌প্যারিটি সাধে হয় নাই!

সুখের কথা, এই আমদানি পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাজে লাগিয়াছে। তাতে গোটা পাকিস্তানেরই কাজে লাগা হইল। তার ফলে পশ্চিম-পাকিস্তানীরা সচ্ছল হইয়াছে। প্রকারান্তরে গোটা পাকিস্তানীদেরই সচ্ছল হওয়া হইল। কিন্তু এটাও ত সমান সত্য যে, তাতে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাতেও গোটা পাকিস্তানেরই ক্ষতি হইল। ফলে, পূর্ব পাকিস্তান গরিব হইল। তাতে গোটা পাকিস্তানও সেই পরিমাণে গরিব হইল।

এর প্রতিকার এই যে, অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা যে পরিমাণ খরচ করিবে, দেশী মুদ্রায় তার দাম দিবে পূর্ব পাকিস্তানকে। এখনকার দাম দিবে অবশ্য বোনাস ভাউচারের হার অনুসারেই। ন্যায়তঃ গত তেইশ বছরের টাকাটাও শোধ করা উচিত। ঐ মুদ্দতে মধ্যেও বোনাস ভাউচার প্রবর্তনের সময় হইতে দিতে হইবে বোনাস ভাউচারের হার অনুপাতেই। বোনাস ভাউচার প্রবর্তনের আগের মুদ্দতের হিসাবটা শতকরা বার্ষিক ব্যাংক রেটের সুদের বুনিয়াদেও হইতে পারে। অথবা ঐ বিদেশী মুদ্রায় স্থাপিত শিল্প কারখানার অর্জিত মুনাফার ডিভিডেন্টের বুনিয়াদেও হইতে পারে।

এ ছাড়াও আরেকটা দফা আছে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে, পশ্চিম পাকিস্তান নিজের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ও পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্তের যোগফলের চেয়েও ১৩০৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করিয়াছে। এই ফাযিল খরচাটা আসিয়াছে বিদেশী খয়রাত, কর্য অথবা বাজার দেনা বা আনফেভারবেল ব্যালেন্স-অব-ট্রেড হইতে। খয়রাতি টাকাটা পরিশোধ করিতে হইবে না। কিন্তু তাতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ জন-সংখ্যার ভিত্তিতে অর্ধেকের বেশী। ধরুন, অর্ধেক। কর্য ও বাজারদেনা শোধ করিতে হইবে বিদেশী মুদ্রায়। কাজেই ঐ দেনার দায়ও পূর্ব পাকিস্তানকে বহন করিতে হইবে। তাও বিদেশী মুদ্রা আয়ের রেশিও অনুপাতেই। আলোচ্য আঠার বছরের গড়-পড়তা হিসাবে দুই অঞ্চলের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের রেশিও পূর্ব পাকিস্তান ৬০; পশ্চিম পাকিস্তান ৪০। উপরোক্ত ও ভবিষ্যতে-কৃত সব দেনাই পূর্ব পাকিস্তান ঐ রেশিওর

ভিত্তিতেই শোধ করিবে। কাজেই এই টাকাটাও পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা ও পশ্চিম পাকিস্তানের দেনা ধরিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে।

হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, সব বিষয় বিবেচনা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে বিদেশী মুদ্রা খরচ হইয়াছে প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হইয়াছে ৫০ কোটি। এটা অবশ্য ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত হিসাব। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাকী চার বছরের মুদ্দতে আঞ্চলিক রেশিও পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে আরও বেশী হইয়াছে। তথাপি আলোচ্য আঠার বছরের রেশিওটাই বাকি চার বছরে ধরিলে মোট বাইশ বছরের মুদ্দতে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইয়াছে ৪৪০০ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে হইয়াছে ১১০০ কোটি টাকা তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার দেনা দাঁড়াইয়াছে ১৬০০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যাংক, পোস্টাল সেভিং, ডিফেন্স সার্টিফিকেট, হাউস বিলডিং ফিনান্স, যে রেটেই মুনাফা ধরেন না কেন, এই ১৬৫০ কোটি দ্বিগুণ হইয়া ৩৩০০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

মনে হয়, আমার এই হিসাব ঠিক হইয়াছে। প্ল্যানিং কমিশনের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার ইকনমিক প্যানেলের পূর্ব পাকিস্তানী অর্থ-বিজ্ঞানীরাও বোধহয় এই একই সিদ্ধান্তে পোঁছিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁদের স্বতন্ত্র রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রাইভেট খাতে প্ল্যানিং কমিশনের প্রস্তাবিত ৩৭০০ কোটির স্হলে ৭০০০ কোটি বরাদ্দের সুপারিশ করিয়াছেন। এই অতিরিক্ত ৩৩০০ কোটির সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পাওয়া ৩৩০০ কোটির অংকটা ঠিক-ঠিক মিলিয়া যায়। প্ল্যানিং কমিশন নিজেরাই যখন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রাইভেট খাতে ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ঐ পরিমাণ টাকার রিসোর্সও তাঁরা ঠিকমত দেখাইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থ-বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত বৃদ্ধির এই ৩৩০০ কোটি টাকার জন্য কমিশন-নির্ধারিত রিসোর্সের উপর কোনও চাপ পড়িবে না। পশ্চিম-পাকিস্তানের দেশীয় মুদ্রা হইতেই এই টাকাটা পাওয়া যাইবে। পাঁচ বছর মেয়াদে ৩৩০০ কোটি টাকা মানে প্রতি বছরে ৬৬০ কোটি টাকা কিস্তিবন্দিতে শোধ করা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হইবে না। এই প্ল্যান মত কাজ হইলে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ হইবে ৫৮০০ কোটি টাকার, পূর্ব পাকিস্তানে সেই মুদ্দতে খরচ হইবে ৯৫০০ কোটি

টাকার। এতে দুই অঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য অনেকখানি হ্রাস পাইবে।

প্ল্যানিং কমিশন এটা করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন, তবে নব-নির্বাচিত গণতন্ত্রী সরকারকেই এ দায়িত্ব নিতে হইবে।

ইত্তেফাক, ১৩ই জুন, '৭০

৪২

আইন ও ন্যায়ের বিচারে চৌথা প্ল্যান

চৌথা পরিকল্পনার রূপরেখার সাথে পাঠক ইতিমধ্যেই মোটামুটি পরিচিত হইয়াছেন। তাতে এটা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনার দুইটা দিক : একটা রাজনৈতিক আইন ও ন্যায়ের দিক, অপরটা অর্থনৈতিক গুণাগুণের দিক। উন্নয়নের প্ল্যান হিসাবে এর গুণাগুণের বিচার করিবার আগে এর রাজনীতি ও ন্যায়নীতিগত বুনিয়াদটার বিচার হওয়া দরকার। আমি আজ তাই করিতে চাই।

প্ল্যানিং কমিশন অবশ্য কোনও শাসনতান্ত্রিক সংস্থা নয়। কিন্তু এটা যে সংস্থার উপশাখা, সেই ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল শাসনতান্ত্রিক বিধানের সৃষ্ট একটি সংস্থা। '৫৬ ও '৬২ সালের উভয় শাসনতন্ত্রেই এই কাউন্সিল গঠনের বিধান ছিল। প্রতিবেশী ভারতের শাসনতন্ত্রেও এমন বিধান আছে। তদনুসারে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ভারতের এই কাউন্সিল গঠিত ও প্ল্যানিং কমিশন নিযুক্ত হয়। তবে তাঁদের কাউন্সিলের নামকরণ হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল। কাউন্সিল ও কমিশন দুইটারই চেয়ারম্যান হন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই হউক, আর প্রয়োজনবোধেই হউক, ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান সরকার একটি প্ল্যানিং বোর্ড গঠন করেন। তখনও আমাদের শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই, কোনও ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলও কাজেই ছিল না। বোর্ড সরাসরি অর্থ-দফ্তরের অধীন ছিল। পরে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল গঠনের বিধান হয়। প্ল্যানিং বোর্ড সেই কাউন্সিলের অধীনে যায়। প্ল্যানিং বোর্ডের নাম প্ল্যানিং কমিশন হয় প্রেসিডেন্ট আইউবের আমলে। কিন্তু ততদিনে পার্লামেন্টারি প্রথার স্থলে প্রেসিডেনশিয়াল প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। তাই প্রাইম-মিনিস্টারের স্থলে প্রেসিডেন্টই হইলেন উভয় সংস্থার চেয়ারম্যান। প্ল্যানিং কমিশনের প্রধানের নাম তাই ডেপুটি চেয়ারম্যান।

'৫৬ ও '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের প্ল্যানিং বোর্ড ও ইকনমিক কাউন্সিলে আরও একটা গুরুতর পার্থক্য ছিল। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ১৯৯ ধারামতে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল চারজন ফেডারেল মন্ত্রী ও তিনজন করিয়া

দুই প্রদেশের ছয়জন মন্ত্রী লইয়া গঠিত হইত। প্রাইম-মিনিস্টার কাউন্সিলের এক্স-অফিশিও চেয়ারম্যান ছিলেন। পক্ষান্তরে '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ১৪৫ ধারার বিধান-মতে এই কাউন্সিল প্রেসিডেন্টের মনোনীত সংস্থা ছিল। তার মেম্বর-সংখ্যা, মুদ্দত বা পদাধিকারের কোনও উল্লেখ ছিল না। বরঞ্চ প্রেসিডেন্টের প্লেযার বা মরযির উপর তাঁদের চাকুরির হায়াত নির্ভর করিত। উভয় শাসনতান্ত্রিক বিধান-মতেই কাউন্সিলের সুপারিশগুলি এবং তার বার্ষিক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে পেশ করিতে হইত এবং প্রাদেশিক আইন-পরিষদে তার কপি দিতে হইত। বলা বাহুল্য, '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের এই বিধান প্রয়োগের আগেই মার্শাল ল' প্রবর্তিত হইল।

এ বিষয়ে এত কথা বলিবার মানে এই যে, আমি দেখাইতে চাই দুইটি বিষয়ঃ প্রথমতঃ, পাকিস্তানের পরিকল্পিত অর্থনীতির সাথে জনগণের কোনও যোগ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল, সুতরাং প্ল্যানিং কমিশন, শাসনতন্ত্রেরই সৃষ্ট সংস্থা। প্রথম বিষয়টার আলোচনাই আগে করা যাক।

পাকিস্তানের গত তিন-তিনটা পাঁচসালা পরিকল্পনাই প্রযুক্ত হইয়াছে রাজনৈতিক ডিক্টেটরি আমলে। জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ অবস্থা-গতিকে এই ডিক্টেটরিটাও ছিল আঞ্চলিক। প্রথম পরিকল্পনাটা যদিও রচিত হইয়াছিল তথাকথিত পার্লামেন্টারি আমলেই, কিন্তু তার প্রয়োগের মোক্ষম শেষ দুইটা বছরই ছিল আইউবশাহির নির্ভেজাল মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার রচনা ও প্রয়োগ হইয়াছিল একনায়কত্বের হৃদয়হীন কঠোর শাসনামলেই। অবাধ-পুঁজিবাদের তখন নিরংকুশ রাজত্ব। জনগণের ভোটে অর্জিত প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তানে তখন প্রকারান্তরে, কিন্তু নির্লজ্জ প্রকাশ্যতায়, পুঁজিবাদী অমাত্য-পরিবেষ্টিত রাজতন্ত্র চলিতেছে। জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের তখন 'টু' শব্দটি করিবার ক্ষমতা বা অধিকার নাই। এইভাবে গরিব নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তান হইয়া উঠে অবাধ অর্থনৈতিক শোষণের দুনিয়ার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। সে শোষণ দৈত্যের মূর্তি ধারণ করে কার্টেল প্রথায়। এই প্রথার জোরে দেশের সব শিল্পিক ও আর্থিক সংস্থা কুক্ষিগত হয় বাইশটি পরিবারের। পাকিস্তান হইয়া পড়ে তাদের আর্থিক সাম্রাজ্য। এক কথায়, এ সবই ঘটিয়াছে সুপরিকল্পিত উপায়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাই এই সুপরিকল্পিত পন্থা।

প্রচারের জয়ঢাক পিটাইয়া এই শোষণ-ব্যবস্থাকেই 'মহান উন্নয়ন দশক'

বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্যয়-বহুল জাঁকজমকপূর্ণ এত প্রচারণা সত্ত্বেও দলমত নির্বিশেষে জনগণ ও তাদের নেতারা এই 'উন্নয়নের যুগ'কে 'ধ্বংসের যুগ' আখ্যা দিয়াছেন, আইউবশাহি খতম করিয়াছেন। আইউবশাহিকে অগ্রাহ্য করার মানেই তাঁর দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করা। পাকিস্তানবাসী তাই করিয়াছে। নিছক অর্থ-বিজ্ঞানের বিচারে এই আড়াইটি পাঁচসালা পরিকলপনা যদি পাকিস্তানের কোনও কল্যাণ করিয়া থাকে, তবে জেনারেল আইউব তার সবটুকু প্রশংসার অধিকারী। আর যদি তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের, পাকিস্তানী জাতির এবং পাকিস্তানী অর্থনীতির কোন বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, তবে তার সবটুকু নিন্দা ও দেশবাসীর অভিশাপের পাত্রও তিনি ও তাঁর সহকর্মীরাই। এইভাবে গোটা দেশবাসীর দ্বারা নিন্দিত ও বর্জিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুসৃত নীতির বুনিয়াদে আর কোনও পরিকল্পনা রচনা করা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, অন্যায় ও নীতি-বিগর্হিত।

দ্বিতীয়তঃ, ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল শাসনতান্ত্রিক বিধানের সৃষ্ট একটি জাতীয় সংস্থা। '৫৬ ও '৬২ সালের যে শাসনতন্ত্রদ্বয় এই কাউন্সিল সৃষ্টি করিতে পারিত, সে দুইটিই আজ বাতিল ও রদ-রহিত। এ অবস্থায় ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল সৃষ্টির ক্ষমতা ও অধিকার কারও নাই। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ারও না। দেশে বর্তমানে মার্শাল ল' চালু আছে। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশ শাসনের সব ক্ষমতার অধিকারী। যতদিন মার্শাল ল' বলবৎ আছে, ততদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একাধারে একযিকিউটিভ ও লেজিসলেচার; শাসনকর্তা ও আইন-রচয়িতা কিন্তু তাঁর এই সর্বময় ক্ষমতা মার্শাল ল' মুদ্দতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মর্শাল ল' মুদ্দতের বাইরে একদিনের জন্যও তাঁর এই ক্ষমতা ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হইতে পারে না। এই সময়ে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার বলে তিনি এমন কোনও কাজ করিতে পারেন না, যা পাকিস্তানকে মার্শাল ল' মুদ্দতের পরেও বাঁধিয়া রাখিতে পারে। এমন কাজ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করেনও নাই। বরঞ্চ তিনি যথাসম্ভব সত্বর নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু জাতীয় আর্থিক কাউন্সিল গঠন ও তার দ্বারা চতুর্থ পাঁচসালা পরি-কল্পনা রচনা ও ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অনুসৃত নীতির একটা গুরুতর ও সাংঘাতিক ব্যতিক্রম। এইখানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আইন-উপদেষ্টারা তাঁকে ভুল পরামর্শ দিয়াছেন। ফলে, এই পাঁচসালা পরিকল্পনার দ্বারা পাকি-স্তানের অর্থনৈতিক জীবনকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটা বিশেষ ধরনের

কাঠামোতে বাঁধা হইয়া গিয়াছে। ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল গঠনের কোনও শাসনতান্ত্রিক বুনিয়াদ না থাকায় তাঁর রচিত পাঁচসালা পরিকল্পনাও বেদাঁড়া হইয়াছে।

পাকিস্তান আজ জীবনের প্রথম গণতন্ত্রের মুখ দেখিবার আশা পাইয়াছে। আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানবাসী তাদের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ-ভোটে-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র পাইতেছে। সেই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দ্বারা দেশ শাসিত হইতে যাইতেছে। মার্শাল ল' শাসনামলের কোনও কাজই সেই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের জনকল্যাণ মূলক কর্মপন্হার প্রতিবন্ধক না হয়, সেটা দেখা মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। অথচ চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বারা তাই করা হইয়াছে। আইউবশাহির ডিক্টেটরি আমলে ১৯৬৮ সালে পরিকল্পিত ও ১৯৭০ সালে রচিত একটি জাতীয় অর্থ-নৈতিক প্ল্যানকে 'ফেইতাকম্‌প্লি' রূপে নির্বাচিত সরকারের নাকে-মুখে নিক্ষেপ করা হইতেছে। এটা কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি ন্যায়নৈতিক, কোনও দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নয়। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অবশ্য বলিয়াছেন যে, আগামী নির্বাচিত সরকার ইচ্ছা করিলে এবং দরকারবোধ করিলে এই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে পারিবেন। এই দয়ার জন্য ডেপুটি চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ। কিন্তু এটা না দেখাইলেও তিনি পারিতেন। কারণ, প্ল্যান সময়-সময় সংশোধন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার প্ল্যানিং কমিশনের নিজেরই আছে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারেরও যে সে ক্ষমতা ও অধিকার আছে সেটা ডেপুটি চেয়ারম্যানের দেওয়া-ক্ষমতা ও অধিকার নয়। প্রশ্ন এই যে, কয়েকমাস পরে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার ওটা বদলাইয়া ফেলিবেন জানিয়াও পরিকল্প-নাটা কেন করা হইল ? কেন তাঁদের জন্য এ কাজটা রাখিয়া দেওয়া হইল না ? শুধু রাখিয়া দেওয়া হইল না তা নয়, দুই হাজার তিন শ' কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য সহ সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার একটা স্কিমের দড়িতে ভবিষ্যৎ সরকারকে বাঁধিয়া যাওয়ার ব্যবস্হা হইল। পরে সংশোধন করা যাইবে, এমন কথা কোনও যুক্তিও নয়, সান্তনাও নয়। পুকুর খুঁদিয়া ফেলিলেও তা ভরাট করিয়া জমি আবার সমতল করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমার বাড়ির অস্হায়ী ম্যানেজার তাঁর ম্যানেজারি শেষ হইবার আগের দিন আমার উঠানে পুকুর খুঁদিতে পারেন না। বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির যুক্তিতেও না। ইচ্ছা করিলে এবং পছন্দ না হইলে পুকুর ভরাট করিয়া ফেলিতে পারিব, একথা বলিয়াও তিনি তা পারেন না। প্ল্যানিং কমিশনের কর্তাদের ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয়, তাঁরা যেন গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হওয়ার ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব দিতে-ছেন না। তবে কি তাঁরা আশা করেন, নির্বাচন-টির্বাচন কিছু হইবে না ?

নির্বাচন হইলেও শাসনতন্ত্র হইবে না? কাজেই গণতান্ত্রিক সরকারও হইবে না। অন্ততঃ আরও পাঁচ বছর স্থিতাবস্থা থাকিবে? অন্যথায় আসন্ন নির্বাচনের মুখে পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা ও ঘোষণা করিবার আর কি অর্থ হইতে পারে?

তারপর প্ল্যানারদের আরেকটা কথা মনে রাখা উচিত ছিল। শুধু অ ইউবী শাসনতন্ত্রেই প্ল্যানিং কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল। '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ওটা ছিল কন্‌কারেন্ট বিষয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মতে এবার 'প্রদেশগুলিকে মাক্সিমাম অটনমি দেওয়া হইবে। তদবস্থায় প্ল্যানিং কিছুতেই কেন্দ্রীয় বিষয় থাকিবে না। এই নিশ্চিত শাসনতান্ত্রিক পরিণতি জানিয়াও বর্তমানের মিলিটারি রেজিম কেন চতুর্থ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করিলেন, এটা একাধিক কারণে রহস্যজনক মনে হয়।

এর সংগে বিচার করুন পূর্ব পাকিস্তানের কথাটা। দেশের বৃহত্তম অংশে তৃতীয় পরিকল্পনার অর্ধেক কাজও হয় নাই। এখানে সে প্ল্যান পুরা করিবার আগে চতুর্থ প্ল্যান স্থগিত রাখিবার পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া উহা (চতুর্থ প্ল্যান) শুরু করার মানে পূর্ব পাকিস্তানে যাই হউক, পূর্ব পাকিস্তান যেখানেই পড়িয়া থাকুক, পশ্চিম পাকিস্তান তার উন্নয়ন-কার্য-সূচী লইয়া আগাইয়া যাইবেই; পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভাবিয়া সে এতটুকু অপেক্ষা করিবে না। পূর্ব পাকিস্তানের মন্থর গতির জন্য পশ্চিম পাকিস্তান বসিয়া থাকিতে পারে না। তাই চতুর্থ প্যান শুরু করার জন্য তার এত তাগিদ। এ প্ল্যানাকে আর যাই বলা যাক, জাতীয় প্ল্যান বলা যায় না।

ইত্তেফাক, ২০শে জুন, '৭০

৪৩

জাতীয় উন্নয়নের মাপকাঠিতে চৌথা প্ল্যান বিচার

চৌথা প্ল্যান ঘোষিত হইয়াছে বেশ কিছু দিন আগে। প্ল্যানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংবাদপত্র-পাঠক ইতিমধ্যে মোটামুটি জ্ঞানলাভ নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছেন। খবরের কাগজের মূল্যবান সম্পাদকীয় ও অনেক বিশেষজ্ঞের সারগর্ভ অভিমতও পাঠকরা পড়িয়াছেন। তাতে অর্থ-বিজ্ঞানের দিক হইতে বিষয়টায় আলোচনা মোটামুটি হইয়াই গিয়াছে। এরপর আমার মত উম্মি লোকের পক্ষে ও-দিক হইতে প্ল্যানের বিচারের দরকার নাই। কিন্তু প্ল্যানিংটা কমনম্যানের স্বার্থেই করা হয় বলিয়া একজন কমনম্যান হিসাবে নিতান্ত কমন-সেন্স হইতে কিছু বলা দরকার। সে কাজটাই আমি করিতে চাই। পাঠকদের অধিকাংশই আমার মতই কমনম্যান বলিয়া তাঁরা এতে সহজেই ব্যাপারটা বুঝিতেও পারিবেন।

বস্তুতঃ, ন্যাশনাল প্ল্যানিংটাই কমনম্যানের জন্য। ন্যাশন মানেই কমনম্যানের সমষ্টি। সেজন্য প্ল্যানাররাও কথায়-কথায় বলিয়া থাকেন, তাঁরা কমনম্যানের জন্য প্ল্যান করিতেছেন। কথাটা সত্যও। কমনম্যান ছাড়া আর কারও উন্নয়নের জন্য প্ল্যানিং-এর দরকার হয় না। প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার হইতে শুরু করিয়া বি, ডি, মেম্বর পর্যন্ত, শিল্প-মালিক, সওদাগর হইতে শুরু করিয়া কালোবাজারী মুনাফাখোর পর্যন্ত, উকিল-ব্যারিস্টার হইতে শুরু করিয়া টুনি-মোখতার পর্যন্ত জাতির সমস্ত বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কারো জন্য প্ল্যানিং-এর দরকার নাই। কোনও দিন ছিলও না। আমাদের দেশের কালোবাজারী-মুনাফাখোররা বিনা-প্ল্যানেই কোটিপতি, শিল্পপতি বনিয়াছেন। বিনা-প্ল্যানেই ঐতিহাসিক বাইশ পরিবার পাকিস্তানের মালিক হইয়াছেন। ইংরাজ সওদাগররা বিনা-প্ল্যানেই ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মার্কিন পুঁজিপতিরা বিনা-প্ল্যানেই দুনিয়া-জোড়া আর্থিক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এমনকি, 'ফ্রেন্ডস্ নট্ মাস্টার্স' পড়িবার আগে আমরা জানিতাম, জেনারেল আইউবও বিনা-প্ল্যানেই পাকিস্তান কংকার করিয়া ফিল্ড মার্শাল হইয়াছেন। এই ধরনের আন্‌কমনম্যানের উন্নয়নের জন্য কোনকালেই কোনও ন্যাশনাল প্ল্যানিং-এর দরকার হয় নাই।

কাজেই দেখা গেল, ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের জন্ম কমনম্যানের খেদমতের জন্য। প্ল্যানিং কমিশনও তাই সব প্ল্যান করিয়া থাকেন কমনম্যানের কল্যাণের জন্যই। এদেশের কমনম্যানের কল্যাণ মানে তার আর্থিক উন্নয়ন। আর্থিক উন্নয়ন মানে আগে পেটেভাতে বাঁচিয়া থাকা। শেরে-বাংলার ভাষায় দুইমুঠা 'ডাল-ভাতের' ব্যবস্থা করা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সে ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা, কমনম্যানের দৃষ্টি পড়িতেছে আগে সেই দিকে।

এই দিককার বিচারে চতুর্থ প্ল্যানের কথিত টার্গেট এই কয়টি ঃ

(১) মাথা-পিছু আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন হার শতকরা সাড়ে সাত ভাগ বাড়ান হইবে। এতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হইবে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়নের হার হইবে শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ মাত্র।

(২) খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ান হইবে অতিরিক্ত সাড়ে আশি লক্ষ টন। মানে বছরে ষোল লক্ষ টনের বেশী। এতে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্যশস্যে প্রথম বছরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতিও ঐ পরিমাণ।

(৩) আর্থিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলাইয়া যাতে সামাজিক ইনসাফও চলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে মেহনতি জনতার মজুরি বাড়ান এবং নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের দাম কমান হইবে। এটা বাস্তবায়িত হইলে যে কমনম্যানের জন্য একটা কাজের মত কাজ হইবে, তা স্বীকার করিতেই হইবে।

(৪) পঁচাত্তর লক্ষ নতুন লোকের কর্মসংস্থান হইবে। আশা করা যাইতে পারে, এই কর্মগুলি আঞ্চলিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ করা হইবে।

(৫) পাঁচ বছরে দেড়শ কোটি অর্থাৎ বছরে ত্রিশ কোটি টাকা খরচ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। এটা হইবে সত্যই একটা দেখিবার বিষয়।

কমনম্যান মানে জনসাধারণের জীবনের দিক হইতে উপরোক্ত পাঁচটি দফাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেম-ওয়ার্কের দেওয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 'ফাইভ প্রিন্সিপলের' সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এবং ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মিলনীর পঞ্চশিলা বলা যাইতে পারে। কিন্তু জনগণের জীবনে বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের দিক হইতেও ঐ দফাগুলি 'প্রিন্সিপল' ও 'শিলা' হইয়াই থাকিবে কিনা, সেটাই আমাদের বিচার্য।

প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের হার সাড়ে সাত ভাগ বৃদ্ধির কথাটাই ধরা যাক। এই বৃদ্ধিটা প্ল্যানাররা কিসের বুনিয়াদে ধরিয়াছেন, তা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। প্ল্যান প্রয়োগের ডিরেকটিভ ও গাইডলাইন অর্থাৎ নির্দেশনামায় ওসব তথ্য-বিবরণ আছে কিনা, বলিবার উপায় নাই। কারণ প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান জানাইয়াছেন, ওসব রচনা হইতেছে, প্রকাশ করিতে মাসখানেক সময় লাগিবে। প্ল্যান ঘোষণা হইবে আগে, তার প্রয়োগ-বিধি ঘোষিত হইবে একমাস পরে, এর মধ্যে যে কি বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে, আমরা উম্মি লোকেরা তা' বুঝিতে পারি না। কাজেই তথ্য বিবরণী দিয়া এই বৃদ্ধির হারটা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে পারিতেছি না। মনে হয়, প্ল্যানের বরাদ্দ মোট টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে তিন শ' কোটি টাকা যে বেশি ধরা হইয়াছে, এই হইতে ঐরূপ বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছে। এই বেশি বরাদ্দই যদি পূর্ব পাকিস্তানের বেশি হারে বৃদ্ধির একমাত্র বুনিয়াদ হইয়া থাকে, তবে সে বৃদ্ধি তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আকাঙক্ষিত বৃদ্ধির মতই হিসাবের খাতায় সীমাবদ্ধ থাকিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাও এই বিশেষজ্ঞরাই করিয়াছিলেন। তাতেও পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বৃদ্ধির হার শতকরা সাত ভাগ ধরা হইয়াছিল। তাতেও পশ্চিম পাকিস্তানের ২৫০০ কোটির মোকাবিলায় পূর্ব পাকিস্তানে ২৭০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু তার ফল কি হইয়াছিল? সরকারী রিপোর্ট মতেই পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। উন্নয়নের হার সাতের জায়গায় হইয়াছিল মাত্র ৩·৮। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানে আকাঙক্ষিত ৫·২ হারের স্থলে ৬·৫ হইয়াছিল। এই উন্নয়ন-বৈষম্যের অনেক কৈফিয়ত দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠনের অভাবে প্ল্যানের বরাদ্দ টাকা খরচ হয় নাই বলিয়াই এখানে উন্নয়নের হার কম হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় মূলধন থাকায় বরাদ্দ টাকাত খরচ হইয়াছেই, তার উপর '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা বাবদ অনেক বেশি খরচ হইয়াছে। তার ফলেই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের হার অত বেশি হইয়াছে।

সব ব্যর্থতারই কৈফিয়ত আছে। সব ঘটনার কারণ আছে। বরাবরই থাকিবে। প্রত্যেক বারের প্ল্যানে যে পূর্ব পাকিস্তানে এত শর্টফল হইয়া থাকে, তারও নিশ্চয়ই কারণ আছে। সে কারণ ভবিষ্যতেও থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দের চেয়ে বেশি টাকা খরচ হইয়া যায় এবং তাতে উন্নয়নের হার জাতীয় উন্নয়নের তুলনায় বাড়িয়া যায়। তারও নিশ্চয়ই কারণ আছে। সে কারণও বরাবরই আছে। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। পশ্চিমা ভাইদের উন্নতিতে

আমাদের মনে কোনও ঈর্ষা নাই। বরঞ্চ আমরা খুশি। কিন্তু আমাদের উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁরা এত লুকোচুরি করেন কেন? কেন অমন শুভংকরের ফাঁকি দেন? কেন কুমিরের বাচ্চা দেখানোর কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়? পূর্ব পাকিস্তানের বরাদ্দ টাকার অর্ধেকও খরচ হইবে না জানিয়াই কি এখানে বেশি টাকা ধরেন? পশ্চিমে বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি খরচ হইবে জানিয়াই কি সেখানে কম ধরিয়া থাকেন? এটা আপনা হইতেই হয় না। কারণ, প্ল্যান করিবার কর্তাও তাঁরাই, খরচ করার মালিকও তাঁরাই।

প্ল্যানাররা এমন চালাকিটা কেন করেন? কেন তাঁরা মনে করেন, পূর্ব পাকিস্তানীদেরে অমন ফাঁকি দেওয়া দরকার? কেন তাঁরা সত্য কথাটা আমাদের কাছে স্বীকার করেন না? সত্য বলিতে তাঁদের এত দ্বিধা কেন? নিজের দেশবাসীকে, ধর্মের ভাইকে, কেন তাঁরা বিশ্বাস করেন না? তাঁরা কি মনে করেন, পূরবীরা পশ্চিমা ভাইদের এ চালাকি বুঝেন না? বরাদ্দের বেলা পীর সাহেব, আর খরচের বেলা সৎ-মা সাজার কথা কি পূরবীরা জানে না? সৎ-মা যখন নিজের ছেলের জন্য কলা ও সতীনের ছেলের জন্য আসমানের চান্দ বরাদ্দ করেন, কিম্বা পীর সাহেব যখন বলেন, 'আল্লারে যা দিবা মান, আর আমারে যা দিবা আন,' তখন ত তাঁরা পশ্চিমা প্ল্যানারদের মতই কাজ করেন।

পশ্চিমের চেয়ে পূর্বের উন্নয়ন হার বৃদ্ধির ওয়াদাটাও এমনি একটা ফাঁকি। বিজ্ঞানীরা ত বটেই, কমনম্যানও জানে যে, উন্নতিশীল লোক বা অঞ্চলের উন্নয়ন-বেগ পানির স্রোতের বেগের মতই। বাঁধ দিয়া না ঠেকাইলে তা থামে না। তবু আমাদের প্ল্যানাররা দুই অঞ্চলের উন্নয়ন হারে সমতা আনিবার জন্য পশ্চিমের উন্নয়ন হার কমাইবার ওয়াদা করিলেন। অথচ ডেপুটি চেয়ারম্যান সংগে সংগে এ-ও বলিলেন, 'আমরা উন্নয়নের টেমপো মেইনটেইন করিব।' এটাই সত্য কথা। আগেরটা সত্য নয়। অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের গতিবেগ বাড়ান যায়। কিন্তু অগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের গতিবেগ কমান যায় না। এ অবস্থায় অনগ্রসর পূর্বাঞ্চলের উন্নতির হার পৌণে চার হইতে সাড়ে সাত হইবে এবং এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের হার সাড়ে পাঁচে বসিয়া থাকিবে, একথা কোনো পূর্ব পাকিস্তানীই বিশ্বাস করিবে না। প্ল্যানাররাও এটা বিশ্বাস ও আশা করেন না। যদি তাঁরা তা করিতেন, তবে দুইটা কাজ অবশ্যই করিতেন। প্রথমতঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটাকে প্রথম প্রায়রিটি দিতেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি প্ল্যানের শর্টফলের প্রকল্পগুলি ও তাঁদের বরাদ্দ টাকা 'ক্যারি-ওভার' হিসাবে পরবর্তী প্ল্যানে ধরিতেন। প্ল্যানাররা এর একটিও করেন নাই।

ইত্তেফাক, ২৭শে জুন, '৭০

৪৪

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের বুনিয়াদ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

আগের প্রবন্ধে বলিয়াছি, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশনের সদিচ্ছা পরিমাপের গজকাঠি দুইটি ঃ, এক, বন্যা-নিয়ন্ত্রণে তাঁদের আন্তরিক উদ্যম; দুই, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে এক প্ল্যানের শর্টফল পরের প্ল্যানে ক্যারি-ওভার।

বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কথাটাই আগে কওয়া দরকার। কারণ এটাই পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের এক নম্বর ইনফ্রাস্ট্রাকচার। চৌথা প্ল্যানে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৫ বছরে ১৫০ কোটি। তার মানে বছরে ৩০ কোটি। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের মত বিশাল আকারের বিপুল ব্যয়সাধ্য প্রকল্পের জন্য বছরে ৩০ কোটি বরাদ্দের মধ্যে আর কিছু না থাক, প্রচুর পরিহাস আছে।

প্ল্যানিং কমিশনের ডিপুটি চেয়ারম্যান অবশ্য তাঁর পয়লা জুলাইর প্রেস কনফারেন্সে বলিয়াছেন যে, কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাবদ দুইশ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার অত বেশি টাকা নিতে আপত্তি করায় কমিশন বাধ্য হইয়াই এই দেড়শ' কোটি বরাদ্দ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে দেড়শ'-দুইশ'র মধ্যে পার্থক্য কি, তার বুনিয়াদই বা কি, ডিপুটি চেয়ারম্যান তা বলেন নাই। তবে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কোনও স্কীম তৈয়ার করিতে পারেন নাই বলিয়াই কমিশন আরও বেশী টাকা দিতে পারিলেন না। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এই গাফলতির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য এখনও কোনও বিদেশী সরকারের কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন নাই। ডিপুটি চেয়ারম্যানের এই দুইটি কথাই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব ও অবোধগম্য। পূর্ব পাকিস্তান সরকার এ অভিযোগের জবাব দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। আশা করি, তাঁরা এর কৈফিয়ত দিয়া পূর্ব পাকিস্তানবাসীর প্রতি তাঁদের কর্তব্য করিবেন।

কিন্তু আমাদের জ্ঞাতব্য ও জিজ্ঞাস্য এই যে, প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে এই অটনমি দেওয়া হইয়াছিল কবে হইতে? আমরা ত জানি, আইউবশাহি প্রবর্তনের সাথে-সাথেই আওয়ামী লীগ সরকার-প্রতিষ্ঠিত

পূর্ব পাকিস্তান প্ল্যানিং বোর্ড ভাংগিয়া দিয়া প্ল্যানিং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নেওয়া হয়। তারপর '৬২ সালের আইউবি শাসনতন্ত্রে প্ল্যানিংকে কেন্দ্রীয় বিষয় করা হয়। বর্তমান মার্শাল ল'র আমলেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার মানে প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত গবর্নরের সরকার। এঁদের উপর স্কীম তৈয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হইয়া থাকিলেও তা কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মাত্র কয়েকদিন আগে ঘোষণাও করিয়াছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা জাতীয়-সমস্যা; জাতীয় ভিত্তিতেই সরকার এ সমস্যার সমাধান করিবেন। সেজন্য অতি সত্বর সরকার এই প্রকল্প হাতে নিবেন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার বাইরেই সে প্রকল্প সমাধা করা হইবে। এতে বুঝা গিয়াছিল, বন্যা-নিয়ন্ত্রণের স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকারই করিতেছেন এবং প্ল্যানের বাইরেই তা হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা স্কীম, তারবেলা, মঙ্গলা, লবণাক্ততা ও জলবদ্ধতার হাজার হাজার কোটি টাকার সব প্রকল্পই পাঁচসালা প্ল্যানের বাহিরে সমাধা করা হইয়াছে।

কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যয়টা প্ল্যানের বরাদ্দ খরচের বাহিরে রাখা হউক, পূর্ব পাকিস্তানীদের এই দাবি পূরণের পন্থা হিসাবেই প্রেসিডেন্ট ঐ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন প্রেসিডেন্টের এই প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছেন। যুক্তি দিয়া সোজাসুজি প্রেসিডেন্টের ওয়াদা-বিরোধী কাজ করিলে সেটা হইত অন্য কথা। কিন্তু প্ল্যানিং কর্তারা এখানেও তাঁদের মজ্জাগত চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কথায় তাঁরা বলিয়াছেন বন্যা-নিয়ন্ত্রণকে প্ল্যানের বাহিরে রাখা হইল। কিন্তু কাজের বেলা এবং হিসাবের অংকে বন্যা-নিয়ন্ত্রণকে প্ল্যানের ভিতরে রাখা হইয়াছে। প্ল্যানে মোট বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের বেলা বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ১৫০ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা বাঁধের ৩০০ কোটি-একুনে ৪৫০ কোটি ধরিয়াই ৭৫০০ কোটি হয়। মোট বরাদ্দ হইতে এই ৪৫০ কোটি বাদ দিয়া প্ল্যানের মোট বরাদ্দ ৭০৫০ কোটি বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া ও পাওয়া যাইত। কিন্তু সে পথও বন্ধ। ডিপুটি চেয়ারম্যান তাঁর ব্যাখ্যায় পরিষ্কার বলিয়াছেন, চৌথা প্ল্যানের বরাদ্দ তেসরা প্ল্যানের বরাদ্দের শতকরা ১৪৪ ভাগ বেশি করা হইয়াছে। তেসরা প্ল্যানের মোট বরাদ্দ ছিল ৫২০০ কোটি। ৫২০০ কোটির শতকরা ১৪৪-এ হয় ৭৫০০ কোটি; ৭০৫০ কোটি হয় না।

তার উপর আরেকটা মোটা চালাকি করা হইয়াছে। প্ল্যানের বাইরেই হউক, আর ভিতরেই হউক, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণকে তারবেলার সাথে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তারবেলা বাঁধ সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য

অংগ হিসাবে বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে বহুদূর সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। তার সংগে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণকে মাইনর পার্টনার রূপে জুড়িয়া দেওয়া নিতান্ত কাগজি বরাদ্দ ছাড়া আর কিছু নয়। তার প্রমাণ পাইতে দেরি হইবে না।

অথচ এতসব মোটা চালাকির কোনও দরকার ছিল না। সোজাসুজি কথাটা বলিয়া ফেলিলে শোভনও হইত, পূর্ব পাকিস্তানীরা এর চেয়ে বেশী সান্ত্বনাও পাইত। সোজাসুজি বলা যাইত ঃ 'নানা কারণে বন্যা-নিয়ন্ত্রণটা প্ল্যানের বাহিরে রাখা উচিত মনে করা হইল না। জাতীয় সমস্যা হিসাবেই এটাকে প্ল্যানভুক্ত করা হইল। সেই কারণে এতদিনের প্ল্যানের বাইরের তারবেলাকেও প্ল্যানের ভিতরে আনা হইল।' অথবা বলা যাইত ঃ 'চৌথা প্ল্যানের মোট বরাদ্দ ৭০৫০ কোটি ধরা হইল ইত্যাদি।' সে অবস্থায় ডিপুটি চেয়ারম্যান চৌথা প্ল্যানে তেসরা প্ল্যানের ১৪৪ ভাগ বৃদ্ধির বড়াই না করিয়া ১৩৬ ভাগ বৃদ্ধির বড়াই করিতে পারিতেন। কিন্তু প্ল্যানিং কর্তারা এই সোজা কথাটা অমন সহজভাবে বলিতে পারিলেন না। কারণ অতি চালাকেরা ঘুরাইয়া না প্যাচাইয়া কথা বলিতে পারেন না।

বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটাও এমনি অতি চালাকির খপ্পরে পড়িয়াছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ না করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের কোনও উন্নয়নের অগ্রগতি সম্ভব নয়। এটা প্ল্যান-বিজ্ঞানীরা বুঝেন না, এমন নির্বোধ তাঁরা নন। আগে যদি থিওরেটি-ক্যাল জ্ঞান নাও থাকিত, তবু দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলাফলের অভিজ্ঞতা হইতে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান তাঁদের এতদিনে হওয়া উচিত ছিল। বহু নযিরের মধ্যে একটি নযির দিতেছি। এটা খাদ্য উৎপাদনের নযির। নযিরটা একেবারে সাম্প্রতিক।

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার কথা। এটা তৃতীয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দফা। প্ল্যান-মেয়াদের এক বছর বাকি থাকিতেই ১৯৬৯ সালে সরকার ঘোষণা করিলেন, টার্গেট মেয়াদের এক বছর আগেই পূর্ব পাকিস্তান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া গেল। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সরকার ন্যায়তঃই আত্মপ্রশংসা করিলেন। দেশবাসীও খুশি হইল। চারদিক আনন্দ-মুখরিত হইল। সরকারী উদ্যোগে কোনও কোনও জায়গায় এই বিজয়োৎসব উদযাপিতও হইল। হইবে না? এই সাফল্যলাভে সরকার কত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন! উন্নত ধরনের বীজ, ইরি ও সার বিতরণ করি-য়াছেন। কীটনাশক দাওয়াই আকাশে-বাতাসে-যমিনে ছড়াইয়াছেন। একরে ১২০ মণ ধান উৎপাদনকারীদের কত পুরস্কার দিয়াছেন। তারই ফলে ত এই

সাফল্য! দেশব্যাপী একটা উৎসব উদযাপনের কথাও উঠিল। কিন্তু ও আল্লা! এটা কি হইল? এত উৎপাদনের পরেও পূর্ব পাকিস্তান স্বয়ংসম্পূর্ণ হইল না। তার বদলে হইল পূর্ব পাকিস্তানের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় খাদ্য ঘাটতি। একেবারে সাড়ে সতর লক্ষ টন! এ যেন 'লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কাতারে কাতার, একুন করিয়া দেখি না হয় হাজার।'

এটা এক প্ল্যানের অবস্থা নয়। সব প্ল্যানের। এক বছরের হিসাব নয়। বছরের পর বছরের। পয়লা প্ল্যান মুদ্দতে পূর্ব পাকিস্তানের চাউল উৎপাদন ছিল গড়ে বছরে ৮০ লক্ষ টন। খোরাকি ছিল গড়ে বছর ৯০ লক্ষ টন। ঘাটতি ১০ লক্ষ টন। এই ১০ লক্ষ টন ঘাটতির মধ্যে চাউল ছিল ৩ লক্ষ টন। আর গম ছিল ৭ লক্ষ টন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দুসরা প্ল্যানের মুদ্দতে আমাদের খোরাকি বাড়িয়া হইল ৯৪ লক্ষ টন। সরকারী হিসাব মতে দুসরা প্ল্যান মুদ্দতে (১৯৬০-৬৫) আমাদের চাউল উৎপাদন হইয়াছিল ৯৫.১৯ লক্ষ হইতে ১০৪,৫৬ লক্ষ টন। সরকারী হিসাব যদি ঠিক হইত, তবে আমাদের খাদ্য ফাযিল হইত ১'১৯ লক্ষ টন হইতে ১১,৫৬ লক্ষ টন। ফাযিল ত হয়ই নাই, প্রচুর ঘাটতি হইয়াছে। প্রমাণ সরকারী হিসাব-মতে এই মুদ্দতে আমেরিকা হইতে পি. এল. ৪৮০ চুক্তি মোতাবেক দুই হাজার একশ' ষোল কোটি টাকার গম আমদানি করা হইয়াছে। তার মানে প্রতিবছর গড়ে চারশ' তেইশ কোটি টাকার গম আমরা আমদানি করিয়াছি খোরাকির জন্য। ঐ মুদ্দতে মার্কিনী গমের দাম ছিল পাকিস্তানী মুদ্রার হিসাবে টনপ্রতি দুইশত পঞ্চাশ টাকা। টনপ্রতি সমপরিমাণ জাহাজ ভাড়া ধরিলে প্রতি টনের দাম পড়ে পাঁচশ টাকা। এই দর হিসাবে আমরা ঐ মুদ্দতে ৮০ লক্ষ টনের কিছু বেশি গম আমদানি করিয়াছি। পাঁচ বছরে আশি লক্ষ, মানে বছরে ষোল লাখ। এই গমের প্রায় সবটুকুই পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যায়। দুই কারণে। প্রথমতঃ, পশ্চিম পাকিস্তান খাদ্যশস্যে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, গমের এই পরিমাণটা পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনের প্রায় সমান সমান। ৭ লক্ষ টন গমের ঘাটতি আমাদের আগেই ছিল। দুসরা প্ল্যান মুদ্দতে দুই কারণে এই গমের চাহিদা ১৫ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমতঃ, লোকসাংখ্যাও বাড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই মুদ্দতে পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলে গমের ব্যবহার খুব বাড়িয়াছিল। একদিকে চাউল ছিল মাংগা ও দুষ্প্রাপ্য, অন্যদিকে গম ছিল সস্তা ও সহজলভ্য। সরকার পক্ষ হইতে গ্রামাঞ্চলে গম সরবরাহ করাও হইয়াছিল প্রচুর। সুতরাং এই আমদানি করা মার্কিনী গমের প্রায় সবটুকুই যে পূর্ব পাকিস্তানে লাগিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই।

এই হিসাবে দেখা গেল যে, এই মুদ্দতে পূর্ব পাকিস্তানে শুধু গমই আমদানি করা হইয়াছে প্রতি বছর ষোল লাখ টন। এই সংগে চাউল যদি চার লাখ টনও আমদানি করা হইয়া থাকে, তবে বার্ষিক খাদ্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় বিশ লক্ষ টন। আমাদের বার্ষিক খোরাক যেখানে ৯৪ লক্ষ টন সেখানে প্রতিবছর যদি বিশ লাখ টন আমদানি করিয়া থাকি, তবে আমরা উৎপন্ন করিয়াছিলাম মাত্র ৭৪ লক্ষ টন। তা হইলে এই পাঁচ বছরে যে আমরা গড়ে ৯৭'৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করিয়াছিলাম বলিয়া সরকারী রিপোর্টে দাবি করা হয়, সেটা ঠিক নয়। বাস্তব অবস্থা ও সরকারী রিপোর্টে এই পার্থক্যের কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর অতি সোজা। যে কারণে তৃতীয় পরিকল্পনা মুদ্দতের হিসাবে ভুল হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা মুদ্দতের হিসাবের ভুলও হইয়াছিল সেই কারণে। যে কারণে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বছর ৬৯-৭০ সালে আমরা খাদ্যে ফাযিল না হইয়া ঘাটতি হইয়াছি সাড়ে সতর লক্ষ টনে, সেই কারণেই দ্বিতীয় পরিল্পনা মুদ্দতেও ফাযিল না হইয়া ঘাটতি হইয়াছিলাম।

কারণ একই, হিসাবের ভুল। হিসাবে ভুল হইত এবং আজও হয় এই জন্য যে, হিসাবটা করি আমরা অফিসে বসিয়া। আমরা উন্নত শ্রেণীর বীজ ও সার বিতরণ করিয়াছি। তাতে জমির উর্বরতা আগের ডবল হইয়াছে। আমরা অনেক পতিত জমি উদ্ধার করিয়াছি। তাতে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে। কীটনাশক অষুধ বিতরণ করিয়া এবং সরকার পক্ষ হইতে হাওয়াই জাহাজে তা ছড়াইয়া শস্যের দুশমন নিকাশ করিয়াছি। এক একরে আশি হইতে একশ' বিশ মণ ধান উৎপাদনকারী কৃষককে পুরস্কার দিয়াছি। অতএব অত একর জমিতে ধান লাগাইয়াছি যখন, তখন অত মণ ধান উৎপাদন হইবেই। এটা ত গণিতের কথা। এইভাবে আমরা আবাদের পরিমাণ হইতেই উৎপাদনের হিসাব করিয়াছি। অনেক সময় ধান গাছ গজাইয়াছেও বাহারের। বাতাসে ঢেউ-খেলানো ঘন-সবুজ লাস্যময় ধানগাছ দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়াছে। তাতেই সরকারী রিপোর্ট তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে, এবার 'বাম্পার ফসল' হইয়াছে। সুতরাং এবার আমাদের এককোটি পাঁচ লাখ টন চাউল হইয়াছে। দরকার আমাদের নব্বই লক্ষ টন। অতএব এবার আমরা পনর লক্ষ টন চাউল বিদেশে রফতানী করিব। ১৯৬৯ সালে পাঠক সত্য সত্যই এমন সরকারী ঘোষণা শুনিয়াছেন। যিনি একথা বলিয়াছেন, তিনিও ভুল করেন নাই। যদি আবাদমত ফসল উৎপাদন হইত, যদি উৎপাদনমত মাড়ান হইত, যদি মাড়ান ফসল ঘরে উঠিত, তবে সত্য-সত্যই আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণও হইতাম। রফতানীও করিতাম।

কিন্তু তা হয় নাই। বন্যায় আবাদ-মত উৎপাদন হইতে দেয় নাই; উৎপাদন মত মাড়াইতে দেয় নাই; মাড়ান-মত ফসল গুদামজাত করিতে দেয় নাই। এমন কি, গুদামজাত শস্যও পচাইয়াছে। বন্যার পানি ঘরে ঢুকিয়া গোলার চাউল ত বটেই, পাকঘরের রান্না ভাতও ভাসাইয়া নিয়াছে। এটা একদিন, দুইদিন বা এক বছর দু'বছরের কথা নয়। প্রতি বছরের কথা। বরাবরের কথা। এটা জানিয়াও আমাদের প্ল্যানাররা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ না করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিতে চান?

ইত্তেফাক, ৪ঠা জুলাই, '৭০

৪৫

শুধু নির্বাচন নয়, মেজরিটি ভোটারের নির্বাচন চাই

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন আমাদের জাতীয় জীবনে অসীম গুরুত্বপূর্ণ, একথা সব দলের নেতারাই স্বীকার করিয়াছেন। যাঁরা এতদিন স্বীকার করেন নাই, হালে তাঁরাও করিয়াছেন। তাঁরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেও সার্বজনীন ভোটের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাম অনেক বেশি। যদি তা বুঝিয়া থাকেন, তবে এটা আশার কথা।

কিন্তু নির্বাচনটা সম্পাদিত হওয়া চাই সুষ্ঠুরূপে। এ সুষ্ঠুতার মানে শুধু নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নয়। এ সুষ্ঠুতা মানে পরিপূর্ণরূপে জনমতের প্রতিফলন। নির্বাচনের ফলও, কাজেই, জনমতের প্রতিবিম্ব প্রতিধ্বনি ও প্রতিনিধি হইতে হইবে! আসন্ন নির্বাচনে এটা আরও বেশি আবশ্যক এইজন্য যে, এটা মামুলি সাধারণ নির্বাচন নয়। এতে শুধু সরকার বদল বা বহাল হইবে না। এই নির্বাচনের প্রতিনিধিরা দেশের বুনিয়াদি আইন শাসনতন্ত্র রচনাও করিবেন। সে-শাসনতন্ত্র হইতে হইবে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে। হইতে হইবে তা জনগণের গ্রহণযোগ্য। শুধু তেমন শাসনতন্ত্রই জনগণের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বস্তু হইবে। তেমন শাসনতন্ত্রকে ঘিরিয়াই ঐক্যবদ্ধ সুসংহত পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া উঠিবে।

এমন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন শুধু গোটা জাতির প্রতিনিধিরাই। গোটা জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইলে সমগ্র জাতির সকল ভোটারকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। অন্ততঃ তাদের বিপুল মেজরিটি যাতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, সরকারকে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। আসন্ন নির্বাচনের বেলা সরকার কি তেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন ? বহু নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি, তেমন সুব্যবস্থা হয় নাই। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, দুইটি বিষয়ে গুরুতর ত্রুটি রহিয়াছে। নির্বাচনের দিন-তারিখ ও ভোটদান পদ্ধতিই এই দুইটি ত্রুটি। নানা কারণে, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট-ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের দরুন নেতারা এই দুইটি ত্রুটির দিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

কিন্তু নেতাদের বুঝা উচিত, লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের বিঘ্নটা নির্বাচনের পরের ব্যাপার, আগের ব্যাপার নয়। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রকৃত গণ-প্রতিনিধি বাছাই-এ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে না। নির্বাচনের পরই প্রতিনিধিদের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। তেমন অবস্থায় নির্বাচনের পরে নির্বাচিত মেম্বররাই প্রতিনিধিত্বের জোরে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের বিচার ও সে সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তার আগে সাকুল্য-ভোটারের সকলে না হোক, মেজরিটির ভোটে যাতে নির্বাচনটা হইতে পারে, তার ব্যবস্থা ত করিতে হইবে। আমার আশংকা এই যে, নির্বাচনের তারিখ ও ভোটদান পদ্ধতি এই কাজটিতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে।

প্রথমে ধরুন, দিন-তারিখের কথাটা। বর্ষা-বাদলের দরুন পাড়াগাঁয়ের ভোটার-দের বিপুল সংখ্যা ও দুর্গাপূজার দরুন হিন্দু ভোটারদের কেউই, ভোট-কেন্দ্রে হাযির হইতে পারিবেন না।

এবার ৫ই অক্টোবর হইতেছে ১৮ই আশ্বিন। এই দিন পূর্ব পাকিস্তানের সোয়া কোটি হিন্দুর বৃহত্তম জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান দুর্গাপূজার আরম্ভ। এবারকার পঞ্জিকা মতে ৫ই অক্টোবর পূর্বাহ্ন দশটায় ষটপঞ্চমী-ব্রত লাগিবে। এই মুহূর্ত হইতে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা বোধন, আমন্ত্রণ, পূজা ও প্রতিমা বিসর্জন ইত্যাদি ধর্মকার্য লাগিয়াই থাকিবে। শুধু এই পাঁচটি দিনই নয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৩ই আশ্বিন, অমাবশ্যার দিন মহালয়া শুরু হইয়া ১৪ই অক্টোবর ২৭শে আশ্বিন পূর্ণিমার দিন কালীপূজার সমাপনে হিন্দুদের এই পবিত্র পূজা-পক্ষের অবসান হইবে। শুধু পূজার ধর্ম-কাজের কথাও নয়। বাৎসরিক ধর্মানুষ্ঠানের প্রস্তুতিস্বরূপ, আমরা মুসলমানরা যেমন ঈদের দুই একদিন আগে হইতেই কেনা-কাটায় ও স্থান পরিবর্তনে লাগিয়া যাই, হিন্দুরাও তেমনি ৫ই অক্টোবরের দুই একদিন আগে হইতেই কেনাকাটায় ও স্থান পরিবর্তনে ব্যস্ত হইবেন। ধর্মানুষ্ঠানের ও যাতায়াতের এই ভিড় ও ব্যস্ততার মধ্যে হিন্দু ভোটারেরা ধর্ম-কাজ ফেলিয়া ভোট দিতে আসিবেন, এটা কেউ আশা করিতে পারেন? শুধু এ কথাই বা কেন? পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনটা দেওয়া হইল কিনা, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নাগরিকদের ধর্মানুষ্ঠানের দিনে? সোয়া কোটি দেশবাসীর জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি এমন উপেক্ষা কল্পনাতীত। বাংগালী মন্ত্রী ও অফিসাররা এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে ঠিকমত উপদেশ না দিয়া মারাত্মক ভুল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করিয়াছেন।

তারপর আবহাওয়ার কথা। বাংলার কুখ্যাত 'আইতান-কাইতানের' দুর্যোগের সময় এটা। যদি তা এবার না-ও হয়, তবু পূর্ব বাংলার এক-

তৃতীয়াংশ থাকিবে পানির নীচে। শহর ছাড়া বাকি দুই-তৃতীয়াংশ থাকিবে পেককাদায় ভরা। এ অবস্থায় পুরুষ ভোটারদের একাংশ লুংগি তুলিয়া মালকাছা মারিয়া ভোট-কেন্দ্রে গেলেও মেয়ে ভোটাররা কেউ যাইতে পারিবেন না। মনে রাখা উচিত, মেয়ে ভোটার পুরুষ ভোটারের সমান। হিন্দু ও মেয়ে ভোটারদের অনুপস্থিতির দরুন এবার শতকরা পঁচিশ-ত্রিশের বেশি ভোটার ভোটকেন্দ্রে হাযির হইতে পারিবেন না।

নেতারা এটা ভাল করিয়াই জানেন। তবু সংগত কারণেই তাঁরা এই ব্যবস্থার জোর প্রতিবাদ করেন নাই। যে দুই-চারজন নেতা এ সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন, তাঁরাও শুধু অসুবিধার কথাটাই জানাইয়াছেন। গলার জোরে প্রতিবাদ করেন নাই। পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া এমন যে, নির্বাচনের তারিখ একবার পিছাইলে নির্বাচন আর মোটেই না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অতীতে এমন হইয়াছে বারবার অশোচ ঘরে সন্তান-মরা মায়ের মত। বরঞ্চ অরক্ষণীয়া কন্যার বাপের মত। পঞ্জিকায় 'শুভ দিনের নির্ঘণ্ট দেখিবার তাঁর সময় নাই। আল্লা-আল্লা করিয়া শুভ কাজটা হইয়া গেলেই বাঁচি। পাকিস্তানের গণতন্ত্রটা এমনি অপয়া মেয়ে যে, নির্বাচনের বর অনেক সময় বিয়ার মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এবার আর তা হইতে দিব না। বিয়াটা হইতেই হইবে। মঘা ত্র্যহস্পর্শ হইলেও। আমরাও তেমনি নির্বাচনটা সারিয়া ফেলিতে চাই। 'আইতান-কাইতান'ও মানিব না। আসলে এটাই নেতাদের মনোভাব।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহে নেতারা যখন এমনি করিয়া 'আইতান-কাইতানের' দুর্যোগ মাথায় লইয়াও নির্বাচনের দিন তারিখ মানিয়া লইলেন, তখন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন নয়া ভোট-দান পদ্ধতি। এই নয়া পদ্ধতি অনুসারে সকল ভোটারকে ব্যালট-পেপারে ক্রসমার্ক দিয়া ভোট দিতে হইবে। প্রার্থীদের জন্য আলাদা-আলাদা ব্যালট বাক্স থাকিবে না। একটিমাত্র বাক্স পোলিং অফিসারের সামনে থাকিবে। ভোটাররা ঘের দেওয়া বুথে নিজ নিজ মার্ক দিয়া বাহিরে আসিয়া অফিসারের সামনে কাগজটি বাক্সে ফেলিবেন। এই নয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে ভোট বিকি-কিনির দুর্নীতি রোধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে। পৃথক পৃথক ব্যালট-পেপারের ব্যবস্থা হইলে ব্যালট পেপার বিক্রি হয়। ভোটাররা নিজ-নিজ ব্যালট-পেপার ব্যালট বাক্সে না ফেলিয়া পকেটে লইয়া বাহির হইয়া আসেন। টাকাওয়ালা প্রার্থী বা তাঁর লোকজন নগদ টাকা দিয়া ঐ ব্যালট-পেপার কিনেন। তাঁদের কেউ ভোট দিবার সময় নিজের ব্যালট-পেপার সহ খরিদা ব্যালটগুলিও নিজেদের বাক্সে ফেলিয়া আসেন। এই দুর্নীতির অবসান ঘটাইবার জন্যই এক বাক্সের ও ব্যালট-পেপারে ক্রস্মার্কের ব্যাবস্থা করা হইয়াছে।

ভোট দানে দুর্নীতি দমনের এটা একটা উত্তম পন্থা, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এর সাফল্য নির্ভর করিবে ব্যালট-পেপারের রং, সাইয ও ব্যালট বাক্সের ছেঁদার আকারের উপর। ব্যালট-পেপারের সাইয ছোট ও বাক্সের ছেঁদা বড় হইলে এবং রংটা বিশেষ ধরনের না হইলে একাধিক ব্যালট-পেপার একত্রে ভাঁজ করিয়া বাক্সে ফেলা চলিবে। তাতে ব্যালট-পেপার বিকি-কিনিও অব্যাহত থাকিবে।

কিন্তু এর অপর দিকটাও বিচার করিতে হইবে। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা কুড়ির কম। এই হারও একুশ বছরের উপরের বয়েসী লোকদের মধ্যে আরও অনেক কম। শিক্ষিতের হার এই শতকরা কুড়িকে বয়স-গ্রুপে ভাগ করিলে একুশ বছর মানে ভোটাধিকারের নিম্নতম বছর হইতে উপরের দিকে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত ভোটারদের বেলা শতকরা পাঁচের বেশি হইবে না। এখানেও মনে রাখিতে হইবে ভোটারদের মধ্যে মেয়েলোকের সংখ্যা অর্ধেক। অশিক্ষিতের হার মেয়েদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাধিক।

এই বিপুল সংখ্যাধিক নিরক্ষর ভোটার ভোটদানে দুই রকম ভুল করিবেন। প্রথমতঃ, তাঁরা নিজেদের প্রার্থীর সিম্বল চিনিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা ঠিকমত ক্রসমার্ক দিতে পারিবেন না।

সিম্বল চিনার কথাটাই আগে আলোচনা করা যাউক। প্রতি ব্যালট-পেপারে জাতীয় পরিষদের বেলা পাঁচ হইতে দশজন এবং প্রাদেশিক পরিষদের বেলা দশ হইতে পনরজন প্রার্থীর নাম ছাপা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ব্যালট-পেপার যদি ফুলস্কেপ শিটের চেয়ে বড় না হয়, তবে প্রত্যেকটি সিম্বলের সাইয পোস্টেজ স্ট্যাম্পের চেয়ে বড় হইবে না। প্রার্থীদের নাম সম্ভবতঃ প্রথম হরফ অনুসারে ব্যালট-পেপারে ছাপা হইবে। এই তালিকা হইতে নিরক্ষর ভোটারের অনভ্যস্ত চোখ নিজের প্রার্থীর সিম্বল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। একরংগা বা রেখা-চিত্রের ছবি চিনা এমনিতেই কঠিন। সাইয ছোট হইলে আরও কঠিন। নিরক্ষর বয়স্ক লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অভিজ্ঞ লোকমাত্রেই জানেন, পঞ্চাশের ঊর্ধ্ব-বয়সী অশিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হইলেও তাঁরা তা বুঝিতে পারেন না। চশমাও ব্যবহার করেন না। কারণ ঘর-গিরস্হালির মোটা কাজে তাঁদের চশমার দরকার হয় না। দৃষ্টি-শক্তির তেজের অভাব তাঁরা জানিতেই পারেন না। তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা হাল-গিরস্হির বদলে সিলাইর কাজ, সোনারূপার চিকন কাজ বা কাঠের সূক্ষ্ম কাজ করেন, সাধারণতঃ তাদের চশমা ব্যবহার করিতে হয়। ঘর-গিরস্হালির মোটা কাজে অভ্যস্ত ঐ-সব লোক যখন ভোট দিতে আসিবেন, তখন সিম্বল বাছাই-এর বেলা তাঁদের ইলিউশান বা দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিতে পারে। এই কারণে প্রচলিত নিয়মে বড় আকারের সিম্বল ছাপিয়া ব্যালট-বাক্সের গা

জুড়িয়া সে সিম্বল আঁটিয়া দেওয়া হইত। এইসব সিম্বলের সাথে ভোটার সাধারণকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ও প্রার্থীদের পক্ষ হইতে ঐ একই সাইযের সিম্বল হাজার-হাজার ছাপিয়া বিলি করা হইত। ভোট-কেন্দ্রের চারিপাশে দেওয়ালে-দেওয়ালে, গাছের গায়ে-গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হইত। যে সাইযের ছবি ব্যালট-বাক্সের গায় লাগান হইত, অবিকল সেই সাইযের ছবিই বিতরণ করা হইত। কারণ সাইয যতই ছোট-বড় হইবে, নিরক্ষর লোকের অনভ্যস্ত চোখে তত বেশি দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে যদি ব্যালট পেপারের সিম্বলের সাইয আগেই সাধারণ্যে প্রচার করাও হয়, তবু ঐ ছোট আকারের সিম্বলের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ভোটার সাধারণকে অভ্যস্ত ও সচেতন করা খুবই দুরূহ হইবে।

এর পরে আসুন ক্রসচিহ্ন দেওয়ার ব্যাপারটায়। ক্রসচিহ্ন দিয়া ভোটদান কাজটাই কঠিন। প্রার্থীর নামের ঠিক ডান দিকের আয়তক্ষেত্রে ক্রসচিহ্ন দিয়া ঠিকমত ভোট দিতে শিক্ষিত লোকেরাও ভুল করিয়া থাকেন। বার কাউন্সিল, বার এসোসিয়েশান, ছাত্রদের হল ইউনিয়নসমূহের ইলেকশনে, এমন কি আইউবী আমলের ইলেকশনেও দেখা গিয়াছে, ক্রসমার্কের দোষে বহু ভোট ক্যানসেল হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় নিরক্ষর লোক অনভ্যস্ত হাতে ক্রসমার্ক দিতে কত যে ভুল করিবেন, তা সহজেই অনুমেয়। নিরক্ষর লোকেরা কলম ধরিতেই জানে না। বেশি বয়সের লোকদের হাত ও আংগুল এমন আড়ষ্ট হইয়া যায় যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও অল্প সময়ে তাঁদেরে কলম ধরান শিখানো যাইবে না। আর মেয়ে ভোটারদের বেলা তেমন চেষ্টা করিবার অবকাশ কোথায়? ফলে এইসব ভোটারদের বিপুলসংখ্যক মেজরিটির ব্যালট-পেপার ক্যান্সেল হইয়া যাইবে।

চিফ ইলেকশন কমিশনার বলিয়াছেন, ভারতে এই পদ্ধতি সফল হইয়াছে। ভারতে এই পদ্ধতি সফল হইয়া যদি থাকে, তবে আমাদের দেশেও হইবে, এটা সত্য। কারণ নিরক্ষতার হার উভয় দেশে প্রায় একই। কিন্তু চিফ ইলেকশন কমিশনার আসল কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের এটা প্রথম ইলেকশন। আর ভারতে এই তেইশ বছরে চারটা জেনারেল ইলেকশন, প্রায় এক ডজন মিড্‌সেশান ইলেকশন, শতাধিক বাই-ইলেকশন হইয়াছে। তথায় প্রথম হইতেই পুরাতন পদ্ধতি ছাড়িয়া নয়া পদ্ধতিতে আসা হয় নাই। ক্রমে-ক্রমে এবং নির্দিষ্ট এলাকা হইতে শুরু করিয়া ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হইয়াছে। এর পরেও ভোট বাতিলের হার যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যা হোক প্রস্তাবিত পদ্ধতি যে দুর্নীতি রোধের পন্থা হিসাবে উন্নততর, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে তা প্রচলন না করিয়া ধাঁ করিয়া করিলে বিপুল ভোট মারা যাইবার আশংকা।

এতে গণতন্ত্র ত ব্যাহত হইবেই, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে জনপ্রিয় গণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ। বস্তুতঃ যে পার্টি যত বেশি জনপ্রিয়, যে পার্টির যত বেশি সমর্থন আছে, সেই পার্টি তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শহরেই হউক আর গাঁয়েই হউক, জনপ্রিয় পার্টিসমূহের শক্তি উৎস সমাজের নিচের তলায়। উপরের তলার লোকেরা সাধারণতঃ কায়েমী স্বার্থবাদী গণ-বিরোধীদের বাক্সে ভোট দিয়া থাকে। যত নিরক্ষরতা সব নিচের তলায়। উপরের তলায় নিরক্ষরতা খুব কম। কাজেই প্রস্তাবিত ভোট-দান পদ্ধতি নিচের তলার ভোটারদের যেমন অসুবিধা করিবে, উপরের তলার তেমন করিতে পারিবে না।

অতএব 'আইতান-কাইতানের' দুর্যোগ, দুর্গাপূজার পার্বণ এবং ক্রসমার্কের ভোট-নিধন সকল ক্ষেত্রেই এই সত্য সমানভাবে প্রযোজ্য। পার্থক্য শুধু নির্বাচনের তারিখে। উক্ত অসুবিধাটা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ভোটাররাই ভোগ করিবে। আর ভোট-পদ্ধতির অসুবিধাটা উভয় পাকিস্তানের ভোটারদেরই সহিতে যাইবে।

আগেই আশংকা প্রকাশ করিয়াছি যে, আক্টোবরে ইলেক্শন হইলে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা পঁচিশ-ত্রিশের বেশী ভোটার নির্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ১৯৫৪ সালের ইলেক্শনে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৬৭ জন ভোটার ভোট দিয়াছিলেন। তেইশ বছরে এবারই প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হইতেছে বলিয়া এবং নেতৃবৃন্দ ব্যাপক প্রচার চালাইতেছেন বলিয়া এবারকার গণ-উদ্দীপনা আরও বেশি। সুসময়ে ইলেক্শন হইলে এবার রেকর্ড নম্বর ভোটার ভোট দিবেন। পুরুষ ভোটার শতকরা ৯০ ও মেয়ে ভোটার শতকরা ৫০ জন, একুনে গড়ে শতকরা ৭০।৭৫ জন ভোটার ভোট-কেন্দ্রে উপস্থিত হইবেন। পুরাতন পদ্ধতিতে ভোট হইলে এই ৭৫ জনের ৬০ জনই জনপ্রিয় গণ-পার্টিকে ভোট দিবেন। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়ার মুখপাত্র পার্টিগুলির বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ সুনিশ্চিত। নির্বাচনের সময় ও ভোটদান পদ্ধতি এই অবস্থাটাই যেন উল্টাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছে। ফলে মোট ভোটারের যে শতকরা পঁচিশ-ত্রিশজন ভোট-কেন্দ্রে উপস্থিত হইবেন, তাঁদের মধ্যে দশ হইতে পনরজনের ভোট বাতিল হইয়া যাইবার আশংকা আছে। তা' যদি হয়, তবে মোট ভোটারের মাত্র শতকরা বিশজনের দ্বারা আইন-পরিষদ গঠিত হইবে। এমন কেন্দ্রীয় আইন-সভা গণ-পরিষদরূপে যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবে, তা জনগণের স্বার্থানুকূল ও গ্রহণযোগ্য হইবার আশা খুবই কম।

এখনও এ অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না কি?

ইত্তেফাক, ১১ই জুলাই, '৭০

৪৬

শিক্ষার সংকট, না জাতির সংকট ?

সম্প্রতি পূর্ব-বাংলার চারটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ম্যাট্রিকের ফল বাহির হইয়াছে। পাসের হার গড়ে পঞ্চাশ। শতকরা পঞ্চাশ ফেল। পরীক্ষার্থীদের ফেলের এই হার জাতির জন্য মস্তবড় বিপদের কথা। সেটা সরকার অথবা শিক্ষক-পরীক্ষকরা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষার্থীদের ফেলের এই হার এবং সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতার সংমিশ্রণকেই আমি জাতির সংকট অভিহিত করিতেছি।

এই সংকটের গভীরতা ও ব্যাপকতাটা পাঠক একবার আন্দায করুন। চারটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এবার মোটমাট কমবেশি আড়াই লাখ। তার মধ্যে পাস করিয়াছে কমবেশি সোওয়া লাখ। কাজেই ফেলের সংখ্যাও সোওয়া লাখ। এটা শুধু এ বছরের অবস্থা নয়। ফেলের হার ক্রমে বাড়িতেছে। কয়েক বছর ধরিয়াই এমন হইতেছে। নমুনাস্বরূপ গত তিন বছরের হিসাবটাই ধরা যাউক। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকের পাসের হার ছিল ৬৩.২। ১৯৬৮ সালে এই হার ছিল ৬১.৭। ১৯৬৯ সালে ছিল ৫৩.৬। ১৯70 সালে হইল ৪৯.৭। অন্যান্য তিনটি বোর্ডের অবস্থাও মোটামুটি এই একই। আমাদের পরীক্ষার্থীদের ফেলের হার শুধু অস্বাভাবিক রূপে বেশি নয়, তার চেয়ে বিপদের কথা এই যে, দিন দিন সে ফেলের সংখ্যা বাড়িতেছে। এর কারণ এই হইতে পারে যে, আমাদের ছেলেমেয়েদের মেধা দিন দিন কমিতেছে, নয়ত আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষণ-দক্ষতা কমিতেছে অথবা দুইটাই একসংগে কমিতেছে।

এই দুইটার একটাও সত্য হইতে পারে না। পড়ুয়ারা স্পষ্টতঃ ও দৃশ্যতঃই তাদের বাপ-মার চেয়ে অনেক বেশি চালাক-চতুর হইতেছে। এটা পরিবেশের অবদান। পরিবেশই শিশু-মন ও মস্তিষ্ক গড়িয়া থাকে। আধুনিক উন্নত ও উদার পরিবেশ স্বভাবতঃই শিশুর মন ও মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাইতেছে। তাতে আজকার শিশুরা সকল দিক হইতেই তাদের মাতাপিতার চেয়ে উন্নত মন ও বিকশিত মস্তিষ্কের অধিকারী হইতেছে। ফলে, তাদের মেধা ও যেহান সাধারণতঃ বাপ-মার মেধা ও যেহানের চেয়ে তীক্ষ্ণ ও তেজী হইতেছে। পড়ুয়াদের বেলা যা সত্য, আধুনিক শিক্ষকদের বেলাও তাই সত্য। আগেকার

শিক্ষকদের চেয়ে বর্তমানের শিক্ষকরা সকল দিক হইতেই উন্নত। এঁদের বেশীর ভাগ ট্রেনিংপ্রাপ্ত। শিশু-মনোবিজ্ঞানে এঁরা শিক্ষিত। কাজেই এঁদের বিপুল সংখ্যাধিক শিক্ষকতায় বিশেষজ্ঞ। আজকালের বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই শিক্ষণের সহায়ক সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাব-পাতিতে সমৃদ্ধ। আগেকার শিক্ষকদের ও বিদ্যালয়সমূহের এসব সুবিধা ছিল না। এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীর মেধার অভাবে এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দক্ষতার অভাবে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা অগ্রসর হইবার বদলে পিছনের দিকে যাইতেছে, এটা বিশ্বাস-যোগ্য কথা নয়।

তারপর এটা শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থাও নয়। উচ্চ-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অবস্থাও তাই। সেখানেও ফেলের হার এমনি লজ্জাকর, হৃদয়বিদারক ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কারণ। এখানে বাৎসরিক পাস-ফেলের বিস্তারিত হিসাবে না গিয়া সংক্ষেপে আমাদের উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে একনযর চোখ বুলাইলেই চলিতে পারে। আদমশুমারির হিসাবটার দিকে নযর দেওয়া যাক। ১৯৫১ সালে আদমশুমারিতে পূর্ব বাংলায় গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ৪১৪৮৫। ১৯৬১ সালে সেই সংখ্যা বাড়িবার বদলে কমিয়া হইয়াছে ২৮৫৬৯। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে আমাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ৮১৬৭। ১৯৬১ সালের হিসাবে হইয়াছে ৭১৬৪। আগামী আদমশুমারিতে এই সংখ্যা কি হইতে পারে, তা আন্দায করা যাক। ষাটের দশকে ভার্সিটি-সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে চার। কাজেই গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা নিশ্চয় বাড়িবে। কিন্তু এই মুদ্দতে জনসংখ্যাও ৫ কোটির জায়গায় ৭ কোটি হইয়াছে। সে তুলনায় গ্র্যাজুয়েটের হার বাড়িয়াছে মনে হয় না। কারণ, ১৯৬৫ সালের হিসাবে দেখা যায়, চারটি ভার্সিটির মোট ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা ৮৪৪৩।

বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় পাসের হারের এই অল্পতা আমাদের গোটা শিক্ষা-জীবনকে কিরূপ অসংগতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন করিয়াছে, নিচের ও উপরের স্তরের ছাত্রসংখ্যা হইতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব-বাংলায় প্রাইমারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৬৮। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ ২১ হাজার ৬১৮। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া হয় ৪৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ২০৫। সেকেণ্ডারি স্কুলে ১৯৪৭ সালে ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৭৪ হাজার। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সংখ্যা হয় ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৭৬৮। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩ জনে। এই সংখ্যাতত্ত্ব হইতে দুইটি

ব্যাপার স্পষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ, প্রাইমারি ছাত্রের তুলনায় সেকেণ্ডারি ছাত্রের রেশিও দিন-দিন কমিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৯-৬০ সাল হইতে ১৯৬৪-৬৫ সালের সেকেণ্ডারি ছাত্র-সংখ্যা ১৮ হাজার কমিয়াছে। ৪৭ সালের প্রাইমারি ছাত্র-সংখ্যা ২৬ লাখের মোকাবিলায় সেকেণ্ডারি ছাত্র-সংখ্যা পৌনে ছয় লাখ। রেশিও মোটামুটি চার ভাগের এক ভাগ। '৫৯-৬০ সালে এই রেশিও হয় সাড়ে পাঁচ ভাগের একভাগ। '৬৪-৬৫ সালে এই রেশিও হয় ছয় ভাগের একভাগ। উচ্চ শিক্ষার স্তরে এই রেশিও-হ্রাস আরও সুস্পষ্টভাবে বেশি। ৪৭-৪৮ সালে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ২৯৬৫০। ৫৯-৬০ সালে এই সংখ্যা হয় ৫৯৩১৮। '৬৪-৬৫ সালে হয় ৯৮৮৫৭। গড়ে ১৮ ভাগের এক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিম্নস্তরে আমাদের পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু সেকেণ্ডারি ও উচ্চস্তরে সে সংখ্যা বিপজ্জনকরূপে কমিতেছে। এই কারণে জনৈক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ পূর্ব বাংলার শিক্ষা কাঠামোকে বিশাল প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত একটি সূচাগ্র-পিরামিডের সাথে তুলনা করিয়াছেন। সরকারী হিসাবমতেই প্রাইমারি স্তরে আমাদের 'ড্রপ-আউটে'র হার শতকরা ৮৫। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি মতে আমাদের স্কুলে-যাওয়ার-বয়স গ্রুপের (৬ হইতে ১৪ বছর) সংখ্যা ১ কোটি ৫২ লাখ। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৪৩.৩ জন স্কুলে ভর্তি আছে। প্রথম পাঁচসালা শেষে তাদের হার শতকরা ৬০ হওয়ার আশা করা হইয়াছিল। অথচ ১৯৬৭ সালের এক সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে, ঐ বছর প্রাইমারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৫১ লাখ ৫০ হাজার। যেখানে প্রথম পাঁচসালা শেষে (১৯৬০) প্রাইমারি ছাত্রসংখ্যা হওয়ার কথা ৯৩ লক্ষ ২০ হাজার, সেখানে মাত্র ৫১ লাখ ৫০ হাজার হইয়াছে কেন? এর কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করিবার কথা আমরা স্বাধীনতার বহু আগে হইতেই বলিয়া আসিতেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে সরকারী উদ্যোগে করাচীতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মিলনী হয়। স্বয়ং কায়েদে-আযমের উৎসাহে, উদ্যোগে পনর বছরের মধ্যে দুই ধাপে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তনে স্কুলে-যাওয়ার-বয়সী ছেলেমেয়েদের শতকরা একশ জনকে শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার তেইশ বছর পরেও গোড়ার সেই শতকরা ৪৩-এর স্তর হইতে আমরা এক পা আগাইতে পারি নাই। তার মানে ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয় না, তা নয়। আসল কথা ঐ 'ড্রপ-আউট'। ছেলেমেয়েরা প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর পর হইতে বিপুল সংখ্যায় 'ড্রপ-আউট' হইতে থাকে। এর হেতু কি, তাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে।

এর নির্ভুল বিচার করিতে হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থাটাও দেখিতে হইবে। শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয় হইলেও 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' দাবিদার শাসক-গোষ্ঠীর তৎপরতায় পাকিস্তানের শিক্ষা বরাবরই কেন্দ্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ফলে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় অঞ্চলেই একই শিক্ষানীতি চলিতেছে। একই কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন উভয় অঞ্চলের শিক্ষা উন্নয়নের প্ল্যান করিতেছেন। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল হইতেছে। হিসাবটা একটু দেখুন ঃ

পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রাইমারি ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৫০ হাজার। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সংখ্যা হয় ১৮ লাখ ৩৯ হাজার। ১৯৬৪-৬৫ সালে তা হয় ২৮ লাখ ৫৮ হাজার। ১৯৫১ সালের সেন্সাস মতে পশ্চিম পাকিস্তানে ম্যাট্রিক পাসের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৮২ হাজার ১৫৮। '৬১ সালের সেন্সাসে তা হইয়াছে ৫ লাখ ৮৪ হাজার ১৮১। '৫১ সালে তথায় গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার ৫০৪। '৬১ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৪ হাজার। ৫১ সালে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছিল ১৪ হাজার ৪১৯। ৬১ সালে হইয়াছে ২৪ হাজার ৩৫৪। সেখানে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ তিন স্তরেই শিক্ষিতের হার বাড়িতেছে। প্রাইমারি স্তরে 'ড্রপ আউটের' হার আমাদের ৮৫-র মোকাবেলায় ৬৩। ম্যাট্রিক পাসের হার সেখানে আমাদের ৫০-এর মোকাবেলায় ৭০।

একই 'স্ট্রং সেন্টারের' শাসনাধীনে একই শিক্ষা-নীতির আওতায় পূর্ব-পাকিস্তানের 'ড্রপ-আউটের' হার ৮৫। পশ্চিমে ৬৩। পূর্ব পাকিস্তানে ফেলের হার ৫০। পশ্চিমে ৩০। তবে কি পূরবী ছেলেমেয়েদের চেয়ে পশ্চিমা ছেলে-মেয়েদের মেধা বেশি ? নিখিল পাকিস্তানী প্রতিযোগিতা পরীক্ষা ত তা প্রমণ করে না। তাছাড়া একাধিকবার ফেল-করা ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র করাচী-লাহোরে গিয়া একবার পাস করিয়াছে, এমন নযিরেরও ত অভাব নাই। তবে এর হেতু কোথায় ?

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এর জন্য দায়ী আমাদের পরীক্ষা-নীতি। এই পরীক্ষা-নীতির সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, ইহা আমাদের শিক্ষানীতির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। এই পরীক্ষা-প্রথা আমাদের শিক্ষানীতিকে শুধু ব্যর্থ করে নাই, বিষাক্তও করিয়াছে। এর ফল এই হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশে, এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানেও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার প্রসার করেন, আমাদের কর্তৃপক্ষ শিক্ষা কন্ট্রোল করেন। অন্যান্য দেশে শিক্ষিতের হার ও সংখ্যা বাড়ে। আমাদের দেশে সে হার ও সংখ্যা কমে। অন্যান্য দেশের শিক্ষার মধ্যেই পরীক্ষা নিহিত, আমাদের দেশে শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, একটা আরেকটার প্রতিপক্ষ, দুশমন। আমাদের শিক্ষকরা যা পড়ান না, আমাদের পরীক্ষকরা তারই পরীক্ষা নেন। অন্যান্য দেশের পরীক্ষা নেওয়া হয় পড়ুয়াদের পাস করাইবার উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশে পরীক্ষা নেওয়া হয় তাদেরে

ফেল্ করাইবার উদ্দেশ্যে। তাই শিক্ষকরা পড়াইবার সময় যে বিদ্যা যাহিরে রূপ-ণতা করেন, পরীক্ষার প্রশ্ন করিবার সময় সে সব বিদ্যার সবটুকু যাহির করেন। এ সবই তাঁরা করেন শিক্ষার মান উঁচা রাখিবার নামে। কাজটা যে আসলে শিক্ষার উঁচা মান নয়, পরীক্ষার উঁচা মান, সে কথা পরীক্ষকরা ভুলিয়া যান। তাঁরা ভুলিয়া যান, শুধু পরীক্ষার মান উঁচা করিলেই শিক্ষার মানও সংগে-সংগে উঁচা হইয়া যায় না। তাঁরা ভুলিয়া যান, আগে শিক্ষার মান উঁচা করিয়া তারপর পরীক্ষার মান উঁচা করিতে হয়। শিক্ষার মান নিচু রাখিয়া পরীক্ষার মান উঁচা করিলে সেটা হয় অন্যায় ও অবিচার।

আমাদের নয়া রাষ্ট্র, নয়া জাতি, নয়া স্বাধীনতা। সবকিছুই আমাদের নতুন করিয়া গড়িতে হইতেছে। সবই আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া ঘটিতেছে। আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের শাসনতন্ত্র, আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সবই চলিতেছে ভাংগা-গড়ার মধ্য দিয়া। তেইশ বছরে আমরা দেশকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে পারি নাই। দেশের যা কিছু সম্পদ আহরণ করিতে পারিয়াছি, তার সবটুকু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার পালনে, দেশরক্ষায় এবং রাজধানী নির্মাণে খরচ হইয়া যাইতেছে বলিয়া সাকুল্য জাতীয় আয়ের শতকরা চার টাকার বেশী শিক্ষা খাতে ব্যয় করিতে পারিতেছি না। যা কিছু টাকা শিক্ষা বাবত খরচ করিয়াছি, তার সবটুকু দালান-ইমারত নির্মাণেই ব্যয় হইয়া যাইতেছে। শিক্ষা ও শিক্ষকের মান বৃদ্ধির কাজে এক পয়সাও খরচ করিবার থাকিতেছে না। ফলে, আমরা প্ল্যানমত গুণের ও সংখ্যার শিক্ষক তৈয়ার করিতে পারিতেছি না। সময়মত ও দরকারমত পুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। কাজেই আমাদের নেতৃত্বের ও শাসন-কর্তৃত্বের মতই, দেশে-বিদেশে আমাদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের ও টাকার মানের মতই, আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষকের মানও আজও নিচুই আছে। এ অবস্থায় শুধু পরীক্ষার মানটা উঁচা করিয়া আমাদের পরীক্ষার্থীদের একঘরে করা কেন? রাস্তায় বাহির হন, বাজারে যান, অফিস-আদলতে প্রবেশ করেন. কোথায় কোন্ জিনিসটার মান উঁচু আছে? রাস্তার আস্তর, দোকান-পাটের জিনিস-পত্র হইতে অফিসের লোকজন পর্যন্ত সবারই মান ত দেখি নিচু। উঁচুত শুধু দামটা, আর ঘুষের পরিমাণটা। এক দিককার মান যত কমিতেছে, অপর দিককার মান তত বাড়িতেছে। এই দেখিয়াই কি আমাদের শিক্ষক-পরীক্ষকরা শিক্ষার মান যত কমাইতেছেন, পরীক্ষার মান তত বাড়াইতেছেন? রাষ্ট্র-নায়করা সব দোষ চাপান জনগণের উপর। তাই দেখিয়া আমাদের শিক্ষা-নায়করাও সব দোষ চাপাইতেছেন ছাত্রদের উপর। ছাত্রদের দোষ, তারা রাজনীতি করে। কিন্তু দুনিয়ার সব জাতির মতই আমাদের জাতীয় জীবনে কোন্ ঐতিহাসিক

বিবর্তনটা ঘটিয়াছে, যাতে ছাত্রদের অবদান সবার চেয়ে বেশী নয়? কোন্ রাষ্ট্রনেতা জাতির সংকট মুহূর্তে ছাত্রদের সহযোগিতা চান নাই ও পান নাই?

নকল ইত্যাদি দুর্নীতির জন্য ছাত্রদের দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু ছাত্রদের গুরুজন বাপ-চাচা ও শিক্ষক-পরীক্ষকদের কয়জন নকলের জীবন যাপন করিতেছেন না? তাঁদের মধ্যে কতজন দুর্নীতির কামাই খাইতেছেন না? টেস্ট পরীক্ষায় এলাও ও পরীক্ষায় পাস করানো ব্যাপারে যে-সব দুর্নীতির কথা শোনা যায়, তা অংশতঃ সত্য হইলেও পরীক্ষার্থীদের অমন ব্যবহারের দোষ দেওয়া যায় না।

আর এই পরীক্ষাটাই বা কি? এতে কি ছাত্রদের মেধা পরীক্ষার চেয়ে মুখস্থ করার ক্ষমতাই পরীক্ষা করা হয় না? ইংরেজী ইত্যাদি যেসব বিষয়ের জন্য পরীক্ষার্থীদের ফেল করান হয়, সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাংসারিক জীবনে ওসবের দরকার কতটুকু? পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট চাকুরির নিয়োগপত্রও নয়। সংসারে প্রবেশ করিবার ভিসা-পাসপোর্ট মাত্র। তাতেই শতকরা পঞ্চাশ-জনকে ফেল করিয়া তাঁরা কার কি উপকার করিতেছেন? পরীক্ষকরা কি ভাবিয়া দেখিতেছেন, যারা ফেল করিতেছে, শুধু তারাই ফেল করিতেছে না। ওরা সবাই ধনী বাপ-মার বখাটে বাউন্ডল সন্তান নয়। ওদের মধ্যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আছে যাদের ফেল করার সংগে গোটা পরিবারটাই ফেল করিয়া থাকে। তাদেরে ঘেরিয়া হাজার হাজার বাপ-মার গরিবের কেল্লা রচিত হইয়াছিল। অনেক বাপ-মা জমিবন্ধক দেওয়া টাকায় নিজেদের ছেলেমেয়ের পরীক্ষার ফিস্ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ফিস দিবার আওকাত তাঁদের নাই। ছেলেমেয়ের পাসের উপরই হয়ত ঐ পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল। তার ফেলে হয়ত তার পরের তিন-চারটা ভাই বোনেরই লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল। পরবর্তী জীবনের জন্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিষয়ের দরুন ফেল করাইয়া পরীক্ষকরা এইভাবে কত পরিবারের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করিলেন! অথচ ঐ পরীক্ষার্থীদের শতকরা একশজনকে পাস করাইয়া দিলে কার কি লোকসান হইত? 'শিক্ষার মান' কোথায় কি ভাবে নিচু হইয়া যাইত? পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশই পাস করান আর শতকরা একশ জনই পাস করান, বিদেশে আমাদের পরীক্ষার মান যাচাই-এর সুযোগ ও সম্ভাবনা হয় যে দশ জনের, তারা উপরের দশ জন। তারা সকল অবস্থায়ই ভাল ছাত্র। বাকী নব্বই জনকেই যার-তার ক্ষেত্রের বিশেষ পরীক্ষা দিয়া জীবন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে।

কাজেই আমাদের পরীক্ষানীতি কি ছাত্রদের মেধার মাপকাঠি হিসাবে, কি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাসপোর্ট হিসাবে, আমাদের জাতীয় জীবনের উপকার করিতেছে না। শুধু অপকার করিতেছে। কাজেই সরকার ও শিক্ষাবিদরা নিজেরাই এই পরীক্ষানীতির পরিবর্তন চাহিতেছেন। সেদিন কেন্দ্রীয়

সরকার একটা পরীক্ষা কমিশন বসাইয়াছেন। সরকারী কমিশনের ফলাফল আমাদের জানা আছে। ছাত্রদেরও তা জানা আছে। ছাত্ররা তাই এ নীতি পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছে। ছাত্রদের আন্দোলনকে আমরা উচ্ছৃংখলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছি। নতুনের দাবিতে তরুণদের সব আন্দোলনকেই উচ্ছৃংখলতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া স্টেটাস কোর সমর্থক সব প্রবীণদের চিরকালের রীতি। গণতন্ত্রের জন্য জনগণ যে আন্দোলন করে, কায়েমী স্বার্থীরা বরাবর তাকে বে-আইনী উচ্ছৃংখলতা বলিয়া দমন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। 'নকল করিবার অধিকার চাই' বলিয়া সম্প্রতি যে দাবি উঠিয়াছে, উহা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হইলেও আসলে ওটা পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের দাবি। বই দেখিয়া প্রশ্নের জবাব দিবার পরীক্ষা-পদ্ধতি উন্নত মানের পরীক্ষা।

আসল কথা, শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের এটিচুড বদলাইতে হইবে। আজকার ছাত্র আগামী কালের নেতা; শুধু মুখে নয়, অন্তর দিয়াও কথাটা মানিতে হইবে। শুধু প্রবীণদের কাছে তরুণরা পরীক্ষা দিবে না। প্রবীণরাও তরুণদের কাছে পরীক্ষা দিবেন।

এটা না বুঝাই আজকার শিক্ষাসংকট। কাজেই এটা জাতির সংকট।

ইত্তেফাক, ১লা আগস্ট, ১৯৭০

৪৭

এই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে আমরা কি শিখিলাম ?

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার যে সর্বনাশ হইয়া গেল, তা যেমন নিদারুণ, তেমনি তুলনাহীন। এর বিস্তারিত বিবরণ রোয পাঠকরা খবরের কাগযে পড়িতেছেন, চিত্রে দেখিতেছেন। গত তিন সপ্তাহ ধরিয়াই প্রায় এসব দেখিয়াছেন, পড়িয়াছেন ও শুনিয়াছেন। এর পরেও পাঠক মনে রাখিবেন, নিদারুণতার সবটুকু আজও জানা হয় নাই। এই জানা হয় নাই মানে এ নয় যে, পরে আরও বেশি জানিবেন। পরে আরও জানিবেন নিশ্চয়ই। প্রতিদিনই এ সর্বনাশের ভয়ংকরতার অধিকতর নিদারুণ খবর পাওয়া যাইতেছে। মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন ডবল হইয়া যাইতেছে। ক্ষয়-ক্ষতির দুরপনেয়তা অধিকতর ভয়াল হইয়া উঠিতেছে। তবু 'জানা হয় নাই' কথা দ্বারা আমি এটা বুঝাইতে চাই নাই। কারণ যা ঘটিয়াছে তার বৈষয়িক বিবরণই শুধু দেওয়া যায়, মানবিক বিবরণ দেওয়া যায় না। আমাদের সম্পাদক, সাংবাদিক ও কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের হৃদয়-চেরা অন্তর ফাড়া রক্ত-ক্ষরা ভাষায় যে বেদনার মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি করিয়াছেন, রিপোর্টারেরা তাঁদের কলিজা-নিংড়ানো রক্তের হরফে যে-সব বিবরণ লিখিয়াছেন, ক্যামেরাম্যানরা যে-সব হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের ফটো তুলিয়াছেন, তা পড়িয়া-দেখিয়াও পাঠক ঐ দিনের ধ্বংসলীলার ভয়াবহতার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারেন নাই; বোঝা সম্ভব নয়। কারণ আর্তনাদের ভাষা নাই। তার কোন ছবিও হইতে পারে না। মানুষের ভাষা তার অভিজ্ঞতারই ফল। জীব জগতে ও প্রকৃতিতে মানুষ যা ঘটিতে দেখিয়াছে, তারই প্রকাশ পাইয়াছে তার ভাষায়। যা মানুষ কোনওদিন দেখে নাই, তা প্রকাশের ভাষাও তার নাই। পূর্ব বাংলার উপকূলে ঐদিনই যা ঘটিয়াছে, মানুষের জীবনে তা কোনও দিন ঘটে নাই। তাই আমাদের ভাষার দৌড়ও ঐখানে সীমাবদ্ধ। 'সাংঘাতিক', 'ভয়ংকর', 'প্রলয়ংকর', যত সংজ্ঞাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, তাদের দ্বারা প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইতে পারে না। পারে না বলিয়াই আমরা 'অভাবনীয়, 'অচিন্তনীয়', 'কল্পনাতীত' ইত্যাদি কথার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকি। যতই বর্ণনা দিবার চেষ্টা করি, উপকূলবাসী আমাদের প্রায় চল্লিশ লক্ষ ভাই বোনের জীবনে ঐ কালরাত্রিতে যে প্রলয় ঘটিয়াছিল, তা সকল বর্ণনার বহু-বহু ঊর্ধ্বে। সারা দুনিয়ায় এবং মানুষের ইতিহাসে এমন মর্মান্তিক দুর্যোগ যে আর ঘটে নাই, এটা শুধু আমরাই বলি না, অন্য দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন।

অতএব গত ১২ই নবেম্বর পূর্ব বাংলার ভাগ্যে যা ঘটিয়াছে, তা সত্যই বর্ণনাতীত। সে মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বটে, কিন্তু মনে কল্পনা করা যায়। আমরা যা বলিতে পারি না, তা ভাবিতে পারি। বস্তুতঃ মানুষের মন আল্লার এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাই তার মুখের ভাষার চেয়ে মনের ভাষার শব্দকোষ অনেক বড়। হাতের তুলির চেয়ে মনের তুলিতে আমরা অনেক বড় চিত্র আঁকিতে পারি। এই হিসাবে ঐ কাল-রাত্রির প্রলয়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা কেউ দিতে পারেন নাই, পারিবেনও না। কিন্তু কল্পনায় অনুমান করিতে পারিবেন সবাই। প্রত্যক্ষদর্শীরা যা দেখিয়াছেন, সেটা দুর্যোগের বিবরণ না, দুর্যোগের পরিণামের বিবরণ মাত্র। পরিণামেরও সম্যক বর্ণনা ওটা নয়। দুর্যোগের পরিণামেও অর্ধেক যখন উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের মুখে সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, 'প্রত্যক্ষদর্শী' দেখিয়াছেন মাত্র দুর্যোগের পরিণামের সেই ভগ্নাবশেষ। বাকিটা তাকে অনুমান করিতে হইয়াছে। এমনকি, দুর্যোগের শিকারদের মধ্যে যারা বাঁচিয়া আছেন. যাঁরা বাস্তবিক অর্থেই প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরাও এই ভয়াল প্রলয়ে নিষ্ঠুরতার সামগ্রিক রূপ দেখিতে পান নাই। শুধু নিজের উপর ও পরিবেশের সীমার মধ্যে বিশাল ভয়ংকরের যে খণ্ডরূপ তাঁকে আঘাত হানিয়াছিল, মাত্র সেইটুকুই তিনি দেখিয়াছেন। বাকিটা তাঁকেও অনুমান করিতে হইয়াছিল। সে অনুমানও তাঁকে করিতে হইয়াছিল পরে। কারণ ঘটনার আকস্মিকতায় তিনিও স্তব্ধ, স্তম্ভিত ও অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন মানসিকভাবে।

এ ব্যাপারে এত কথা বলিলাম এই জন্য যে দুর্গত মানবতার এই চরম দুর্দিনে যাঁরা কর্তব্যে অবহেলার পাপ করিয়াছেন, তাঁদের অমানুষিকতারও পরিমাপ করিতে হইবে অনুমান করিয়াই। তাদের নিষ্ঠুরতারও বর্ণনা ভাষায় করা যাইবে না। একদিকে, যে বাপেরা বাঁচিয়া আছেন, অথচ তাঁদের ছেলেরা চোখের পলকে প্রাণ হারাইয়াছে, যে মায়েরা বাঁচিয়া আছেন অথচ তাঁদের বুকের মানিক সন্তানদিগকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ছিনাইয়া নিয়াছে ; যে স্ত্রীরা স্বামীহারা হইয়াছেন, আর যে স্বামীরা স্ত্রী হারাইয়াছেন ওঁদের মনের দুঃখ, অন্তরের জ্বালা ও জীবনের বিপদ কি ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব? অপরদিকে, ক্ষমতাসীন যাঁদের উপেক্ষা-অবহেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহে-মনে-জীবনে এই দুর্দৈব নামিয়া আসিল, তাদের পাপের শাস্তি কি শুধু কঠিন ভাষা প্রয়োগেই বিধান হইতে পারে? ধরা যাইতে পারে, এই দুর্যোগে কম-বেশী পনর লাখ আদমসন্তান প্রাণ হারাইয়াছে। এদের মৃত্যুতে আর কত লাখ লোকের দেহে-মনে যাতনা ও জীবনে-সংসারে দুর্দিন সৃষ্টি হইয়াছে তাও আমরা বুঝিতে ও অনুমান করিতে পারি। যাঁদের হাতে আমাদের ভাগ্য ন্যস্ত আছে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, যাঁরা আমাদের ভাগ্যের ভার নিজ হাতে নিয়াছেন তাঁদের ব্যবহারে এটাই কি বলা যায় না যে যারা মরিয়াছে তারাই বাঁচিয়াছে আর যারা বাঁচিয়া

আছে আসলে তারাই মরিয়াছে। এটাও কবির কল্পনা বা সাংবাদিকের রিপোর্ট চাতুর্য নয়। সত্য-সত্যই ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় তার পরের মৃত্যু-সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ঘটনার এক-দুই সপ্তাহের পর যখন রিলিফ-দ্রব্য ও ঔষধ-পত্র ঘটনাস্থলে পেঁছিয়াছে, তখন রিলিফ গ্রহণ করিবার জন্য অরে কেউ বাঁচিয়া নাই এমন খবর পাঠকরা অনেক পড়িয়াছেন।

আমি এখানে ভাই বোন হারাইবার দুঃখের কথাটাই বলিতেছি, ধনসম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির কথা বলিতেছি না। গরু-মহিষে, ছাগল-ভেড়ায়, হাঁসে-মুরগিতে, ধানে-পাটে আমাদের যে সব সম্পদ গিয়াছে, তার পরিমাণ করা হইতেছে কম-বেশি একশ কোটি টাকা। গরিব পূর্ব বাংলার জন্য এটা খুব বড় লোকসান। কিন্তু যেখানে আমরা কম বেশী পনর লাখ ভাই বোন হারাইলাম, সেখানে টাকা-পয়সার ক্ষতিটার কথা নাই বা বলিলাম। তাছাড়া আর্থিক লোকসানের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। কিন্তু ভাই-বোন হারাইবার ক্ষতিপূরণ হয় না। পূর্ব বাংলার শোকে সারা দুনিয়া যেমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, পূর্ব বাংলার এই বিপদে দুনিয়ার লোক যেমনভাবে সাহায্যের হাত বাড়াইয়াছে, তাতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি-পূরণ হইয়াও যাইতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার হাজার আহা-জারি ও সমবেদনাতেও আমরা আমাদের ভাই-বোনদেরে ফিরিয়া পাইব না।

আমরা কত লোক হারাইলাম, তার সরকারী হিসাব পাওয়ার অনেক দেরি। গবর্নর আহসান বলিয়াছেন : ঘরে-ঘরে হিসাব করিয়া মৃতের সংখ্যা বাহির করার উপায় নাই। কারণ দুর্গত এলাকায় ঘর বাড়ির চিহ্নও নাই। গবর্নরের এই উক্তি হইতেই দুর্যোগের ভয়াবহতা অনুমান এবং মৃতের সংখ্যার হিসাব করা যায়। সরকার পাওয়া লাশ গণিয়া মৃতের সংখ্যা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই তাঁদের ভুল হইতেছে, সরকারী ও বেসরকারী হিসাবে এত ব্যবধান হইতেছে। বেসরকারী হিসাব যেখানে পনর লাখ, সেখানে সরকারী হিসাব মাত্র তিন লাখ। সরকার মৃতের সংখ্যা চৌদ্দ হইতে শুরু করিয়া তিন লাখে উঠিয়াছেন এই কারণেই। অথচ হিসাবের অন্য ও সহজতর পন্থায় সরকার যাইতেছেন না। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে দুর্গত এলাকার লোকসংখ্যা ছিল কম-বেশি পঁয়তাল্লিশ লাখ। প্রতিবছর শতকরা তিনজন বাড়ার সরকারী নিয়ম অনুসারে এই অঞ্চলে দশ বছরে লোক বাড়িয়াছে দেড় লাখ। ধান কাটার মওসুম বলিয়া এই সময়ে বাইরের কামলা জমায়েত হইয়াছিল অনুমান পঞ্চাশ হাজার। এই মোট সাতচল্লিশ লাখ হইতে জীবিত লোকের সংখ্যা বাদ দিলেই মৃতের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রলয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া উঠিয়াও শুধু যথাসময়ে রিলিফ ও চিকিৎসার অভাবে আরও যে লাখ লাখ লোক মারা গেল, তারাও এই হিসাবের মধ্যে পড়িবে।

মানুষের মানবতা বোধের বিচারের জন্য এত লাখ লোক মারা যাওয়ার দরকার হয় না। অন্যান্য দেশে এর চেয়ে হাজার গুণ কম লোক মারা গিয়াও সারা দেশবাসীর অন্তর ও সরকারের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে তেমনটি হয় নাই। এই না হওয়াটা ইচ্ছাকৃত বলিতে আমার মন চাহিতেছে না। কিন্তু কিসের দরুন এমনটা হইল, দুর্যোগের আগের ও পরের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করিলে কিছুটা আন্দায করা যায়। আগের কথাটাই আগে বলা যাউক। ওয়াশিংটনস্থ আন্তর্জাতিক হাওয়া উপগ্রহের ডিরেক্টর মিঃ ডেভিড জনসন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৫ই নবেম্বর এই আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের আভাস তাঁরা পাইয়াছিলেন এবং সংগে সংগে আমাদের হাওয়া-অফিসকে সে সংকেত দিয়াছিলেন। তারপর ৭ই নবেম্বর হইতে ১২ই নবেম্বরের দিবাগত রাতের আড়াইটা পর্যন্ত এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ও আসন্নতার ক্রমবর্ধমান তীব্রতার সংকেত তাঁরা প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। চাটগাঁস্থ পাকিস্তান সরকারের হাওয়া অফিসের ডিরেক্টরও বলিয়াছেন, যথাসময়ে তাঁরা এই বিপদের খবর পাইয়াছেন এবং যথারীতি সংকেত তিনি যথাস্থানে দিয়াছেনও। কিন্তু পূর্ব বাংলাবাসী সে সংকেত পায় নাই। পাইলে উপকূলবাসী সাবধান হইতে পারিত। দুর্গত এলাকার একজন চেয়ারম্যান বলিয়াছেন তাঁর ইউনিয়নে পাকা দুতলা হাইস্কুল, কমিউনিটি সেন্টার ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের বাড়িতে অনেক লোকের আশ্রয় দান সম্ভব হইত। এটি একটি নমুনা মাত্র। দুর্যোগের আগে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। দুর্যোগের পরে বিদেশী রিলিফ আসিবার আগে আমাদের সরকারী রিলিফ আসে নাই। গবর্নর আহসান বলিয়াছেন পূর্ব বাংলা সরকারের একটিও হেলিকপ্টার নাই। তিনি কেন্দ্রের কাছে হেলিকপ্টার চাহিয়া পান নাই। কেন পান নাই তার কারণ তিনি জানেন না। আজ যখন তিন ডজন বিদেশী হেলিকপ্টার আসিয়া সেবা-কাজে নিয়োজিত হইয়াছে সেই সময় পাকিস্তান সরকারের দুইটি হেলিকপ্টার পূর্ব বাংলায় আসিয়াছে। দুর্যোগের হুঁশিয়ারী ক্ষতির পরিমাণ রিলিফের গতি ও পরিমাণ সবতাতেই সরকারী ব্যর্থতা সীমাহীন।

এই অবহেলা, উপেক্ষা অথবা অযোগ্যতার জন্য পূর্ব বাংলার সমস্ত সংবাদপত্র ও জননেতা কঠোর ভাষায় সরকারী কর্মচারীদের নিন্দা করিয়াছেন। অপরাধের তুলনায় সে কঠোর নিন্দাও যথেষ্ট কঠোর নয়।

বিদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্য-তৎপরতা সামান্য। দুই-এক জন ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কেউ আমাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইবার জন্যও আসেন নাই। এজন্যও আমাদের খবরের কাগযে তীব্র ভাষায়

তাঁদের নিন্দা করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসী সত্যই এতে মর্মাহত হইয়াছে। এমন দুঃখে মানুষ ক্রুদ্ধ না হইয়া পারে না। আমরাও ক্রুদ্ধ হইয়াছি। রাগে-দুঃখে আমরা এমন-সব কথা বলিতেছি যা বলা উচিত নয়; কিন্তু বলা স্বাভাবিক।

তবু রাগ করিলে চলিবে না। বিপদেই মানুষের শিক্ষা হয়। চরম বিপদেই চরম শিক্ষা। বস্তুতঃ আল্লাহ্ আমাদেরে বিপদ দেন শিক্ষার জন্যই। যে নিদারুণ বিপদে আমরা পনর লাখ ভাই বোন হারাইয়াছি, আরও বিশ লাখ হারাইতে পারি বলিয়া মার্কিন সিনেটর কেনেডী পর্যন্ত আশংকা করিয়াছেন, তেমন বিপদ হইতেও যদি আমাদের শিক্ষা না হয়, তবে সেটা হইবে আমাদের বুদ্ধির দোষেই রাগ করিয়া অপরকে গাল দিলেই আমাদের সে শিক্ষা হইবে না। এই চরম বিপদের মুখেও তাই আমাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। একদিকে আমাদের বুঝিতে হইবে, জোর করিয়া ভালবাসাও আদায় করা যায় না, মানবতা-বোধও সৃষ্টি করা যায় না। অপর দিকে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মানবতাবোধ ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা এক বস্তু নয়। মার্কিনী-ইংরাজ-জার্মানী-ইরানীরা আমাদের বিপদে সহায়তা করিতে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। এটা তাদের শালীন মানবতাবোধের পরিচায়ক। সেজন্য তাঁরা দুনিয়ার প্রশংসা ও আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁরা আমাদের রাষ্ট্রীয় জাত-ভাই হইয়া যান নাই। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা আমাদের এই চরম দুর্দিনে সেবায় ঝাপাইয়া পড়েন নাই, সেটা তাঁদের মানবতাবোধের অভাবের পরিচায়ক। তবু তাঁরাই আমাদের রাষ্ট্রীয় জাত-ভাই। ভাই-এর ভালবাসা জোর করিয়া আদায় করা যায় না সত্য, কিন্তু নিজের অংশ আদায় করা যায়। পশ্চিমা ভাইদেরে এতটা হৃদয়হীন বলিতে যদি কারও আপত্তি থাকে, তবে আমাদের এ বিপদে তাঁদের এই উদাসীনতার কি ব্যাখ্যা তিনি করিবেন? তিনি কি বলিবেন, পূর্ব বাংলার লোক-ক্ষয়ে জন-সংখ্যা প্রতিনিধিত্বের পাল্লার হেরফেরে পশ্চিমা ভাইরা মনে-মনে খুশি হইয়াছেন? এমন কুৎসিত কথা কি বলা যায়? আগেই বলিয়াছি, মানুষ মুখে যা বলিতে পারে না, মনে তা ভাবিতে পারে।

যদি কেউ তা ভাবে, তবে সেটাও দোষের নয়। কারণ আসল সমস্যা মানবিক নয়, শাসনযান্ত্রিক। অতএব রাজনৈতিক। পূর্ব বাংলার সরকারী কর্মচারীরাও আমাদেরই ভাই। আমাদেরই মত হৃদয়বান মানুষ তাঁরা। তবু এই বিপদে তাঁরা যে নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন না, তার কারণ তাঁদের হাত-পা সরকারী নিয়ম কানুনের শিকলে বাঁধা। আমাদের গবর্নর চাওয়া সত্ত্বেও যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হেলিকপ্টার আসিল না তার হেতুটি ঐ আইন-কানুনের শিকল। শুধু এবারকার বিপদ-সংকেত অগ্রাহ্য করার কথাও নয়। গত বারটা বছর ধরিয়াই ত বছর বছর ঝড় ঝঞ্ঝা ও বন্যায় হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। তবু কেন পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিমান বন্দর

নির্মাণ, চাটগাঁয়ে হাওয়া ইনস্টিটিউট ও উপকূলে রাডার স্হাপন হইল না? ঐ একই আইনের শিকলের দোষে।

তাই এবার শুধু রিলিফ নয়। ঐ শিকল ভাংগিতে হইবে। আমাদের গবর্নরকে কণ্টার চাহিয়া বিফল হইলে চলিবে না। পূর্ব বাংলার নিজের কণ্টার থাকিবে না, এটা চলিতে দেওয়া হইবে না। আমাদের গবর্নর রিলিফের জন্য নব্বই কোটি টাকার এক স্কীম বিশ্ব ব্যাংকের নিকট পেশ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কেন্দ্রের মারফতে না দিয়া সরাসরি বিশ্বব্যাংকের সংগে দরবার করিবার অধিকার আমাদের গবর্নরের থাকুক, এটাই আমরা চাই। লাহোর প্রস্তাবই শিকলভাংগার হাতিয়ার। পরের হাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না। নিজের হাতেই আমরা তা করিতে চাই। এটাই এ ঘূর্ণিঝড়ের শিক্ষা।

ইত্তেফাক, ২৯শে নবেম্বর '৭০

৪৮

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কি মত বদলাইয়াছেন ?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৭শে নবেম্বরের প্রেস কন্‌ফারেন্সের বক্তৃতায় আমি নিরাশ হইয়াছি। ৩রা ডিসেম্বরে তাঁর বেতার বক্তৃতা আমার সে নৈরাশ্য দূর করে নাই। এ নৈরাশ্যের কারণ, প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা বদলাইয়াছেন। মতও বদলাইয়াছেন কিনা, আমরা সে পরীক্ষার সামনে পড়িয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, এই বক্তৃতা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মর্যাদার উপযোগী হয় নাই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই পৌনে দুইটা বছর ধরিয়া প্রতি চার মাস অন্তর-অন্তর তিনি নিজের মনোভাব ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে দেশবাসীকে জানাইয়া আসিতেছেন। খুব স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন। মার্শাল ল' প্রধানের উপযোগী দৃঢ় ও কঠোর সুরেই কথা বলিয়াছেন। তবু ২৭শের বক্তৃতার তুলনায় অতীতের কথাগুলির স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল অনেক উঁচু, সুর ছিল যথেষ্ট মিঠা এবং ভাষা ছিল খুবই শালীন। যে অবস্থায় তিনি মার্শাল ল' ঘোষণা করিয়াছিলেন, রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে নিবার পরদিন হইতেই জনগণের হাতে সে ক্ষমতা ফিরাইয়া দিবার যে অবিরাম ওয়াদা ও অশ্রান্ত পরিশ্রম তিনি করিয়া আসিতেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যে দক্ষ ক্ষিপ্রতার সাথে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের দিন-তারিখ নির্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাতে গণ-মনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আন্তরিকতার যে চিত্র ও তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ইমেজ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁর প্রায় সবগুলি বক্তৃতা-বিবৃতিই ছিল সেই ইমেজের উপযোগী। তাঁর বিঘোষিত এল. এফ. ও'র কোনও-কোনও বিধান গণ-মনের উৎসাহ উদ্দীপনার আগুনে পানি ঢালিলেও মোটের উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ইমেজ তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জনগণ ও তাদের নেতাদের প্রায় সকলেরই এই বিশ্বাস অব্যাহত ছিল যে, দেখিতে-শুনিতে যতই কুশ্রী ও কঠোর হউক না কেন, এল. এফ. ও'কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হইতে দিবেন না।

কিন্তু তাঁর সর্বশেষ প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতাটিতে সে বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়াছে। প্রথমতঃ, এই বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট যা বলিয়াছেন, তাঁর কোনও দরকার ছিল না। এল. এফ. ও'র গুণগত ত্রুটি, আইনগত তাৎপর্য ও ব্যবহারিক মূল্য সবই নেতাদের ও দেশবাসীর জানাই ছিল। আক্ষরিক প্রয়োগের আইন অপেক্ষা ওটাকে সীমা-নির্দেশক হুঁশিয়ারি হিসাবেই গ্রহণ করিতে নেতারা মনের দিক

হইতে তৈয়ার হইতেছিলেন। এমন সময় উহার উপর অতিরিক্ত এবং অনাবশ্যক এমফ্যাসিস দিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিদার নিরপেক্ষ মার্শাল ল' চীফ-এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজেকে খেলো করিয়াছেন। তাঁর আইন-উপদেষ্টারা এবারও প্রেসিডেন্টকে ভুল উপদেশ দিয়াছেন। ফলে চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব ও অধিকারের এলাকার বাহিরে পদক্ষেপ করিয়াছেন। পাঠকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য কথাটা খোলাসা করিয়া বলিতেছি।

দেশের অবস্থা বিশেষে শান্তি-শৃংখলা সহ সরকার চালাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে মার্শাল ল' দেশের ভালর জন্যই একটা বিশেষ আইন। এই আইন যতদিন চালু থাকে, ততদিন দেশবাসীর সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ও মৌলিক স্বত্বাদি সাসপেন্ডেড থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের যে সার্বভৌমত্ব, নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইবার যে মৌল অধিকার, সবই ঐ সংগে ও ঐ পর্যন্ত মুলতবী থাকে। দেশের প্রচলিত যাবতীয় আইন কানুনও মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সীমার মধ্যে ও শর্তাধীনে প্রযুক্ত হয়। যতদিন ইচ্ছা ও সম্ভব, ততদিন মার্শাল ল'তে দেশ শাসন করিয়া যাইবার সম্পূর্ণ অধিকার মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের আছে। কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কোনও নির্ধারিত তারিখে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে তাঁরা বাধ্য নন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও বাধ্য ছিলেন না। তবু তিনি নির্বাচন ঘোষণা করিয়াছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভারও দিয়াছেন। এতে তিনি তাঁর গণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। মর্শাল ল' মুদ্দত দীর্ঘায়িত করিয়া নিজের আধিপত্য কায়েম করিবার তাঁর কোনও অভিপ্রায় নাই, তারও তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

এই কাজটি করিতে গিয়া তিনি এল. এফ. ও'র পাঁচ-দফা শর্ত আরোপ করিয়াছেন। এই শর্তে নির্বাচিত গণ-পরিষদ-পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হইয়াছে, এটা ঠিক। কিন্তু তা করিয়াও প্রেসিডেন্ট তাঁর মার্শাল ল' কর্তৃত্ব ও অধিকারের সীমার মধ্যেই অবস্থান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: 'আমার আরোপিত পাঁচ দফা শর্ত মানিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিলেই আমি তা অনুমোদন করিব, অন্যথায় করিব না। মার্শাল-ল' চালাইয়া যাইব।' অতিশয় স্পষ্ট কথা। এমন কথা বলিবার, 'মার্শাল-ল' প্রত্যাহারের শর্ত আরোপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে। সে শর্ত যদি নেতারা না মানেন, তবে মার্শাল ল' চালাইয়া যাইবার অধিকারও তাঁর আছে। এতদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই কথাটাই বলিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু তাঁর শেষ কনফারেন্স-বক্তৃতায় তিনি নূতন কথা বলিয়াছেন।

আগের-আগের ঘোষণায় এবং এল. এফ. ও'তে বলা হইয়াছিল, পাঁচ-দফা শর্তানুসারে নির্ধারিত একশ বিশ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে গণপরিষদ ভাংগিয়া যাইবে। তার মানে শাসনতন্ত্রও রচিত হইবে না, ক্ষমতাও হস্তান্তরিত হইবে না, মার্শাল ল'ই চলিতে থাকিবে। কিন্তু শেষ প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা বলিবেন এল. এফ. ও তাঁরা মানেন না, ধরিয়া লওয়া হইবে তাঁরা নির্বাচনেই অংশ গ্রহণ করেন নাই। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁদের মেম্বরগিরি তিনি বাতিল করিয়া দিবেন। এ কথার তাৎপর্য এই যে গণপরিষদ ভাংগিয়া যাইবে না, যাঁরা এল. এফ.ও মানিয়া চলিতে রাযী হইবেন, শুধু তাঁদের লইয়াই গণ-পরিষদ চলিতে থাকিবে। এই সব মেম্বরকে লইয়া গণপরিষদের যে ভগ্নাবশেষ থাকিবে তাঁরা স্বভাবতঃই প্রেসিডেন্টের পছন্দমত একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। সে শাসনতন্ত্রও স্বভাবতঃই প্রেসিডেন্টের অনুমোদন পাইবে। অতএব এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই অবশিষ্ট গণপরিষদের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে। তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। মার্শাল-ল' উঠিয়া যাইবে। আমার মতে, প্রেসিডেন্টের শেষ সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তৃতার এই অর্থ ও এই পরিণাম দাঁড়াইতেছে।

পাঠক ঐ দুইটা অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন ত? আগের অবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্টের পছন্দ-মত শাসনতন্ত্র রচনা না করিলে গণ-পরিষদ ভাংগিয়া যাইত। মার্শাল-ল'ই চলিতে থাকিত। প্রেসিডেন্ট নিজের পছন্দ-মত কোনও শাসনতন্ত্র রচনা করাইয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করিতেন না। কিন্তু পরের ঘোষণায় এই কাজটিই তিনি করিতে যাইতেছেন। এতে একসংগে দুইটা অনিষ্ট সাধিত হইয়া গেল। এক, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমস্ত বিরোধের সমন্বয় বিধান করিয়া তাঁদের দ্বারা গোটা জাতির গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করানোর তাগিদ প্রেসিডেন্টের আর থাকিল না। দুই, নিজের পছন্দ-মত শাসনতন্ত্র গণ-পরিষদকে দিয়া গ্রহণ করাইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা প্রেসিডেন্ট করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রথমতঃ, দলীয় নেতাদের প্রায় সকলেই বিশেষভাবে এবং দেশবাসী সাধারণভাবে আশা করিয়াছিলেন যে, এল. এফ. ও.তে যাই লেখা থাকুক না কেন, গণ-পরিষদ সর্ব-সম্মতিক্রমে অথবা খুব ভাল মেজরিটিতে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া ফেলিলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেটা অনুমোদন করিবেনই। এল. এফ. ও.র টেকনিক্যাল বিচ্যুতির দরুন প্রেসিডেন্ট তেমন শাসনতন্ত্র বাতিল হইতে দিবে না। এল. এফ. ও.র ব্যাখ্যা করিবার সমস্ত অধিকার প্রেসিডেন্ট যে একা নিজের হাতে রাখিয়াছেন, সেটা রাখিয়াছেন তিনি এই সাধু উদ্দেশ্যই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রেসিডেন্টের শেষ ঘোষণায় সে পরিবেশ ও প্রয়োজন আর থাকিল না। এখনও মনে হয়, এল. এফ. ও.-বিরোধী মেম্বরদের নাম কাটিয়া দিয়া শুধু এল. এফ. ও. সমর্থক মেম্বরদেরে লইয়া গণ-পরিষদ গঠিত হইবে। পরস্পর-বিরোধী নেতাদের মধ্যে আপোস ঘটানোর কোনও মওকা থাকিবে না। পুরোপুরি এল. এফ. ও. মাফিক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সে ক্ষেত্রে ধরা কথা। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তর, নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন ও মার্শাল ল' প্রত্যাহার হইয়া যাইবে।

উক্ত দুই অবস্থার উভয় অবস্থাতেই এল. এফ. ও.-র মাফিক শাসনতন্ত্র হইবে বটে, তবে দুই অবস্থার মধ্যে খুব বড় একটা পার্থক্য থাকিবে। প্রথম অবস্থায় গণ-পরিষদের আকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। দ্বিতীয় অবস্থার গণ-পরিষদের আকার ছোট হইয়া যাইবে। প্রথম অবস্থায় রচিত শাসনতন্ত্র দ্বিতীয় অবস্থার শাসনতন্ত্রের চেয়ে উন্নততর হইবে। পূর্ণ গণ-পরিষদে বামপন্হী দক্ষিণ পন্হী স্ট্রংসেন্টারওয়ালা ও স্বায়ত্তশাসনওয়ালা, সমাজবাদী ও পুঁজিবাদী সকলের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতেও নিরপেক্ষ মার্শাল ল' প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যস্থতায় যে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটা হইবে নিশ্চয়ই একটা আপোসভিত্তিক শাসনতন্ত্র। এমন আপোস সবাইকে মানিয়া লইতেই হইবে। কারণ শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মার্শাল ল' সরাইবার ইহাই একমাত্র পন্হা। পক্ষান্তরে, এল. এফ. ও-বিরোধীদের বাদ দিয়া গণ-পরিষদের ভগ্নাংশের দ্বারা যে শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, সেটা হইবে ষোলআনা পুঁজিবাদী স্ট্রং সেন্টারওয়ালা দক্ষিণপন্হী শাসনতন্ত্র। প্রথম অবস্থাঘটিত পরিবেশ-আপোসমূলক শাসনতন্ত্র এল. এফ. ও-র সাথে সংগতি রাখিতে গিয়া যতই ত্রুটিপূর্ণ ও গণ-বিরোধী হউক না কেন, ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটার, মার্শাল ল' প্রত্যাহারের ও পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব পুনরুজ্জীবনের, পরে সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রয়োজনীয় সংশোধনের দ্বারা শাসনতন্ত্র গণমুখী করিতে পারিবে। দ্বিতীয় অবস্থার শাসনতন্ত্রে এটা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, সে অবস্থায় ভগ্নাবশেষ গণ-পরিষদ শুধু দক্ষিণপন্হীদের লীলাভূমি হইবে। তাঁরাই সরকার গঠন করিবেন। শাসনতন্ত্রকে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের বলে সংশোধন করিয়া গণমুখী করিবার ইচ্ছা তাঁদের থাকার কথা নয়। এই অবস্থায় রচিত শাসনতন্ত্রে যদি এল. এফ. ও. নির্ধারিত পার্লামেন্টের মেম্বর সংখ্যা (তিন শতে) ঠিক থাকে এবং নির্বাচন প্রথা ও প্রতিনিধিত্বের বুনিয়াদ (মুক্ত নির্বাচন ও জন সংখ্যা) বজায় রাখা হয়, তবে হয়ত এল. এফ. ও. বিরোধী মেম্বরদের খালি করা

আসনগুলি বাই ইলেকশনে পূর্ণ করা হইবে। কিন্তু তাতেও শাসনতন্ত্র সংশোধনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ সংখ্যা কমাইয়া ভগ্নাবশেষ গণ-পরিষদের মেম্বর-সংখ্যাকেই শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের মোট আসন-সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় এবং যদি যুক্ত নির্বাচন-প্রথার বদলে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত ও জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব বাতিল অথবা সমান ক্ষমতাবান উচ্চ পরিষদ গঠিত হয় তবে পুঁজিবাদী, স্ট্রং-সেন্টারওয়ালা অটনমি বিরোধীদের শক্তি এমনভাবে কায়েম হইয়া যাইবে যে, সমাজবাদী অটনমি-স্টদের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তার পরিণাম শুভ হইবে না।

এইবার আশা করি, পাঠকদের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগের কথার ও পরের কথার তাৎপর্যের গুরুতর পার্থক্যটা পরিষ্কার হইয়াছে। মোটকথা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগের কথার অর্থ ছিল, তাঁর পছন্দমত শাসনতন্ত্র যদি গণ-পরিষদ রচনা না করে, তবে গণ-পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে, মার্শাল ল চলিতে থাকিবে। তাঁর পরের কথার তাৎপর্য এই যে, গণ-পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশের মত যাই হউক কার্যতঃ তিনি নিজেই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিবেন। স্পষ্টতঃই সে শাসনতন্ত্র নির্বাচিত গণ-পরিষদের-দেওয়া শাসনতন্ত্র হইবে না। সেটা হইবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার-দেওয়া শাসনতন্ত্র। সে শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদে ক্ষমতা হস্তান্তর হইলে সে হস্তান্তরে রাষ্ট্র-ক্ষমতা জনগণের হাতে আসিবে না। এটাকে কিছুতেই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলা চলিবে না। অধিকাংশ ভোটারের ইচ্ছামত দেশ চলার নামই গণতন্ত্র।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিক বক্তৃতার যে অর্থ উপরে করিলাম শেষ পর্যন্ত আমি প্রার্থনা করিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যেন ও পথে না যান। এ আশা আমি করিব এই জন্য যে, ওটা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পথ নয়, ওটা সাবেক প্রেসিডেন্ট আইউবের পথ। সাবেক প্রেসিডেন্ট আইউবের পথে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যাইবেন না, দেশবাসী গোড়া হইতে এই আশা করিয়া আসিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কোনও কারণেই সে পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। কারণ তাতে আমাদের বিপদ অনিবার্য।

ইত্তেফাক, ৬ই ডিসেম্বর, '৭০

৪৯

সোনালী আঁশের অযত্নের অবসান হইবে কবে?

গত ৭ই-৮ই জানুয়ারি ঢাকায় পাট বিজ্ঞানীদের একটি সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে সম্মিলনীটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আমাদের সাংবাদিকরা সম্মিলনীটিকে কোনও গুরুত্ব দেন নাই। তারও হয়ত কারণ আছে। কিন্তু তার ফলে এমন একটি সম্মিলনীর বিষয়ে দেশবাসী কিছুই জানিতে পারিল না। এটা দুঃখের বিষয়।

সম্মিলনীর আয়োজন হইয়াছিল কেন্দ্রীয় পাট কমিটির পক্ষ হইতে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জুট কমিটির কৃষি গবেষক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ এস. ডি. চৌধুরী সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ভাষণ দিয়াছেন কেন্দ্রীয় কৃষি দফতরের সেক্রেটারি মিঃ এ. কে. এম. আহসান, জুট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ লুৎফুর রহমান এবং আরও অনেক পাট-বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। আশা করা যায়, এঁদের প্রত্যেকের ভাষণই মূল্যবান, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও শিক্ষামূলক হইয়াছিল। প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে বুঝা যায়, সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর-প্রসারী ছিল। বিশেষ বক্তাগণের ভাষণও নিশ্চয়ই সেই অনুপাতে শিক্ষণীয় হইয়াছিল। এই ধরনের ভাষণের মর্ম জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, জানা খুবই দরকার। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের প্রাক্কালে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পাট সম্পদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কথা জানা দেশবাসীর জন্য ছিল সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

যতদূর জানা গিয়াছে তাতে বোঝা যায়, পাট গবেষণা সম্বন্ধে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা তৈয়ারীর উদ্দেশ্যেই পাট-গবেষক বিজ্ঞানীদের এই সম্মিলনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। কি কি সিদ্ধান্ত সম্মিলনীতে হইয়াছে, তা প্রকাশিত হয় নাই। ও-সব বিশেষজ্ঞের ব্যাপারে জনসাধারণের কিছু জানিবার বা বলিবার নাই বলিয়াই বোধ হয় সে-সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু সম্মিলনীতে কেন্দ্রীয় কৃষি সেক্রেটারির ভাষণের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী বাহির হইয়াছে, তাই যদি তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম হয়, তবে এই সম্মিলনীর সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ না হইয়া উপায় নাই। আমাদের সদা-

সচেতন-কর্তব্যপরায়ণ সাংবাদিকরা যে এই সম্মিলনীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন তার কারণও বোধ হয় এটাই।

রিপোর্টে যা প্রকাশ পাইয়াছে, তাতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় কৃষি সেক্রেটারি বলিয়াছেন ঃ এক, আমাদের পাটের উৎপাদন বাড়ান দরকার; দুই, পাট সম্পর্কে গবেষণা হওয়া যতটা দরকার, আমাদের বিজ্ঞানীরা তা করিতেছেন না; তিন, সরকারের টাকা-পয়সা কম বলিয়া উদ্দেশ্য-পূর্ণ গবেষণা ছাড়া অন্য কাজে সে টাকা-পয়সার অপব্যয় করা উচিত না।

কথা কয়টি টিপিক্যাল। পাটের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী মনোভাবের নির্যাস। গত তেইশ বছর ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই একই ধরনের কাজ করিয়া আসিতেছেন। পাট-সম্পদের উপর স্বভাবতঃই একই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। পাকিস্তান হওয়ার দিন যে পাট ছিল আমাদের বাহাত্তর লক্ষ বেল, কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় তার পরিমাণ নামিয়াছিল বিয়াল্লিশ লক্ষ বেলে। পাকিস্তানের জীবনের গোড়ার দিকে বহু বছর ধরিয়া যে পাট আমদানি করিত আমাদের বিদেশী মুদ্রার শতকরা সত্তুর টাকা, সেই পাট এখন বিদেশী মুদ্রা আয় করে শতকরা চল্লিশেরও কম। বিদেশের পাটের বাজারে আমাদের যে পাটের ছিল একদিন মনপলি, পরিমাণ ছিল শতকরা আশি, কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় আজ তাই হইয়া পড়িয়াছে পিছনের কাতারের বিক্রেতা, শতকরা হিসাবে বত্রিশ ভাগ। পার্টিশনের দিন যে ভারতের পাটের অংশ ছিল তের লক্ষ বেল, সেই ভারত আজ পাট উৎপাদন করে আশি লক্ষ বেলেরও বেশী। কেন্দ্রীয় সরকারের পাট-নীতির ইহাই সংক্ষিপ্ত সার। আলোচ্য সম্মিলনীতে কৃষি-সেক্রেটারির বক্তৃতায় সেই সনাতননীতিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

প্রথমে উৎপাদনের কথাটাই বলা যাউক। কৃষি-সেক্রেটারি তাঁর ভাষণে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির উপর খুব জোর দিয়াছেন। আট-নয় বছর আগে পাট-চাষীরা সরকারের নির্দেশমত কম পরিমাণ জমিতে পাট উৎপাদন করিতেন। পাট-চাষীদেরে বলা হইত, কম পাট উৎপাদন করিলে বেশী দাম পাওয়া যাইবে। সরকারে কথা সত্য প্রমাণিত হয় নাই। হইবার কথাও নয়। কারণ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক সরকারের। আর পাট বিক্রির অধিকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। যে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা নাই ন্যায্য মূল্য দিবার, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার, মানে কমাইবার, তাঁর ন্যায়তঃ কোনও অধিকার নাই। তাই পাট-চাষীরা সরকারের নির্দেশমত পাট চাষ কমায়ও নাই, বাড়ায়ও নাই। পাট নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করিতে গিয়া সরকার খামাখা পাট-চাষীদের উপর

যুলুম করিয়াছেন। পাটের দাম দেখিয়াই চাষীরা উৎপাদন বাড়াইয়াছেন, কমাইয়াছেন। কাজেই শুধু কৃষি সেক্রেটারির নির্দেশে পাটের উৎপাদন বাড়িবে না।

তখন বলা হইয়াছিল, পাটের ন্যায্য দাম পাইবার উদ্দেশ্যেই সরকার পাট চাষ কমাইতেছেন। বিশ্বের বাজারে পাটের চাহিদা কম ও প্রতিযোগিতা বেশি বলিয়াই পাট চাষ কমান দরকার। এখন কি তবে চাহিদা বাড়িয়াছে ? প্রতি-যোগিতা কমিয়াছে ? পাটের বিকল্প আঁশের উপদ্রব হ্রাস পাইয়াছে ? এবারের বাজার অবশ্য গড়ে মণ-প্রতি চল্লিশ। কিন্তু এটা ত উপর্যুপরি ঝড়-তুফান ও বন্যার দরুন উৎপাদনের কমতির ফল। সরকার পাট-চাষীকে ন্যায্য মূল্য দিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? এবারের এই উচ্চ মূল্যও ত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সত্তুর টাকার মোকাবিলা অনেক কম।

কাজেই সরকারের এই নীতি আজও আগের মতই রহস্যজনক। তার প্রমাণ এই যে, আলোচ্য সম্মিলনীর তারিখেই পূর্ব পাকসরকারের প্রচার দফতর হইতে একটি আত্ম-প্রশংসামূলক প্রেসনোট বাহির হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষি-সেক্রেটারি সাহেবের বক্তৃতার সাথে মিল রাখিয়াই যেন প্রাদেশিক সরকার এই বিবৃতি ছাড়িয়াছেন। এই প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, পাট উৎপাদন বৃদ্ধির সরকারী চেষ্টা গতবার আশাতিরিক্ত সফল হইয়াছে। গতবার চার লাখ একর জমিতে নতুন ধরনের পাট চাষ করা হইয়াছিল। তাতে বরাবরের চেয়ে ৪·১৮ লাখ বেল বেশী উৎপাদন হইয়াছে। হইবে না ? সরকার যে এই নয়া স্কিমে আঠার লাখ টাকা খরচ করিয়াছেন। এমন ভাল ফল পাইয়া সরকার এবার দশ লাখ একরে নতুন ধরনের উৎপাদন নীতি চালাইবেন। আশা করা যায়, সবদিক সহি-সালামতে গেলে আগামী বছর ৮১·৮৫ লাখ বেল-পাট উৎপাদিত হইবে। এই খবর পাইবার পর কেন্দ্রীয় কৃষি-সেক্রেটারি নিশ্চয়ই খুশী হইয়াছেন। উৎপাদনের দিকের দুশ্চিন্তা তাঁর দূর হইল।

এইবার আসুন পাট-গবেষণার দিকে। সেক্রেটারি সাহেব যথাযোগ্য গবেষণার অভাবের জন্য বিজ্ঞানীদেরে দোষী করিয়াছেন। বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য নয়। কৃষি-সেক্রেটারি আমলাতন্ত্রের সনাতন অভ্যাসমত সরকারের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাট-গবেষণার দুইটা দিক ঃ এক, উৎপাদন-গবেষণা, দুই, শিল্প-গবেষণা। এই দুইটা ব্যাপারেই বিজ্ঞানীরা মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। গবেষণার ফলাফলও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানীরাও সাধ্য ও সুযোগমত গবেষণা করিয়াছেন। যে-যে কারণে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানীরা বেশি কিছু করিতে

পারেন নাই, সে সব কারণের জন্য দায়ী সরকার একা। গবেষণার জন্য যে ধরনের ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম অত্যাবশ্যক, তার ব্যবস্থা সরকার-কেই করিতে হইবে। কৃষি-সেক্রেটারি বিজ্ঞানীদেরে দোষ দিবার আগে নিজের দফতরে খোঁজ করুন, সরকার এ বিষয়ে কি করিয়াছেন। সি. এস. আই. আর. ও বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের কথা বাদ দিলেও খোদ কৃষি-দফতরের অধীনস্থ জুট কমিটির জুট-রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কারিগরি শাখার বিজ্ঞানী-দের কি কাজে তাঁরা লাগাইয়াছেন? আজ হইতে ছয়-সাত বছর আগে ডাঃ কুদরতে খুদার নেতৃত্বে ঢাকাস্থ সি. এস. আই. আর. ল্যাবরেটরিতে পাট-শোলা, পাটপাতা, পাটবীজ ও পাটশিকড় হইতে মূল্যবান গৃহ-নির্মাণ সরঞ্জাম ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার গবেষণা করা হইয়াছিল এবং ঐসব গবেষণার ফল কাজে লাগাইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই ছয়-সাত বছরে সরকার তার কি করিয়াছেন? দেশবাসী ও বিজ্ঞানীরা সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি?

১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সরকার একটি পাটতদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। বহুদিন দেশময় ভ্রমণ, তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, বহু সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞের মতামত লইয়া লন্ডন, প্যারিস ও ডান্ডি সফর করিয়া কমিশন একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট দাখিল করেন ১৯৬০ সালে। এই রিপোর্টে পাটের উৎপাদন ও কারিগরি উভয় দিক হইতে রিসার্চ করিবার অনেকগুলি মূল্যবান ও সুদূর-প্রসারী সুপারিশ করা হইয়াছিল। আলোচ্য সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ডাঃ এস. ডি. চৌধুরী ঐ কমিশনের মেম্বর ছিলেন। তিনি কৃষি-বিশেষজ্ঞ একজন বিজ্ঞানী। কাজেই ঐ সব মূল্যবান সুপারিশে তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল, এটা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দশ বছরে সে সব সুপারিশের কয়টি সরকার কার্যে পরিণত করিয়াছেন, তাও তিনি ভাল করিয়া জানেন। আলোচ্য রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, বিদেশে পাকিস্তানী পাট-জাত বায়ান্ন প্রকারের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পাটের এত বেশী সংখ্যক ব্যবহার শুধু জুট ফাইবার, মানে নালিতার ছালের। ডাঃ কুদরতে খুদার প্রদর্শিত পাটশোলা, পাটজাত ও পাটবীজাদির ব্যবহার ঐ বায়ান্ন রকমের দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। পাটের এই বহুল ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়াই পাট-কমিশন আমাদের দেশে জুট রিসার্চের উপর এত জোর দিয়া-ছিলেন। কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, জুট ইন্সটিটিউটের টেকনিক্যাল উইংসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদিগকে পাট-গবেষণার কাজে লাগান হউক। তাঁদের শিক্ষা ও ট্রেনিং দিবার জন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনা হউক। গত

দশ বছরে এই সুপারিশের কতটুকু কার্যে পরিণত হইয়াছে, কতজন পাকিস্তানী বিজ্ঞানীকে এই জাতীয় টেকনোলজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে, আগাগোড়া সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী হিসাবে ডাঃ চৌধুরীর তা ভালরূপ জানিবার কথা। ইংলন্ডের লন্ডন, ডান্ডি, ম্যাঞ্চেস্টার ও জার্মানীর হামবুর্গ ইত্যাদির মত উন্নত মানের না হইলেও পাকিস্তানে ও ভারতে পাট গবেষণা বেশ কিছুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। পাকিস্তানী পাট ভারতীয় পাটের চেয়ে অনেক গুণে উন্নত মানের। এই কারণেই তেইশ বছরের স্বাধীনতার মুদ্দতে উপরোক্ত বায়ান্ন প্রকারের পাটজাত দ্রব্যের অনেকগুলি পাকিস্তানে তৈয়ার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে জুট রিসার্চের প্রতি সরকারী অবহেলার দরুন ভারত গবেষণার ব্যাপারেও আমাদের চেয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কেন? কিভাবে এটা ঘটিয়াছে? এর প্রতিকারইবা কি? এ সব কথা যদি আলোচ্য সম্মিলনীতে বিবেচনা করা হইয়া থাকে, তবে সম্মিলনী সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু কি কি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে, দেশবাসী তা জানিতে পারিল না বলিয়া সম্মিলনীর সাফল্য-নিষ্ফলতা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা যাইতেছে না। প্রকাশিত রিপোর্টের 'লম্বা মেয়াদী ও খাট মেয়াদী পরিকল্পনার দ্বারা পাট-বিজ্ঞানীরা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তা তাঁরাই জানেন। কৃষি-সেক্রেটারি সরকারী সাহায্যের যে আশ্বাস দিয়াছেন, সেটা সহযোগিতা বা সরকারী দায়িত্বের কথা নয়, শর্তাধীনে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার কথা। বিভিন্ন বিভাগের পাট-গবেষকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন, তবে কেন্দ্রীয় কৃষি-দফতর তাঁদের 'যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্যের' 'দ্বারা সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। এটা দেশী সরকারের ভাষা নয়। বিদেশী হিতৈষীর কথা। পূর্ব বাংলার পাট-সম্পদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের প্রতীক এটা।

পূর্ব বাংলায় পাট উৎপাদক জমির পরিমাণ পঞ্চাশ লাখ ত্রিশ হাজার একর। গত বছরের গড়পড়তা হিসাবে এর মধ্যে ষোল লাখ একর জমিতে পাট আবাদ করা হইয়াছে। গড়পড়তা উৎপাদন হইয়াছে বছরে পঁয়ষট্টি লাখ বেল। তার মানে গড়ে একর প্রতি ষোল মণ। এই হিসাবে পূর্ব বাংলা প্রতিবছর আট কোটি বেল পাট উৎপাদন করিতে পারে। কাঁচা পাট ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই আমরা আল্লার দেওয়া এই সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। এ সদ্ব্যবহার মানে শুধু পাট ছালের নয়, তার শোলা, পাতা, বীজ ও শিকড় সবই। টাকার হিসাবে এই সম্পদের দাম হইবে বছরে পাঁচশ কোটি টাকা। এটা কবির কল্পনা নয়, বিজ্ঞান ও কারিগরির সাহায্যে এটা সম্ভব। তেইশ বছরের মধ্যেই এটা সম্ভব হওয়া উচিত ছিল।

শুধু একটিমাত্র বস্তুতে যে পূর্ব বাংলা এত সম্পদের অধিকারী, তাকে গরিব বলা এবং সত্য সত্যই তাকে দারিদ্র্যের নর্দমায় ফেলিয়া রাখা দস্তুরমত ফৌজদারি অপরাধ।

আজ আমরা গণতন্ত্রের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত। সবদিক সহি-সালামতে থাকিলে দুই-এক মাসের মধ্যেই জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা আসিতেছে। পাট-সম্পদের সার্বিক সদ্ব্যবহারের জন্য গণতান্ত্রিক সরকার কি কি পন্থা গ্রহণ করিবেন, আলোচ্য সম্মিলনীতে সমবেত বিজ্ঞানীরা যদি তা নির্দেশ করিয়া থাকেন, তা হইলেই সম্মিলনী সফল হইয়াছে বলা যাইবে।

ইত্তেফাক, ১৭ই জানুয়ারি, '৭১

৫০

আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি

(১)

সব সভ্য জাতিরই একটা কৃষ্টিক পটভূমি থাকে। পাক-বাংলারও আছে। পাক-বাংলা রাষ্ট্রীয় নেশন হিসাবে নতুন হইলেও সভ্য মানব-গোষ্ঠী হিসাবে পুরাতন। বস্তুতঃ প্রাচীন সভ্য মানবগোষ্ঠী হিসাবে পাক বাংগালী জাতির বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে পাক-বাংলা দ্রাবিড় নামক এক প্রাচীন সভ্য জাতির অধিবাস ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশে আর্য জাতির আগমনের প্রায় দুই হাজার বছর আগে হইতেই এঁরা পাক-বাংলার স্থায়ী বাশেন্দা ছিলেন। দ্রাবিড়রা সেমেটিক গোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। পাক-বাংলায় আগমনের আগে এরা ব্যাবিলন অঞ্চলে বাস করিতেন। আর্যদের বহু আগে এঁরা ভারতে আসেন। প্রথমে তাঁরা সিন্ধু-দেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা এঁদেরই দ্বারা স্থাপিত রাজধানী। এই দুই সুপ্রাচীন নগরীর স্থপতি ও কারুকার্য হইতেই দ্রাবিড় জাতির সভ্যতার পরিমাপ করা যায়। এই স্থপতির বয়স পাঁচ হাজার বছর। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে এই দুই প্রাচীন নগরী নির্মিত হইয়াছিল।

এঁদেরই এক অংশ দক্ষিণ ভারতের পথে ছড়াইয়া পড়েন। সেখান হইতে একদল পাক-বাংলার মাটির উর্বরতায় আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসেন এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মত সুন্দর নগরী পাক-বাংলায়ও নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ-উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোনও চিহ্ন নাই। প্রাকৃতিক কারণে পাক-বাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল মসলাও যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতী, মহাস্থানগড় ইত্যাদিই তার প্রমাণ। ময়নামতী ও মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া পাক-বাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দায করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না। এগুলি সে স্থপতির আসল ও

সম্পূর্ণ রূপ নয়। ঐতিহাসিক ও স্থপতি-বিশেষজ্ঞদের মতে পাক-বাংলার বহু প্রাচীন স্থপতি নিদর্শন কীর্তিনাশা পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনা, সুর্মা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, কপোতাক্ষ নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নদীমাতৃক পাক-বাংলার পলিমাটি শুধু হাজার হাজার বছরের প্রাচীন কীর্তিই গ্রাস করে নাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাঠান মোগল যুগের কীর্তিগুলিও ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। ছয় শ' বছরের পাঠান-মোগল আমলে এবং তারও আগে চার হাজার বছরের দ্রাবিড়ী ও বৌদ্ধ-হিন্দু শাসন আমলে পাক-বাংলার নিশ্চয়ই অসংখ্য নগর-বন্দর ও রাজধানী-শহর স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেখানে অগণিত দুর্গ-প্রাসাদ ও হাবিলি-ইমারত নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলি গেল কোথায় ? কোনও চিহ্ন নাই তাদের কি কারণে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন স্যার চার্লস উইলি ও তাঁর মত বহু বিশেষজ্ঞ। স্যার চার্লস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'এন্টিকস্-অব ঢাকা'য় লিখিয়াছেনঃ 'যে জায়গায় চার শ' মাইলের মধ্যে পাথর পাওয়া যায় না, যে দেশের মাটিতে শক্ত কাঠ জন্মে না, যে স্থানে এবং যে যুগে সিমেন্ট আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই যুগে স্বভাবতঃই ইট-শুড়কি-চুন দিয়াই দালান-ইমারত নির্মিত হইত। যে দেশের আবহাওয়ার বার্ষিক আর্দ্রতা ৯২ ডিগ্রি, যে দেশে বন্যা লাগিয়াই আছে, যে দেশের প্রবল স্রোতস্বিনী নদী দু'কূল ছাপাইয়া ও ভাংগিয়া পথ চলে, সে দেশে দালান-ইমারতের হায়াত লম্বা হইতে পারে না। কিভাবে পাখীর ঠোঁটে বা বাতাসের সাথে বটের বীজ দালান-ইমারতে ছড়াইয়া পড়ে, কিভাবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সে বটের বীজ চারায় পরিণত হয়, কিভাবে সে চারার শিকড় দালানের পরতে পরতে প্রবেশ করিবার পর তাতে পাতা হয় এবং মানুষের নযরে ধরা পড়ে, কিভাবে ততদিনে সে বটের শিকড় তেমন মজবুত ও পাথরের মত শক্ত ইট শুড়কির গাঁথনি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া দুরপনেয় গাছে পরিণত হয়, কিভাবে সেই সব শিকড় অক্টোপাসের মত অংসখ্য হাত-পা ছড়াইয়া দালানের লাইনে লাইনে বিরাট ও মারাত্মক চির ও ফাটল সৃষ্টি করিয়া অমন শক্ত দালান-ইমারতের হায়াত কমাইয়া দেয়, সূক্ষ্মদর্শী বিশেষজ্ঞের মতই স্যার চার্লস তাঁর নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন। তারপর বহু নযির প্রমাণ দিয়া স্যার চার্লস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাক-বাংলার অগণিত নগর-বন্দর ও দুর্গ-শহর তাদের প্রাসাদ-ইমারতসহ হয় নদী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে, নয় ত নদী-তীরের বালু-কণায় পর্যবসিত হইয়াছে। অন্যান্য নযিরের মধ্যে দুলাই নালার মোহনায় অবস্থিত ঢাকা বন্দরের অতীত গৌরবের বর্ণনাই তিনি বিশেষভাবে দিয়াছেন। তিনি তাঁর বিশাল পুস্তকের অন্যতম প্রধান সুচিন্তিত সুলিখিত অধ্যায় 'রিফ্লেকশন্স অন তাঁতি বাজার ব্রিজ'এ বলিয়াছেনঃ

"অসংখ্য নাবিক ও জাহাজ-মিস্ত্রীদের হৈ-হল্লা একদা এই বন্দরে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইত। দুলাইনালার দুই পাড় ও তৎসংলগ্ন বিশাল এলাকা একদা বাণিজ্যিক কর্ম-ব্যস্ততায় সদা-চঞ্চল ও কর্ম-তৎপরতায় সদা-মুখরিত থাকিত। মূল বন্দর রাজকীয় রণতরীর সাজ-সরঞ্জামে সদা-সমৃদ্ধ ও সম্ভারপূর্ণ থাকিত। অসংখ্য আলোকমালায় গোটা বন্দর এলাকা দিন-রাত আলোকে উদ্ভাসিত থাকিত। সেই বন্দরই আজ নিস্তব্ধ জন-শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করিতেছে। আজও এখানে সেই বুড়ীগংগা তার নীরব ম্যাজেস্টি লইয়া আগের মতই বহিয়া যাইতেছে। মানুষের তৈরারী যে-সব আর্ট ও ইন্ডাস্ট্রি বুড়ীগংগার তীর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময় করিয়াছিল, সে সবের সকল নিদর্শন আজ তারই গর্ভে বিলীন হইয়াছে। অথবা তার তীরবর্তী বালুকারাশিতে পরিণত হইয়াছে। পদ্মার পারের ইতিহাসও অবিকল তাই। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে পদ্মাকে কীর্তিনাশা নাম দেওয়া ঠিকই হইয়াছে।"

(২)

পাক-বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী-নালা তার অতীত গৌরবের আর্ট ইন্ডাস্ট্রি ও স্থপতিকে এমনিভাবে বিধ্বস্ত ও তছনছ করিয়াছে। কিন্তু একটিমাত্র ব্যাপারে এসব নৈসর্গিক প্রতিকূলতা পাক-বাংলার জীবনে কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন সাধিতে পারে নাই। সেটা পাক-বাংলার কৃষ্টি। পাক-বাংলার মজবুত শক্ত দুর্গ-প্রাসাদ ও দালান-ইমারত যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীর ভাংগনের সামনে টিকিতে পারে নাই, সেই কীর্তিনাশা সর্বনাশা ঝড়-ঝন্ঝা-প্রলয়ের সামনে যে একটিমাত্র বস্তু অটল স্থায়িত্ব লইয়া নিজের গৌরবে উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তা পাক-বাংলার কালচার। তার কারণ এই যে, পাক-বাংলার কালচার তার মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। সে কালচারের শিকড় দেশের মাটির গহিনে বিস্তৃত। পাক-বাংলার কৃষ্টি, পাক-বাংলার দালান-ইমারতের মত ইট-শুড়কি দিয়া নির্মিত হয় নাই, তার বদলে এ কালচার নির্মিত হইয়াছে তার রগ-শিরায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পাক-বাংলার আত্মায়। ফলে বৈদেশিক ভাবধারা ও পরকীয় কালচারের বন্যার পলিমাটি ও ঝড়-তুফানের ধূলি-বালুতে মাঝে-মাঝে সে কালচার চাপা পড়িয়া থাকিলেও প্রতিকূল আব-হাওয়ার অবসান হওয়া মাত্র স্বাভাবিকতার মলয় হাওয়ায় সে কালচার তার আপন ঔজ্জ্বল্যে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে।

অতি প্রাচীন পাক-বাংলার ঐ কালচারেরই নব-রূপ নব-পর্যায়ে আমাদের বর্তমান কালচার। নব-পর্যায়ের এই কালচার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ধর্ম

ইসলামেরই অবদান। ইসলাম ধর্ম পাক-বাংলা ও তার জনগণের সামনে দিগিব-জয়ীর বেশে আসে নাই। এখানে সে ধর্ম আসিয়াছে জনগণের ধর্ম হিসাবেই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলামের আবির্ভাবের ইহাই মৌলিক পার্থক্য। ইতিহাসের অসাধারণ লেখক ও পাঠকরা এইখানেই মস্তবড় ভুল করিয়া থাকেন। তাঁরা দিগিবজয়ী বীর বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলায় আগমনকেই এদেশে ইসলামের আগমন মনে করিয়া থাকেন। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলা জয় করেন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে। বার শতকের শেষ-বছরে। এই ঘটনার প্রায় তিনশ বছর আগে হইতেই পাক-বাংলায় শুধু ইসলামের আবির্ভাবই হয় নাই, ততদিনে ইসলাম পাক-বাংলার অনেক অঞ্চলে জনগণের ধর্মে পরিণত হইয়াছে। পাক-বাংলায় ইসলামের প্রথম আবির্ভাব হয় পশ্চিমা স্থলদেশ দিয়া নয়, দক্ষিণ দিক দিয়া জল-পথে। চাটগাঁ বন্দর হইয়াই ইসলাম বাংলায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম।

বায়যিদ বোস্তামী দীর্ঘদিন বাংলায় ইসলাম প্রচার করিবার পর হাজার-হাজার মুরিদ-মোতেকাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা লইয়া ৮৭৪ খ্রীষ্টীয় সালে পরলোক গমন করেন এবং তাঁর প্রধান কর্ম-স্থল চাটগাঁয়ে সমাহিত হন। মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহিসোওয়ার (মৃত্যু ১০৪৭ খৃঃ), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (মৃত্যু ১০৫৩ খৃঃ), বাবা আদম শহীদ (মৃত্যু ১১১৯ খৃঃ), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকান প্রমুখ ইতিহাস বিখ্যাত অলি-আল্লাগণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচার করিয়া হাজার হাজার মুরিদান রাখিয়া গিয়াছেন। এ'রা সকলেই বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের এক হইতে তিন শ' বছর আগে বাংলাদেশে লক্ষ-লক্ষ লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বখতিয়ার খিলজির আমল (১১৯৯) হইতে ইলিয়াস শাহী আমল (১৩৪২) পর্যন্ত এই প্রায় দেড়শ বছর কালকেই বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার প্রাথমিক অধ্যায় বলা যাইতে পারে। এই মুদ্দতেই মুসলমান শাসকরা সর্বপ্রথম গোটা বাংলায় নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে সফল হন। কিন্তু এই মুদ্দতকে বাংলায় ইসলামধর্মের প্রসার লাভ করার প্রথম যুগ বলা ভুল হইবে। উপরে উল্লিখিত অলি-আল্লাদের প্রচার-ফল কি হইয়াছিল তা অনুমান করিতে পারি আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, ১৩০৩ সালে বিখ্যাত পীর দরবেশ বীর-যোদ্ধা শাহ জালাল সাহেব সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করিয়া সিলেট জয় করেন। পীর সাহেব নিশ্চয়ই বিনা-কারণে পররাজ্য দখল করিতে আসেন নাই। মুসলমান প্রজাদের উপর রাজা গৌরগোবিন্দ অমানুষিক যুলুম

করিতেছিলেন বলিয়াই শাহ জালাল সাহেব শুধু মুসলমানদের রক্ষার জন্যই সিলেট আক্রমণ করিয়াছিলেন। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, রাজা গৌরগোবিন্দ তাঁর মুসলিম প্রজাদের ধর্ম-কাজে বাধা দিতেন। তাদের উপর সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতেন। মুসলিম প্রজারা আবেদন-নিবেদন করিলে রাজা তাতে কর্ণপাত করিতেন না। বিধি-নিষেধ অমান্য করিলে প্রজাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। মসজিদে আযান দিতে না দেওয়া, জমাতে ঈদের নামায পড়িতে না দেওয়া, গরু কোরবানি নিষেধ করা, টুপি পরিতে না দেওয়া, মুসলমানদের দাড়ি কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ছিল রাজা গৌরগোবিন্দের অসংখ্য যুলুমের কয়েকটি নমুনা মাত্র। রাজার অত্যাচার মুসলমানদের পক্ষে অসহ্য হইলেই তারা বাধ্য হইয়া দিল্লীর বাদশাহ সুলতান ফিরোয শাহের দরবারে একদল প্রতিনিধি পাঠায়। এই প্রতিনিধি দলের মুখে রাজা গৌরগোবিন্দের মুসলিম-প্রজা-নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়াই দিল্লীর বাদশাহ শাহ জালালকে মুসলিম নির্যাতন নিবারণ করিতে পাঠান। শাহ জালাল সিলেট পেঁছিবার আগেই ফিরোয শাহ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন এবং সুলতান আলাউদ্দিন তখ্তে আরোহণ করেন। আলা-উদ্দিন খিলজিও শাহজালালকে সাহায্য করেন। রাজা গৌরগোবিন্দ কোন প্রতিকার না করাতেই শাহ জালাল সিলেট আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে রাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হন। শাহ জালাল সিলেট দখল করেন।

(৩)

এই ঘটনা হইতে আমরা কি বুঝি? বুঝি এই যে, ঐ সময়ে সিলেটে এত বেশী মুসলমান ছিল যে, হিন্দু রাজার পক্ষে অত্যাচার করা দরকার হইয়াছিল। মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী ও দলে ভারি না হইলে রাজার আদেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারিত না, আইন অমান্য করিতে পারিত না, টুপি পরিয়া দাড়ি রাখিয়া প্রকাশ্যে চলাফিরা করার, মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাতে উচ্চস্বরে আযান দিবার ও জামাতে ঈদের নামায পড়িবার সাহস পাইত না। অবশেষে দিল্লীর দরবারে প্রতিনিধি পাঠাইবার সাহসও তাদের হইত না। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ঐ সময়ে সিলেটে বহু সংখ্যক মুসলমান বিদ্যমান ছিল।

এই একটিমাত্র ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বখতিয়ার খিলজী বাংলা দখল করিবার বহু আগে হইতেই বাংলার জনগণের এক বিপুল অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অন্য কথায় বলা যায়, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি

বাংলা জয় করিবার বহু আগেই ইসলামের কৃষ্টিক শক্তি বাংলা জয় করিয়াছিল।

প্রশন এই যে, এটা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং কবে হইয়াছিল? প্রথম প্রশনটার ঐতিহাসিক জবাব এই যে, চাটগাঁ বন্দরের মধ্য দিয়া বাংলা-দেশে প্রথম ইসলামের শুভাগমন হয়। এই হিসাবে পাক-বাংলার কৃষ্টিক পটভূমি রচনায় চাটগাঁ বন্দরের ভূমিকা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি প্রবেশ করে পশ্চিম সীমান্ত পথে, উত্তর-ভারত হইতে। পক্ষান্তরে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে দক্ষিণ দিক হইতে সমুদ্র পথে চাটগাঁ বন্দর দিয়া। বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির রূপ তুর্কী, পাঠানী ও মোগলাই রূপ। পক্ষান্তরে বাংলার ইসলাম ধর্মীয়রূপ খাঁটি আরবী রূপ। পাক-ভারতে অপরাপর অঞ্চলের মুসলমানদের তুলনায় বাংগালী মুসলমানদের আড়ম্বরহীন, অপ্রদর্শনবাদী সতেজ ধর্মীয় চেতনাই বাংগালী মুসলমানদের এই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বাংগালী মুসলিম জনসাধারণের কথ্য ভাষায়, মুখের যবানে ফারসী-উর্দুর চেয়ে আরবী শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায় বেশি। তার কারণও এইখানে নিহিত। কিন্তু সে কথা একটু পরে বলিতেছি।

চাটগাঁ বন্দরের মধ্যে দিয়া পাক-বাংলায় ইসলামের আগমন এবং পাক-বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি কায়েমের বহু আগে হইতেই ধর্ম হিসাবে এখানে ইসলামের প্রতিষ্ঠার কথাটাই আগে বলিয়া নিতেছি। এতে দেখা যাইবে যে, যেদিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বাধীনে বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির প্রথম পদার্পণ হয়, সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করিবার মত যথেষ্ট মুসলিম জন-শক্তি বাংলায় বিদ্যমান ছিল। কেমন করিয়া এটা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করিতেছি।

চাটগাঁ বন্দর আজ পাকিস্তানের জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে, এটা সবাই জানেন।

পাকিস্তানের দুই বাহুর নৌ-সংযোজক হিসাবে চাটগাঁ পাকিস্তানের সামুদ্রিক মীন রেখা নেভাল লাইফ লাইন। তার উপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্ট্র্যাটাজিক ঘোপের বন্দর হিসাবে এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ সবই চাটগাঁর আধুনিক গুরুত্ব।

কিন্তু চাটগাঁ বন্দরের অতীত গুরুত্ব ও গৌরব এর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সে গৌরব ও গুরুত্ব শুধু তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবেই

ছিল না, তৎকালীন জগতের সভ্যতা বিতরণের নাভিস্থল হিসাবেও এর অবিস্মরণীয় গুরুত্ব ছিল। সেই পরিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টিক পটভূমি হিসাবে চাটগাঁ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাই।

চাটগাঁ প্রাচীন বন্দর। কত প্রাচীন তা বলা কঠিন। তবে এ বন্দর যে বাংলাদেশের সমবয়সী, সে কথা নির্ভয়ে বলা চলে। বয়স ও সমৃদ্ধির দিক দিয়া চাটগাঁ দুনিয়ার অভিজাত বন্দরসমূহের অন্যতম, এটাও ইতিহাসেরই কথা। ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এই যে, খৃষ্টপূর্ব দুই শতক হইতেই এয়মন ও ব্যাবিলনীয় অঞ্চলের আরবরা চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী ছিল। সিংহল, মালাবার, কালিকট, চাটগাঁ, যাবা, সুমাত্রা, মালয় ও ক্যানটনে ইহাদের বাণিজ্যিক একাধিপত্য ছিল। সেই সময় হইতে পনর শতকে ওলন্দাজদের আগমন পর্যন্ত সে একাধিপত্য অটুট ছিল। চাটগাঁ এইভাবে দুই হাজার বছরের অধিককাল পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত ছিল এবং পশ্চিমে আরব, আবিসিনিয়া, এয়মন, আসিরিয়া, গ্রীস ও রোম এবং পূর্বে চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিত। এই দুই হাজার বছরের সুদীর্ঘ মুদ্দতে চাটগাঁ অনেকবার হাত বদল হইয়াছে। হিন্দুদের হাত হইতে বৌদ্ধদের হাতে, বৌদ্ধদের হাত হইতে আবার হিন্দুদের হাতে, হিন্দুদের হাত হইতে মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের হাত হইতে আবার বৌদ্ধদের হাতে, বৌদ্ধদের হাত হইতে দ্বিতীয়বার মুসলমানদের হাতে আসিয়াছে। হিন্দুদের আমলে এর নাম ছিল চাটিগ্রাম। বৌদ্ধদের আমলে এর নাম হয় চিট্‌সি-গং। মুসলমানদের হাতে এর নাম প্রথমে হয় সাতগাঁও, পরে ফতেহাবাদ এবং অবশেষে ইসলামাবাদ। তার পরে ১৭৬৬ সালে বাংলার শেষ নবাব মীর কাসিম আলী খাঁ ইংরাজদেরে এই বন্দর উপহার দেন। ইংরাজরা এর নাম রাখে চিটাগাং। কিন্তু এই সব পরিবর্তন ও হাত বদলের মধ্যেও চাটগাঁ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে তার পূর্ব গৌরব বরাবর অটুট অক্ষুন্ন রাখে। ষোল শতকের শেষ দিকে সম্রাট আকবরের সনদ লইয়া ওলন্দাজরা যেদিন চাটগাঁ বন্দরে প্রবেশ করে সেদিন এই বন্দর বহুদর্শী ওলন্দাজরাও চাটগাঁকে 'পোর্টো গ্র্যাণ্ড' মহান বন্দর বলিয়া উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়াছিল।

কিন্তু বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর হিসাবে চাটগাঁর গৌরব আলোচনা আমার আজকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমার আলোচ্য আরও গভীর। পাক-বাংলার ধর্ম-কৃষ্টিক জাতীয় জীবনের উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে চাটগাঁর যে

বিপুল অবদান, সে কথা বলাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার প্রতিপাদ্য এই যে, পাক-বাংলার কৃষ্টিক পটভূমি হিসাবে চাটগাঁর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অবিস্মরণীয়।

(৪)

দুনিয়ার যে-সব বন্দর-শহর দেশের রাজধানী না হইয়াও সোজা কথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হইয়াও জাতির জীবনে রাজধানীর চেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, চাটগাঁ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। বস্তুতঃ চাটগাঁ বন্দর শুধু চাটগাঁ শহর ও জিলাকে নয় তার নিকট ও দূরবর্তী সমস্ত হিন্টারল্যান্ড যথা আরাকান, বাংলা, ত্রিপুরা, কাছাড় ও আসামকে ধর্ম-কৃষ্টিতে প্রভাবিত করিয়াছে। কিভাবে, সে কথাই এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি ঃ

প্রধানতঃ দুইদিক হইতে এই প্রভাব ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, চাটগাঁ বন্দর পথে ইসলাম বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চাটগাঁর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

ধর্ম বিস্তারের কথাটাই আগে বলি। উপরে বলা হইয়াছে, চাটগাঁ বন্দর ইসলামের আবির্ভাবের বহু যুগ আগে হইতেই আরবদের বাণিজ্যিক কলোনী ছিল। চাটগাঁ হইতে সমুদ্র-পথে তারা উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ত করিতই, তার উপর নদী-পথে মেইনল্যান্ডের ভিতরেও বহুদূর পর্যন্ত উজাইয়া যাইত। কর্ণফুলী, মেঘনা, সুর্মা, গংগা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি-মূলনদী এবং ধলেশ্বরী, করতোয়া, তিস্তা, কংস, ইছামতী, শীতলক্ষ্যা ইত্যাদি শাখানদী-পথে যে-সব শহর-নগরে যাওয়া সম্ভব ছিল, সে-সব জায়গাতেও আরবরা নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। চাটগাঁ বন্দর-শহর প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরব সওদাগরদের বসতি স্থান ছিল। শহরের নাগরিক ও মিউনিসি-প্যাল কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ছিল এবং তারা তা যোগ্যতার সহিত পালনও করিত। দেশের ভিতরে বড়-বড় নগর-শহরেও বহু আরব সওদাগর একরূপ স্থায়ীভাবেই বসবাস করিতেন। স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে রাজপুত-নার মাড়োয়ারী ও কচ্ছ-সুরাটের ময়মনরা যেমন আমাদের জিলা শহর হইতে শুরু করিয়া সমস্ত বড়-বড় বাজার-বন্দরগুলিতে ছড়াইয়া ছিলেন খৃষ্টীয় সাতই শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত বাংলার শহর-নগরের আরব সওদাগরদের অবস্থাও তাই ছিল। সাতই শতকের গোড়ার দিকে আরবের মক্কা নগরীতে ইসলামের আবির্ভাব হয়। এই শতকের প্রথমার্ধেই ইসলাম আরব দেশে জনপ্রিয় ধর্মে পরিগণিত হয়। আরব জাতির মধ্যে ইসলাম জনপ্রিয়

হওয়ার সাথে-সাথেই বিদেশে ব্যবসারত সমস্ত আরবরাই স্বভাবতঃই নিজের দেশের এই নয়া ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইভাবে সাত শতক শেষ হইবার আগেই বাংলায় বিশেষতঃ চাটগাঁ বন্দরে, ব্যবসায়রত সমস্ত আরব ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। এটা ত গেল আরব ব্যবসায়ীদের কথা। বাংলার জনগণের অবস্থাটা তখন কি?

আগেই বলিয়াছি, বাংলার জনসাধারণ দ্রাবিড় জাতীয়। দ্রাবিড়রা আদিতে সেমেটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা ব্যাবিলন অঞ্চল হইতে ইরান, মাকরান ও সিন্ধু হইয়া দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল দিয়া বাংলায় আসে, এ কথাও আগেই বলিয়াছি। এদের মধ্যে সেমেটিকদের রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। মনের দিক দিয়া কাজেই এরা স্বাধীনতা-প্রিয় সাম্যবাদী। এই কারণেই বাংলার হিন্দুরা ধর্ম-বিশ্বাসে ওয়ারিশী আইনে ও পূজা পার্বনে উত্তর ভারতীয় আর্যহিন্দু হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। এরা বর্ণাশ্রমী আর্য ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিতই হয় নাই। এরা এই সময়ের বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য ও গণতান্ত্রিক মতে প্রভাবিত ছিল। ইসলাম ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের মতই সাম্যবাদী কিন্তু তার চেয়েও সহজ ও বাস্তববাদী। কাজেই সেমিটিক বংশজাত বাংলার জনসাধারণ অতি সহজেই ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আরব জাতি যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দক্ষ প্রচারক। ফলে আরবদের নয়া ধর্মপ্রচার-কৌশল ও স্থানীয় জনসাধারণের উর্বর মনোভাব ইসলাম প্রসারের অনুকূলে হইল। সাত শতক শেষ হইবার আগেই বাংলার বহু অধিবাসী মুসলমান হইয়া গেল। আট শতকে ইসলাম যে উত্তরবংগে প্রসারিত ছিল, তার আরেকটি প্রমাণ এই যে, রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে খলিফা হারুনর রশিদের আমলে (৭৮৪-৮০৯ সাল)। একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বখতিয়ার খিলজী উত্তরবংগ জয় করিবার পর রংপুরের মুসলমান অধিবাসীদের দাবীতে তিনি রংপুরের মাদ্রাসাকে দারুল উলুমে উন্নীত করিয়াছিলেন। সুতরাং এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল, বার শতকের শেষ সালে (১১৯৯) বখতিয়ার খিলজীর আগমনের বহু আগেই ইসলাম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও তিন শ' বছরের পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের (৭০৮-৭১১) সময়েও ইসলাম বাংলায় কমসেকম পঞ্চাশ বছরের পুরান ধর্ম হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের সময়েই সিন্ধুদেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। কারণ মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের রাজত্ব মাত্র তিন বছর স্থায়ী হইয়াছিল। ৭১১ সালে খিলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুতে সোলেমান সিংহাসনে

আরোহণ করেন। পূর্বশত্রুতাবশতঃ তিনি মোহাম্মদ-বিন-কাসিমকে দামেশ্‌কে ফিরাইয়া নিয়া নানা প্রকার যুলুম করিয়া হত্যা করেন। মোহাম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু ত্যাগের পরে পরেই রাজপুতেরা পুনরায় সিন্ধু জয় করিয়া নেয়। দুই শ' বছর রাজপুত শাসন চলার পর ১০২৭ সালে সুলতান মাহমুদ সিন্ধু আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে জিতিয়াও তিনি স্থায়ীভাবে সিন্ধু দখল করেন নাই। তারপর সুলতান মুইযুদ্দিন মাহমুদ ১১৮২ সালে সিন্ধু আক্রমণ করিয়া সিন্ধুর রাজধানী দাইবুল দখল করেন। এই সময় হইতে সুলতানা রাযিয়ার আমল (১২৩৬-৪০) পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছরে সিন্ধুতে মুসলিম রাজ কায়েম হয়। কাজেই মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের শাসন হইতেই সিন্ধু দেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, এ কথা ঠিক নয়। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার মানে এই যে, পাক-ভারতের পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠার সাথে যেরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাকবাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকবাংলায় ইসলামের আগমন হইয়াছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম প্রচারের প্রায় তিন শ' বছর আগে।

এটা ঘটিয়াছিল চাটগাঁ বন্দরের দওলতে এবং তার মধ্য দিয়া। চাটগাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ ১৫২১ সালে চাটগাঁর নাম রাখেন ফতেহাবাদ অর্থাৎ ইসলামের দরজা। ঠিক দেড় শ' বছর পরে ১৬৭০ সালে নবাব শায়েস্তা খাঁ চাটগাঁকে আরও বেশি সম্মান দেন এর নাম ইসলামাবাদ রাখিয়া।

(৫)

এটা ত গেল ধর্মের দিক। কৃষ্টি-সাহিত্যের বেলাতেও এই কথাই সত্য। পাকবাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে চাটগাঁয়ের অবদানের তুলনা নাই। এ বিষয়েও চাটগাঁই পাকবাংলার পটভূমি। অবশ্য সব সভ্য জাতির মতই আমাদের কৃষ্টিও ধর্মভিত্তিক। কাজেই যেদিন বাংলার মেজরিটি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে সারা মুসলিম বাংলাই ভাবী পাকবাংলার কালচারের নার্সারি হইয়াছে। তবু এ ব্যাপারে আমাদের দিশারী ও পটভূমি একমাত্র চাটগাঁই। এর প্রমাণও সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ, পাঠান আমলের সব কয়জন বাংগালী কবি—যথা মোহাম্মদ সগীর, দওলত উযির, বাহরাম খাঁ, সৈয়দ সুলতান, খুরশিদ খাঁ, মোহাম্মদ খাঁ, মোজাম্মেল, মোহাম্মদ কবির প্রমুখ সকলের জন্মস্থান ও কর্মস্থান চাটগাঁ।

দ্বিতীয়তঃ, আরাকানের রাজদরবারের বাংগালী বড়-বড় কবিরা যথা দৌলত কাযী, আলাওল, মাগনঠাকুর ও আবদুল করিম আসলে চাটগাঁরই লোক।

তৃতীয়তঃ, আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ-দরবারের অন্যান্য কবিরা যথা দুনা গাযী, শেখ সাদি, আবদুল হাকিম এবং শেরবায প্রমুখ চাটগাঁর লোক না হইলেও চাটগাঁর কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ, যদিও আরাকানের রাজারা মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তথাপি ঐ রাজাদের প্রধানমন্ত্রীরা, যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিরা, এমন কি ধর্মীয় বিভাগের মন্ত্রীরা (নবরাজ) সকলেই চাটগাঁয়ের মুসলমান ছিলেন। কোরায়েশী, মাগন, সোলেমান, মজলিশ খাঁ এবং আশরাফ খাঁর নাম এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরাকান রাজাদের উপর এঁদের এত প্রভাব ও প্রতাপ ছিল যে, ঐ সব রাজার দরবারী কবি ও পারিষদবর্গ সকলেই মুসলমান ছিলেন। ওঁদের প্রভাবে স্বয়ং রাজারাও ধর্মে বৌদ্ধ হইয়াও সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় তাঁরা মুসলিম নাম গ্রহণে গৌরব বোধ করিতেন। রাজা মেং ফালাং সিকান্দর শাহ, মেং বাদিয়াগ্নি সেলিম শাহ, মেং খামাউং হোসেন শাহ উপাধি ধারণ করেন উঁহাদেরই প্রভাবে। নিজেদের ভাষা বাদ দিয়া রাজারা যে বাংগালী কবি ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, এটাও সম্ভব হইয়াছিল চাটগাঁবাসী ঐ মুসলমান রাজকর্মচারী ও কবিদের অসাধারণ প্রভাবেই।

পঞ্চমতঃ, তৎকালীন ঐ সব বড়-বড় কবির ব্যবহৃত বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য ছিল স্বাভাবিক কারণেই। সাধারণভাবে পাকবাংলার বিশেষভাবে চাটগাঁ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্য বাংলাতেও আরবী শব্দের প্রাচুর্য ছিল বলিয়াই কাব্য-সাহিত্যের ভাষাতেও তাই হইয়াছিল। আরবী ও ফারসী ভাষা তৎকালীন দুনিয়ার সমৃদ্ধিশালী ভাষাসমূহের অন্যতম প্রধান ভাষা ছিল। কাজেই আরবী-ফারসীর প্রভাবে আমাদের সাহিত্যও উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। পাকবাংলার ভাষায় কি শব্দ-সম্পদে, কি বাক্‌রীতিতে, কি শব্দপ্রকরণে, কি পদ-বিন্যাসে, কি ছন্দ প্রকরণে, কি সন্ধি-সমাসে কি উপমা-অলংকারে, কি ধাতু প্রত্যয়ে, কি মুখ্‌রেজ তালাফ্‌ফুযে এবং ব্যাকরণ ও ভাষা রীতিতে আরবী-ফারসীর এই প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া পাকবাংলার সাথে সংস্কৃত প্রভাবিত পশ্চিম বাংলার এত পার্থক্য দেখা যায়।

এই পার্থক্যটুকুই আমাদের ভাষিক নিজস্বতা, কৃষ্টিক স্বাধীনতা। পরাধীন আমলে বাংলা ভাষার ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু ধ্বংস করা হয়। তারই ফলে পশ্চিম বাংলার বাক-বিন্যাস ও উচ্চারণ ভংগিকে অভিজাত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মুসলিম পুনর্জাগরণে পাকবাংলার সে স্বকীয়তার উদ্ধার আমরা করিব না কি?

পূর্বদেশ, ঈদ সংখ্যা, '৬৯

৫১

সাধারণ নির্বাচনে সেকিউলারিযমের জয়

সাম্প্রতিক নির্বাচন ছিল একাধিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলাফল পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে তাই একাধিক শুভ সূচনা করিয়াছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান এই যে, এই নির্বাচনে সেকিউলারিযমের জয় হইয়াছে। সেকিউলারিযমই ছিল জাতির পিতার নসিহত ও ওসিয়ত। কাজেই এই নির্বাচনে কায়েদের জয় হইয়াছে। জনমতের দিক হইতে আধুনিক প্রগতি-বাদী রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান টিকিয়া গিয়াছে। কথাটা একটু খোলাসা করিয়া বলিতেছি।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সামগ্রিক ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস্ পার্টির বিপুল জয় হইয়াছে। এই জয়ের পার্লামেন্টারি তাৎপর্যের কথা সবাই জানেন। আমি আজ সেদিককার আলোচনা করিতেছি না। এই নির্বাচনের ফলাফল আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন-দর্শনের শুভ সূচনার যে তাৎপর্য বহন করিতেছে, সে কথাই আজ আমি বলিতেছি। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস্ পার্টির বিরুদ্ধে যাঁরা নির্বাচন লড়াই করিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে দুই-একটি বাদে আর সবাই ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিকেই নির্বাচনী ইস্যু করিয়াছিলেন। নিজেদেরে তাঁরা 'ইসলাম-পছন্দ' আখ্যা দিয়াছেন। প্রকারান্তরে আর সবাইকে তাঁরা 'ইসলাম-নাপছন্দ' বলিয়া-ছেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পিপলস্ পার্টি, জাতীয় লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলসমূহ রাজনীতিতে ধর্মের আমদানি সমর্থন করে না বলিয়াই 'ইসলাম-পছন্দেরা' ইহাদিগকে ইসলাম-বিরোধী আখ্যায়িত করিয়াছেন। এইসব দলকে ভোট দিলে পাকিস্তানে ইসলাম থাকিবে না, পাকিস্তান কুফরের মুল্লুক হইয়া যাইবে, এই ধরনের সাংঘাতিক-সাংঘাতিক কথা বলিয়া ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদের ধর্মোম্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে তাঁরা দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, নির্বাচনটা যেন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটা জেহাদ। একটা ধর্মযুদ্ধ। এই নির্বাচনে ইসলাম-পছন্দরা হারিলেই যেন পাকিস্তানে ইসলাম খতম হইয়া যাইবে।

"ইসলাম-পছন্দরা' সত্যই হারিয়া গিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁরা কার্যতঃ

নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও তাঁরা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রায় সব-কয়টি আসন পাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্‌স্‌ পার্টি বিপুল মেজরিটি পাইয়াছে। এর তাৎপর্য কি? পাকিস্তানে ইসলাম খতম হইয়া গিয়াছে? পাকিস্তান কুফরিস্তান হইয়া গিয়াছে? ইসলাম-পছন্দদের কথা সত্য হইলে অবস্থা তাই ঘটিয়াছে। কিন্তু আসল সত্য কথা কি? পাকিস্তানে ইসলাম সগৌরবে বহাল আছে। মুসলিম দেশবাসী সামগ্রিকভাবে আওয়ামী লীগকে এবং বিপুলভাবে পিপল্‌স্‌ পার্টিকে ভোট দিয়াও ধর্ম-বিশ্বাসে ও ঈমান-আমানে সহি-সালামতে আগের মতই ঈমানদার মুসলমান রহিয়াছে। আওয়ামী লীগসহ সকল ধর্ম-নিরপেক্ষতা-বাদী রাজনৈতিক দলই বলিয়াছেন, তাঁরা ধর্ম-বিরোধী নন, তাঁরাও পাক্কা ঈমানদার মুসলমান, তাঁরা নির্বাচিত হইয়া ক্ষমতায় গেলে ধর্ম-বিরোধী কোনও আইন রচনা ও কাজ সম্পাদন করিবেন না। 'ইসলাম-পছন্দ'রা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতিবাদীদের এসব কথা বিশ্বাস না করিবার জন্য মুসলমান ভোটারদেরে তাকিদ দিয়াছেন। মুসলিম ভোটাররা তাঁদের নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন। তাঁদের কথিত ইসলাম-বিরোধীদেরে জিতাইয়া দিয়াছেন। তাতেও ইসলাম খতম হয় নাই, হইবার কোনও সম্ভাবনাও দেখা যায় নাই। বরঞ্চ এটাই প্রমাণিত হইল যে, 'ইসলাম-পছন্দ'রাই মুসলিম ভোটারদেরে ধোঁকা দিয়াছিলেন, আর আওয়ামীসহ অন্যান্য সেকিউলারিস্ট পার্টিরাই সত্য কথা বলিয়াছিলেন। ফলে এই দাঁড়াইল যে, নির্বাচনে ইসলামকে ইস্যু খাড়া করিয়াও ধর্মীয় রাজনীতি-বাদীদের কোনও লাভ হয় নাই। খামখা তাঁরা পবিত্র ধর্মের অমর্যাদা করিলেন।

ধর্মকে রাজনীতিতে টানিয়া আনার বিপদ এইখানে। নির্বাচন দুনিয়াবি ব্যাপার। এতে দুই পক্ষের এক পক্ষ জিতিবে। আরেক পক্ষ হারিবে। আজ আমি জিতিব। কাল আপনিও জিতিতে পারেন। এর মধ্যে যদি এক পক্ষ ধর্মকে টানিয়া আনেন, তবে তাঁর পরাজয়ে ধর্মের পরাজয় হয় না। অনর্থক ধর্মের অপমান করা হয়। যাঁরা ধর্মের দোহাই দেন, তাঁরাও এটা জানেন। তবু শুধু নির্বাচনে জিতিবার মতলবেই অনেকে এটা করিয়া থাকেন। ফলে ধর্মের বিরুদ্ধে ভোট দিতে ভোটারদেরে তাঁরা বাধ্য করিয়া থাকেন। এটা যেন মসজিদে আশ্রয় লইয়া শত্রু-পক্ষের সহিত গুলাগুলির লড়াই করা। মসজিদকে ধর্মস্থান আল্লার ঘর বলিয়া সবাই শ্রদ্ধা করে। মসজিদে গুলি করিতে কোনও মুসলমানই রাযী হইবে না। কিন্তু একদল মুসলমান যদি মসজিদে আশ্রয় লইয়া শত্রু-পক্ষের উপর গুলিবর্ষণ করে, তবে অপর পক্ষ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়াই মসজিদের দিকেই গুলিবর্ষণ করিবে। হাজার মুসল্লি-মুত্তাকি হইলেও

করিবে। এখানে দোষটা বাহির হইতে গুলিবর্ষণকারীর নয়। যে পক্ষ মসজিদের ভিতরে বসিয়া গুলি করিল, দোষটা আসলে সেই পক্ষের। এই নির্বাচনের বেলাও যাঁরা ধর্মকে ঢাল বানাইয়া নির্বাচনে জিতিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁদের পরাজয়ে ধর্মের পরাজয় হয় নাই। পরাজয় হইয়াছে নির্বাচন-যুদ্ধের এক পক্ষের। মাঝখান হইতে ঐ মসজিদটার মতই ধর্মের অমর্যাদা ঘটিয়াছে।

এই কারণে নির্বাচন প্রচারে ধর্মের দোহাই দেওয়া, আল্লার গযব নাযিলের ভয় দেখানো, ইংরাজ আমলেও নিষিদ্ধ ছিল। আইয়ুবশাহির আগে পাকিস্তানেও নিষিদ্ধ ছিল। মসজিদ ইত্যাদি ধর্মস্থানকে রাজনৈতিক প্রচারনার আখড়ায় পরিণত করিতে তখনও দেওয়া হইত না। প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের শত চেষ্টাতেও এবার সে নিয়ম করা যায় নাই। ফলে মসজিদে ও ঈদগাহে প্রচুর 'ইসলাম-পন্থী' রাজনীতির প্রচার হইয়াছে। এত করিয়াও ভোটারদের মন পাওয়া যায় নাই। কারণ ভোটাররা জানেন, ধর্ম কোন্‌টা, আর রাজনীতি কোন্‌টা ? ধর্মীয় ব্যাপারে যে সব আলেমকে মুসলিম জনসাধারণ আন্তরিক শ্রদ্ধা করে, রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কথাও তারা শুনিবে না। তাদের সাধারণ কান্ডজ্ঞানই বলিয়া দেয়, যার যে কাজ তারেই সাজে। ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হইলে ভারতের দশ-কোটি মুসলমানের শতকরা নিরানব্বইজন সুন্নী হইয়াও তারা শিয়া জিন্নার নেতৃত্ব মানিয়া নিত না। তাঁকে কায়েদে-আযম বলিত না। জাতির পিতা মানিত না। বস্তুতঃ, সর্বজনমান্য বড়-বড় অনেক আলেম জিন্না সাহেবের শিয়াত্বের দিকে বারে-বারে অংগুলি নির্দেশ করিয়াছিলেন। শিয়া নেতৃত্ব বর্জনের উপদেশও দিয়াছিলেন। এমন সময়ে তা করিয়াছেন, যখন লাখনৌ-দিল্লীতে শিয়া-সুন্নী-দাংগা হিন্দু-মুসলিম-দাংগার চেয়ে কম ভয়াবহ ছিল না। কিন্তু উপমহাদেশের শতকরা নিরানব্বই জন মুসলমান পাক্কা ঈমানদার সুন্নী হইয়াও এবং ধর্মীয় ব্যাপারে ঐ ঐ আলেমগণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মান্য করিয়াও রাজনীতিক ব্যাপারে ঐ আধা-ইংরাজ কোট-টাই-পরা বেনামাযী জিন্নাকেই তারা কায়েদে-আযম, শ্রেষ্ঠ নেতা, বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে। ঐ সব আলেমের অনেকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও করিয়াছে।

মুসলিম জনসাধারণের রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি এমনি তীক্ষ্ন। এই তীক্ষ্নতাই তাদের কাল হইয়াছে। জনগণের এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই পাকিস্তানের তেইশ বছরেও একটা সাধারণ নির্বাচন তারা পায় নাই। শাসক-গোষ্ঠী জনগণের এই রাজনৈতিক জ্ঞানকেই ভয় করিয়া চলিয়াছেন। নির্বাচন হইলেই

তাঁরা গদিচ্যুত হইবেন, জনগণের নির্বাচিত নেতারা গদিতে বসিবেন, এটা তাঁরা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই নির্বাচন এড়াইবার তাঁরা ভাল-ভাল ফন্দি আবিষ্কার করিলেন। বলিলেন, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র চালাইতে হইলে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের কোনও ছাঁচে-ঢালা নযির নাই। কাজেই বহু তালাশ অনুসন্ধানেই সেটা আবিষ্কার করিতে হইবে। অতএব সময়ের দরকার। এসব কথা বলিলেন তাঁরা কায়েদে-আযমের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও ওসিয়তের খেলাফে। কায়েদে-আযম বহুবার বলিয়াছেন: 'পাকিস্তান হইবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।' এই কথাটাই তিনি শেষবারের মত বলিয়াছিলেন গণ-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায়। তিনি ঐ বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থ-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন: 'ধর্মবিশ্বাসে আপনি হিন্দু হউন, আর আপনি মুসলমান হউন, যে কোনও ধর্মেই আপনি বিশ্বাসী হউন না কেন, রাষ্ট্রের ব্যাপারে তার কোনও সম্পর্ক নাই। রাজনীতিতে আপনারা সবাই সম-অধিকারভোগী সমান দায়িত্বশীল পাকিস্তানী নাগরিক।' ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতি সম্পর্কে কি সুন্দর ও স্পষ্ট নির্দেশ। পাকিস্তান সংগ্রামের গোড়ার দিকে হিন্দুরা বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক রক্তক্ষয়ী দাংগা-হাংগামা হইয়াছে। তার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাহীন তিক্ততা সৃষ্টি হইয়াছে। এই তিক্ততার কথা স্মরণ করিয়া কায়েদে-আযম বলিয়াছিলেন: 'আপনারা গতকালের শত্রুতা কবরস্থ করুন। অতীতটা ভুলিয়া যান। শুধু ভাবুন বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা। হিন্দু ও মুসলমান, মেজরিটি ও মাইনরিটি, এই ধরনের মনোবৃত্তি আপনারা ত্যাগ করুন। তা হইলে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সীমাহীন প্রগতির পথে আগাইয়া নিতে পারিবেন।'

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য কায়েদ তাঁর বক্তৃতায় আরও বলিয়াছিলেন: 'যে অবস্থায় দেশ ভাগ হইয়াছে, তাতে উভয় রাষ্ট্রে মাইনরিটি এড়াইবার উপায় ছিল না। সমাধানের অন্য কোনও পথ ছিল না। এখন আমাদের করণীয় কি? আমরা যদি অতীত ভুলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় জন-কল্যাণে নিয়োজিত হই, তবে এই মহান পাকিস্তান রাষ্ট্র সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে বাধ্য।' ইংলন্ডের দৃষ্টান্ত দিয়া কায়েদে-আযম বলিয়াছিলেন: 'আমাদের মত সাম্প্রদায়িক সমস্যা একদিন ইংলন্ডেও ছিল আজ সেখানে রোমান ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট-সমস্যা নাই বলিতে পারেন।'

কায়েদে-আযমের রাজনৈতিক ওয়ারিশরা এই কথাটাই বুঝেন নাই। কেউ আদতেই বুঝেন নাই, কেউ ইচ্ছা করিয়া বুঝেন নাই। রোমান ক্যাথলিক

প্রোটেস্টান্টদের বিরোধের যুক্তিটা অখণ্ড ভারতে চলিত না। কিন্তু পাকিস্তানে চলে। অখণ্ড ভারতে গণতান্ত্রিক মেজরিটি শাসন মানেই চিরস্থায়ী হিন্দু শাসন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক মেজরিটি শাসন মানেই চিরস্থায়ী মুসলিম শাসন। কাজেই ভারতে হিন্দুর ধর্ম-কৃষ্টি-স্বার্থ-স্বত্ব রক্ষার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই। পাকিস্তানেও তেমনি মুসলিম ধর্ম-কৃষ্টি-স্বার্থ-স্বত্ব রক্ষার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিশেষ বিধানের দরকার নাই।

এসব কথাই আমাদের শাসক-গোষ্ঠী জানতেন। তবু কায়েদের আকস্মিক ও সন্দেহজনক মৃত্যুর পর হইতে তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের ধোঁকা দিয়া এগারটি বছর বিনানির্বাচনে দেশ শাসনের নামে জনগণকে শোষণ করিলেন। তাঁদের মেয়াদ ফুরাইলে তাঁদেরই অন্যতম প্রধান জেনারেল আইয়ুব জোর করিয়া গদি দখল করিলেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বুলির সাথে আরেকটি যুক্তি যোগ করিলেন। পাকিস্তানের জনগণ মূর্খ-অশিক্ষিত। তারা ভোট দিতে জানে না। কাজেই এরা গণতন্ত্রের অযোগ্য। এদেরে ডান্ডা দিয়া শাসন করা দরকার। তিনিও জানিতেন, পাকিস্তানের জনগণ ভোট দিতে জানে। ভোট দিয়াই তারা শত প্রতিকূলতার মধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি এও জানিতেন, কায়েদে-আযম পাকিস্তানী জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকারবোধে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। সেই কারণেই তিনি নিজে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা না করিয়া বলিয়াছিলেনঃ 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র জনগণই রচনা করিবে।' এসব জানিয়াও যে জেনারেল আইউব বলিতেন, পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। তার কারণ তিনি এটাও জানিতেন যে, নির্বাচন হইলে তিনি একদিনও গদিতে থাকিতে পারিবেন না।

অবশেষে গণ-আন্দোলনের মুখে আইউবশাহি খতম হয়। গণতন্ত্র কিন্তু কায়েম হয় না। আইউব বিরোধী আন্দোলনে পাকিস্তানের গোটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমবেত ছিলেন। তাতে একদিকে ইসলামপন্থী ও অপরদিকে সেকিউলারপন্থী, উভয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমাবেশ হইয়াছিল। ফলে এটা বুঝিবার উপায় ছিল না, পাকিস্তানের জনগণ জাতির পিতা কায়েদে-আযমের রাষ্ট্র-দর্শনের অনুসারী ? না, জাতির 'চাচা-মামা'দের আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী ও ধর্মীয় রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী ? দুনিয়ার কাছে ত বটেই, পাকিস্তানী অনেক চিন্তানায়কের এবং রাষ্ট্র-নেতার কাছেও, ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল না। কারণ গত বাইশটি বছরে পুঁজিবাদী ও কায়েমী-স্বার্থী শাসক-গোষ্ঠীর সীমাহীন প্রচার-প্রচারণায় এবং রাশি-রাশি বই-পুস্তকে

বড়-বড় কথা বলিয়া, এমন কি কায়েদে-আযমের বক্তৃতা-বিবৃতির বিকৃত রূপ ও কদর্থ পরিবেশন করিয়া দেশময় ও দুনিয়াজোড়া এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, অনেকের ধারণা ও আশংকা হইয়াছিল, এতদিনে পাকিস্তানের জনগণ জাতির পিতাকে এবং তাঁর ওসিয়তকে বোধহয় সত্যই ভুলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানের জোর বরাত, দেশবাসী জাতির পিতাকে ভুলে নাই। এবারকার নির্বাচনে অত গাঢ় ধূম্রজালের মধ্যেও পাকিস্তানী ভোটাররা জাতির পিতাকেই ভোট দিয়াছেন।

ইত্তেফাক, ২৫শে ডিসেম্বর, '৭০

৫২

জনমতের ম্যাজেস্টির দরবারে মাথা নত করুন

সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। নির্বাচনের ফল বিস্ময়কর। যাঁরা কিছুতেই বিস্মিত হন না, তাঁরাও হইয়াছেন। জনতার রায় সমস্ত কল্পনাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভোটাররা এ্যয্-ওয়ান-ম্যান ইন-এ-বডি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটাররা ঠিক তেমনটি না করিলেও বিপুল সংখ্যাধিক্যে পিপলস পার্টিকে ভোট দিয়াছেন। উভয় অঞ্চলেই প্রবীণ নেতৃত্ব বর্জিত হইয়াছে। এ নির্বাচন নবীন নেতৃত্বের হাতে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছে। অথচ আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও আসন পায় নাই। পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টি কোনও আসনে প্রার্থী দেয়ই নাই।

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই এতে দুইটা আশংকার উদয় হইতে পারে ঃ এক, পাকিস্তানের দুই অঞ্চল কি দুই পথে চলিল ? দুই, দুই অঞ্চলেই কি একদলীয় শাসনের সূচনা হইল ?

এই দুইটা আশংকাই স্থূল দৃষ্টির। ফলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ আশংকা যাঁরা করেন, তাঁরা এই নির্বাচনের ইস্যু বিচারে ভুল করিয়াছেন। নির্বাচনের ইস্যুটির সঠিক বিচার করিতে পারিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, যা ঘটিয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছে। পাকিস্তানের কল্যাণ ও স্থায়িত্বের খাতিরেই ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, আঞ্চলিক কাতারবন্দিই আসলে পাকিস্তানের জাতীয় কাতারবন্দি। দুই অঞ্চল আসলে দুইটি দেশ। পাকিস্তানী জাতীয়তা গড়িয়া উঠার আগেতক দুই অঞ্চলের পৃথক নেতৃত্বই স্বাভাবিক। বর্তমান আঞ্চলিক কাতারবন্দি পাকিস্তানের সংহতি নষ্টের বদলে তাকে সুসংহত করিবার কাজ সহজতর করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সর্বসম্মত গণমুখী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এই এক দলীয়তা অপরিহার্য ছিল। শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে কোনও দলীয়তা নাই।

আওয়ামী লীগের তরফ হইতে শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনকে ছয়-দফার উপর গণভোট বলিয়াছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের ভোটাররা তাঁর এই দাবি সত্য প্রমাণ করিয়াছেন। তারা একটিমাত্র ব্যক্তির মতন একই সুরে বলিয়াছেন ঃ 'হাঁ, আমরাও এই নির্বাচনকে ছয়-দফার উপর গণভোট মনে

করি। তাই প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ, যোগ্যতা-অভিজ্ঞতার বিচার না করিয়া আমরা ছয়-দফার পক্ষে ভোট দিলাম।' পূর্ব পাকিস্তানের ভোটাররা ১৯৫৪ সালে আরেকবার এমনি করিয়া প্রার্থীর বিচার না করিয়া ইস্যুকে ভোট দিয়াছিলেন। এবারের মত সেটাও ছিল পূর্ব পাকিস্তানের লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। তারও আগে ১৯৪৬ সালে মুসলিম-বাংলা লাহোর প্রস্তাবকে ভোট দিয়াছিল প্রার্থীর গুণাগুণ বিচার না করিয়া। নেতারা যদি ১৯৪৬ সালের জনমতের প্রতি সম্মান দেখাইতেন, তবে ১৯৫৪ সালের ঘটনা ঘটিত না। ১৯৫৪ সালের জনমতের মর্যাদা রাখা হইলে ১৯৭০ সালে এটা ঘটিত না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনমতকে যত অগ্রাহ্য করিয়াছে, সে জনমত তত দৃঢ় ও তত সংহত হইয়াছে। এই সংহতির শতকরা হার ১৯৪৬ সালের চেয়ে ১৯৫৪ সালে ছিল বেশি। এবারের হার আরও বেশি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানীদের এ দাবি রাজনৈতিক দামাদামি নয়। এটা তাদের বাঁচার দাবি। এ দাবিতে কোনও আপোস চলে না। চলে না বলিয়াই জনমত এমন একরোখা। আগের দুইবার যেমন ছিল, এবারও তেমনি হইয়াছে।

এটাকে একদলীয় শাসনের প্রবণতা বলিলে ভুল হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের জনতা নিরংকুশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তারা কোনও দিন একদলীয় শাসন চায় নাই। আজও চায় না। তবু যে তিন-তিনটা নির্বাচনেই পূর্ব পাকিস্তানের ভোট একরোখা হইয়াছে, তার কারণ তিনটা নির্বাচনই আজকার মতই ইস্যু-ভিত্তিক রেফারেন্ডাম ছিল।

জনতার রায় কখনও ভুল হয় না। এবারও হয় নাই। এবারের নির্বাচন প্রবীণ নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে এইজন্য যে, তাঁরা গত তেইশ বছর ধরিয়া কেবল ভুলের উপর ভুল করিয়াছেন। জনগণকে তাঁরা অধিকতর বঞ্চিত, পাকিস্তান রাষ্ট্রকে অধিকতর দুর্বল ও পাকিস্তানী জাতিকে অধিকতর বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। ভোটাররা তাঁদেরে অগ্রাহ্য করিয়াছেন তেইশ বছরের অভিজ্ঞতায়ও তাঁদের চেতনা হয় নাই বলিয়া, তাঁরা সংশোধনের অতীত বলিয়া। পক্ষান্তরে অতিবামপন্থীদেরে ভোটাররা বর্জন করিয়াছেন এইজন্য যে, দক্ষিণ-পন্থীদের মতই তাঁরাও নির্বাচনের ইস্যু বিচারে ভুল করিয়াছেন। দক্ষিণপন্থীরা রাজনৈতিক ইস্যু ফেলিয়া ধর্মীয় ইস্যু তুলিয়াছেন। বামপন্থীরা তেমনি রাজ-নৈতিক ইস্যুর চেয়ে অর্থনৈতিক ইস্যুকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বেলা এই প্রাইওরিটি বিচারে তাঁদের এই ভুল ছিল শুধু মারাত্মক নয়, আত্মঘাতী। তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ভূগোলের বিচারে সকল অর্থেই পূর্ব

বাংলা একটা স্বতন্ত্র দেশ। রাজনৈতিক অধিকারহীন সমাজবাদে পূর্ব বাংলার কোনও লাভ হইবে না। 'পিন্ডি-ইসলামাবাদ ক্রেমলিন হইয়া গেলেও না। পূর্ব বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আগে পূর্ব বাংগালীর হাতে আনিতে হইবে। পূর্ব বাংলার সম্পদকে আগে পশ্চিমা পুঁজিপতির শোষণের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। পূর্ব বাংলার অর্থনীতিকে আগে স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে। পূর্ব বাংলার মেহনতী জনতার মধ্যে তা সুষম বণ্টনের প্রশ্ন আসিবে তার পরে। এই প্রাইওরিটি বিচারে ভুল করিয়াছিলেন বলিয়াই সকল দিক হইতে বাঞ্ছিত এবং পরবর্তীকালে অত্যাবশ্যক বামপন্থী নেতৃত্ব এই নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন। তাঁরা নিরাশ হইবেন না। তাঁদের এই নিশ্চিহ্নতা গণ-পরিষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দক্ষিণপন্থী ইসলামী-পছন্দদের মতই এঁদের উপস্থিতি গণ-পরিষদে অনাবশ্যক। কিন্তু গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট চালাইতে দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী সকল দলের দরকার হইবে। গণ-তান্ত্রিক সমাজবাদের জন্য, জনগণের আর্থিক মুক্তির জন্য, বামপন্থী দলের বিশেষ দরকার হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এমন সকল মতের লোকই আছে এবং থাকিবে। তবু তারা আজ একটিমাত্র দলকে ভোট দিয়াছে আজিকার ইস্যু পাকিস্তান ইস্যুর মতই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অটনমির ইস্যু বলিয়া। সত্যই ছিল এটা রেফারেন্ডাম।

পশ্চিম পাকিস্তানের ইস্যু রাষ্ট্রীয় অধিকারের ইস্যু ছিল না। রাষ্ট্রীয় অধিকার তাদের হাতেই ছিল। পাকিস্তানের রাজধানী তাদের বৈঠকখানায়। রাষ্ট্রের সমস্ত টাকা তাদের সিন্দুকে। সারা পাকিস্তানের সম্পদ তাদের দখলে। কিন্তু সে সবই ছিল তথাকথিত 'বাইশ পরিবারের' হাতে। পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ চলিতেছিল সেখানে দোর্দণ্ড প্রতাপে। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকার ও সম্পদ আদায়ের প্রশ্ন ছিল না। ছিল সুষম বণ্টনের প্রশ্ন। তাই সমাজবাদ সেখানে জনগণের চিত্ত আন্দোলিত ও মন জয় করিয়াছে। তথাকার ছাত্র-তরুণরা এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মিঃ ভুট্টো এই সমাজবাদী তারুণ্যের প্রতীকরূপে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় নেতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। মিঃ ভুট্টোর এই নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সিন্ধুর মত মাইনরিটি প্রদেশের বাশেন্দা হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবের ছাত্র-তরুণরা তাঁকে এই নেতৃত্ব দিয়াছেন। পাঞ্জাবের ভোটাররা বিপুল ভোটাধিক্যে সেটা অনুমোদন করিয়াছেন। এতকাল গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের ত বটেই, সারা পাকিস্তানের নেতৃত্ব ছিল পাঞ্জাবের হাতে। এই নেতৃত্ব পাকিস্তানের ভাল করেন নাই। বরঞ্চ মন্দ করিয়াছেন। তাই খোদ পাঞ্জাবের

ছাত্র-তরুণরাই পাঞ্জাবের প্রবীণ নেতাদেরে বিসর্জন দিয়া মিঃ ভুট্টোর মত একজন অপাঞ্জাবী তরুণকে পাঞ্জাবের তথা গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বে বরণ করিয়াছেন। এতে একসংগে দুইটা লাভ হইয়াছে। এক, ওয়ান ইউ-নিট ভাংগার পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্তশাসিত সর-কার স্থাপনের ফলে ভিন্ন-ভিন্ন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়া-ছিল। গোটা পশ্চিম পাকিস্তান এক রিজিওনরূপে একই নেতৃত্বের পরি-চালনায় ঐক্যবদ্ধ হইবার আশা তিরোহিত হইতেছিল। পাঞ্জাবের কোনও তরুণ নেতার পক্ষে তেমন দায়িত্ব গ্রহণের আশু সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ গত তেইশ বছরের বঞ্চনার জন্য সব মাইনরিটি প্রদেশই পাঞ্জাবকেই দায়ী করিয়া থাকে। এ অবস্থায় যতই তরুণ ও প্রগতিবাদী হউন, কোনও পাঞ্জাবীকে নেতা মানিয়া লওয়া সকল মাইনরিটি প্রদেশের তরুণদের পক্ষে আপাততঃ সম্ভব ছিল না। 'সীমান্ত গান্ধী'র ঐতিহ্য, 'পাখ্তুনিস্তান আন্দোলন' ও আফগানিস্তানের নৈকট্যহেতু সীমান্ত প্রদেশেও এমন রিজিওন্যাল নেতৃত্ব গড়িয়া উঠার আশা আপাততঃ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মিঃ ভুট্টোর নেতৃত্ব সকল দিকে উপযোগী হইয়াছে। তাঁর সমাজবাদী মতবাদ ও ভারত-বিরোধী মনোভাব পাঞ্জাবী তরুণদের নিকট তাঁকে খুবই গ্রহণযোগ্য করিয়াছে। দুই, মিঃ ভুট্টোর এই রিজিওন্যাল জাতীয় নেতৃত্ব গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কথা বলিবার অধিকারী একজন মুখপাত্র সৃষ্টি করিয়াছে। আমি বহুবার বলিয়াছি, পূর্ব পাকিস্তান কোনও অবস্থাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের চার-পাঁচ প্রদেশের মোকাবেলায় একটিমাত্র প্রদেশরূপে গণ্য হইতে রাযী হইতে পারে না। লাহোর প্রস্তাবমত পূর্ব পাকিস্তান একাই একটি রিজিওন। ঐ প্রস্তাব-মতই গোটা পশ্চিম পাকিস্তানও একটিমাত্র রিজিওন-রূপে পূর্ব পাকিস্তানের সমান হইতে পারে এবং সাম্যের ভিত্তিতে রিজিওন্যাল অটনমি ভোগ করিতে পারে। এই নির্বাচনের ফল ও ভুট্টোর নেতৃত্ব এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নেতা ও সোল্ রিপ্রেজেনটেটিভ শেখ মুজিবের সাথে কথা বলিবার অধিকার ও দায়িত্ব পশ্চিম পাকিস্তান মিঃ ভুট্টোকেই দিয়াছে। মিঃ ভুট্টোর দ্বারা সে অধিকার খাটাইবার ও দায়িত্ব পালনের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল মিঃ ভুট্টোর ঐতিহ্য ও মনোভাব উভয় দিক হইতেই। খোদ সিন্ধুতে এবং অন্যান্য মাইনরিটি প্রদেশেও কায়েদে-আযমের আমল হইতেই প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় নেতা বেশ কিছুসংখ্যক ছিলেন বটে এবং আজো তাঁরা অনেকে বাঁচিয়া আছেন ঠিকই, কিন্তু পাঞ্জাবী নেতৃত্বের প্রভাবেই হউক, আর নিজস্ব মতবাদের দরুনই হউক, পূর্ব পশ্চিম রিজিওন্যাল সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয়

কাঠামো ও আর্থিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের মতবাদ ও চিন্তাধারা একটা বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁদের পক্ষে নতুন চিন্তা করা যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সনাতনী ও স্থিতিস্থাপক চিন্তাধারা তাঁদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। 'পাকিস্তানের সংহতি', 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' ও 'শক্তিশালী কেন্দ্র' তাঁদের মুখের বুলি ও মনের সংস্কার হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বুনিয়াদ 'লাহোর প্রস্তাবের' নাম শুনিলেই তাঁরা চটিয়া যাইতেন। প্রস্তাবটি পড়িয়া দেখিবার সাহস ও ইচ্ছা তাঁরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ওতে কি আছে, পাতা উল্টাইয়া দেখিতেও তাঁরা রাযী ছিলেন না। তাই পূর্ব পাকিস্তানীরা 'লাহোর-প্রস্তাবের' নাম মুখে আনিলেই তাঁরা মনে করিতেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা দুই পাকিস্তান করিবার কথা বলিতেছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ মিঃ ভুট্টো এই ত্রুটিমুক্ত। তিনি শুধু বয়সে তরুণ নন, রাজনীতিতেও নবাগত; পশ্চিম পাকিস্তানের সনাতনী প্রবীণ নেতাদের মত তাঁর তেমন কোনও রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও সংস্কার নাই। আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, ফেডারেশনের রূপ-রেখা ও স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁর মন ও চিন্তা কোনও ছাঁচে ঢালা নয়। এ সম্পর্কে কোনও নির্বাচনী ওয়াদাও তিনি ভোটারদের কাছে করেন নাই। তাঁর নির্বাচনী ওয়াদা একমাত্র সমাজবাদী অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ। লাহোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত। এই হিসাবে মিঃ ভুট্টোর নেতৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানের দিক হইতে সম্পূর্ণ নতুন।

পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানের লাহোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি কোনও নতুন দাবি নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি অবধি তারা এ দাবি করিয়া আসিতেছে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ছয়-দফায় সে দাবির রূপ-রেখা অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়াছে মাত্র। এই নির্বাচনে ছয়-দফাকে রেফারেন্ডামের ইস্যু ঘোষণা করিয়া এবং সে ইস্যুতে কার্যতঃ সাত কোটি বিশ লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানীর একক প্রতিনিধিত্ব হাসিল করিয়া শেখ মুজিব ছয়-দফাকে লিগ্যাল ও কন্‌স্টিটিউশন্যাল স্যাংশন দিয়াছেন। একদিকে শেখ মুজিবের ছয়-দফা ফেডারেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোরূপে পাকিস্তানের মেজরিটি পূর্ব পাকিস্তানীদের রায়ে-আম্মার স্যাংশন পাওয়ায় এবং অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে মিঃ ভুট্টোর দেওয়া কোনও ব্যতিক্রম বা অল্টারনেটিভ কাঠামো না থাকায় ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ ছয়-দফাই গোটা পাকিস্তানবাসীর ম্যানডেট বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকারী।

এইভাবে আজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি ও জনগণেরর ভাগ্যের দায়িত্ব দুই-

জন নেতার হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমেই এটা ঘটিয়াছে। এতে উভয়ের দায়িত্ব ও অধিকার সমভাবেই আইন ও ন্যায়ের দৃঢ় বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উভয়ের অধিকার যেমন পূর্ণ, দায়িত্বও তেমনি মহান। তা প্রয়োগ ও পালনের কর্তব্যও তেমনি কঠিন। এতে সাফল্য যেমন তাঁদেরে অমর করিবে, ব্যর্থতা তেমনি নিন্দনীয় করিবে। তাঁদের সাফল্য হইবে যেমন কল্যাণের সুপ্রভাত, ব্যর্থতা হইবে তেমনি বিপর্যয়ের অমানিশা।

এ দায়িত্ব পালনে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। গণ-পরিষদের বৈঠকের জন্য বসিয়া থাকা উচিতও নয়। তার দরকারও নাই। অতএব যথাসম্ভব শীঘ্র দুই নেতার একটি বৈঠকে মিলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সে বৈঠকে ছয়-দফা-ভিত্তিক একটি শাসনতন্ত্রের ফ্রেমওয়ার্ক সম্বন্ধে দুই নেতাকে একমত হইতে হইবে। কারণ, যদিও আওয়ামী লীগ এককভাবেই গণ-পরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, তবু শাসনতন্ত্র রচনার কাজে উভয় অঞ্চলের সম্মতি ও সহযোগিতা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। এক আঞ্চলিক মেজরিটিতে শাসনতন্ত্র রচনা করিলে, অনেকের মতে, তা ন্যায়সংগতও হয় না। অনেকের আশংকা, মিঃ ভুট্টোর পূর্ব-ধারণা ছয়-দফা-বিরোধী। ছয়-দফা সম্বন্ধে মিঃ ভুট্টোর শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কথা তাঁরা স্মরণ করেন। ঘটনাটার তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। মিঃ ভুট্টোর তৎকালীন রাষ্ট্রীয় মনিব সাবেক প্রেসিডেন্ট আইউবসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতা সে সময়ে ছয়-দফাকে বিচ্ছিন্নতা-বাদের দফা আখ্যায়িত করিতেছিলেন। আইউব সাহেব যেদিন ছয়-দফার বিরুদ্ধে অস্ত্রের যুক্তি ও 'গৃহযুদ্ধের' ধমক দিতেছিলেন, সেই সময় পশ্চিম-পাকিস্তানের একমাত্র মিঃ ভুট্টোই ছয়-দফাকে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় বলিয়া-ছিলেন। ওতে বিচ্ছিন্নতাবাদের কিছু নাই, তাও স্বীকার করিয়াছিলেন। আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। একদিকে, মিঃ ভুট্টোও আজ ডিক্টেটরের মনোনীত মন্ত্রী হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। অপরদিকে, ছয়-দফা দাবিও একটিমাত্র পার্টির মেনিফেস্টো হইতে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে আইনানুগভাবে পাকিস্তানের মেজরিটি পূর্ব পাকি-স্তানীদের ম্যানডেটে পরিণত হইয়াছে। কাজেই মিঃ ভুট্টো আজ মিঃ মুজিবুর রহমানের সহিত যখন মিলিত হইবেন, তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগেই কথা বলিবেন। আর সে মিলন দুই ব্যক্তির ডিবেটের সভা হইবে না, হইবে দুই অঞ্চলের ডায়লগের সভা। মিঃ ভুট্টো শেখ মুজিবের সাথে আন্তরিকতার সাথে আলোচনায় বসিলেই বুঝিতে পারিবেন, ছয়-দফা বিচ্ছিন্নতার দাবি নয়, সুসংহত পাকিস্তানেরই বাস্তব পন্হামাত্র। এটা

নিজে বুঝিবার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদেরে বুঝাইবার দায়িত্ব এখন মিঃ ভুট্টোর। তাঁর নিজে বুঝিতে হইবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে বুঝাইতে হইবে, ছয়-দফার পরে 'একটিমাত্র দফার' দাবিও উঠিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষাও তাই। অখন্ড ভারতের রাজনীতির বিবর্তনের শিক্ষাও তাই। পাকিস্তানেও তাই ঘটিবে। ছয়-দফা না মানিলে এক দফা মানিতে হইবে। পক্ষান্তরে মিঃ ভুট্টো যদি পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে অন্তরের সাথে নীতি হিসাবে ছয়-দফা মানিয়া লইয়া মিঃ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় বসেন, তবে তাঁর শাসনতান্ত্রিক প্রয়োগে প্রয়োজন-মত এক-আধটু এ্যাডজাস্টমেন্টে মিঃ মুজিবুর রহমানের মধ্যেও আন্তরিক শুভেচ্ছার অভাব দেখিবেন না। শাসক-গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের প্রচারণায় পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানীদের প্যাট্রিওটিযম সম্পর্কে যতই সন্দেহ পোষণ করুক, মিঃ ভুট্টো শেখ মুজিবের সাথে কথা বলিয়াই বুঝিবেন, কষ্টার্জিত পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখিবার আগ্রহ পূর্ব পাকিস্তানীরও কম নয়। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি যদি ছয়-দফা বুঝিতে নাও পারেন, তবু তাঁকে জনমতের ম্যাজেস্টির সামনে মাথা নত করিতে হইবে। পাকিস্তান অখন্ড রাখিবার ঐ একটিমাত্র উপায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অনেকবার বলিয়াছেন, 'জনগণের ইচ্ছানুসারে দেশ শাসিত হইবে।' তাঁরই ঘোষিত নির্বাচনে সে সুযোগ তাঁর আসিয়াছে। এইবার তিনিও জনমতের ম্যাজেস্টির দরবারে মাথা নত করুন। পাকিস্তান চিরতরে নিরাপদ হইবে।

ইত্তেফাক, ১৩ই ডিসেম্বর, '৭০

৫৩

পশ্চিমা ভাইরা এবার দেশপ্রেমের পরীক্ষায় পাশ করুন

তেইশটি বছর ধরিয়া পশ্চিমা ভাইরা পূরবী ভাইদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা নিয়াছেন। এবার পূরবীদের হাতে পশ্চিমা ভাইদের পরীক্ষা। এতদিন পূরবীরা যখনই নিজেদের অসুবিধার কথা বলিয়াছেন, পশ্চিমারা তখনই বলিয়াছেনঃ 'নিজেদের কথা ভাবিও না। পাকিস্তানের কথা ভাব।' পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথাকে তাঁরা আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা আখ্যা দিয়াছেন। তাঁরা বলিয়াছেনঃ 'পাকিস্তানের স্বার্থ অবিভাজ্য। তার অর্থ-নীতি অবিভাজ্য। তার প্রতিরক্ষা অবিভাজ্য। এ সবের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বলিয়া কোনও বস্তু নাই। পাকিস্তানের স্বার্থই পূর্ব পাকিস্তানেরও স্বার্থ। পশ্চিমের স্বার্থই পূর্বেরও স্বার্থ।' এবার পরীক্ষার সময় আসিয়াছে, পাকিস্তানের জনগণ ও তাদের ভোটটাও অবিভাজ্য কিনা। গোটা পাকিস্তানী জাতির মেজরিটির ভোটটাও পাকিস্তানের ভোট কিনা। পাকিস্তানের মেজরিটি পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে। এই পূর্ব পাকিস্তানীদের ভোটটা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর বাধ্যকর কিনা।

এবারের নির্বাচনে যে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইতেছে, সেই পরিষদই শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। পরিষদের মেম্বররা সর্বসম্মতিক্রমে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিলে সেটা হইবে সর্বোত্তম। কিন্তু সেটা না হইলে গণতান্ত্রিক নিয়ম ও প্রথা অনুসারেই মেজরিটির ভোটেই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এল. এফ. ও.তে অনেক ব্যাপারেই বাধ্যকর বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে ভোটাভুটির মেজরিটির পরিমাণ বা হার সম্বন্ধে কোনও বিধান তিনি করেন নাই। এ অবস্থায় গণপরিষদ ইচ্ছা করিলে সিম্পল মেজরিটিতেই শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবে। এতে আপত্তি করিবার অধিকার কারো নাই। যিনি করিবেন, তিনি গণতন্ত্রের প্রতি অসম্মান দেখাইবেন।

এই নির্বাচন গোটা পাকিস্তানের ভিত্তিতে 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট' নীতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এ পর্যন্ত মোট

২৯১টি আসনের মধ্যে ১৫১টি পাইয়াছে। আরও ১৭টি পাইয়া ১৬৮টি হইবে। মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৮টিকে স্বচ্ছন্দ মেজরিটি বলা যাইতে পারে। আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্রের সুস্পষ্ট ফ্রেম-ওয়ার্ককে রেফারেন্ডামের ইস্যু করিয়া নির্বাচনে এই বিপুল মেজরিটি হাসিল করিয়াছে। এই ফ্রেমওয়ার্ক আওয়ামী লীগের ছয়-দফা। দুই-একটি পার্টি ছাড়া আর সব পার্টি আওয়ামী লীগের ছয়-দফার বিরোধী শ্লোগান ও মেনিফেস্টো দিয়া নির্বাচনে লড়িয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁরা কোনও আসন পান নাই। ফলে এখানকার ভোটাররা তাঁদেরে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও তাঁরা পরাজয় বরণ করিয়াছেন। সেখানে যে পিপলস্ পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন, তাদের নিজস্ব কোনও শাসনতান্ত্রিক ফ্রেমওয়ার্কও ছিল না। আওয়ামী লীগের ছয়-দফার বিরোধিতাকেও তাঁরা নির্বাচনের ইস্যু করেন নাই। কাজেই বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটাররাও ছয়-দফার বিরোধিতাকে সমর্থন করেন নাই। তথাকার বিজয়ী পার্টির নিজস্ব কোনও শাসনতান্ত্রিক ফ্রেমওয়ার্ক না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ম্যানডেটকেই তাঁরা গোটা জাতির ম্যানডেট বলিয়া মানিয়া নিতে ন্যায়তঃ ও আইনতঃ বাধ্য। ভালয় ভালয় যদি পশ্চিমা নেতারা এটা করেন, তবে ছয়-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনায় বেশী দিন লাগিবে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এমন সর্বসম্মত বা প্রায়-সর্বসম্মত যে শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, সেটা হইবে জনগণের এল. এফ. ও.। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এল. এফ. ও-র চেয়ে সেটা হইবে শ্রেষ্ঠতর ও গ্রহণযোগ্যতর। গণতন্ত্রকামী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও এমন শাসনতন্ত্র অনুমোদন করিবেন, এ আশা আমরা করিতে পারি।

এটাকে সহজতর করিতে পারে পিপলস পার্টি। পশ্চিমাঞ্চলের নিরংকুশ মেজরিটি পার্টি হিসাবে এটা তাঁদের দায়িত্ব। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতায় বিশ্বাসী গণতন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানবাসীর মেজরিটির রায় মানিয়া লওয়া তাদের কর্তব্যও। আশার কথা, পিপলস পার্টির নেতা মিঃ ভুট্টো তাঁর সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তিনি শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আলোচনা করিতে সব সময়ে প্রস্তুত আছেন। কোনও কোনও মহল হইতে বলা হইয়াছিল যে, শেখ মুজিব ও মিঃ ভুট্টোর মধ্যে মতবিরোধ এত বেশী যে, তাঁদের মধ্যে সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা নাই। এই প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মিঃ ভুট্টো বলিয়াছেন ঃ 'মিঃ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার কোনও মতভেদ নাই।' এটা নিশ্চয় শুভ লক্ষণ।

কিন্তু এত ভাল কথা বলিয়াও কাজের বেলা কিন্তু তিনি ভুলপথে পা বাড়াইইয়াছেন। তিনি একটি শাসনতন্ত্র কমিশন গঠন করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানীদের দেখাইবার জন্য যদি এটা করিয়া থাকেন, তবে তাতে দোষের কিছু নাই। তিনি পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি-বিরোধী কোনও শাসনতন্ত্রে রাযী হইবেন না বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, আওয়ামী লীগের ছয়-দফার মোকাবিলায় সেটা অবান্তর হইলেও পশ্চিমাদের প্রবোধ দানের যুক্তিতে সেটাও বোঝা যায়। কিন্তু আশংকার কথা এই যে তিনি তাঁর কমিশনের চেয়ারম্যান করিয়াছেন এমন এক নেতাকে, যিনি ছয়-দফার বিরোধিতায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে ঐ কমিশনে মেম্বর মনোনয়নের ক্ষমতা দিয়াছেন ঐ চেয়ারম্যানকেই। এটা অশুভ লক্ষণ। জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস। এতে পূর্ব বাংলার ম্যানডেটকে আঞ্চলিক রায় গণ্য করা হইতেছে। ছয়-দফার ম্যানডেট প্রাপ্ত পাকিস্তানের মেজরিটির প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদে, তথা গণপরিষদে, একক মেজরিটি পার্টি হওয়াতেই এই কথা উঠিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতের কথা, পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থের কথা, এমন কি পাঞ্জাবেরও স্বার্থের কথা উঠিয়াছে। এতদিনে বোঝা গেল, পাকিস্তানের স্বার্থ ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানী ও পাঞ্জাবী স্বার্থ বলিয়া একটা বস্তু আছে এবং সেটা মোটেই আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিক স্বার্থপরতা নয়। আমার পকেট ছাড়া আর সবার পকেটই স্বার্থপরতা। এটা জগতের চিরন্তন নিয়ম। 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব', 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা', 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা' সবই মহৎ কথা যতদিন ওসব কথায় আমার পকেটে হাত না পড়ে। যতদিন রাষ্ট্রের রাজধানী পশ্চিমাঞ্চলে, ততদিনই পশ্চিমা ভাইরা সকলে স্ট্রং সেন্টারের দাবিদার। পার্লামেন্টের মেজরিটি ভোটে রাজধানী ঢাকায় আনিতে চাহিলে পশ্চিমা ভাইরাই জোর গলায় পশ্চিমাঞ্চলের স্বতন্ত্র স্বার্থের কথা বলিবেন। এমন কি, কেউ কেউ বলিতে পারেন ঃ 'দরকার নাই অমন পাকিস্তানের অখণ্ডতার।' পশ্চিমা ভাইরা এটা বুঝেন না, এমন নির্বোধ তাঁরা নন। তবু তাঁরা এটা স্বীকার করেন নাই। কারণ তার দরকারই হয় নাই এতদিন।

পাকিস্তানের সৃষ্টি অবধিই পূর্ব বাংলা মেজরিটি। প্রথম গণ-পরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৪৪। আর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ২৮। এত বড় মেজরিটি লইয়াও পূর্ব বাংলা নিজের জন্য কিছু চায় নাই। কায়েদের খাতিরে রাষ্ট্রের রাজধানী করাচিতে রাখিয়াছে। কায়েদে-আযম ও প্রধানমন্ত্রীসহ ছয়-ছয়জন পশ্চিমা নেতাকে পূর্ব বাংলার ভোটে

গণপরিষদের মেম্বর করিয়াছে। দেশরক্ষা বাহিনীর তিন-তিনটা সদর দফতর, ফেডারেল কোর্ট, স্টেট ব্যাংকসহ সমস্ত নিখিল পাকিস্তানী সংস্থার হেড অফিস পশ্চিমাঞ্চলে রাখিয়াছে। এর কিছুটা করিয়াছে স্বেচ্ছায়, কিছুটা বাধ্য হইয়া। গোড়া হইতেই পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধীনে একদলীয় শাসন চলিয়াছে। অপযিশন সৃষ্টি হইতে দেওয়া হয় নাই। মুসলিম লীগের বিরোধিতাকে পাকিস্তানের বিরোধিতা বলা হইয়াছে। পূর্ব বাংলার যে কয়জন হিন্দু মেম্বরকে মুসলিম লীগের মেম্বর করা সম্ভব হয় নাই, 'পাকিস্তানের শত্রু' আখ্যা দিয়া তাঁদেরেও কথা বলিতে দেওয়া হয় নাই। এই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-বাংলার মুসলিম মেম্বররাও এই নেতৃত্বের ডিসিপ্লিনের শিকলে বাঁধা। এই শাসকরা রাজধানী-সহ সকল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপন করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তাঁরা দুই চেম্বারের পার্লামেন্ট সৃষ্টির দ্বারা পূর্ব বাংলার মেজরিটিকে অর্থহীন ও নিষ্ক্রিয় রাখিবার নিরাপদ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বলা হয়, লাহোর প্রস্তাবের দুই পাকিস্তানকে দিল্লী প্রস্তাবে এক পাকিস্তান করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ এক পাকিস্তানে যে পূর্ব-পশ্চিম-অঞ্চল নির্বিশেষে মেজরিটি ভোটে সরকার চলিবে, এ কথাটি পশ্চিমা নেতারা কোনও দিন স্বীকার করেন নাই। রাজধানীর অবস্থানের দিক হইতে ত নয়ই, সরকার পরিচালনের দিক হইতেও না, আইন রচনার দিক হইতেও না। রাজধানী, ব্যুরোক্র্যাসি, জুডিশিয়ারি, আর্মি, শিল্প-বাণিজ্য, সকল ব্যাপারে পাকিস্তান এক ও অখণ্ড। পূর্ব বাংলার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আইন পরিষদের ভোটের বেলা পূর্ব বাংলা একটা অঞ্চল মাত্র। পূর্ব বাংলার মেজরিটি একটা আঞ্চলিক মেজরিটি। সেই 'হেড আই উইন্, টেইল ইউলুয'-এর ব্যাপার আর কি! এটা বরাবর চলিবার কথা। পশ্চিম-কেন্দ্রিক মুসলিম লীগের নেতৃত্ব বজায় রাখিতে পারিলে এটা আজও চলিত। সব মুসলমান ভাই ভাই। এক ভাই খাইলেই আরেক ভাই-এর পেট ভরিল। অপর ভাই-এর যে একটা আলাদা মুখ ও পেট আছে, একথা স্বীকার করা যেন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের খেলাফ। পাকিস্তানের সংহতি-বিরোধী। কিন্তু আজ পশ্চিমা ভাই-দের অসুবিধা ঘটাইয়াছে আওয়ামী লীগ। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগসহ স্ট্রং-সেন্টারওয়ালা সমস্ত 'ইসলাম-পছন্দদেরে' সমূলে উৎখাত করিয়া আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একক মেজরিটি হইয়াছে। শুধু শাসনতন্ত্র রচনা নয়, আগামী চার-পাঁচ বছর পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট চালাইবার গণতান্ত্রিক একক অধিকার হাসিল করিয়াছে। এতেই পশ্চিমা ভাইদের টনক

নড়িয়াছে। পূর্ব বাংলা যে একটা স্বতন্ত্র অঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে ওটা হাজার মাইলের ব্যবধান, আওয়ামী লীগের মত পূর্বাঞ্চলীয় নেতৃত্বের পার্টির হাতে পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থ যে নিরাপদ নয়, এসব কথাই এতদিনে পশ্চিমা ভাইদের মনে পড়িয়াছে। কিন্তু কেন মনে পড়িয়াছে? আওয়ামী লীগ পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থহানিকর কি চাহিয়াছে? তার ছয়-দফায় কি আছে? ওতে রাজধানী ঢাকায় আনিবার কথা নাই। দেশরক্ষা বাহিনীর সদর দফতর বদলাইবার প্ল্যান নাই। পশ্চিমাঞ্চলের গভর্নরি বাংগালীকে দিবার কথা নাই। পশ্চিমাঞ্চলের ওয়াপডা, পি. আই. ডি. সি., পোর্ট ট্রাস্টগুলির চেয়ারম্যানি দখলের স্কিম নাই। মোট কথা, গত তেইশ বছর পশ্চিমা ভাইরা পূর্ব বাংলার যেসব অধিকার হরণ করিয়াছেন, তার প্রতিশোধ লইবার এবং তার পন্হা হিসাবে পশ্চিমাঞ্চলের উপর তেমন ব্যবহার করিবার কোনও প্রস্তাবই ছয়-দফায় নাই। এমন কি, তাতে পূর্ব বাংলার সংখ্যা-গুরুত্বেরও দাবি নাই। অন্যান্য পার্টির মতই ছয়-দফায় ফেডারেশন, পার্লামেন্টারি পদ্ধতি, সার্বভৌম পার্লামেন্ট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা আছে। অন্যান্য পার্টি হইতে আওয়ামী লীগের বিশেষত্ব এই যে, তাঁরা পশ্চিমাঞ্চলের দ্বারা পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের পথ ফলপ্রসূ ব্যবস্থার দ্বারা বন্ধ করিতে চান। এতে পশ্চিমা ভাইরা আপত্তি করেন কেন? আওয়ামী লীগ মেজরিটির দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানী দিয়া পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করাইতে চান না। পূর্ব পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করিবে, তারা শুধু এই কথাই বলে। উভয় পাকিস্তানের স্বার্থযুক্ত কমন বিষয়গুলিই শুধু এজমালিতে শাসিত হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা—এই কথাটা বলিলেই পাকিস্তান ভাংগিয়া দুই টুকরা করা হয় কেমন করিয়া? পশ্চিমা ভাইরা রাজধানীর অবস্থানের সুযোগ লইয়া সরকার ও দেশরক্ষা বাহিনীর সবটুকু বগলদাবা করিয়া পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নামে বরাবর পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকৃত এলাকার মত শাসন-শোষণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানীরা কোনও দিন মেজরিটির দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তান শাসন-শোষণ করিতে চায় নাই। এক পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ গোড়া হইতে দুই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনার দাবি করিয়াছে। আওয়ামী লীগ শুধু আজ নয়, তার জন্মের দিন হইতেই একথা বলিতেছে।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম। পাকিস্তানের স্রষ্টা মুসলিম লীগের তৎকালের বেসরকারী অংশই আওয়ামী লীগ। বার-দফা প্রোগ্রাম আওয়ামী

লীগের প্রথম মেনিফেস্টো। এই বার-দফার দ্বিতীয় দফাতেই আছেঃ 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি ইউনিটঃ পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল। তৃতীয় দফায় বলা হইয়াছেঃ 'দুইটি অঞ্চলই লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবে। দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। বাকী সব বিষয় ইউনিটের হাতে থাকিবে।'

এই আওয়ামী লীগের উদ্যোগেই ১৯৫০ সালে ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন আহূত হয়। ঐ কনভেনশন গণ-পরিষদে লিয়াকতমন্ত্রিসভার 'ব্যাসিক প্রিন্সিপালের জবাবে একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পেশ করিয়াছিলেন। এই কাঠামোর এক নম্বর ধারায় বলা হইয়াছিলঃ 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম হইবে ইউনাইটেড স্টেট্‌স অব পাকিস্তান।' দুই নম্বর দফায় বলা হইয়াছিলঃ 'এই যুক্তরাষ্ট্র দুইটি রিজিওনে গঠিত হইবে।' উনিশ নম্বর দফায় বলা হইয়াছিলঃ 'পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এক চেম্বারের হইবে।' একুশ নম্বর দফায় বলা হইয়াছিলঃ 'পার্লামেন্টের মেম্বর সংখ্যা দুই রিজিওনের সমান-সমান হইবে।' একচল্লিশ নম্বরে বলা হইয়াছিলঃ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা থাকিবে দুইটিঃ বাংলা ও উর্দু।' বিয়াল্লিশ নম্বর দফায় বলা হইয়াছিলঃ 'কেন্দ্রীয় বিষয় থাকিবে দুইটিঃ দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র।'

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার উনিশ নম্বর দফায় বলা হইয়াছিলঃ 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক হইবে এবং কেন্দ্রে মাত্র তিনটি বিষয় থাকিবে যথাঃ পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও কারেন্সি।' লক্ষণীয় যে, গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন কেন্দ্রীয় বিষয় হইতে মুদ্রা বাদ দিলেও যুক্তফ্রন্টের একুশ-দফায় আবার মুদ্রা যোগ করা হইয়াছিল। পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীকরূপেই তা করা হইয়াছিল। তার সাথে অর্থনীতির কোনও সম্পর্ক ছিল না।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ ছয়-দফা পেশ করেন। এতে অপর দুইটি বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব-পূর্ব ম্যানিফেস্টো ঠিক রাখিয়া শুধু মুদ্রার ব্যাপারে দুইটি অলটারনেটিভ দেওয়া হইয়াছে। একটাতে মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় ও অপরটাতে মুদ্রাকে ইউনিটের বিষয় করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইবে, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে যা বলিয়াছিল এবং গত একুশ বছর ধরিয়া পূর্ব বাংলার সমবেত জনমত যে দাবি করিয়া আসিতেছে, ছয়-দফায় ঠিক সেই কথাটিই বলা হইয়াছে। রেভিনিউ ও ট্যাক্সেশন সম্বন্ধে ছয়-দফায় যা বলা হইয়াছে, সেটাও কোনও নতুন কথা নয়। আগের-আগের দফায় যে কথাটা উহ্য ছিল, ছয়-দফায় সেই কথাটাই ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। একাধিক কারেন্সি ও রিযার্ভ ব্যাংক দুনিয়ার আরও দেশে আছে। খোদ ইংলন্ডেও স্কটল্যান্ডের জন্য

স্বতন্ত্র কারেন্সি। ছয়-দফায় কেন্দ্রকে ট্যাক্সের অধিকার না দিয়া তাকে ইউনিটের খয়রাতের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে, কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ফেডারেল সরকার প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের উপর ট্যাক্স ধার্য করিতে পারিবেন না সত্য, কিন্তু ইউনিটের উপর ট্যাক্স ধার্য করিতে পারিবেন। বর্তমানেও সরকার কর্পোরেশন ট্যাক্সের বেলা সংস্থার মেম্বরদের উপর ট্যাক্স না ধরিয়া প্রতিষ্ঠানের উপর ধরিয়া থাকেন। ছয়-দফা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারও তাই করিবেন। শাসনতন্ত্রে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিধান থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পার্লামেন্টে আলোচনার সময়েই কোন ইউনিটের দেয় কত, তা নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক ইউনিট সে টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে। আদায়ও হইয়া যাইবে শাসতান্ত্রিক বিধানমতেই। ইউনিটসরকার যখন যে ট্যাক্স ও রেভিনিউ আদায় করিবেন, সে আদায়ী টাকার নির্দিষ্ট শতকরা অংশ অটমেটিক্যালি স্টেট ব্যাংক বা রিযার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় ও ইউনিট সরকারের নামে জমা হইয়া যাইবে। ইউনিট সরকারের নামে জমা টাকায় যেমন কেন্দ্রীয় সরকার হাত দিতে পারিবেন না, কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা টাকায় তেমনি ইউনিট সরকারও হাত দিতে পারিবেন না। বিদেশী মুদ্রা সম্পর্কেও এমনি ব্যবস্থা থাকিবে। এমন বিধানে কেন্দ্র ইউনিটের চাঁদার উপর নির্ভরশীল হইলেন কেমন করিয়া ? বরঞ্চ আদায়ী খরচার হাত হইতে মুক্ত হইয়া কেন্দ্রের সব টাকাই সুনিয়োজিত হইতে পারিবে।

কাজেই দেখা গেল, আওয়ামী লীগ ছয়-দফা পেশ করিয়া কেন্দ্রকে অর্থবিত্তহীন দুর্বল ফকির বানাইয়া পাকিস্তান ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছে, কথাটা মোটেই সত্য নয়। 'স্ট্রং সেন্টারের' নামে আঞ্চলিক শোষণ কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠী ও তাঁদের সমর্থক পুঁজিপতিরা এই মিথ্যা জুজুর ভয় দেখাইতেছেন। আসলে আঞ্চলিক শোষণ ও তার পরিণাম সন্দেহ ও অবিশ্বাসের রেষারেষি দূর করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট দুই অঞ্চলের ভিত্তিতে শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ারই পন্থা এই ছয়-দফা।

এই পন্থা বাস্তবায়িত করিয়া গোটা পাকিস্তানকে সুখী-শক্তিশালী করিবেন কি না, পশ্চিমা ভাইরা আজ সে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন। এতদিনের বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের একক মেজরিটি পার্টিরূপে পশ্চিমা ভাইদেরে উদাত্তসুরে বলিতেছেন : 'আঞ্চলিক শোষণের অবসানে পাকিস্তানকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করিবার খাতিরে এতদিনের অন্যায়লব্ধ ভুক্তিত অধিকার ও ক্ষমতা ত্যাগ করুন শুধু নিজেকে ও নিজের অঞ্চলকে ভাল না বাসিয়া গোটা পাকিস্তানকে ভাল বাসুন।' এখানেই আজ পশ্চিমা ভাইদের দেশপ্রেমের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তাঁরা পাশ করুন।

ইত্তেফাক, ২০শে ডিসেম্বর, '৭০

৫৪

অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে কি?

সম্প্রতি একটি খবর বাহির হইয়াছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। খবরটি এইঃ পশ্চিম পাকিস্তানের নব-নির্বাচিত এম. এন. এ.দের মধ্যে সত্তুরজনের বেশি আওয়ামী লীগ পার্টিতে যোগ দিবার অথবা অন্ততঃ কেন্দ্রীয় পরিষদে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। খবরটা বাহির হইবার পর বেশ কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। খবরটা মিথ্যা, একথাটি কেউ বলেন নাই। তার সত্যতাও কেউ স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই খবরটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনায় সবচেয়ে খুশি হইবার কথা যাঁদের, সেই আওয়ামী লীগ মহল হইতেইও এই খবরে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এটা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এ অবস্থায় প্রকাশিত খবরের দুইটি অর্থ হইতে পারে। তার একটি অশুভ, অপরটি শুভ। প্রথমতঃ, এটা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলের ঘুঁটি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের শুভবুদ্ধি উদয়ের লক্ষণ হইতে পারে। একটা বরাবরের 'প্রাসাদ-চক্রী'দের দাবার চাল হইতে পারে। অপরটা পাকিস্তানের সংহতি ও স্থায়িত্বের বুনিয়াদ হিসাবে আঞ্চলিক ব্যবধান ও বৈষম্যের চিরস্থায়ী সমাধানের শুভ ইচ্ছার প্রমাণ হইতে পারে। প্রথমটা শয়তানের হাত। দ্বিতীয়টা ফেরেশতার হাত। শয়তানের ফাঁদ একাধিক হইতে পারে। তার দু একটা দেখানোও যাইতে পারে। কিন্তু সেদিকে যাইতে আমার মন চায় না। একদিকে ভৌগোলিক ব্যবধানের বাস্তববাদী মীমাংসার দ্বারা পাকিস্তানের সংহতি সাধনের সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত ও অপূর্ব সুযোগ এই সর্বপ্রথম আসিয়াছে আমাদের জীবনে। অপর দিকে ঠিক সেই কারণেই আজ সবচেয়ে সংকট কালের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি আমরা। রাষ্ট্রীয় জীবনের এই চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া মরাবাঁচার প্রশ্নে অশুভ কল্পনা করিতে কিছুতেই আমার মন সায় দিতেছে না। জাতির জীবনের এমন নাযুক সময়ে তাই চোখ বুঁজিয়া এই খবরের শুভ দিকটাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। এইদিক হইতে বিচার করিলে মনে হইবে, প্রকাশিত সংবাদটির মূলে কিছুটা সত্য রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট মহল সাধু উদ্দেশ্যেই এই সংবাদটি প্রচার করিয়াছে। সেই 'কিছুটা সত্য' ও 'সাধু উদ্দেশ্য'টি কি? সত্যটুকু এই যে, নব-নির্বাচিত বহু এম. এন. এ. ঐ

ধরনের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় তাঁদের নেতাদেরে জানাইয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের নেতা বা নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবের দাবি মানিয়া লউন। অন্যথায় তাঁরা নিজেরাই তাঁর দাবি মানিয়া লইয়া পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করিবেন। এই অর্থে প্রকাশিত সংবাদটি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রতি একটি হুঁশিয়ারি মাত্র। সময়মত এমন হুঁশিয়ারিতে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইয়া থাকে।

সংবাদটি যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয় এই ধরনের কিছু-একটা যে ঘটিয়াছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নির্বাচনের পরে নির্বাচিত মেম্বররা পার্টি বদল করিতে পারেন কি না, এই বিতর্ক পশ্চিম পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি মহলে উঠিয়াছে। সংবাদপত্রে সে সম্পর্কে বাদানুবাদও শুরু হইয়াছে। এক দল বলিতেছেন, নির্বাচিত মেম্বরদের পার্টি বদলের কোনও সম্ভাবনা নাই। তেমন অধিকারও তাঁদের নাই। কারণ ১৯৬২ সালের পলিটিক্যাল পার্টিয্ এ্যাক্টের বিধানমতে নির্বাচনের পরে কোন মেম্বরের পক্ষে পার্টি বদল সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যদি কোনও মেম্বর তা করেন, তবে তাঁর মেম্বরগিরির অবসান হইবে। এমন কড়া আইনের খেলাফে কোন মেম্বর নিজের দল ছাড়িয়া অন্য দলে যোগ দিতে পারেন না। অতএব প্রকাশিত সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা। তবে অবশ্য ইন্ডেপেন্ডেন্ট মেম্বররা ইচ্ছামত যে কোনও পার্টিতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু সারা পশ্চিম পাকিস্তানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেম্বরের সংখ্যা মাত্র চৌদ্দ। তার মধ্যে সাতজনই উপজাতীয় এলাকার প্রতিনিধি। তাঁরা সকলে মিলিয়া সভা করিয়া সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁরা কোনও দলে যোগ দিবেন না এবং নিজ নিজ এলাকাকে কোনও প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার-শাসিত ইউনিট হিসাবে বজায় রাখিবেন। এমন অবস্থায় সত্তুরের অধিক সংখ্যক মেম্বরের আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার খবরের সহিত পিপ্ল্স পার্টির দল-ভাংগার খবর আপনি আসিয়া পড়ে। তাই সেদিক হইতে পলিটিক্যাল পার্টির এ্যাক্টের ঐ ব্যাখ্যা করাই সবচেয়ে বেশি সম্ভব।

পক্ষান্তরে অপর মতের লোকেরা বলিতেছেন যে, আইয়ুব-আমলের পলিটিক্যাল পার্টিয্ এ্যাক্ট আইয়ুব ঘোষিত '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সাথে-সাথেই লোপ পাইয়াছে। সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচন '৬২ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে হয় নাই, হইয়াছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষিত এল. এফ. ও.র বিধান অনুসারে। এল. এফ. ও. তে পার্টি বদলের বিরুদ্ধে কোনও বিধি-নিষেধ না থাকায়

নব-নির্বাচিত মেম্বরদের পার্টি বদলে কোনও বাধা নাই। পলিটিক্যাল পার্টিয্-এ্যাক্ট কাজেই নব-নির্বাচিত সদস্যদের উপর প্রযোজ্য নয়। এ কথার জবাবে অপরপক্ষ বলিতেছেন যে, শাসনতন্ত্র বাতিলের সংগে সংগে দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইনও আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যায় না। দ্বিতীয় মার্শাল 'ল কর্তৃপক্ষ পলিটিক্যাল পার্টিয্ এ্যাক্ট রদ-রহিত করেন নাই। কাজেই ঐ আইন এখনও দেশের বলবৎ আইন। অতএব নব-নির্বাচিত মেম্বররা পার্টি বদল করিলেই তাঁদের মেম্বরগিরি খসিয়া যাইবে।

এ কথারও জবাব আছে। দল-বদল সমর্থকরা বলিতেছেন যে, পলিটিক্যাল পার্টিয্ এ্যাক্ট নব-নির্বাচিত মেম্বরদের উপর প্রযোজ্য ধরিয়া নিলেও কথিত সত্তুরজন সদস্যের অভিপ্রায় সিদ্ধির কোনও অসুবিধা হইবে না। তাঁদের কথা এই যে, পার্টিয্ এ্যাক্টের বিধানমতে মাত্র একটি ব্যাপারেই মেম্বরদের মেম্বরগিরি খসিতে পারে। পলিটিক্যাল পার্টিয্ এ্যাক্টের ৫ ধারার দ্বিতীয় উপধারায় বলা হইয়াছে যে, কোনো পার্টি-মনোনীত নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচিত হইবার পর যদি সেই পার্টি হইতে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন, তবেই তাঁর মেম্বরগিরি বাতিল হইবে। কোনও দলীয় মেম্বর যদি তাঁর পার্টি হইতে নাম প্রত্যাহার না করিয়া অর্থাৎ পদত্যাগ না করিয়া এবং জাবেদাভাবে অন্য কোনও পার্টিতে যোগ না দিয়া নিজের দলের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অমান্য করিয়া অন্য দলের পক্ষে ভোট দেন, তবে তাঁর মেম্বরগিরি বাতিল হইবার বিধান নাই। অতএব কথিত সত্তুরজন পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর যদি নিজ-নিজ পার্টিতে ইস্তফা না দিয়া শাসনতন্ত্র রচনায়, এমনকি সরকার পরিচালনেও, আওয়ামী লীগের সমর্থন করেন, তবে তাতে আইনগত কোনও বাধা নাই। এটা পশ্চিম পাকিস্তানী দলীয় নেতাদের চিন্তার কারণ।

এ ব্যাপারে এত কথা বলিলাম, উপরোক্ত তর্কিত ব্যাপারে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়। বস্তুতঃ, এই বিতর্কের দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ ঠিক, তা দেখানোও আমার উদ্দেশ্য নয়। পলিটিক্যাল পার্টিব এ্যাক্টের প্রযোজ্যতা ও ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, দলীয় মনোনয়নের পরে নির্বাচিত হইয়া কোনও মেম্বরেরই দলত্যাগের অধিকার থাকা উচিত নয়। এ উদ্দেশ্যে পলিটিক্যাল পার্টিয এ্যাক্টের চেয়েও ব্যাপক ও কড়া বিধান থাকা প্রয়োজন। সুষ্ঠু পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বিকাশ ও সাফল্যের জন্য এমন বিধান অত্যাবশ্যক।

তবু এ ব্যাপারে এত দীর্ঘ আলোচনা করিলাম এই জন্য যে, এ খবরের মধ্যে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা তাৎপর্য আছে। পলিটিক্যাল পার্টিয

এ্যাক্টের বিধি-নিষেধ লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহল যখন এতটা চঞ্চল ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন কথিত সত্তুরজন বা বহুসংখ্যক নবনির্বাচিত সদস্যের দলত্যাগের হুমকিটা সত্যই বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে। হুমকিটা সত্যসত্যই দলত্যাগের নয়। প্রকারান্তরে এটা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে, মানে আওয়ামী লীগের সাথে, শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আপোস করিবার নির্দেশ। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে তার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক প্রভাবশালী অংশ পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া ও অভাব-অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি ও বাস্তব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এটা পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য সাধারণভাবে এবং আওয়ামী লীগের জন্য বিশেষভাবে সুখবর এবং সেই কারণে অভিনন্দনযোগ্য। আওয়ামী লীগ গণপরিষদে একক নিরংকুশ মেজরিটি পার্টি। অন্য কোনও দলের সহযোগিতা ছাড়াই দেশেই শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার ও ক্ষমতা আওয়ামী লীগ পার্টির আছে। তবু আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ মুজিব বার বার বলিতেছেন, শাসনতন্ত্র রচনায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেন। একমাত্র শর্ত এই যে, ছয়-দফা ও এগারো-দফার মূলনীতিতে কোন আপোস চলিবে না। গণ-পরিষদে নিরংকুশ মেজরিটি হইয়াও আওয়ামী লীগ যে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করিতেছেন, তা কেবল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন। ভূগোলের বিচারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুইটি স্বতন্ত্র দেশ। তা সত্ত্বেও আমরা দুই দেশ মিলিয়া এক রাষ্ট্র করিয়াছি। এক রাষ্ট্রের ভিত্তিতেই মাথাপিছু এক-ভোট নীতিতে সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে। এই নির্বাচনে গঠিত গণপরিষদ পার্লামেন্টের এলাকা ও অধিকার বিচারে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় আঞ্চলিক জয় হইলেও ন্যায়তঃ ও আইনতঃ আওয়ামী লীগই এখন গোটা পাকিস্তানের একক প্রতিনিধি। পশ্চিমাঞ্চলসহ গোটা পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-রচিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। নিজের এই এলাকা অধিকার ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও আওয়ামী-নেতা শেখ মুজিব ভৌগেলিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই পশ্চিমা ভাইদের সহযোগিতা চাহিতেছেন। আওয়ামী লীগ-নেতার এই দেশ-প্রেমাত্মক উদারতার উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়া পশ্চিমা নেতারা নিতান্ত অবান্তরভাবে 'ইসলামী আদর্শবাদ, 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অখণ্ডত্ব'র স্লোগানে নিরংকুশ মেজরিটি পার্টির বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রয়োগের আয়োজন করিতেছেন। এই ধরনের চিন্তাধারার সাথে সনাতন 'প্রাসাদ চক্রান্ত-

কারীদের চিন্তা ও কাজের মিল থাকা খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক। তা যদি ঘটে, তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্তে আমাদের জীবনে আবার বিপর্যয় নামিয়া আসিবে—ঘাটে আসিয়া আমাদের গণতন্ত্রের নৌকার ভরাডুবি হইবে। এমন বিপদ যে কবির কল্পনা নয়, স্বয়ং শেখ মুজিবও একাধিকবার সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের গণতন্ত্রীদের একাংশের মধ্যে স্পষ্টতঃই সে আশংকা দেখা দিয়াছে। তাই তাঁরা নিজ নিজ দলের নেতাদের উদ্দেশ্যে ঐ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। দলত্যাগের হুমকিটা হুঁশিয়ারির চরম কঠোর রূপ। হুঁশিয়ারির এই কঠোরতায় পশ্চিমা নেতা বা নেতারা যদি ছয়-এগার দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনায় সম্মত হন, তবে সত্যই তাঁরা দূরদর্শী দেশপ্রেমের পরিচয় দিবেন। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার বাস্তব সমাধানভিত্তিক খাঁটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার মাধ্যমে তাঁরা পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার কায়েমী ব্যবস্থা করিবেন। সেজন্য ভাবী বংশধরদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন তাঁরা। অবশ্য এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কৃতিত্ব হইবে ঐ দলত্যাগের হুমকিদাতা সত্তুরজন এবং তাঁদের পরামর্শদাতাদেরই।

আমার এ অনুমান কি সত্য হইবে ? দেশবাসীর এ আশা কি পূর্ণ হইবে ? পশ্চিমা নেতাদের অন্তরে অবশেষে এই শুভবুদ্ধির উদয় সত্যই কি হইয়াছে ?

ইত্তেফাক, ১০ই জানুয়ারি, '৭১

৫৫

নদী উত্তাল কে ধরিবে হাল কাণ্ডারী হুঁশিয়ার হে

পাকিস্তান একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। কথাটা সবাই স্বীকার করিতেছেন। অনেক-অর্থবিজ্ঞানী অবস্থাটাকে সিরিয়াস মনে করিতেছেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও সে কথা সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রকে তিনি যে সংকটজনক অবস্থায় পাইয়াছিলেন, সেই অবস্থায়ই তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দিয়া যাইতেছেন। তার মানে, দুই বছর আগে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয়ার দিন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন খারাপ ছিল, এই দুই বছরে সেই অবস্থায়ই আছে। তার চেয়ে খারাপ হয় নাই।

এটা রাষ্ট্রনায়কদের জন্য সান্ত্বনার কথা হইতে পারে, কিন্তু জনগণের এতে সান্ত্বনার কিছু নাই। তাদের অবস্থা দুই বছর আগে যা ছিল, তার চেয়ে অনেক খারাপ হইয়াছে। এটা স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছে। কারণ জনসাধারণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অংশ না পাইলেও অর্থনৈতিক অবনতির আঘাতটা তাদের গায়েই লাগে বেশি। প্রাচুর্যের অংশীদার তারা নয়, অভাবের বড় শরিক তারা। সুখের সাথী নয়, দুঃখের সাথী। এটাই আমাদের দেশের জনগণের বরাত। আইউবশাহির উন্নয়ন যুগই তার বড় প্রমাণ। কতিপয়ের উন্নতিতে যে বহুর সর্বনাশ হয়, সে আমলটা তারও প্রমাণ। সেই জন্যই আইউবের 'উন্নয়ন দশক' উদযাপনের উৎসবের মধ্যেই ইয়াহিয়া গদিতে বসিয়া দেখিলেন অবস্থা খারাপ। আইউবশাহির পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে, তাঁদের দোষে ঐ বিপর্যয় ঘটে নাই। তাঁরা উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতি তাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দু ভাইদের বার মাসে তের পার্বণের মতই আইউব আমলে আমাদের দেশে বার বছরে তের তুফান হইয়াছিল। প্রতিটি বন্যা-তুফানেই উন্নয়নগুলি তছনছ করিয়া গিয়াছে।

তেমনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষেও বলিবার কথা আছে। তিনি যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনি রাখিয়া যাইতেছেন। এরও যুক্তি আছে। তাঁর আমলের দুই বছরেও তিনটি দুর্যোগ ঘটিয়াছে। তার মধ্যে শেষের মারটার ত তুলনাই হয় না। এতে তিনি যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনি যে রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন, এটাই ত ভাগ্যের কথা।

অতএব যুক্তি আছে সবার পক্ষেই। নাই শুধু জনগণের পক্ষে। তাদের দুর্ভোগের কোন সান্ত্বনাও নাই। ওটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে দুর্ভোগের চরম প্রকাশ একদিকে বেকারি, অপরদিকে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি। প্রতিটি পাঁচসালা পরিকল্পনাতেই লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ওয়াদা করা হইতেছে। আর প্রতিটি পরিকল্পনার সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির পর বেকারের সংখ্যা দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতিটি পরিকল্পনায় শতকরা ছয় হইতে ছত্রিশ হারে আমাদের সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির ওয়াদা করা হইয়াছে। পরিকল্পনার 'কল্পনাতীত সফলতার পরেও দ্রব্যমূল্যে ডবল হইয়াছে। ফলে আজ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলিয়া গিয়াছে। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির ফলে আজ দেশের দরিদ্র জনসাধারণ প্রায়-আকালের মধ্যে জীবন-যাপন করিতেছে। জনজীবনের এই চরম দুর্ভাগ্যেরও একটা পরিহাসের দিক আছে। সেটা অদৃষ্টের পরিহাস। জনগণের এই বেকারি অনাহারের মধ্যেও দু'চারজন এমন ধর্মবিশ্বাসী আছেন, যাঁরা পাঁচ হাজার টাকায় একটা কোরবানির গরু কিনিতেছেন। আমাদের উপকূল এলাকায় এক নযিরহীন তুফানের ফলে পনর লক্ষ মানুষ নিহত হওয়ার সংগে সংগে কম-সে-কম ঐ পরিমাণ গরু মরিয়াছে। তাতে দেশে গরুর আকাল হইয়াছে। এ অবস্থায় কোরবানিতে লক্ষ-লক্ষ গরু যবেহ না করিয়া অন্ততঃ তার কিছু অংশ উপদ্রুত এলাকার ভাইদেরে দান করিলে তাতে সওয়াব কম হইত কিনা, তা আলেমদের বিচার্য। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানীদের বিচার্য এই যে, দেশে গরুর যত অভাবই হউক, তার দাম পাঁচ হাজার ছয়-শ টাকা হওয়া উচিত ছিল না। এতে কি প্রমাণিত হইল? গরুর দাম বাড়িয়াছে? না, টাকার দাম কমিয়াছে? জিনিসের দাম বাড়ার অর্থই টাকার দাম কমা। অর্থ-বিজ্ঞানীরা এর অনেক ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভোগী জনসাধারণের তাতে সান্ত্বনা পাইবার কিছু নাই। তাই দ্রব্যমূল্যের এই লম্ফমান বৃদ্ধির প্রতিকার আজ জনগণের সার্বজনীন দাবি। এই দাবি পূরণ করিবেন কে? দ্রবমূল্যে বৃদ্ধি সংযত করিতে গেলে অর্থনীতিতে যে মৌলিক পরিবর্তন আনিতে হইবে, তা করিতে পারেন একমাত্র জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। বর্তমান সরকার নির্বাচিত সরকার নন। তাঁরা ইন্টারিম সরকার মাত্র। আইউবের ডিক্টেটরি আমল হইতে গণতন্ত্রী আমলে বিবর্তনের স্তর হিসাবে তাঁরা 'কেয়ার টেকার' সরকাররূপে সেই উদ্বর্তনের কাজটিই করিয়া যাইতেছেন। এ কাজের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচন সংঘটনও তাঁরা করিয়াছেন। এখন শাসনতন্ত্র রচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের শুভ দিনটির

জন্যই তাঁরা অপেক্ষা করিতেছেন। সেজন্য দেশের অর্থনীতিতে এমন কিছু বিপ্লবাত্মক যোগ-বিয়োগ তাঁরা করিতে চান না, যার ফলে গণতান্ত্রিক সরকারের সংস্কারমূলক কাজ বিঘ্নিত হইতে পারে।

এই যুক্তিতেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধের ব্যবস্থা করিয়া জনগণকে কোনও রিলিফ তাঁরা দিতেছেন না। সরকার শুধু জনগণের কথা লইয়াই থাকিতে পারেন না, নিজের কথাও সরকারকে ভাবিতে হয়। সত্য কথা এই যে, সরকারের আর্থিক অবস্থাও জনগণের অবস্থার মতই খারাপ। আভ্যন্তরীণ বাজারে জনগণ যা দেখিতেছে, বিদেশের বাজারে সরকারকেও সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিদেশেও পাকিস্তানের মুদ্রার দাম কমিয়া গিয়াছে। সরকারের উপর জনগণের সুবিধা এই যে, জনগণ উপাস করিয়া অর্থাভাবের প্রতিকার করিতে পারে। কিন্তু সরকার উপাস করিতে পারেন না। বিদেশের বাজারে দেশের টাকার যে দাম সরকারকে তা মানিয়া লইতে হয়। তার মানে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে হয়। সরকার তাই পাকিস্তানী টাকার মূল্য হ্রাস করার কথা চিন্তা করিতেছেন। চিন্তা করিতেছেন তাঁরা আভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের কথাও। কিন্তু দুইটা চিন্তার মধ্যে বুনিয়াদী পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস না করিলে অসুবিধা হয় জনগণের। দুর্ভোগ পোহাইবার ক্ষমতা আমাদের জনগণের অসাধারণ। ধৈর্য তাদের সীমাহীন। অতএব তাদের দুর্ভোগ দূরীকরণের কাজটা অপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সরকারের অসুবিধা দূরীকরণের কাজটা অপেক্ষা করিতে পারে না। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যাপার লইয়া সরকার তারে-নারে করিতে পারেন না।

কারণ সব ধনতন্ত্রী সরকারের মতই পাকিস্তানও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বরঞ্চ কিছুটা স্বাধীনতা আছে, পাকিস্তানের তাও নাই। আমরা দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অতীতের সমস্ত উন্নয়ন কাজ করিয়াছি আমরা দেনা করিয়া। সে দেনার সুদের পরিমাণও মাশাআল্লাহ্ সাত রাজার ধন। তারপর বর্তমানে নির্মীয়মাণ ও ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সব প্রকল্পই আমাদের বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তান আই. এম. এফ. (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল)-এর মেম্বর। এই মেম্বরগিরিতে আমাদের অনেক সুবিধা। এর জোরে আমরা ঐ তহবিল হইতে এস. ডি. আর. (স্পেশাল ড্রয়িং রাইট—টাকা তুলিবার বিশেষ অধিকার) পাইয়া থাকি। বিদেশী মুদ্রার কমতি হইলে এই তহবিল হইতে টাকা তুলিয়া আমাদের বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি পূরণ করিতে পারি। কাজেই এটা একটা মূল্যবান অধিকার। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক এই তহবিলের মেম্বরগিরির জোরে আমরা

'পাকিস্তান কনসর্টিয়ামে'র অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকি। পাকিস্তানের হিতকামী ধনী রাষ্ট্রেরা আমাদের উন্নয়ন কাজে অর্থসাহায্য করিবার জন্য জোট বাঁধিয়াছেন। তারই নাম কনসর্টিয়াম। ইংরাজী 'কনসর্ট' মানে স্বামী-স্ত্রী। এই সব হিতৈষী রাষ্ট্রের পক্ষে আমাদের সম্পর্ক সত্য-সত্যই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতই মধুর। বর্তমানে এই কনসর্টিয়াম মানে দম্পতি-জোটের মধ্যে নয়টি কনসর্ট আছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর মতই এরা সকলেই নবরত্ন হিসাবে পাকিস্তানকে সমান ভালবাসেন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মানে বিশ্ব মহাজনসহ আমাদের নবকনসর্টের সকলেই বলিতেছেন, দুনিয়ার বাজারে আমাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের মুদ্রামান হ্রাস করিতেই হইবে। এই উপদেশের মূল্য আমাদের জন্য খুবই বেশি। আমাদের হিতৈষী মহাজনরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, আমরা তাঁদের পরামর্শমত মুদ্রামান হ্রাস না করিলে তাঁরা আমাদিগকে আর অর্থসাহায্য দিবেন না। এটাও সতিকার হিতৈষীর কথা। মা যেমন ছেলেকে বলিয়া থাকেন ঃ 'স্কুল-এ না গেলে তোমাকে ভাত দেওয়া হইবে না। কাজেই আমরা জননী-গত-প্রাণ বাধ্য ছেলের মতই অন্ততঃ ক্ষুধার ভয়ে মায়ের আদেশ পালন করিবার চিন্তা করিতেছি।

কিন্তু খাদ্য-মূল্য হ্রাসের কথা আলাদা। এখানে ধমক দিবার মত কোনও কনসর্ট সরকারের নাই। তাই বর্তমান সরকার 'ইন্টারিম সরকার' এই যুক্তিতে খাদ্য-মূল্য হ্রাসের মত 'গুরুতর ব্যাপারে' হাত দিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু 'ইন্টা-রিম সরকারে'র যুক্তিতে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মত ঘোরতর গুরুতর ব্যাপারও প্রয়োগ করিতে সরকারের বাধে নাই। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী-বেসরকারী সমবেত বিরোধিতার মুখেও এই 'ইন্টারিম সরকারই' তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পূর্ব পাকিস্তানের ভাগের এগার শ' কোটি টাকা খরচ না করিয়াই চতুর্থ পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন। এটাও করিয়াছেন সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক কনসর্টের অভিপ্রায় অনুসারে।

'ইন্টারিম সরকারে'র এইসব বাস্তব অসুবিধা দূর করিবার সবচেয়ে সহজ উপায় যে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া এবং সে কাজের প্রথম পদক্ষেপ যে নব-নির্বাচিত ন্যাশনাল এসেমব্লির বৈঠক ডাকিয়া দেওয়া, সেই কাজটিই কিন্তু সরকার করিতেছেন না। যে প্রেসি-ডেন্ট ইয়াহিয়া গদিতে বসিবার দুই বছর শেষ হইবার আগেই আদর্শ ক্ষিপ্রতা ও পরম আন্তরিকতার সংগে সার্বজনীন ভোটে সাধারণ নির্বাচনের মত কঠিন কাজটি সমাধা করিয়া ফেলিলেন, নির্বাচনের দুইমাস পরেও তিনি সেই নির্বাচিত পরিষদের বৈঠক ডাকিতেছেন না কেন, তার নিশ্চয়ই গুরুতর

কারণ আছে। সে কারণ জনগণ জানিতে না পারায় তাদের কাছে এটা রহস্যজনকই বিবেচিত হইতেছে।

কিন্তু সরকার যুক্তিসংগত কারণে বসিয়া থাকিলেও দেশের অর্থনীতি এক জায়গায় বসিয়া নাই। সেখানে স্বভাবতঃই তরংগ উঠিতেছে। সে তরংগ ক্রমে উত্তাল হইতেছে। তাড়াহুড়া করিয়া চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু করিয়া থাকিলেও পরিকল্পনা-মুদ্দতের প্রথম সালের পরিকল্পনাসমূহই ভেস্তে যাইতেছে। সরকারী সূত্র হইতেই জানা যাইতেছে যে, এই সালের লগ্নি ও উৎপাদন উভয়টাই পরিকল্পনার বহু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। এটা ঘটিয়াছে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই। কৃষি উৎপাদন ঘাটতির জন্য ঝড় তুফান, বন্যা-প্লাবন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, খরা-মরা, কীট-পতংগ ইত্যাদি অবশ্যই দায়ী। কিন্তু সার ও কীটনাশক ঔষধ বিতরণের জন্য লগ্নির অভাবকেই দায়ী করা হইয়াছে। শিল্প-উৎপাদনের ঘাটতির জন্য একদিকে যেমন লগ্নি কমতির কথা বলা হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি দেশের অস্থির পরিস্থিতিকেও দায়ী করা হইয়াছে। একদিকে অনবরত হরতাল-স্ট্রাইকের জন্য উৎপাদন হ্রাস, অপরদিকে জাতীয়করণের ভয়ে পুঁজির 'শাইনেস্' এই দুই-এ মিলিয়া শিল্প-উৎপাদনের বারটা বাজাইয়া দিয়াছে। ফলে একদিকে আভ্যন্তরীণ মূল্য-বৃদ্ধি অপরদিকে রফতানী আয় হ্রাস। এই দুইদিক হইতে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে। একদিকে রফতানী আয়ের অভাবে আমাদের ব্যালেন্স-অব-প্যামেন্টে দেনা হইয়াছে। অপরদিকে অতীত দেনা শোধ করার বদলে নয়া দেনা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এটা স্বাভাবিক। এটা চিরন্তন। 'ভাল মহাজন' যাদের আছে, অর্থাৎ চাওয়া মাত্র দেনা-পাওয়া যাদের সহজ, তাদের দেনা কোনও কালেই শোধ হয় না। শোধ হওয়ার দরকারই হয় না। দেনা শোধের জন্য 'ভাল মহাজন'দেরও তাগিদ নাই। শুধু মুদ্রা-মান হ্রাস করিলেই হইল।

মুদ্রামান হ্রাসটা জাতির জন্য সব সময়ে দোষের নয়। অনেক সময় তাতে কল্যাণই হইয়া থাকে। আর কোনও-কোনও সময় কল্যাণ-অকল্যাণের পাল্লা প্রায় সমান সমান হইয়া থাকে। পাকিস্তানের জীবনে বর্তমানটা এমনি একটি মুহূর্ত। একদিকে মুদ্রামান হ্রাস করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। বোনাস ভাউচার প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমরা ইতিমধ্যেই প্রকারান্তরে পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য শতকরা পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হ্রাস করিয়াই ফেলিয়াছি। কাজেই পাকিস্তানী মুদ্রার বর্তমান আন্তর্জাতিক রেশিও কৃত্রিম। বাজার-মূল্য হইতে তার সরকারী দাম অনেক বেশী। সরকারী বাট্টার

হারে টাকা দিতে কোন বিদেশী ব্যবসায়ী রাযী নয়। দেওয়া হয়ও না। কাজেই সরকারী দেনা-পাওনা বাট্টার হারে হওয়ার দাবি করা সংগত নয়। রফতানী আয় বাড়াইয়া নিজের আয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। রফতানী আয় বাড়াইতে হইলে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। শিল্প-উৎপাদন বাড়াইতে হইলে মেশিনারি ও কাঁচামাল আমদানি করিতে হয়। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মানিয়া সন্তুষ্ট শ্রমকে দিয়া উৎপাদন-যন্ত্রের ফুল ক্যাপাসিটি কাজে লাগাইতে হয়। কাজেই আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যয় বাড়াইতে হয়। কৃষি উৎপাদন বাড়াইতে হইলেও সেই খরচা। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। সার উৎপাদন বা আমদানি করিতে এবং কীটনাশক ঔষধ বিতরণ করিতে হয়।

অতএব ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মহাজনেরই দ্বারস্থ হইতে হয়। যতদিন পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবসান না হইবে ততদিনই এইভাবেই চলিতে হইবে। অতএব মুদ্রামান হ্রাস করিয়াই হিতৈষী মহাজনদের খুশি রাখিয়া আমাদের আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করিতে হইবে। মুদ্রামান হ্রাসের দ্বারা আমাদের কৃষক-সম্প্রদায়ের লাভ হইবে। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িবে। বিশেষতঃ পাট-ধান-তুলা-সরিষার দাম বাড়িয়া যাইবে। তাতে একদিকে কৃষকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও মুখে হাসি আসিবে। অপরদিকে 'অধিক শস্য ফলাও' নীতি জোরদার হইবে। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খরিদা জিনিসেরও দাম বাড়িবে বটে, কিন্তু ফিল-ফাসিলে তাদের লাভ থাকিবে।

কিন্তু শহরিয়া গরিবদের, বিশেষতঃ শ্রমিক ও নিম্ন-আয়ের কর্মচারিদের এতে ঘোরতর লোকসান হইবে। খাদ্য-দ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে এদের জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসিবে। এই বিপর্যয় হইতে শহরিয়া গরিব জনসাধারণকে রক্ষা করা যায় একমাত্র রেশন-দোকান ও ফেয়ার প্রাইসশপের সার্বজনীন প্রবর্তনের দ্বারা। এ ব্যবস্থা না করিয়া মুদ্রামান হঠাৎ হ্রাস করিলে শহরিয়া গণ-জীবনে যে ধকল আসিবে এবং সেই ধকল যে উচ্ছৃংখলতার আকারে ফাটিয়া পড়িবে, সেটা সামলানো খুবই কঠিন হইবে।

এ অবস্থায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা-অবস্থা আরও বিপদ-সংকুল করিয়া তুলিয়াছে। অবিলম্বে এ অনিশ্চয়তা দূর করা দরকার। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তাই তৎপর হইতে হইবে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া একটিমাত্র পথ সরকারের সামনে খোলা আছে। সেটি হইতেছে, কাল বিলম্ব না করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। অতএব রাজনৈতিক ও জাতীয় অর্থনীতিক উভয় প্রয়োজনেই অনতিবিলম্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকিয়া দেওয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কর্তব্য।

ইত্তেফাক, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, '৭১

৫৬

ভাষা-আন্দোলনের মর্ম-বাণী আমরা বুঝিয়াছি কি ?

আজ একুইশা ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হইয়াছিলেন, তাঁদের সেই স্মৃতি দিবস এটা।

কিন্তু কথাটা কি ঐখানেই শেষ ? না, তা নয়। যে কযের জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই কয্‌টাই বড় কথা। সে কষ্‌টা কি ? মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটাই সেই পবিত্র কয্‌।

তবু কথাটার শেষ সেখানেও নয়। তা যদি হইত, তবে ওটা মামুলি ব্যাপার হইত। আমাদের জন্য তা অতীতের কথা হইত। শহীদ দিবস তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিবসে পরিণত হইত। কারণ ১৯৫৬ সালেই বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রে জনগণের মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা হইবে এটা ত অতিশয় স্বাভাবিক সহজ মামুলি কথা। তবু এই সহজ স্বাভাবিক কথাটা দেশের শাসকদেরে বুঝাইতে ছাত্র-তরুণদের আন্দোলন করিতে হইয়াছিল। সরকার বন্দুকের গুলিতে সে আন্দোলন দমাইতে চাহিয়াছিলেন। তাতে কতিপয় তরুণের প্রাণ গিয়াছিল। পরিণামে দেশের সরকার সে দাবি মানিয়া লইয়াছেন। শাসনতন্ত্রে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শহীদদের আত্মদান সফল হইয়াছে। তাঁদের আত্মদানে আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ করিয়াছে। সারা দেশবাসী সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আত্মদান করিয়াছেন, স্বাধীনতালাভে তাঁদের অভীষ্ট পূরণ হইয়াছে। তাঁদের কাছেও দেশবাসী কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশের মত সব দেশের জন্যই একথা সত্য। সব দেশেই এমন শহীদদের স্মৃতিরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বড় বড় যুদ্ধে যে সব সৈন্য প্রাণ দেয়, 'আননোন সোল্‌জারস' নামে এজমালিতে তাঁদের জন্যও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। সেই সব স্তম্ভে ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। দেশের শাসকরা ত দেনই, বিদেশী মেহমানদেরও সে কাজে বাধ্য করা হয়। এ সবই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কথা। স্মৃতিরক্ষার কথা।

কিন্তু একুইশা ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসের তাৎপর্য শুধু তাই নয়। সেটা আরও গভীর, আরও সুদূরপ্রসারী। স্বাধীনতালাভে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধজয়ে লড়াইয়ের ময়দানের শহীদদের

উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষা শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষারূপে লিপিবদ্ধ হওয়াতেই ভাষা-আন্দোলনের শহীদানের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কারণ ভাষা আন্দোলন শুধু একটা জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ছিল না। উর্দুর বদলে বা উর্দুর সংগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানেরই প্রশ্ন এটা ছিল না। এটা ছিল স্বকীয়তার দাবি। এ দাবি শুধু প্রত্যক্ষ ও বাইরের দাবি নয়। এটা শুধু অর্জনের দাবি নয়, উপলব্ধিরও দাবি। এর অন্তর্নিহিত শাশ্বত মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী। জাতীয় স্বকীয়তারই অমর বাণী। স্বীকৃতিতে এর শুরু, উপলব্ধিতে এর সাফল্য। একুশা ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসের মর্মবাণী এমনি মহান, এমনি চিরঞ্জীব বলিয়াই কয়জন লোক এতে শহীদ হইলেন, সেটা বড় কথা নয়, যে সত্যদর্শের জন্য তাঁরা প্রাণ দিলেন, সেটাই বড় কথা। এই বড় কথাটা কি আমরা বুঝিয়াছি? মনে হয় অনেকেই বুঝি নাই।

বুঝি যে নাই, তার প্রমাণ চোখের সামনে। পনর বছর আগে বাংলা ভাষা দেশের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা পাইয়াছে। এতদিনেও আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মিডিয়াম ও সরকারী-বেসরকারী অফিস আদালতের ভাষা হয় নাই। এটাই সাধারণ অভিযোগ। অভিযোগটা মোটা বলিয়াই এটা সাধারণ, মনে সবার মুখেই। শহীদ দিবসের প্রতি বার্ষিকীতেই আমরা এই কথার পুনাবৃত্তি করিয়া আসিতেছি। অভিযোগটা সত্যও। এইদিক হইতে একুশা ফেব্রুয়ারির সংগ্রাম আজিও সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। সম্পূর্ণ সফল হয় নাই মানে, কিছুটা হইয়াছে, কিছুটা হয় নাই। বাংলা রাষ্ট্র-ভাষা হইয়াছে, কিন্তু সরকারী ভাষা হয় নাই। এইখানে আমাদের পাকিস্তান হাসলের সাথে রাষ্ট্রভাষা হাসিলের খুব খানিকটা মিল আছে। আমরা রাষ্ট্র পাইয়াছি। কিন্তু গণতন্ত্র পাই নাই। তেমনি রাষ্ট্রভাষা পাইয়াছি, সরকারী ভাষা পাই নাই। রাষ্ট্র পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে ভাষা আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। উভয়টার জন্যই দৃশ্যতঃ দায়ী দেশের শাসক-গোষ্ঠী। দৃশ্যতঃ এইজন্য যে গণতন্ত্রবিরোধী ভূমিকায় শাসক গোষ্ঠীর দায়িত্ব একক ও ঐকান্তিক। কিন্তু বাংলা ভাষাবিরোধী ভূমিকায় তাঁদের দায়িত্ব একক ও ঐকান্তিক নয়। উভয় ভূমিকায় প্রাসাদ-চক্রান্ত থাকিতে পারে। কিন্তু দুই-দুইটা মার্শাল ল' যেমন করিয়া গণতন্ত্র ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, বাংলা ভাষা প্রয়োগের বিরুদ্ধে তেমন প্রত্যক্ষ কোনও মার্শাল ল' প্রবর্তিত বা প্রযুক্ত হয় নাই;

একটু গভীরে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এ প্রার্থক্যটাও স্থূল পার্থক্য। মূলতঃ যে মনোভাব গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দিনরাত কাজ করিতেছে,

সেই মনোভাবই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধেও অহর্নিশ ক্রিয়া করিতেছে। জন-গণের প্রতি অশ্রদ্ধা যেমন গণতন্ত্র-বিরোধীদের বুনিয়াদী শক্তি অথবা দুর্ব-লতা, মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাও তেমনি বাংলা ভাষা-বিরোধীদের বুনিয়াদী 'শক্তি' বা দুর্বলতা। শক্তি ও দুর্বলতার মত দুইটা পরস্পরবিরোধী চারিত্রিক গুণ এ ব্যাপারে একই ব্যক্তিত্বে, একই শ্রেণীতে, একই সময়ে থাকিতে পারে। কারণ জনগণের প্রতি অনাস্থার আরেক নাম নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। ঠিক তেমনি, নিজের মাতৃ-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার আরেক নাম নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা, আত্ম-মর্যাদাবোধের অভাব। দেশের জনগণকে অজ্ঞ মূর্খ ও গণতন্ত্রের অযোগ্য বলিয়া যাঁরা ডিক্টেটরি করিতে চান, হিসাব করিয়া আংগুলে গণিয়া দেখিবেন তাঁরা সকলেই আজীবন চাকুরিয়া। কেউ কেউ পুরুষানুক্রমেও। গোলামি এঁদের পেশা, তা যত মোটা মাহিয়ানার গোলামিই হউক। অনেকের পৈত্রিক পেশাও বটে। গোলাম এঁদের অস্থিমজ্জায়, রক্তে-মাংসে। পদবিটা যত মোটা হয়, গোলামিটা তত-সূক্ষ্ম হয়। মাহিয়ানার পরিমাণটা যত উচ্চ হয়, গোলামির মনোভাবটা তত নীচমানে গভীর-মূল হয়। আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদা ও আত্ম-সম্মান বোধ তত কম হয়। নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই বলিয়া এঁরা জনগণকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। নিজের মর্যাদা-জ্ঞান নাই বলিয়া জনগণকে এঁরা মর্যাদা দিতে জানেন না। যাঁরা নিজেদেরেই সম্মান করেন না, তাঁরা অপরের সম্মান করিবেন কি? তাই গণতন্ত্র এঁরা চান না। শুধু চান না নয়, গণতন্ত্রকে এঁরা রীতিমত ঘৃণা করেন।

মাতৃভাষা-বিরোধীদের মনোভাবটাও মূলতঃ এই একই। দেশের জনগণকে এঁরা যেমন রাষ্ট্র পরিচালনার অযোগ্য মনে করেন, মাতৃভাষা, মানে জন-গণের ভাষাকেও তেমনি রাষ্ট্রভাষা হইবার অযোগ্য মনে করেন। তবে বাংলাকে এঁরা কাগজে-পত্রে রাষ্ট্র-ভাষা করিলেন কেন? উত্তর, এঁরা নিজেরা করেন নাই, করিতে রাযী হইয়াছিলেন মাত্র। ইচ্ছা ছিল না, তবে রাযী হইলেন কেন? উত্তর, ভাবালু ছাত্র-তরুণরা হৈ-চৈ করিয়াছিল বলিয়া। রাইফেলের গুলিতেও সে হৈ-চৈ থামান যায় নাই বলিয়া। স্বাধীনতা হাসিলের সাথে রাষ্ট্রভাষা হাসিলের এখানেও খুব মিল আছে। আমাদের রাষ্ট্রচালকরা স্বাধীনতাও চান নাই, বাংলা রাষ্ট্রভাষাও চান নাই। মানে বাধ্য হইয়াই চাহিয়াছিলেন। পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম আমরা অখণ্ড স্বাধীন ভারতে হিন্দু মেজরিটির ডরে। তেমনি বাংলা রাষ্ট্রভাষা চাহিয়াছিলাম উর্দুর ডরে। ভারতের হিন্দুরা স্বাধীনতা দাবি না করিলে আমরাও পাকিস্তান দাবি করিতাম না।

পশ্চিমা ভাইরা উর্দু রাষ্ট্রভাষা দাবি না করিলে আমরাও বাংলা রাষ্ট্রভাষা দাবি করিতাম না। আমরা জানিতাম, আমাদের জনগণ অজ্ঞ মূর্খ, দেশশাসনের অযোগ্য। ঠিক তেমনি জানিতাম আমাদের মাতৃভাষাটাও অভদ্র, অশালীন, রাষ্ট্রভাষা হইবার অযোগ্য। ইংরাজের শাসন ও ইংরাজী ভাষা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। হিন্দুরা যখন জান-প্রাণ দিয়া সংগ্রাম করিয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রায় হাসিল করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন হিন্দু ডমিনেশনটা এড়াইবার জন্য আমরা অগত্যা পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম। ঠিক তেমনি, পশ্চিমারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা যখন প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন অগত্যা আমরা বাংলার দাবি করিয়াছিলাম উর্দু ডমিনেশন এড়াইবার জন্য। অগত্যার ব্যাপার বলিয়াই আমরা পাকিস্তান বা বাংলা ভাষা কোনোটাই ভালবাসি না।

মাতৃভাষার প্রতি মনোভাবটা জাতীয় স্বকীয়তাবোধের গোড়ার কথা। মা এখানে জাতির মা, ব্যক্তির মা নন। মাতৃভাষা জাতির মাতৃভাষা, ব্যক্তির মাতৃভাষা নয়। ব্যক্তির জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব খুব বেশী না। ব্যক্তি মাতৃভাষা ভুলিতে পারে, পরের ভাষার পণ্ডিত হইতে পারে, তুখাড় বক্তৃতাও করিতে পারে। কিন্তু জাতি মাতৃভাষা বদলাইতে পারে না। জাতির মান-মর্যাদা, তার গৌরব, অহংকার, তার কৃষ্টি-সভ্যতা তার মাতৃভাষায়। এটা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁরাই ভাষা-আন্দোলনের ত্যাগকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। মাতৃভাষাকে যাঁরা শিক্ষার বাহন হইবার অযোগ্য মনে করেন, তাঁরাই এটাকে সাহিত্যের ভাষা হইবারও অযোগ্য মনে করেন। যাঁরা এমন মনে করেন, তাঁরা আসলে নিজের মাতৃভাষাকে অসভ্য, অভদ্র ও অশালীন মনে করেন। এঁরা আসলে নিজের মাকেই অসভ্য, অশালীন মনে করেন। যে চাষীপুত্র দারোগা হইয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজের বাপকে বাড়ির চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এরা সেই শ্রেণীর লোক। এরা বাড়ির মধ্যে বাপকে বাপ ডাকিতে পারে, কিন্তু নিজের শিক্ষিত বন্ধু-বান্ধবের 'সভ্য সমাজে' তা পারে না। কারণ বাবার পরনে কোট-প্যান্ট নাই। আছে লুংগি-নিমা। মাতৃভাষা সম্বন্ধেও এঁদের এই মনোভাব। মাতৃভাষাকে সাহিত্যের মাধ্যম করা যায় না। পরিভাষার কোট-প্যান্ট না পরাইয়া ওটাকে শিক্ষার মাধ্যমও করা যায় না। তাই এঁরা বাংলা খবরের কাগজের চাইতে ইংরাজী কাগজ পড়িতে ভাল বাসেন। নিজেদের ছেলেমেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াইতে চান। বাংলায় যদি নিতান্ত লিখতেই হয়, তবে মাতৃভাষা বাংলায় না লিখিয়া পশ্চিমা বাংলার কথ্যভাষায় লিখিয়া থাকেন। এঁরাই ভুলিয়া যান, ভাষা সাহিত্যকে উন্নত করে না, সাহিত্যই ভাষাকে উন্নত করে। রবীন্দ্রনাথ ও-ভাষায় লিখিয়াছিলেন বলিয়াই

সেটা উন্নত হইয়াছে। ওটা উন্নত ভাষা ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সে ভাষায় লেখেন নাই।

তেমনি, ভাষা জ্ঞানকে উন্নত করে না, জ্ঞানই ভাষাকে উন্নত করে। পরিভাষার অভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে না, এটা হয় কুযুক্তি, নয় ত অজ্ঞতা। পরিভাষা আবার কি? যে ভাষায় টিচার-স্টুডেন্টে, অফিসে-আদালতে, রাস্তাঘাটে, স্টেশনে-স্টিমারে কথাবার্তা হয়, সেটাই শিক্ষার মাধ্যম। যে-সব শব্দ চালু আছে, যা বক্তা বলে, শ্রোতা বুঝে, সেটা যে ভাষার শব্দই হউক না কেন, ওটাই বাংলা শব্দ। তার আবার পরিভাষা কি? অথচ পরিভাষার প্রশ্নটাই বহুদিন ধরিয়া অনেক শিক্ষাবিদের মাথার বিষ হইয়া আছে। যাঁদের মাথার বিষ হয় নাই, তাঁদের অন্ততঃ অজুহাত হইয়াছে। অনেক বিদ্বান পণ্ডিত এই পরিভাষা তৈয়ারির কাজে নিজেদের মূল্যবান সময় এবং হয়ত কোনও প্রতিষ্ঠানেব অর্থের অপচয় করিতেছেন। অভিধান ঘাঁটিয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া ইংরাজী-ল্যাটিন-গ্রীক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দের নামে সংস্কৃত শব্দ আবিষ্কার করিতেছেন। ইংরাজী ইত্যাদি 'বিদেশী' শব্দগুলি বরঞ্চ বহু প্রচলনের ফলে জনগণের বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাদের স্থলে যে সব অভিনব 'বাংলা' শব্দ আবিষ্কৃত হইল, সেটা একেবারেই অপরিচিত, দুর্বোধ্য। মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম যে ভাষা, এই পরিভাষার দওলতে তাই হইয়া গেল ভাব গোপন করিবার হেঁয়ালী। উনিশ শতকের নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বংগভাষা 'শুদ্ধি' করিবার উদ্দেশ্যে কলম-দোয়াত-কাগজ ইত্যাদি বিদেশী আরবী শব্দের পরিভাষা তৈয়ারের যে পণ্ডশ্রম করিয়াছিলেন, আমাদের যুগের আমাদের দেশের পরিভাষা-সন্ধানী পণ্ডিতরাও ঠিক সেই মহৎ কাজটিই করিতেছেন।

এ ধরনের চেষ্টা অতীতেও টিকে নাই, ভবিষ্যতেও টিকিবে না। ভাষা নিজের জোরেই আত্মবিকাশ করে। কারণ মনোভাব প্রকাশটাই তার কাজ। এ কাজে কোন্ শব্দ ব্যুৎপত্তির দিক হইতে কোন্ ভাষা হইতে আসিয়াছে, সেটা ভাষা-বিজ্ঞানীর বিচারের বিষয়, কথক বা শ্রোতার বিবেচনার বিষয় নয়। লেখক বা পাঠকের কাজও নয়। তাই জনগণের কাছে সুপরিচিত 'বিদেশী শব্দের' 'বাংলা পরিভাষা' আবিষ্কারের চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম নয়, প্রতিক্রিয়াশীলতাও। এইজন্যই 'ফোন্'কে 'দূরালাপনী', 'ডিরেক্টরকে 'কর্মাধ্যক্ষ, 'লাইব্রেরিয়ান'কে 'গ্রন্থাগারিক' করার চেষ্টা, 'ইউনিয়ন কাউন্সিল'কে 'মিলন সংঘ' করিবার মতই অপচেষ্টা মাত্র। পরিভাষা-সন্ধানী পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়াই জনগণ যেমন 'টার্পেন্টাইন'কে তার্পিন, 'অর্ডারলি'কে আর্দালী, 'হস্‌পিটাল'কে হাসপাতাল করিয়াছে, তারই অনুসরণে কঠিন ও দুরুচ্চার্য ইংরাজি শব্দগুলিকে সহজোচ্চার করিলেই পরিভাষা রচনার কাজ হইয়া যাইবে। খোদ

ইংরাজি ভাষীরাই তাদের নিজ ভাষায় 'ল্যাববেটরি'কে 'ল্যাব', 'পাবলিক রাস্তুরী'কে 'পাব,' 'পুলিসম্যানকে' 'কপ্' করিয়া লইয়াছে। তেমনি উর্দুওয়ালারা 'পার্লামেন্টারি'কে 'পার্লেমানি' করিয়া লইয়াছে। আমরাও তেমনি 'ইঞ্জিনিয়ারিং'কে 'ইঞ্জিনারি', 'লাইব্রেরিয়ান'কে 'লাইবারিয়ান' করিলে উচ্চারণও শ্রুতি-মধুর হইবে, বোঝাও সহজ হইবে।

তবু এসব করিবার অপেক্ষায় বাংলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মিডিয়াম ও অফিস-আদালতের ভাষা করার কাজ ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। শিক্ষার মিডিয়াম ও সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলা চালাইতে-চালাইতেই এসব কাজ হইয়া যাইবে। শুরু করাটাই আসল কাজ। শুরুটা করিতে হইবে আজই। কারণ এখনও 'ওয়েল বিগান, হাফ ডান' সত্য হইবে। সাঁতার শিখিবার আগে পানিতে নামিতে হইবে।

কিন্তু এটা করিতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে ভাষা-আন্দোলনের মর্ম-বাণীটা। বুঝিতে হইবে মানে, অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। ভাষা-আন্দোলন মানে স্বকীয়তার আন্দোলন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। পরের ভাষার বদলে নিজের ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা করার দাবিটা এ আন্দোলনের বাহিরের রূপমাত্র। এর ভিতরের কথা জাতীয় কৃষ্টিক স্বকীয়তা। যে ভাষায় মানুষ চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে, সে ভাষায় কথা না বলা ও সাহিত্য রচনা না করা পর্যন্ত মানুষ আত্ম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার মনে আত্মবিশ্বাসও জন্মে না। এটাই একইশা ফেব্রুয়ারির বাণী।

ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারি, '৭১

৫৭

মেজরিটির ডিক্টেটরশিপ বনাম মাইনরিটির ডিক্টেটরশিপ

কথাটা উঠিয়াছে ঠিকই। পাকিস্তানে মেজরিটির ডিক্টেটরশিপ চলিতে পারে না। এখানে মাইনরিটির ডিক্টেটরশিপ চলতেই হইবে। অন্যথায় পাকিস্তানের সংহতি ধ্বংস হইবে। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার সাধু উদ্দেশ্যে, অতএব, মেজরিটির শাসন ঠেকাইয়া রাখিতেই হইবে। এটা কিভাবে করা যায়? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ইতিমধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছেন। সে নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সব ভোটাররা যে একটিমাত্র পার্টিকে ভোট দিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাশেন্দারা যে পাকিস্তানের মেজরিটি, এটা অবশ্যই জানা ছিল। কিন্তু এটা ত জানা ছিল না এবং ভাবাও যায় নাই যে ঐ মেজরিটি একটি দলকে ভোট দিয়া বসিবে। এটা আগে আন্দায করা গেলে প্যারিটি বাতিল করিয়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন কিছুতেই করিতাম না। আন্দায করিবার কোন উপায়ও ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানীরা এতদিন ধরিয়া এত-এত দল করিল, দলে-দলে ঝগড়া-ঝাটি, ধরা-ধরি, মারা-মারি করিল। তাতে আমরা পশ্চিমা মাইনরিটিরা স্বভাবতঃই এবং যুক্তিসংগতভাবেই ধরিয়া লইলাম, পূর্ব পাকিস্তানী ভোটাররা সব দলকেই কিছু-কিছু ভোট দিয়া নির্বাচিত করিবেন। সব দলের কিছু কিছু মেম্বার নির্বাচিত হইলে পূর্ব পাকিস্তানের মেজরিটি আর ভয়ের হেতু থাকিত না। সেই আশাতেই এবং এমন বিশ্বাসেই আমরা সংখ্যা-ভিত্তিক নির্বাচনে রাযী হইয়াছিলাম। অংশ গ্রহণ করিয়াছিলামও সেই বিশ্বাসেই। পূর্ব পাকিস্তানী ভোটাররা এমনভাবে জোট বাঁধিয়া আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে, এটা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণার আগে জানিতে পারিলে তাঁকে এমন ঘোষণা করিতেই দিতাম না। আর ঐ ঘোষণার পরে জানিতে পারিলে আমরা নির্বাচন বয়কট করিতাম। কিন্তু তখনও আমরা তা বুঝতে পারি নাই। এইভাবে আমাদিগকে কিছু বুঝিতে না দিয়া আতেক্কা পূর্ব পাকিস্তানী ভোটাররা একজোটে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়া আমাদের বিশ্বাসভংগ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাসভংগ করার মানেই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। সোজা ইংরাজী

কথায় পূর্ব পাকিস্তানীরা আমাদের বিট্রে করিয়াছে। ফলে আমরা আজ 'ইলেকটেড ডেসপটিযম্' মানে নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের খপ্পরে পড়িয়াছি। আমরা কিছুতেই এটা মানিতে পারি না। আমরা বরাবর ডেসপটিযম বরদাশ্ত্ করিয়া আসিয়াছি। সুবিধামত সমর্থনও করিয়াছি। সুযোগ পাইলে সহযোগিতাও করিয়াছি। কিন্তু সেটা ছিল আন্-ইলেকটেড ডেসপটিযম। তাই বলিয়া 'ইলেকটেড ডেসপটিযম' আমরা কিছুতেই মানতে পারি না। আমরা নীতিগতভাবে ওটার বিরোধী। কারণ ওটা ব্রুট্ মেজরিটি'ট। আমরা বরাবর 'ব্রুট মাইনরিটির শাসন চালাইয়া আসিতেছি এবং সেইভাবেই পাকিস্তানের সংহতির হেফাযত করিয়া আসিতেছি। সেখানে ব্রুট মেজরিটির শাসন চলিতে দিলে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা জানি, মেজরিটির হাতে পড়িলেই পাকিস্তান ধ্বংস হইবে। সেই হেতু পাকিস্তানকে বরাবর মেজরিটির হস্তক্ষেপ হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।

সেজন্য আমাদের কম ফন্দি-ফিকির খাটাইতে হয় নাই। পাকিস্তানের সৃষ্টির দিন হইতেই পাকিস্তানের রাজধানীকে মেজরিটির নাগালের বাহিরে দেড় হাজার মাইল দূরে করাচিতে রাখিয়াছিলাম। তার-পরেও পাকিস্তান ধ্বংসের মতলবে যেদিন মেজরিটিরা সস্তা জাহাজের ডেকে চড়িয়া আসিয়া করাচিতে ভিড় করিতে লাগিল, তখন রাজধানীটা সুদূর পিন্ডিতে নিয়া গেলাম। গরমের দেশের মেজরিটিরা ঠান্ডার দেশ 'পিন্ডিতে আসিতে পারিবে না, আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ছেঁড়া কম্বল গায় দিয়া হইলেও মেজরিটিরা 'পিন্ডিতেও আসা শুরু করিয়াছে। এ অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রকে মেজরিটির হামলা হইতে বাঁচাইতেই হইবে। সেজন্য প্রয়োজন হইলে রাজধানী আমরা কাগান, হুন্জা, এমনকি কারাকোরামে লইয়া যাইব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে যেমন মেজরিটির হামলা হইতে রক্ষা করার সাধু উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত কোটের ইন্সাইড পকেটে তুলিয়াছিলাম, রাজধানীকেও আমরা তেমনি হেফাযত করিব।

রাজধানীর নাগাল না পাইয়া মেজরিটিরা এখন অন্য উপায়ে পাকিস্তান ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছে। পাকিস্তানের আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ, ব্যাংক শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদিতে হামলা করিতে চেষ্টা করিতেছে। আইন পরিষদ ছাড়া আর সবই আমরা কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। আইন পরিষদের ব্যাপারটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি মেজরিটির দেশে পরিষদের বৈঠক ডাকিয়া দিয়াছেন। তাতে পরিষদটা আসলে কসাইখানা হইয়া গিয়াছে। কসাইখানা নয় ত কি ? আমরা পাকিস্তানের সলিডারিটির জন্য সব বাড়ি-ঘর, দালান-ইমারত মাইনরিটির

দেশেই বানাইলাম। তাতে আমাদের দেশে পার্লামেন্ট বসাইবার দশ-বিশটা জায়গা হইয়াছে। মেজরিটির দেশে আমরা একটা বাড়িও করি নাই এবং হইতে দেই নাই। আমাদের দেশে এত-এত অট্টালিকা থাকিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিনা মেজরিটির দেশে একটা টিনের ঘরে জোড়াতালি দিয়া পরিষদ আহ্বান করিয়াছেন। আমরা মাইনরিটি দেশের কোটিপতি গরিবেরা সেই টিনের ঘরের গরমে বসিতে পারিব না। তা ছাড়া মেজরিটিরা ভদ্রতা ও আদব-কায়দায় মাইনরিটির পছন্দ-মত ব্যবহার করিবে, এটা আশা করা যায় না। এ অবস্থায় আমরা মাইনরিটিরা পরিষদের ঢাকা বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। বস্তুতঃ, ঢাকা গিয়া আমরা কি করিব ? পাকিস্তান ভাংগিয়া দিবার দলিল স্বরূপে মেজরিটিরা ছয়-দফার শাসনতন্ত্রের মুসাবিদা করিয়াছে। তাতে স্ট্যাম্প মারিয়া আমরা ত পাকিস্তান ধ্বংস কার্যে শরিক হইতে পারি না। তবে হাঁ, যদি মেজরিটিরা অগ্রিম ওয়াদা করে যে, এতদিন আমরা মাইনরিটিরা যে পন্থায় পাকিস্তান শাসন-শোষণ কয়িয়াছি সে ভাবে চলিতে দেওয়া হইবে, অথবা যদি স্বীকার করে যে, আমরা মাইনরিটিরা যা-যা বলিব, সেই মত শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, তবে আমরা ঢাকা যাইতে পারি। অন্যথায় নিজের দেশবাসীকে অরক্ষিত রাখিয়া ডবল-যিম্মিরূপে কসাইখানায় গলা বাড়াইয়া দিতে পারি না।

তার মানে, ঢাকার পরিষদ বৈঠক বয়কট করিয়া আমরা কি পাকিস্তান রক্ষার জন্য পাকিস্তান ভাংগিয়া দিলাম ? মেজরিটির মনে যদি তেমন কোনও আশা জাগিয়া থাকে, তবে সেটা কুহকিনী আশামাত্র। আমরা গণপরিষদ বয়কট করিলাম বটে, তবে পাকিস্তান ভাংগিয়াও দিলাম না ! বরঞ্চ মজবুত করিলাম। মেজরিটির হাত হইতে পাকিস্তান রক্ষা করিলাম। অতীতে আমরা বহুবার এমনি করিয়া পাকিস্তানকে আসন্ন-ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। কায়েদে-আযমকে 'একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষার' কথা বলিলাম। তিনি ঢাকাতে সেকথা একবার মাত্র বলিয়া ঢাকার ছাত্রদের ধমকেই উর্দু-ত্যাগ করিলেন। সেজন্য জাতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা জাতির পিতাকেই কোরবানি করিলাম। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁকে দিয়া ব্যাসিক প্রিন্সিপাল্স ঘোষণা করাইলাম। ঢাকার ছাত্র-জনতার এক ধমকে তিনি নিজের ঘোষণা প্রত্যাহার করিলেন। কাজেই পাকিস্তানের সংহতির জন্য আমরা তাঁকেও নিকাশ করিলাম। মেজরিটির উৎপাত বন্ধ করিবার আশায় তাদের মধ্য হইতে পর-পর দুইটা প্রধানমন্ত্রী বসাইলাম। এমন বাছাই করিয়া নিলাম, তবু কাজ হইল না। হাজার হইলেও মেজরিটির দেশের লোক ত। তাঁরা ভাষা-আন্দোলনটা যথেষ্ট

শক্ত হাতে দমাইতে পারিলেন না। বরঞ্চ ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দিয়া বসিলেন। ভোটের সুযোগ পাইলেই মেজরিটিরা দেশটা ডুবাইবে, এটা জানিয়াও কিনা দেওয়া হইল ঐ ইলেকশনটা। যা আশংকা করা গিয়াছিল, তাই হইল। ফলে পাকিস্তান রক্ষার খাতিরে দিলাম আমরা সেই নির্বাচন বাতিল করিয়া। দিলাম পাঠাইয়া 'ডাণ্ডাবাদী' সেকান্দর মির্যাকে গভর্নর করিয়া। এসব টালি-বালিতেও যখন পাকিস্তানের সংহতিকে বিপন্নমুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না, তখন দিলাম সেকরার টুকটাক কামারের এক ঘা। ১৯৫৮ সালে দিলাম মার্শাল ল' বসাইয়া। নিলাম চালাইয়া এক নাগাড়ে দশ-দশটা বছর। যাঁকে বসাইলাম তিনি নিজে একাই সব গিলিবার চেষ্টা না করিলে দিতাম চালাইয়া তাঁকে দিয়াই আরও অনেক দিন। তাঁকে সরাইয়া ইয়াহিয়াকে বসাইলাম। তিনি আমাদেরে জিজ্ঞাসা না করিয়া এমন একটি কাজ করিয়া বসিলেন, যেটা আমাদের দুইযুগের অনুসৃত নীতির বরখেলাফ। তাই পাকিস্তানের সংহতি আজ এমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিপদ হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করিবার জন্যই আমাদিগকে সেই সনাতন নীতিই অবলম্বন করিতে হইতেছে।

আমরা মেজরিটিকে সমঝাইয়া দিতে চাই যে, দেশ তাদের ইচ্ছামত চলিবে না। বরাবরের মতই আমাদের ইচ্ছানুসারেই চলিবে। তারা মেজরিটি বলিয়াই তাদের কথামত আমরা মাইনরিটিরা চলিব, এমন দুরাশা-উচ্চাশা তাদের না হওয়াই ভাল। মাইনরিটির উপর মেজরিটির শাসন চলিবে না মানে কি মেজরিটিরা নিজেদেরে শাসন করিতে পারিবে? ছয়-দফা পশ্চিম পাকিস্তানে না চলুক, পূর্ব পাকিস্তানেও কি চলিতে পারে না? পাগল নাকি? তাতে পাকিস্তান দুই টুকরা হইয়া যাইবে না? তার মানে ছয়-দফা পশ্চিম পাকিস্তানে ত চলিবে না-ই, পূর্ব পাকিস্তানেও চলিবে না। কিন্তু ওরা যে বলে মেজরিটির সবাই ছয়-দফার পক্ষে ভোট দিয়াছে। আরে মর! ভোট দিলেই হইল নাকি? ওদের ভোটের মূল্য কি? ওরা ভোট দিতে জানে? তা যদি জানিত, তবে আমরা সংহতিবাদী এত-এত প্রার্থী খাড়া করিলাম, দু'চারটা লোকও নির্বাচিত হইতে পারিল না। ১৯৫৪ সালে ভুল ভোট দিয়াছিল বলিয়া ওদের আচ্ছা সাজা দিয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম, এবার ঠিকমত ভোট দিবে। কিন্তু নিরেট মূর্খতা! আদিবাসীর বংশধর ত, জ্ঞান সহজে মাথায় ঢুকে না। রডের দরকার হয়। একবারে হয় নাই। আরেকবার দেখিতে হইবে।

কিন্তু আপনারা মাইনরিটিরাও যে গণতন্ত্রের কথা বলেন। গণতন্ত্রে ত শুনিয়াছি মেজরিটির শাসনই চলে। তবে পাকিস্তানে চলিবে না কেন? আরে মূর্খ, এটাও বুঝিতে পারিলে না? প্রথমতঃ, পাকিস্তান একটা ইউনিক স্টেট।

এখানকার গণতন্ত্রও হইবে ইউনিক। পাকিস্তানের দুই উইং-এর মতই 'গণতন্ত্র' শব্দটার মধ্যেও দুইটা উইং আছে ঃ একটা 'গণ' আরেকটা 'তন্ত্র'। পাকিস্তানী গণতন্ত্রের 'তন্ত্রটা' থাকিবে 'গণ' হইতে দূরে। এক উইং-এ গণ, আরেক উইং-এ তন্ত্র। দেখ নাই, এই কারণে আমরা রাষ্ট্রের তন্ত্র মানে রাজধানীটা 'গণ' হইতে আগেই দেড় হাজার মাইল দূরে স্থাপন করিয়াছিলাম। সেখানেও নিরাপদ মনে না করায় পরে আড়াই হাজার মাইল দূরে পিণ্ডিতে সরাইয়া নিয়াছি! দেখ নাই, তেইশ বছর রাষ্ট্র চালাইয়াছি বিনা নির্বাচনে। নির্বাচন আমরা দেই না কেন, এইবার তার কারণ বুঝলে ত? দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। এ কথার অর্থ বুঝিয়াছ কি? খাঁটি মোমিন মুসলমান দিয়া রাষ্ট্র চালাইতে হইবে। খালি জন্মে মুসলমান হইলেই চলিবে না। খাঁটি মুসলমান হইতে হইবে। পূর্বাঞ্চলের আধা-মুসলমানদের কথা ত উঠিতেই পারে না। সর্বত্রই পাক্কা মুসলমানের সংখ্যা কম। পড় নাই কিতাবে, স্বয়ং খোদাতালা বেহেশতের চেয়ে দুযখ অনেক বড় বানাইয়াছেন? তার মানে, বেহেশতীর চেয়ে দুযখীর সংখ্যা অনেক বেশি। তোমরা কি আশা কর, বেহেশতী-দুযখীদের মধ্যে 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট' নীতিতে ভোটাভুটি করিয়া এজমালিতে বেহেশত-দুযখ শাসন করিতে পরওয়ার দেগার রাজী হইবেন? সে অবস্থায় বেহেশতের সব মেওয়া-শরাবনতহুরা হুর-গেলমান দুযখীরা লুটপাট করিয়া নিবে না।

হাঁ, বুঝিলাম। কিন্তু ছয়-দফার বিরুদ্ধে আপনাদের আপত্তি কি, তা ত বলিলেন না। ছয়-দফার মোকাবিলায় কোনও অলটারনেটিভও ত আপনারা দিলেন না।

মূর্খ আর বলে কাকে? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনার পরে বলে কি না ঃ সীতা কার বাপ? আপত্তির কারণ দেখাই নাই, তবে এতক্ষণ বলিলাম কি? দুযখী-দের বেহেশতের মেওয়া লুটপাটের মিছালটা কি বৃথাই দিলাম? আর অল-টার্নেটিভের কথা? অলটার্নেটিভ থাকিলে ত দিব? ছয়-দফা বাদ দেওয়াই আমাদের অলটার্নেটিভ। আরে আহাম্মক, ছয়-দফা মানিয়া লইলে আমাদের আর থাকিল কি? শিল্প-বাণিজ্য, চাকরি-নকরি সবই ত শেষ হইবে। এতকাল খাটিয়া-খুটিয়া যা দওলত-ইমারত বানাইলাম, তালাফি-মেরামতের অভাবে সব ত ছাতাইয়া যাইবে।

বলেন কি সাব! সব যাইবে কেন? অর্ধেক ত থাকিবে? তাছাড়া এত-দিনের জমা ধন-দওলত?

হায়রে নির্বোধ! দওলতের মর্ম তুমি কি বুঝিবে? ষোল আনা খাইয়াও

যার পেট ভরিতেছে না, 'আরও চাই' 'আরও চাই' করিতেছে, তাকে তুমি উপদেশ দিতেছ আট আনা খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে? এ ধারণা তোমার ভুল। আমাদের ভোগে ভাগ বসাইতে দিব না। দওলতে শরিক এলাউ করিব না। আমাদের ভোগ-দওলত অটুট রাখিতে চাই। একেই বলি আমরা পাকিস্তানের সংহতি। এই সংহতি রক্ষায় আমরা স্ট্রং সেন্টার চাই। কিন্তু সে স্ট্রং সেন্টার ঢাকায় হইলে চলিবে না, থাকিতে হইবে সেটা 'পিন্ডিতেই। সে সংহতি রক্ষায় যদি ডিক্টেটরশিপ দরকার হয়, তবে সেটা মেজরিটির ডিক্টেটরশিপ হইবে না, হইবে সেটা মাইনরিটির ডিক্টেটরশিপ। এই শুভ কাজে যদি ডেসপটিযম আবশ্যক হয়, তবে সেটা নির্বাচিত ডেসপটিযম হইতে পারিবে না, হইতে হইবে সেটা বিনা-নির্বাচনের ডেসপটিযম। এই শর্তেই মেজরিটিকে আমাদের সাথে থাকিতে হইবে। থাকিতে না চাহিলেই যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তাও নয়। থাকিতেও হইবে আমাদের সাথে, চলিতেও হইবে আমাদের কথামতই। সে ক্ষমতা আমাদের আছে। তোমরা কবে স্বরাজ পাইবে, সেটাও ঠিক করিব আমরাই। মাশআল্লাহ।

ইত্তেফাক, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, '৭২

৫৮

এই জটিল পরিস্থিতির সমাধান কোথায় ?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা আবার তাঁকে ভুল উপদেশ দিয়াছেন। এবারের ভুলটা সাংঘাতিক মারাত্মক। প্রেসিডেন্টকে এই উপদেশ যাঁরা দিয়াছেন, তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়টারই প্রেসিডেন্ট, শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নন। তাঁরা এও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁদের এই উপদেশ আইন-কানুন, নিয়মতন্ত্র, ন্যায়নীতি, এমনকি খোদ এল. এফ. ও. বিরোধী। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া উপদেষ্টাদের এই মারাত্মক অপরিণামদর্শী উপদেশ মানিয়া লইয়া নিজেই নিজের ঘোষিত এল. এফ. ও.র খেলাফ কাজ করিয়াছেন। এই খেলাফটা ঘটিয়াছে এল. এফ. ও.র মূলনীতি ও কার্যবিধি উভয় দিক হইতেই। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক এ্যাপ্রোচের বিরোধী হইয়াছে তাঁর এই কাজটি।

এই মারাত্মক কাজটি হইতেছে ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা এবং তার বদলে পার্টি লিডারদের সম্মিলনী আহবান করা। এই কাজটি এল. এফ. ও.র মূলনীতি-বিরোধী হইয়াছে এইজন্য যে, প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদের বৈঠক স্থগিত করিয়াছেন মেজরিটি পার্টির লিডার ও ভাবী প্রধানমন্ত্রীর মত না লইয়াই। বরঞ্চ তাঁর মতের বিরুদ্ধেই। এটা আরও গণতন্ত্র-বিরোধী হইয়াছে এইজন্য যে, তিনি মাইনরিটি দলের দাবিমত এটা করিয়াছেন। মাইনরিটি পার্টির দাবিটার শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অশুভ পরিণামটার কথাও বিবেচনা করা হয় নাই। এল. এফ. ও.তে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র শাসনব্যবস্থা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের হইবে। পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আইন পরিষদের আহবান-অনুষ্ঠান সমাপন সবই করা হইয়া থাকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশে। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব মতামত নাই যদিও এ সবই করা হইয়া থাকে প্রেসিডেন্টের নামে। শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিয়া জাবেদাভাবে সরকারের দায়িত্ব মেজরিটি পার্টির হাতে তুলিয়া দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইন্টারিম প্রেসিডেন্টের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে ধরিয়া নিলেও এবং সে দায়িত্ব পালনের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আইন পরিষদের তারিখ পরিবর্তন অত্যাবশ্যক

বিবেচনা করিলেও তিনি সেটা মেজরিটি পার্টির নেতা এবং তাঁর নিজ মুখে স্বীকৃত ভাবী প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়াই করিতে পারিতেন। আইনের ভাষায় সেটা এ্যাডজোর্নমেন্ট হইত না। সেটা হইত তারিখ পরিবর্তন। প্রেসিডেন্ট করাচি বসিয়া এটা না করিয়া ঢাকায় আগমন করিয়া মেজরিটি পার্টির লিডারের সংগে পরামর্শ করিয়া তারিখ পরিবর্তন করিলেই বর্তমান সংকট এড়ান যাইত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি সকল দিক বিবেচনা করিয়া তারিখ পরিবর্তনটা রাষ্ট্র ও জাতির জন্য কল্যাণজনক মনে করিয়া থাকেন, তবে মেজরিটি পার্টির নেতা দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী সে-সব যুক্তি না মানিবার কোন কারণ ছিল না। তবু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শ না করিয়া ঢাকায় মোটেই না আসিয়া, ঢাকার পথে পিন্ডি হইতে করাচি পেঁছিয়া, স্বয়ং 'ব্রডকাস্ট টু দি নেশন' না করিয়া রেডিও এনাউন্সারের মুখে একটি স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি কেন করাইলেন, তার কারণ শুধু রহস্যজনক নয়, তার পরিণামও বিপজ্জনক। গোটা ব্যাপারটাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিঘোষিত নীতি-বিরোধী ও আজ পর্যন্ত অনুসৃত তাঁর কার্য-কলাপের সহিত বেখাপ্পা হইয়াছে।

এতে কার্যবিধি, মানে আইন পরিষদের প্রসিডিওর‍্যাল রুলও লংঘন করা হইয়াছে। দুনিয়ার সমস্ত পার্লামেন্টের নিয়মানুসারে এবং এল. এফ. ও. র রুল অনুসারে প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদের 'সামনিং' ও 'প্রোরোগেশনের'ই মালিক। এ্যাডজোর্নমেন্টটা প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারভুক্ত নয়। পার্লামেন্ট একবার আহুত হইয়া গেলে প্রেসিডেন্ট শুধু প্রোরোগই করিতে পারেন। প্রেসিডেন্টের সে এখতিয়ার শুরু হয় পার্লামেন্ট বসিবার পরে। তার আগে নয়। এ অবস্থায় ৩রা মার্চের আইন পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখাটা আইনের দিক হইতেও অশুদ্ধ হইয়াছে।

আইন পরিষদ স্থগিত করিয়া প্রেসিডেন্ট পার্টিলিডারদের একটি সম্মিলনী আহবান করিয়াছেন। এই কাজটি মারাত্মকরূপে অনিয়মতান্ত্রিক হইয়াছে। এতে নির্বাচিত পার্লামেন্টকে বাই-পাস করা হইয়াছে। এটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহজ ও সাধারণ পন্থা ত নয়ই, তার উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিজ মুখে ঘোষিত গণতান্ত্রিক সমাধানেরও বিপরীত। পাঠকগণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন পার্টি নেতাদের একটি সম্মিলনীর প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে কেউ কেউ দিয়াছিলেন। তার উত্তরে প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, নির্বাচনের আগে কেউই নেতা নন, সবাই ব্যক্তি। ব্যক্তি যত বড়ই হউন, ভোটারগণের ভোট না পাওয়া পর্যন্ত কেউই জনগণের পক্ষে কথা বলিবার অধিকারী নন। আজ নির্বাচন শেষ হইয়াছে। কোন্

নেতা জনগণের প্রতিনিধি, সে প্রতিনিধিত্বের আকার ও পরিমাণ কতটুকু, নির্বাচনের মাধ্যমে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টরূপে তা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যা কিছু আলোচনা, যত কিছু দেন-দরবার, যতবার ইচ্ছা এ্যাড-জোর্নমেন্ট, আইন পরিষদেই হইতে পারিত। যে সাধু উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩রা মার্চের অধিবেশন বাতিল করিয়াছেন, সেটা না করিয়া ৩রা মার্চের বৈঠক ঠিক রাখিয়াই সে সাধু উদ্দেশ্য সফল করা কি অধিকতর সহজ হইত না ? প্রেসিডেন্ট যদি দুই তিন দিন আগে নিজে ঢাকা আসিতেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সব পার্টিলিডারকে এখানে ডাকিতেন, তাঁদের লইয়া ৩রা মার্চের আগে সম্মিলনীতে বসিতেন, তবে তাঁর সাধু উদ্দেশ্য পূরণের একটা চেষ্টা হইয়া যাইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি প্রেসিডেন্টের এই মহৎ চেষ্টা সফল না হইত, তবে তিনি মেজরিটি-লিডার ভাবী প্রাইম মিনিস্টারকে বলিতে পারিতেন, আইন পরিষদের ফর্মাল উদ্বোধন ও স্পীকার-ডেপুটি নির্বাচনের পরে আবার কয়েক দিনের জন্য আইন পরিষদ স্থগিত রাখিয়া লিডারদের লইয়া আবার তিনি সম্মিলনীতে বসিতে চান। প্রেসিডেন্টের এই সাধু প্রস্তাবে মেজরিটি পার্টির নেতা নিশ্চয়ই রাযী হইতেন। বস্তুতঃ শেখ মুজিব একাধিকবার এবং শেষবারের মত ২৮শে ফেব্রুয়ারির প্রেস কনফারেন্সে এই কথাই বলিয়াছেন। তাতে দেখা যাইতেছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ যদি নাও নিতেন, তথাপি শেখ মুজিব মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে নিজেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করিতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইরূপ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেশীর ভাগকে তিনি স্বমতে আনিতে না পারিতেন, ততদিন শুধু নিজের পার্টির মেজরিটির জোরে কোনও শাসনতান্ত্রিক সংবিধান পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর চাপাইয়া দিতেন না। এই ধরনের আলাপ-আলোচনার ফলে যদি নির্ধারিত একশ বিশ দিনে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত না হইত, তবে সে মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়ার ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টের ছিল, এতদিনে তাও বুঝা গেল।

আইন পরিষদ চলিতে থাকাবস্থায় নেতৃসম্মিলনী, আর পরিষদের বৈঠক বাতিল করিয়া নেতৃ-সম্মিলনীর মধ্যে যে মৌল পার্থক্য রহিয়াছে, উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টকে নিশ্চয়ই তা বুঝাইয়া দেন নাই। তার ফলে গণতন্ত্রের কি ক্ষতিটা হইল, আর জাতির জন্যই বা কি সংকটের উদ্ভবটা হইল, প্রেসিডেন্ট তা আগে বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই এটা করিতেন না। আইন পরিষদ ৩রা মার্চের বদলে কবে বসিবে প্রেসিডেন্ট তা বলেন নাই। নেতৃ-সম্মিলনীর ঘোষণার প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন যে, এই সম্মিলনী সফল হইলে সপ্তাহ দুয়েকের

মধ্যে পরিষদের বৈঠক না ডাকার কোনও কারণ তিনি দেখিতেছেন না। তার মানে, নেতৃ-সম্মিলনীর সাফল্য-নিষ্ফলতার উপরই পরিষদের বৈঠক নির্ভর করিতেছে।

মেজরিটি পার্টির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এই সম্মিলনীতে বসিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি এটাকে 'বন্দুকের নলের মুখে আহূত সম্মিলনী' আখ্যা দিয়াছেন। মর্মার্থের দিক দিয়া ও পরিবেশের বিচারে শেখ মুজিবের এই উক্তি মোটেই অতিশয়োক্তি নয়, আশা করি প্রেসিডেন্ট তা বুঝিতে পারিবেন। নেতৃ-সম্মিলনীর সাফল্যকে আইন পরিষদ ডাকা-না-ডাকার শর্ত করার অর্থ ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? সম্মিলনীর এই অভীপ্সিত সাফল্যটা কি? কাদের উপর এই সাফল্য নির্ভর করিতেছে? যাঁদের বয়কটের হুমকিতে প্রেসিডেন্ট পরিষদের নির্ধারিত তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য বতিল করিলেন, বয়কটের কারণটাও তাঁরা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁদের কথামত আইন পরিষদ স্থগিত রাখিয়া তাঁদের সাথেই সম্মিলনীতে বসিতে বলা এবং সেই সম্মিলনীর সাফল্যকেই পরিষদ ডাকার শর্ত করার অর্থ কি বয়কট-ওয়ালাদের দাবি মানিয়া লওয়ারই পরোক্ষ নির্দেশ নয়? এমন নির্দেশ কি গণতান্ত্রিক হইয়াছে? এটাকে মাইনরিটির নিকট মেজরিটির নতি স্বীকারের নির্দেশ বলিতে প্রেসিডেন্ট সম্ভবতঃ রাযী হইবেন না। পরিষদের তারিখ বাতিলের ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট 'পশ্চিম পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির বয়কটের উল্লেখ করিয়াছেন। এটাকেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কনফ্রন্টেশন আখ্যা দিয়াছেন। পরিস্থিতিটাকে জটিলও বলিয়াছেন।

এটা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এতদিনের সুর নয়। নতুন সুর। পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ান ইউনিট ভাংগিয়া দেওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান নামে কোনও রাষ্ট্র সংস্থা নাই। তার স্থলে সেখানে হইয়াছে চারটি প্রদেশ। তার উপর ট্রাইবাল এরিয়ার সাতজন প্রতিনিধি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে কার্যতঃ পশ্চিমাঞ্চলে প্রদেশ পাঁচটি। এই পাঁচ প্রদেশের মধ্যে মাত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের মেজরিটি মেম্বর বয়কটের হুমকি দিয়াছিলেন। বেলুচিস্তান ও ট্রাইবাল এরিয়ার সকলে এবং সীমান্ত প্রদেশের মেজরিটি পরিষদে যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। অনেকে ঢাকায় আসিয়াও পড়িয়াছিলেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মাইনরিটি দলেরাও আসিতেছিলেন। তথাপি সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মেজরিটির বয়কট ধরিয়া নিলেও পাকিস্তানের ছয়টি প্রদেশের চারটিই পরিষদে বসিতে রাযী ছিলেন। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট

পরিস্থিতিটাকে দুই পাকিস্তানে কনফ্রনটেশন মানে যুদ্ধ মোকাবিলা আখ্যা দিলেন কেন? নিশ্চয়ই তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের 'ব্যাস্টওন-অব-পাওয়ার' বলিয়া মানিয়া নেন নাই। তথাপি তিনি এটাকে দুই উইং-এর কনফ্রনটেশন বলিয়াছেন এইজন্য যে, দুইটা উইংকে তিনি দুইটি সার্বভৌম রিজিওন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে তিনি এই দুই সার্বভৌম রিজিওনের একত্রে বসবাস করিবার চুক্তি আখ্যা দিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর আলোচ্য ঘোষণার জোর দিয়াই বলিয়াছেনঃ 'আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, আমাদের শাসনতন্ত্র হইবে একত্রে বসবাস করিবার চুক্তি।'

কথাটা সত্য। সত্যই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বরাবর এই একই কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের এক ইউনিট ভাংগিয়া চারটি প্রদেশ ও আরেকটি স্বতন্ত্র এলাকাও তিনিই করিয়াছেন। তাতে চুক্তির পক্ষ আর দুইজন নাই। হইয়াছে ছয়জন। এই ছয়জনের মধ্যে মাত্র দুইজনের প্রতিনিধি পিপলস পার্টি। কাইউম লীগ কোন পক্ষেরই প্রতিনিধি নয়। অথচ প্রেসিডেন্ট মাত্র দুইটি প্রদেশের প্রতিনিধির দাবিমত পরিষদ স্থগিত করিলেন। চারটি প্রদেশের মত তিনি বিচারই করিলেন না। তিনি একথাটা চিন্তা করিলেন না যে, পিপলস পার্টি শুধু সারা পাকিস্তানেই মাইনরিটি পার্টি নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও তারা মাইনরিটি। কারণ তথাকার পাঁচটি প্রদেশের মাত্র দুইটিরই তারা প্রতিনিধি। এই অবস্থায় পিপলস পার্টি শুধু বাংলাদেশেরই বিরোধিতা করিতেছে না, পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি প্রদেশেরও বিরোধিতা করিতেছে। কাজেই এই পরিস্থিতিকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মোকাবিলা আখ্যা দেওয়ার কোনও কারণ নাই।

তথাপি তর্কস্থলে যদি বর্তমান পরিস্থিতিটাকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের কনফ্রনটেশন ধরিয়াও লওয়া যায় এবং পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ মিটানোই যদি প্রেসিডেন্ট-প্রস্তাবিত নেতৃ-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে আন্তঃআঞ্চলিক বৈঠক হিসাবে এটা এখন অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের অপর একমাত্র নিমন্ত্রিত নেতা নূরুল আমিন সাহেবও এই বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। এর পরেও প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত নেতৃ-সম্মিলনীর যদি কোন কাজ থাকিয়া থাকে, তবে সেটা হইবে পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচ প্রদেশের আভ্যন্তরীণ কনফ্রনটেশন মিটাইবার চেষ্টা। তাঁরা যদি শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন, তবেই উঠিবে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কনফ্রনটেশনের কথা। পূর্ব

পাকিস্তানীরা সব একমত হওয়ার পরেও যখন সে মত পশ্চিম পাকিস্তানের উপর বাধ্যকর হয় নাই, তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা সকলে একমত হইলেও সেটা নিশ্চয়ই পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর বাধ্যকর হইবে না। এ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের প্রস্তাবিত দুইটি শাসনতন্ত্রের যুক্তি খুব জোরের সংগেই আসিয়া পড়ে। সেই সংগে আমার প্রস্তাবিত 'ডুয়েল সেন্টারের' কথাটাও প্রেসিডেন্ট ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

পরিস্থিতিটা সত্যই জটিল। কিন্তু এই জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে পরিষদের বৈঠক বাতিলের আগে নয়, পরে। সুতরাং এই জটিলতার সমাধানের একমাত্র উপায় প্রস্তাবিত নেতৃ-সম্মিলনীর আগে আইন পরিষেদর অধিবেশন আহবান করা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক বাধা পার হইয়াছেন। আশা করি, এই বাধাটাও তিনি পার হইবেন।

ইত্তেফাক. ৭ই মার্চ, '৭১

৬৪

আকাশের পানে চাই সেই সুরে গান গাই একেলা বসিয়া

সাবেক এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ সম্প্রতি দুইটি মহামূল্যবান কথা বলিয়াছেন। ঢাকা ত্যাগের পথে তিনি বলিয়াছেনঃ 'গতকাল যা বৈধ ছিল, আজ আর তা বৈধ নাই। আজ যা বৈধ আছে, আগামীকাল তা থাকিবে না।' করাচি পেঁছিয়া ঐ কথারই রেশ ধরিয়া তিনি বলিয়াছেনঃ 'পাকিস্তানের দুই অঞ্চল মনের দিক দিয়া ইতিমধ্যেই ভাগ হইয়া গিয়াছে। শেখ মুজিবই দুই অঞ্চলের দ্রুত ছিদায়মান বন্ধনের শেষ সুতা। স্বাধীন বাংলার প্রবল দাবির মুখে তিনি চরম ধৈর্য দেখাইতেছেন।'

দুইটি কথাই খাঁটি সত্য। আঞ্চলিক সম্পর্ক ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এর চেয়ে নিখুঁত নির্ভুল বর্ণনা আর হইতে পারে না। শেখ মুজিবকে যে-সব পশ্চিমা নেতা বিশ্বাস করিতেছেন না, তাঁরা পাকিস্তানের ভবিষ্যতেই বিশ্বাস করেন না। যে শাসকগোষ্ঠী জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেছেন না, তাঁরাই পাকিস্তান ভাংগিয়া দিতেছেন। এয়ার মার্শাল সত্যই বলিয়াছেনঃ আজ যা সম্ভব, কাল আর সম্ভব থাকিবে না। পাকিস্তান অটুট রাখিবার দৃঢ় ও আন্তরিক বাসনা থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব আর বেশিদিন এ ভাংগন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। কারণ শেখ মুজিব গণ-নেতা। জনমতই তাঁর মত। নেতার মতই তিনি জনমত নিয়ন্ত্রিত করেন সত্য, কিন্তু প্রতিনিধির মতই তিনি জনগণের রায় মানিয়াও চলেন। তাঁর মত বলিষ্ঠ নেতার জন্যও সময় বহিয়া যায়। তিনিও আজ যা পারিবেন, কাল তা পারিবেন না। যে সুযোগ একবার যায়, তা আর ফিরিয়া আসে না।

ব্যক্তি জীবনে এটা যতখানি সত্য, জাতির জীবনে এটা তার চেয়ে বেশি সত্য। ব্যক্তি-জীবনে ভুলের সংশোধন আছে, জাতির জীবনে ভুলের সংশোধন নাই। এটা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে বলিয়াই তা সকলের নযরে পড়ে না। যারা দেখে, তারাও বুঝে না। বুঝিলেও সময় থাকিতে বুঝে না। পরেরটা দেখিয়া আমরা শিখি ত না-ই, নিজেরটায়ও আমরা শিখি না। তার চেয়েও পরিতাপের বিষয় এই যে, গতকাল যে ভুল করিয়াছিলাম, যে ভুল আজ বুঝিতে পারিয়াছি, ঠিক তেমনি ভুল আজও করিয়া

ফেলিতেছি। গতকালের ভুল বুঝিতে পারিয়াও আজ সে উপলব্ধি কাজে লাগাইতে পারি না।

ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠ বলিয়াই দুনিয়ার ইতিহাস হাতড়াইবার দরকার নাই। সুদূর অতীতে যাইবারও আবশ্যকতা নাই। সর্বাধুনিক ব্যাপারটাই ধরা যাউক। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে ২৮শে ফেব্রুয়ারি যেটা সত্য ছিল, ১লা মার্চ হইতে সেটা আর সত্য নাই। ফলে আমাদের জাতীয় পরিষদ ৩রা মার্চ যেটা করিতে পারিত, ২৫শে মার্চ আর সেটা করিতে পারিবে না। একটু পিছন ফিরিয়া তাকান। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ যেটা হইতে পারিত, ঐ তারিখের পরে আর তা হওয়া অসম্ভব ছিল। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের আগে যা হইতে পারিত, ঐ তারিখের পর সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারও মাত্র বছরখানেক আগে ১৯৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থা যা ছিল, ঐ দিনের পরে অবস্থা তেমন ছিল না। ১৯৫৪ সালে যে সুযোগ আসিয়াছিল, তা আর কোনও দিন আসে নাই। সকল কথার শেষ কথা, ১৯৪৭ সালে যে সুযোগ আমাদের সামনে ছিল, তাও আর ফিরিয়া আসে নাই। এইসব ঘটনা-পরম্পরার দিকে তাকাইলেই দেখা যাইবে, আগের দিন অবস্থা যা ছিল, পরের দিন তা ছিল না। প্রতিদিনই পরিস্থিতি জটিলতর হইয়াছে। প্রতি মোচড়ে সমস্যা আরেক পেঁচ মযবুত হইয়াছে। গেরো আটিয়া বসিয়াছে। সমাধান কঠিনতর হইয়াছে। এটা যে আমরা কেউ বুঝি নাই, তা নয়। অনেকেই বুঝিয়াছি। কিন্তু কেউ সে ভুল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি নাই। বরঞ্চ বিস্ময়ের কথা এই যে, পুরাতন ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া এবং একই রকমের নতুন ভুল করিয়া চলিয়াছি। গতকালের সহজ কাজটাই যে আজ কঠিন হইয়াছে, এটা যেমন বুঝিয়াছি, আজকার এই কঠিন কাজটাই যে আগামীকাল কঠিনতর হইবে, তাও বুঝিয়াছি। তবু সাবধান হই নাই।

ভুলের খেসারত দিতে হয়। হক পাওনা সুদে-আসলে পরিশোধ করিতে হয়। পাওনা ও সুদের কথায় আমরা 'মহাজনের' পাওনার কথাই ভাবিয়া থাকি। খাতকেরও যে একটা পাওনা আছে মহাজনের কাছে এবং সে পাওনারও যে একটা সুদ আছে, মহাজনরা তা ভুলিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মযলুমদের কাছে যালেমদের যে একটা ঋণ আছে, যালেমরা একদিনের তরেও তা ভুলে না। তারা ভাবে, মযলুমদের উপর তারা যে যুলুম করিতেছে, সুযোগ পাইলেই মযলুমরা তাদের উপর তেমনি যুলুম করিবে। যুলুমের অবসান হইলে আর ভেদাভেদ শোষণ থাকিবে না, আজিকার

যালেমরা তা বিশ্বাস করে না। তাদের বিশ্বাস, যুলুম থাকিবেই, হয় আমি করিব তোমাকে, নয় তুমি করিবে আমাকে। তাই কায়েমী স্বার্থীরা 'স্টেটাসকে' বজায় রাখিবার এমন মরণ-পণ চেষ্টা করে। তারা জান দেয়, তবু ঘর দেয় না; শির দেয়, তবু আমামা দেয় না। দুনিয়ার ইতিহাসে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের বদলে রক্তাক্ত বিপ্লবের সংখ্যা তাই এত বেশি।

অথচ সত্য কথা এই যে, মযলুমরা যালেমের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে, সেটা পাল্টা যুলুম করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য নয়। শোষিতেরা শোষকের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে, সেটা পাল্টা শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে নয়। যুলুম ও শোষণ চিরতরে বন্ধ করিবার জন্য। তবু যালেম ও শোষকেরা এই সত্যের এমন প্রখর আলোটাও দেখিতে পায় না। কারণ তারা স্বার্থে অন্ধ। তারা বুঝে না যে, তাদের যুলুমের শিকার শুধু মযলুমরাই নয়, তারা নিজেরাও সে যুলুমের শিকার। ভুঞ্জিত স্বার্থের প্রভু তারা নয়, ভুঞ্জিত স্বার্থটাই তাদের প্রভু। তারা তাদের বিপুল ধনের মালিক নয়। ঐ বিপুল ধনই তাদের মালিক। তারা সম্পদ খাটায় না, সম্পদই তাদেরে খাটায়। তারা শুধু মদই খায় না, মদও তাদেরে খায়।

পশ্চিমা যালেম ও শোষকেরা তাই সেই যে যুলুম ও শোষণের নেশায় মাতাল হইল, সে মাতলামি আর কাটিল না। ভোট দিয়া জনগণ যে পাকিস্তান কায়েম করিল, ভোটের মাধ্যমে সে পাকিস্তান ভোগ করিতে জনগণকে দিল না এই যালেমচক্র, এই শোষকগোষ্ঠী। এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের সবটুকু ভবিষ্যৎ, এমন বিপুল সম্পদশালী দেশের সবটুকু ঐশ্বর্য, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের আগুনে জ্বালাইয়া দিল। পরিণামের কথা ভাবিল না। সে চিন্তাও করিতে পারিল না। পাকিস্তানী জনতার বিপুল মেজরিটি যে পূর্বাঞ্চলে বাস করে, তাদের ভোটেই যে পাকিস্তান আসিয়াছে, তারাও যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ও দেশের সম্পদের সমান অধিকারী, সে কথা তাদের মনেই পড়িল না। অবশেষে যেদিন মনে পড়িল, ততদিনে যালেমের ও শোষকের মনোবিকার তাদেরে পাইয়া বসিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা যখন এই অন্যায় অসংগত আঞ্চলিক যুলুম ও শোষণের প্রতিবাদ করিল, তখন কিছুদিন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও পাকিস্তানী সংহতির নামে শিশুরাষ্ট্রের দোহাই দিয়া চালাইল। এইভাবে রাষ্ট্রের ষোল আনা ক্ষমতা ও অধিকার যখন তাদের কুক্ষিগত হইল, দেশের ষোল আনা সম্পদ ও ঐশ্বর্য যখন তাদের পেটে পড়িল, তখন তারা ক্ষমতার দাপটে দাম্ভিক ও অতৃপ্ত ক্ষুধার পেটুক হইয়া পড়িল। তারা অবিরত চীৎকার করিতে লাগিল : 'আরও ক্ষমতা চাই', 'আরও

খাবার চাই'। ক্ষমতার ক্ষুধা ও পেটের ক্ষুধার তৃপ্তি নাই। কারণ এ দুইটাই নেশা।

এইভাবে ক্ষমতা ও সম্পদ যত বাড়িয়াছে, ঐগুলি হারাইবার ভীতিও তাদের তত বাড়িয়াছে। পূর্বাঞ্চলকে তারা শোষণ ও বঞ্চনা যত বেশি করিয়াছে, পূর্বাঞ্চলের প্রতিশোধের সম্ভাবনায় তারা তত বেশি সন্ত্রস্ত হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলে নেতারা যত বলিয়াছেন, 'আমরা শোষণের অবসান চাই, প্রতিশোধ চাই না', এঁদের কথা ওঁরা তত অবিশ্বাস করিয়াছেন। উল্টা তাঁদের পাপী-মন আশংকায় কাঁপিয়াছে। কল্পনায় শুনিয়াছে নজরুলের হুংকার ঃ

আসিতেছে সেইদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে
দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।

এই কারণেই ছয়-দফার মধ্যেও তারা প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র দেখিতেছে। ছয়-দফার মধ্যে যতই স্পষ্ট ভাষায় লেখা থাকুক, আঞ্চলিক বঞ্চনা, শোষণ বন্ধ হইবে, দুই অঞ্চল যার তার সম্পদ ভোগ করিবে, শেখ মুজিব যতই বলিতেছেন, তিনি শুধু বাংলাকে বাঁচাইতে চান, পশ্চিমাঞ্চলকে মারিতে চান না, পশ্চিমারা তাতে আশ্বস্ত হইতেছেন না। তাঁরা বুঝিতেই পারিতেছেন না যে, শেখ মুজিব যদি গত তেইশ বছরের বঞ্চনা-শোষণের প্রতিশোধ নিতেই চাহিতেন, তবে দুই হিসাবের খাতা খুলিতে বলিতেন না। নির্বাচনের আগে দুই খাতার কথা বলিলেও নির্বাচনের পরে এক খাতার কথাই বলিতেন। তিনি আজ জাতীয় পরিষদে একক মেজরিটি। পশ্চিমাঞ্চলের উপর প্রতিশোধ নিবার ইচ্ছা থাকিলে নির্বাচনের পরে ছয়-দফার সংশোধন করিতেন তিনি নিজেই। ছয়-দফা সংশোধনের কথা পশ্চিমাদের বলিতে হইত না। পশ্চিমা নেতারা কতবার দশ বছরের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ওয়াদা করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে বিধানও করিয়াছেন। হউক না হউক, শেখ মুজিব আজ সত্য সত্যই তা প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তাঁরা যেটা দিয়াছিলেন ধাপ্পা হিসাবে, শেখ মুজিব সেটাই করিতে পারিতেন কার্যকরী। তেইশ বছরের ইমব্যালেন্স দশ বছরে দূর করিতে হইলে সামনের দশ বছরের ষোল আনা জাতীয় সম্পদ পূর্বাঞ্চলে খাটাইলেই শুধু চলিবে না, অতীতে পশ্চিমাঞ্চলের পেটে যা কিছু ঢুকিয়াছে, তারও কিছুটা উগলাইয়া আনা দরকার হইবে। পশ্চিমাদের কথামতই শেখ মুজিব তা পারিতেন। রাজধানী ঢাকায় আনিয়া সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত করিয়া পশ্চিমাদের 'স্ট্রং সেন্টারে'র সাধ চিরতরে মিটাইতে পারিতেন। কিন্তু শেখ মুজিব তা করেন নাই। কারণ

তিনি দুই অঞ্চলের মধ্যে শোষণ-বঞ্চনার দুশমনির স্থলে সাম্য ও সমতার দুস্তির বুনিয়াদে পাকিস্তানকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ও পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থীরা শেখ মুজিবের এই দূরদর্শী ও সরল প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলেন না। প্রতিশ্রুতি ভংগ যাঁদের স্বভাব, তাঁরা পরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিবেন কিরূপে? জাতীয় পরিষদের কক্ষে দাঁড়াইয়া নিজেদের মনের কথা তাঁরা বলিতে পারেন না। দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসী সে গোপন কথা শুনিয়া ফেলিবে যে। তাই তাঁরা শেখ মুজিবের কানে দুইটি প্রাণের কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। দেশের স্বার্থে বিশ্বাসী গণ-নেতা শেখ মুজিব কান-কথা শুনিতে রাযী হইলেন না। জনগণের ও রাষ্ট্রের স্বার্থের কথায় গোপনীয়তা কেন?

কিন্তু কে শুনে কার কথা? শেখ মুজিবকে তাঁদের গোপন কথা শুনিতেই হইবে। না শুনিলে জাতীয় পরিষদের বৈঠক যেমন বাতিল করা হইয়াছে, অনেক কিছুই তেমনি বাতিল করা হইবে। বিদেশী উপদেষ্টা উঠাইয়া নেওয়া হইবে, বিদেশী সাহায্য বন্ধ করা হইবে, আর্থিক শেকেঞ্জায় পূর্বাঞ্চলকে পিষিয়া মারা হইবে। তাতেও যদি এরা না মরে অথবা আত্মসমর্পণ না করে, তবে শেষ ও শ্রেষ্ঠ শক্তি অস্ত্রের ভাষায় কামারের এক ঘা ত আছেই। এটা গত তেইশ বছরের সনাতন ইতিহাস। প্রশাসন ক্ষমতা ও অস্ত্রের শক্তির দ্বারা এরা পাকিস্তানের সংহতি স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন বলিয়াই সংহতি হইল না। হইল যে না, সময় থাকিতে তাও বুঝিল না। কারণ এদের কাছে পাকিস্তানের স্বার্থের চেয়ে নিজের ব্যক্তি স্বার্থই বড়। তাই শেখ মুজিব ছাড়া, তার মানে বাংলাদেশ ছাড়া, আর কেউ পাকিস্তানের স্থায়ী সংহতির কথা ভাবিতেছেন না। ফলে পাকিস্তানের আকাশে সন্ধ্যা নামিতেছে। আঞ্চলিক শ্রেণী-স্বার্থের যূপকাষ্ঠে একটা বিপুল সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের বলিদানের এমন নযির দুনিয়ায় আর একটিও নাই। তাই সে রাষ্ট্রের মেজরিটি পূর্বাঞ্চলের একচ্ছত্র নেতা ও মুখপাত্র শেখ মুজিব ৩২ নং বুড়িগংগার তীরে বসিয়া পশ্চিমাকাশে অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা সংগীতের ভাষায় গাহিতেছেন:

আকাশের পানে চাই
সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া

ইত্তেফাক, ১৪ই মার্চ, '৭১

৬৫

যে গিরো দিয়াছ নিজ হাতে তা খুলিতে হইবে তোমাকেই

মুজিব-ইয়াহিয়া মোলাকাত সফল হউক, সবারই এ প্রার্থনা। এ মোলাকাতের সাফল্যের উপর শুধু দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে না, এর আশু শান্তি-শৃংখলাও নির্ভর করিতেছে। শুধু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে না, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তাও নির্ভর করিতেছে। একটু গভীরভাবে তলাইয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দরবারের নযির ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাইবে। সুদূর ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও সাম্প্রতিককালের গান্ধী-জিন্না মোলাকাতের চরিত্র হইতেও আজিকার ইয়াহিয়া-মুজিব মোলাকাতের চারিত্রিক পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য একদিকে করিয়াছে এই মোলাকাতকে যেমন সাংঘাতিক পরিণাম-বাহক, অপরদিকে করিয়াছে এটাকে তেমনি সহজ। বস্তুতঃ মহাগুরুত্বপূর্ণ এই দরবারের ইস্যুটি এতই সহজ যে, এই দরবার এতটা লম্বা হইবার কথা নয়। অতএব, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইস্যুর জটিলতা দরবারের মুদ্দত লম্বা করিতেছে না, অন্য কারণে এটা লম্বা হইতেছে।

বর্তমান মোলাকাতের ইস্যু এত সহজ যে, এতে আলাপ-আলোচনা, দেন-দরবার ও বাদবিতণ্ডার কিছু নাই। শুধু আছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার করণীয় কাজ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার চিন্তা করিবার এবং নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার অনেক কিছু ছিল ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চের আগে পর্যন্ত। ঐ আলাপ-আলোচনা-দেন-দরবার তিনি পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও পরম দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছেন। তার ফলস্বরূপ তিনি ঐ তারিখে 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' নামে একটি শাসনতন্ত্রের কাঠামো ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর প্রেসিডেন্টের একমাত্র করণীয় ছিল ঐ কাঠামো অনুসারে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। সেটিও তিনি অসাধারণ তৎপরতার সাথে সমাধা করিয়াছেন। আদর্শ শান্তি-শৃংখলার মধ্যে সে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। দেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সব আইন পরিষদ গঠিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটিমাত্র কর্তব্য অবশিষ্ট ছিল জাতীয় পরিষদের দিন-তারিখ ও স্থান ঘোষণা করা। গত ৩রা মার্চ

ঢাকায় এই অধিবেশন তিনি আহবান করিয়াছিলেন। আপাততঃ প্রেসিডেন্টের আর কোনও কর্তব্য ও দায়িত্ব বাকী ছিল না। ৩রা মার্চের পর একশ বিশ দিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আরামে ও স্বচ্ছন্দে অন্য কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন। একশ বিশ দিন গত হইবার পর আবার প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের দরকার হইত। ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি তা অনুমোদন বা অন্য কিছু করিতে পারিতেন। শাসনতন্ত্র রচনা সমাপ্ত না হইলে তিনি একশ বিশ দিনের মেয়াদ বাড়াইয়াও দিতে বা অন্য কিছু করিতেও পারিতেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজের রচিত এই এল. এফ. ও. নির্ধারিত পথে চলেন নাই। শাসনতন্ত্র রচনার কাজটি জাতীয় পরিষদের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া সে দায়িত্বও তিনি নিজের মাথায় লইলেন। এ সম্পর্কে নির্বাচিত দলীয় নেতাদের সাথে তিনি আবার দেন-দরবার শুরু করিলেন। পরিষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতার আলাপ-আলোচনাকে বলে লবিইং। পরিষদ বসি-বার আগেই এ কাজ শুরু করিলে তাকে বলা যায় দূতিয়ালি। এ কাজ আর যাকেই মানাউক, দেশের প্রেসিডেন্টকে মানায় না। এ কাজে ঝুকিও অনেক। গোড়াতে উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক, ব্যক্তিটি যতই নিরপেক্ষ হউন, এই ধরনের দেনদরবার পরিণামে তাকে অন্ততঃ মনের দিকে পক্ষপাতী করিয়া তুলে। বিরোধী পক্ষগণের মধ্যে এক পক্ষের কথা ন্যায়সংগত ও অপরপক্ষের কথা অন্যায় মনে হইতে পারে। এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সবাই মানুষ। কেউই ফেরেশতা নন। দেশের প্রেসিডেন্টও তাই। এই কারণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দূতিয়ালি-ঘটকালির দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল না। হয়ত খুব সাধু উদ্দেশ্যেই তিনি করাচি-লারকানা-ঢাকা দৌড়াদৌড়ি করিয়াছেন। হয়ত তিনি প্রেসিডেন্টের গর্ব-অহংকার ভুলিয়া দেশের কল্যাণের জন্যই এ-সব করিয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ বড় অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিতে পারে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেলাও ঠিক তাই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোস ঘটাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিরপেক্ষতা হারাইয়াছেন। এক দলের পক্ষে ও অপরাপর দলের বিপক্ষে গিয়াছেন। শুধু মনের দিক হইতে নয়, কাজের দিক হইতেও।

এইভাবে ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের যে বৈঠক তিনি মুল-তবী করিয়াছেন, সেটা শুধু পক্ষপাতমূলক, বেআইনী এল. এফ. ও.-বিরোধীই হয় নাই, তা গণতন্ত্র-বিরোধীও হইয়াছে। শুধু তাও নয়। ৩রা মার্চের বৈঠক বাতিল করিয়া পরিস্থিতি যেভাবে ওলট-পালট করা হইয়াছে, ২৫শে মার্চের

ডাকা বৈঠক তা সংশোধন করিতে পারে নাই। ঘটনাপ্রবাহ নদীর স্রোতের মতই বহিয়া চলিয়াছে। কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১লা মার্চ ৩রা মার্চের বৈঠক বাতিল করিয়া ঘটনার স্রোতের সদরঘাটে যে হাতিয়ার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ৬ই মার্চ ওটা সেখানে ছিল না। ওটা ভাসিতে-ভাসিতে চানপুর চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই ১লা মার্চ বাতিল করিলাম, আর ৬ই মার্চ আরেকটা তারিখ দিলাম, ব্যাপারটা আর অত সোজা ছিল না। বাতিল করা যত সহজ পুনর্বহাল করা তত সহজ নয়। কাজেই ২৫শে মার্চের বৈঠক সফল করিতে হইলে প্রেসিডেন্টকে সদরঘাট হইতে চানপুর যাইতে হইবে। শেখ মুজিবের চারটি শর্ত মানিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য ১লা মার্চের পরেই এই চারটি শর্তের কারণ উদ্ভব হইয়াছে। এই জটিলতার স্রষ্টা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজে। সুতরাং তার মীমাংসাও করিতে হইবে তাঁকেই। ৬ই মার্চের প্রেসিডেন্টি বক্তৃতা সে কারণ আরও মযবুত করিয়াছে। ২রা মার্চ হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইস্যুর সামরিক সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। ৬ই মার্চের বেতার ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ৩রা মার্চের বৈঠক বাতিলসহ সকল গণ্ডগোলের জন্য পরিষদের মেজরিটি পার্টির নেতার 'অনমনীয় মনোভাব'কে দায়ী করিয়াছেন। এ ব্যাপারে তিনি পিপলস পার্টির নেতাদের ভাষাকে নিজের ঘোষণার ভাষা করিয়াছেন। তাতে প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা উপযোগী নিরপেক্ষতা তিনি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছেন। তার উপর তিনি শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে অনাবশ্যকরূপে এল. এফ. ও-র তলওয়ার ঘুরাইয়াছেন। পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ না বলিয়া সামরিক বাহিনীকেই সে রক্ষাকবচ বলিয়াছেন। মোট কথা, ৬ই মার্চের এই একটিমাত্র ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের আবশ্যকতা উড়াইয়া দিয়াছেন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত পার্লামেন্টকে এমন অমর্যাদা-অসম্মান কোনও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট করিতে পারেন না। পারে শুধু জঙ্গী আইন। কাজেই ইয়াহিয়া গত পনর দিন যা করিয়াছেন, তা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টরূপে করেন নাই, করিয়াছেন চীফ মার্শাল ’ল এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে, যে নামেই কথা বলিয়া থাকুন না কেন ?

এই কারণেই জাতীয় পরিষদের 'লিডার অব দি হাউস' পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদে যোগ দেওয়ার শর্তস্বরূপ মার্শাল ল' প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন। তাঁর চারটি দাবির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় দাবি। বাকি তিনটির দুইটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মানিয়া লইয়াছেন। অবশিষ্ট শর্ত

ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিও কার্যতঃ মানিয়া লইতে প্রেসিডেন্ট রাযী আছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। তর্ক উঠিতে পারে শুধু মার্শাল ল' প্রত্যাহার লইয়া। মার্শাল ল' থাকা অবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছামত সরকার চালাইতে পারেন না, একথা যেমন ঠিক, মার্শাল ল' উঠিয়া গেলে জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকিবেন না, তাতে ফর্মাল ট্রান্সফার-অব-পাওয়ারে জটিলতার উদ্ভব হইতে পারে, এ কথাও ঠিক। তাই পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ও মার্শাল ল' প্রধানের মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া অত্যাবশ্যক, এটা সহজেই অনুমেয়। কাজেই মুজিব-ইয়াহিয়ার মোলাকাতের এতদিনের লম্বা বৈঠকে এই সমস্যাটারই সমাধান বাহিরের চেষ্টা চলিতেছে, এটা ধরিয়া নেওয়া যায়। অন্য কিছু আলোচনার নাইও। ছয়-দফা যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা-বিরোধী নয়, শেখ মুজিব গত তিনটি সপ্তাহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ডিফ্যাক্টো সরকার চালাইয়া তা প্রমাণ করিয়াছেন। এই একুশ দিনে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকার বলিতে কিছু নাই। তবু শেখ মুজিব ছয়-দফার বাইরে এক ইঞ্চি জমিতেও পদক্ষেপ করেন নাই। পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা ব্যাপারে তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। কারফিউ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করিয়াছেন। বিচারের ট্রাইবিউন্যালও তিনি তাঁদের কাছে চাহিয়াছেন। স্টেট ব্যাংক হাতে নিয়াও তিনি ছয়-দফার খেলাফ কাজ করেন নাই। গোটা পাকিস্তানের এক কারেন্সি রাখিতে হইলে দুই উইং-এ দুইটি স্টেট ব্যাংক থাকিবে, একথা ছয়-দফাতেই আছে।

কাজেই অহিংস বিপ্লবের পথে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের যে অটনমি ও সভারেইনটি হাসিল করিয়াছেন, তা ছয়-দফারও খেলাফ নয়, পাকিস্তানের অখণ্ডতারও বিরোধী নয়। কাজে ও কথায় শেখ মুজিব আজ পর্যন্ত পাকিস্তান ভাংগিবার পক্ষে একটি ইংগিতও করেন নাই। বরঞ্চ অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যাঁরা তেইশ বছর ধরিয়া পাকিস্তানের অখণ্ডতার যিকির গাইয়া আসিয়াছেন, সেই কায়েমী-স্বার্থী শাসকচক্রই পাকিস্তান ভাংগিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছেন। আর যে শেখ মুজিব আগরতলায় বসিয়া এবং যে ওয়ালি খাঁ কাবুলে বসিয়া পাকিস্তান ধ্বংস করিতেছিলেন বলিয়া শাসকচক্র অভিযোগ করিয়া আসিতেছিল, আজ সেই শেখ মুজিব ও ওয়ালি খাঁ পাকিস্তান অখণ্ড রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতার আসল দুস্ত-দুশমন কে। দেশবাসী এইবার নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমি ঐ দলভুক্ত মনে করি না। তিনি জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা আগাগোড়াই

করিয়াছেন। তিনি চক্রান্তকারীদের খপ্পরে পড়িয়াছেন সম্প্রতি। আশা করি, তিনি কুচক্রীদের হাত হইতে সবলে মুক্ত হইয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি সমাধা করিবেন। শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কাজটি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিতে হইলে প্রেসিডেন্টরূপে ঐদিন পর্যন্ত ইয়াহিয়ার থাকা দরকার, আশা করি নেতারা এ দিকটাও বিবেচনা করিবেন। গণতান্ত্রিক সরকার, ও মার্শাল ল' সরকার একসংগে চলিতে পারে না। দেশের সাধারণ আইন দেওয়ানী আবাদি ও আইন পরিষদসমূহের এলাকার সংগে মার্শাল ল'র একটা সংঘাত আছে। কিন্তু এই সংঘাতের সীমা-রেখা সুস্পষ্ট। মার্শাল ল' নয়, মার্শাল ল' রেগুলেশন ও অর্ডারগুলিই দেশের সাধারণ আইন ও দেওয়ানী আযাদি সংকুচিত করিয়াছে। শাসনতন্ত্র রচনা অথবা জাতীয় পরিষদ অন্য কোনও বিধান না করা পর্যন্ত মার্শাল ল'র প্রতীকরূপে জেনারেল ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট রাখিয়া এবং সকল মার্শাল ল' রেগুলেশন ও অর্ডার বাতিল করিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নেতাদের সাথে আপোস করিতে পারেন কিনা, ভাবিয়া দেখিবেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই গিরো বাঁধাইয়াছেন। ওটা খুলিতে হইবে তাঁকেই।

ইত্তেফাক, ২১শে মার্চ, '৭১